বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

উৎপত্তিপ্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

ব্রহ্মই মহাবাক্যের প্রভাবে ব্রহ্মবিৎ হন, এ কথার অর্থ এই যে, যিনি এক্ষণে জীব, তিনি চতুর্ব্বিধ মহাবাক্য * শ্রবণজনিত অনন্তাদ্বয়ব্রহ্মাকারা মানসী বৃত্তির (জ্ঞানের) দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া জীবত্ব প্রাপক স্বাশ্রিত অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মভাবে প্রকাশিত হন। তাদৃশ স্বাত্মপ্রকাশের নাম ব্রহ্মজ্ঞান ও স্বতত্ত্বসাক্ষাৎকার। যেমন স্বপ্নের আবির্ভাব, তেমনি, এই দেহেন্দ্রিয়াদি দৃশ্যপ্রপঞ্চের আবির্ভাব। এ আবির্ভাব প্রত্যগাত্মরূপ † পরব্রহ্মে, অন্যত্র নহে। অতএব স্বশব্দের দ্বারা অর্থাৎ "এই চরাচর সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্ম" এইরূপ এইরূপ মহাবাক্যের দ্বারা যিনি কথিত প্রকার স্বাত্মরহস্য অবগত হন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্মবিৎ[১]। যাহা বলিলাম, তাহাই ব্রহ্মবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি দ্ব্যংশ। এক অংশের নাম অধ্যারোপ, অপর অংশের নাম অপবাদ। অধ্যারোপ পদ্ধতিরই একাংশে অর্থাৎ অধ্যারোপ পদ্ধতিতে, ব্রহ্মরূপ আকাশে সৃষ্টি এবং অপবাদ পদ্ধতিতে তাহার ব্রহ্মাবশেষতা বুঝা যায়। ‡ এই সৃষ্টি ব্রহ্মাবশেষ বা ব্রহ্মাকাশে পরিশেষিত (লুপ্ত) হইলেই তখন ইহা কি, কাহার সৃষ্টি, এবং ইহা কিসে আছে, এ সকল

---

* সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, এই ৪ মহাবাক্য ৪ বেদে প্রসিদ্ধ।

† শরীরের মধ্যে যে সর্ব্বদ্রষ্টা চৈতন্য বিরাজিত, যাহা অবলম্বন করিয়া অহং বৃত্তি অর্থাৎ আমি-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই এতৎ শাস্ত্রের প্রত্যগাত্মা।

‡ প্রায় আকাশের অনুরূপ, তাই শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মকে কখন কখন আকাশ নামে উল্লেখ করেন। অধ্যারোপ শব্দে কল্পিত সৃষ্টি এবং অপবাদ শব্দে সেই সেই কল্পনার লয়। কল্পনার লয় হইলে তখন সৃষ্টি থাকে না; কল্পনাধার ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্মার কল্পনায় সৃষ্টি, ব্রহ্মার লয়ে প্রলয়। সেইজন্য এক এক সৃষ্টির নাম এক এক কল্প।

পূর্ব্বপক্ষের তিরস্কার হইয়া থাকে[২]। এই বিষয়ের বিবরণ জ্ঞান, বস্তু, ক্রম ও স্বভাব অনুসারে ব্যক্ত করিব, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[৩]। বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আত্মা চিদাকাশবপু অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ আকাশের ন্যায় নিরাকার এবং তাহা কেবল চৈতন্য। তদ্‌ব্যতীত অন্য কোন আকার নাই। তিনি জীব হইয়া জগৎ দেখিতেছেন, পরন্তু তাহা স্বপ্নদর্শনের অনুরূপ। যেমন, বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে তাহার দর্শন হয়, তেমনি, জগৎ না থাকিলেও তাহার দর্শন ঘটনা হইতেছে। তুমি, আমি, ইত্যাদি ভেদ না থাকিলেও তাহা স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। সেইজন্য স্বপ্নের সহিত সংসারের তুলনা করা হয়[৪]।

আমি তোমার নিকট মুমুক্ষু ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে জগতের উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৫]।

দৃশ্য বা দৃশ্যের জ্ঞান আছে বলিয়াই বন্ধন। সুতরাং দৃশ্যের বা দৃশ্য জ্ঞানের অভাব ঘটনা হইলে তখন আর বন্ধন থাকে না। যে প্রকারে দৃশ্য বা দৃশ্যের জ্ঞান অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা বলি, শ্রবণ কর[৬]।

এই নশ্বর জগতে যে জন্মে, সেই বৃদ্ধি পায়, সেই মরে, সেই মুক্ত হয় এবং স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে[৭]। (ইহাই বদ্ধ জীবের গতি)। যে হেতু তুমি নিজের স্বরূপ না জানায় বদ্ধ আছ, সেই হেতু আমি তোমার নিকট তোমার আত্মবোধার্থ সংসারে তোমার উৎপত্তি হওয়ার প্রকার বর্ণন করিব[৮]। এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য—সংসারের উৎপত্তি। তাহা প্রথমতঃ সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর, অনন্তর ইচ্ছানুসারে ইহার বিস্তারার্থ শ্রবণ করিও[৯]।

স্বপ্ন যেমন সুষুপ্তিতে বিলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎও মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে[১০]। তৎকালে এক-মাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছু থাকে না। সমস্তই লুপ্ত হয়। তখন না তেজ, না অন্ধকার, না নাম, না রূপ, কিছুই থাকে না। কেবল মাত্র সৎ অর্থাৎ প্রলয়কারী পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন[১১]। পণ্ডিতগণ বাগ্‌ব্যবহারার্থ সেই নামহীন পরমাত্মার ঋত, আত্মা, পরব্রহ্ম, সত্য, ইত্যাদি নাম কল্পনা করিয়া থাকেন[১২]। তিনি শুদ্ধচিৎস্বভাব হইলেও সৃষ্টিকালে আপনিই আপনার মায়ায় বিভিন্নরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া বিবিধ নাম সমন্বিত জীব ভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকেন[১৩]।

(তাঁহাকে ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ বলে)। অনন্তর সেই জীবভাব প্রাপ্ত পরমাত্মা আপনার বিবিধরূপ প্রদর্শন বাসনায় প্রথমতঃ মন, তদনন্তর মনন, ইত্যাদি কাল্পনিক ভেদ পরিকল্পন করেন। যেমন সুস্থির সাগর হইতে অস্থির তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তেমনি, নির্ব্বিকার পরমাত্মা হইতে প্রথমে সবিকার মন (হিরণ্যগর্ভের মন) প্রাদুর্ভূত হয়[১৪,১৫]। সেই মন তখন স্বেচ্ছানুসারে প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার কল্পনা করে এবং তাহা হইতেই এই জগদ্রূপ ইন্দ্রিয়জাল বিস্তৃত হইয়া থাকে[১৬]। যেমন কাঞ্চনবলয় কাঞ্চন হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু কাঞ্চন কাঞ্চনবলয় হইতে ভিন্ন; তেমনি, পরমাত্মা এই জগৎ হইতে ভিন্ন না হইলেও ইহা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ ইহা পরমাত্মায় অবস্থিত। পরমাত্মা স্বসত্তায় অবস্থিত; জগৎ তাহার অধীন। অর্থাৎ জগতের পৃথক্ সত্তা নাই। জগতে যে সত্তা (অস্তিতা) আছে, তাহা ব্রহ্মসত্তার অনতিরিক্ত[১৭,১৮]। যেমন মরু-মরীচিকায় নদীতরঙ্গের ভ্রম, তেমনি, পরমাত্মাতেই এই ইন্দ্রজালময় জগতের ভ্রম[১৯]। সেই কারণে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই জগতের অবিদ্যা, সংসৃতি, বন্ধ, মোহ, তম, এই কয়েকটী নাম প্রদান করিয়া থাকেন[২০]।

বৎস চন্দ্রানন রাম! আমি প্রথমে তোমার নিকট বন্ধের স্বরূপ কীর্ত্তন করি, পরে মোক্ষের স্বরূপ বর্ণন করিব[২১]। দর্শনকর্ত্তার দৃশ্য-পদার্থের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার বন্ধন। দ্রষ্টাই দৃশ্যের দ্বারা বদ্ধ এবং দৃশ্যের অভাবে মুক্ত[২২]। "তুমি, আমি" ইত্যাদিবিধ মিথ্যা বিজ্ঞানই জগৎ ও দৃশ্য নামে অভিহিত হয়। যাবৎ ঐরূপ জগৎ বা মিথ্যা জ্ঞান (ভ্রম) বিদ্যমান থাকিবে তাবৎ মুক্তিলাভের আশা করা যায় না[২৩]। কেবল মুখে প্রলাপ বাক্যের ন্যায় "ইহা নাই তাহা নাই এ সকল মিথ্যা" ইত্যাদিবিধ বাক্য উচ্চারণ করিলে দৃশ্যবোধরূপিণী ব্যাধির শান্তি হয় না; অধিকন্তু তাহা বৃদ্ধিই পায়[২৪]। বিচারকগণ বলিয়াছেন, তর্কের কৌশলে, তীর্থের সেবায় ও নিয়মাদির অনুষ্ঠানে দৃশ্যদর্শন ব্যাধির শান্তি হয় না[২৫]। এই দৃশ্য জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকে, তাহা হইলে কদাচ ইহার অন্যথা (না থাকা) হইবে না। কারণ, অসতের সত্তা ও সতের অসত্তা সর্ব্বথা অসম্ভব[২৬]। চিন্ময় আত্মা অচেত্য অর্থাৎ জ্ঞান-সম্পর্কবর্জ্জিত অসার তপস্যাদির অপরিজ্ঞেয়। ইহ শরীরে যিনি আত্মদর্শনে বঞ্চিত, তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মের বলে যেখানে যাইবেন, অবস্থিতি করিবেন,

স্থানেই তাঁহার দৃশ্য দর্শন হইবে। এমন কি পরমাণু মধ্যে
শ করিলেও এরূপ দৃশ্য দর্শন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেক না[২৭]। *
জন্যই আমি জগৎ থাকিলেও তাহার দৃশ্যভাব পরিমার্জ্জন অর্থাৎ
ত্যাগ করিয়াছি। † যেমন "সুরা ভক্ষণে তৃপ্তি নাই" এতদ্রূপ
স্বাধ ব্যতীত সুরাপান পরিত্যক্ত হয় না, তেমনি, "দৃশ্য জগৎ মিথ্যা"
প দৃঢ় বোধ ব্যতীত কেবল তপস্যায়, কেবল দানে, কেবল ধ্যানে
কবল জপে জগৎ দর্শন মন হইতে উন্মার্জ্জিত হইবে না[২৮]। হে
ন্দ্র! যাবৎ জগতের দৃশ্যতা বোধ থাকিবে, তাবৎ, পরমাণু মধ্যে
করিলেও ক্ষুদ্র দর্পণে বৃহৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব পাতের ন্যায় সঙ্কীর্ণতম
দেশে ইহার (জগতের) প্রতিবিম্বপাত হইবেই হইবে[২৯]। চিদ্
(জীব) যেখানেই থাকুক, সেই স্থানেই তাহাতে শরীরাদি ও
, পৃথিবী, নদ, নদী, জল প্রভৃতি, সমস্তই প্রতিবিম্বিত হইবে[৩০]
তন্নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ দুঃখ, জরা, মরণ, জন্ম, এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন
, এই তিন অবস্থা, পদার্থের স্থূল সূক্ষ্ম বিভাগ ও স্থির অস্থির
, সে সকলের অভাব অর্থাৎ লয়, সমস্তই দৃষ্ট হইবে[৩১]। রাম!
মনে করিও না যে, জ্ঞান-নিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি আয়ত্ত
দৃশ্য মার্জ্জন হইবে। কারণ এই যে, সমাধিকালেও সংসারের
থাকে। সমাধিকালেও "আমি দৃশ্য দেখিতেছি না, তাহা মার্জ্জন
অবস্থিতি করিতেছি" এইরূপ বোধ বা বোধসংস্কার বিদ্যমান থাকে।
ন্য সমাধি ভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয়। সেই স্মরণই পুনঃ সংসারের
বীজ এবং সেই বীজ পুনঃ পুনঃ সংসারাঙ্কুর প্রসব করে। যদিও
কল্প সমাধিকালে মানবগণ তুরীয় পদ পাইবে বলিয়া আশা করে,
, দৃশ্য জ্ঞান সম্পূর্ণরূপ লুপ্ত না হওয়ায় নির্ব্বিকল্প সমাধির সম্ভাবনা
অল্প[৩২,৩৩]। যেমন সুষুপ্তির অবসানে সমুদায় পূর্ব্বতন জ্ঞানের

শ্য দর্শনের বীজ ভ্রান্তি, তাহা থাকিতে কুত্রাপি পরিত্রাণ নাই। ভ্রান্তি পরমাণুমধ্যেও
র্বৎ দেখাইতে পারে।

ই জগৎ আছে ও দেখা যাইতেছে, সুতরাং ইহা সত্য, এ ভাব পরিত্যাগ করিতে হয়।
দেখা যাইতেছে না, যাহা আছে ও দেখা যাইতেছে, তাহা আত্মা অর্থাৎ আমি, এই
ভ্যস্ত করিতে হয়। করিলে অল্পে অল্পে দৃশ্যমার্জ্জন হইবে, তখন আর ইহা থাকিলেও
কারণ হইবেক না।

উদয় হয়, তেমনি, সমাধি হইতে উত্থিত হইলেও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখ পরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে[৩৪]। রামচন্দ্র! পুনর্ব্বার অনর্থ ভোগে নিপতিত হইতে হয়, এরূপ ক্ষণিক সমসুখদায়ক সমাধিতে ফল কি[৩৫]। যদি এমন হয় যে, কস্মিন্ কালেও নির্ব্বিকল্প সমাধি ভঙ্গ হইবে না, তাহা অনন্তকালে অনন্ত প্রবাহে স্থিতি করিবে, তাহা হইলে অবশ্য অনাদি অনন্ত সুষুপ্তিসম অমল ব্রহ্ম পদ লাভ হইতে পাবে বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব[৩৬]। কারণ এই যে, মনোনামক মূল দৃশ্য বিদ্যমান থাকিতে যত্নবান্ যোগীরাও দৃশ্য মার্জ্জনে অশক্ত হইয়া থাকেন। নিশ্চিত জানিবে, তাদৃশ চিত্ত যে যে বিষয়ে নিবিষ্ট হইবে সেই সেই বিষয়েই জগদভ্রম থাকিবেই থাকিবে[৩৭]। দ্রষ্টা যদি আপনাকে বলপূর্ব্বক পাষাণ ভাবনায় ভাবিত করিয়া পাষাণপরিণামে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করেন, তাহা হইলে, সে পরিণামের অবসানে পুনর্ব্বার তাহার দৃশ্য দর্শন হইবেই হইবে[৩৮]। অপিচ, এ পর্য্যন্ত কোনও যোগীর নির্ব্বিকল্প সমাধি পাষাণতুল্য স্থিতিপ্রবাহ প্রাপ্ত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই, ইহা অনুভবসিদ্ধ[৩৯]।

নির্ব্বিকল্প সমাধি নিত্যপাষাণতুল্য স্থিতিপ্রবাহ (চিরস্থৈর্য্য) লাভ করে ইহা সর্ব্ববিদিত। করিলেও তাহা (অচেতনপাষাণভাবপ্রাপক সমাধি) সচ্চিদানন্দ অজ অক্ষয় মোক্ষ নামক পরম পদের প্রাপক নহে[৪০]। রামচন্দ্র! তপ, জপ ও ধ্যান করিলে দৃশ্যের বিনাশ, অদর্শন বা পরিহার সাধিত হয় না। দৃশ্য কি? দৃশ্য কেবল আত্মনিষ্ঠ অজ্ঞানের জৃম্ভণ (কল্পনা)। সুতরাং আত্মাশ্রিত অজ্ঞানের বিনাশ ব্যতীত দৃশ্য নাশের সম্ভাবনা নাই[৪১]। যেমন পদ্মবীজের মধ্যে ভবিষ্যৎ পদ্মের দল লুক্কায়িত থাকে, তেমনি, দ্রষ্টাতে (চিদাত্মায়) দৃশ্যবুদ্ধি লুক্কায়িত অর্থাৎ সংস্কাররূপে নিহিত থাকে[৪২]। পদার্থ বিশেষের আশ্রয়ে রস, তিলে তৈল ও কুসুমে প্রমোদ (সুগন্ধ যেরূপ), দর্শনকর্ত্তাতে দৃশ্যবুদ্ধি সেই-রূপ জানিবে[৪৩]। কর্পূরাদি পদার্থ যে স্থানে থাকুক না কেন, সেই সেই স্থানে গন্ধ উদ্ভব করিবেই করিবে। সেইরূপ, জীবভাবাপন্ন চিদাত্মা যে অবস্থায় ও যেখানে থাকুন, তদীয় উদরে জগতের উদ্ভব হইবেই হইবে[৪৪]। সেই প্রদেশেই অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধিতত্ত্ব মধ্যেই স্বপ্নের ও সঙ্কল্পাদির ন্যায় জগতের আবির্ভাব হইয়া থাকে, স্বকীয় অনুভব তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত।

যেমন স্বচিত্তের কল্পনাপ্রভব পিশাচ বালক গণকে বিনাশ করে, তেমনি, এই দৃশ্যরূপিণী রূপিকা (পিশাচী) দ্রষ্টাকেই হনন করিয়া থাকে[৪৫।৪৬]। * যেরূপ বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর উপযুক্ত দেশ কাল প্রাপ্তে কাণ্ড প্রকাণ্ড-যুক্ত (শাখা প্রশাখান্বিত) বৃহৎ বৃক্ষ হয়; সেইরূপ, অন্তঃস্থ চিৎসংযুক্ত চিত্তে সংস্কাররূপে অবস্থিত দৃশ্যজ্ঞানও দেশ কাল ও অবস্থাদিক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়[৪৭]। যেমন বীজাদির উদরে বৃক্ষশক্তি অথবা অপূর্ব্ব কার্য্যশক্তি (অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি) বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ, চিন্মাত্রশরীর জীবের অন্তরে (জীব কি? জীব চিৎ ও অন্তঃকরণ উভয়ের একীভাব। অন্তঃ-করণ মায়িক। এই. মায়িক অন্তঃকরণে) মায়াময় অপ্রতর্ক্য জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে[৪৮]।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

---

* এক শ্রেণীর পিশাচী আছে তাহারা স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া পুরুষ দিগকে মুগ্ধ করতঃ বিনাশ করে। এই শ্রেণীর পিশাচীরা রূপিকা নামে অভিহিতা হয়। বোধ হয়, ইহারাই লিত ভাষায় "পেত্নী"। দৃশ্যদর্শন অর্থাৎ জগদ্দর্শন তাহারই অনুরূপ বলিয়া রূপিকা বলা হইয়াছে। বালকেরা ভূতের ভয়ে বিহ্বল হয়, অনেকে ভয় পাইয়া মরিয়া যায়, পরন্তু ভূত তাহারই অমার্জ্জিত বুদ্ধির কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বালক যেমন নিজ কল্পিত ভূত দেখিয়া মরণ পর্য্যন্ত দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, জীবও স্বীয় কল্পিত দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হয় ও জন্মাদিযুক্ত সংসার নামক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়।

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! তোমার নিকট আকাশজ ব্রাহ্মণের শ্রুতি-
থাবহ উপাখ্যান বর্ণন করি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে উচ্যমান
ঃপত্তিনামক প্রকরণ সম্যকরূপে বোধগম্য করিতে পারিবে[১]।

পূর্ব্বে আকাশজ নামে * প্রজাহিতপরায়ণ ধ্যাননিষ্ঠ পরম ধার্ম্মিক এক
হ্মণ ছিলেন[২]। মৃত্যু ইঁহারে চিরজীবী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগি-
ন, "আমি অবিনাশী। অপিচ, আমি একে একে সকল প্রাণীকেই উদর-
ঃ করি[৩]। কিন্তু কি জন্য এই আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে
রিতেছি না? যেমন শাণিত খড়্গের ধার প্রস্তরে কুণ্ঠিত বা ব্যর্থ
, তেমনি, এই ব্রাহ্মণে আমার সেই ভক্ষণ শক্তি ব্যর্থ হইতেছে
ন? তাহা ভাল করিয়া দেখা যাউক[৪]।" মৃত্যু এইরূপ চিন্তা করিয়া
হ্মণের সংহারার্থ তদীয় পুরে গমন করিলেন। কোনও উদ্যোগশীল
য স্বকার্য্যসাধনে উদ্যম ত্যাগ করেন না; সুতরাং মৃত্যুও স্বকার্য্য-
নের উদ্যোগ ত্যাগ করিলেন না[৫]। বৎস রাম! মৃত্যু তদীয় পুরে
িষ্ট হইবামাত্র, প্রলয়াগ্নিসন্নিভ হুতাশন তাঁহারে দগ্ধ করিতে লাগিল[৬]।
াপি তিনি সেই অগ্নি বিদারণ পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।
ন্তর ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রযত্ন সহকারে তাঁহার হস্তাকর্ষণ করিবার
। করিলেন[৭]। মৃত্যু অতিশয় বলবান ছিলেন, তথাপি সবলে শত হস্ত
ার করিয়াও সেই সঙ্কল্পপুরুষসদৃশ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতে পারি-
না[৮]। তখন তিনি সকল সংশয়ের উচ্ছেদ কর্ত্তা যমের নিকট গমন
ক কহিলেন, প্রভো! আমি কি জন্য আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ
তে পারিতেছি না?[৯] যম কহিলেন, মৃত্যো! তুমি একাকী
াকেও সংহার করিতে সমর্থ নহ। মারণীয় ব্যক্তির মরণোপযোগী

মায়াশক্তিশবলিত ব্রহ্ম আকাশসদৃশ। আকাশে নীলিমা নাই, অথচ তাহা নীল বলিয়া
ন্মে। আকাশ যেমন নীল ভ্রমের আশ্রয়, তেমনি, ব্রহ্মও মায়াসঙ্গের আশ্রয়।
াবে ব্রহ্ম আকাশ সদৃশ বলিয়া আকাশ নামের নামী। যিনি তাঁহা হইতে প্রথম উৎ-
। তিনি আকাশ-সদৃশ হন। এই আকাশ সদৃশ আকাশজ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সামান্য ব্রাহ্মণ
। ইনি পুরাণ বর্ণিত ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ।

কর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহই মারণীয় ব্যক্তিকে সংহার করিতে সমর্থ নহে। কর্ম্মই প্রকৃত মারক, অন্যে প্রকৃত মারক নহে[১০]। তুমি এক কার্য্য কর। তুমি যত্ন সহকারে ঐ মারণীয় বিপ্রের কর্ম্ম সমুদায় অন্বেষণ কর, পরে উহার মারক কর্ম্মের সাহায্যে উহাকে সংহার করিও[১১]।

অনন্তর মৃত্যু আকাশজ দ্বিজের কর্ম্মান্বেষণে যত্নপরায়ণ হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত দিক্, দিগন্ত, সরিৎ, সরোবর, অরণ্য, শৈল, সমুদ্র, দ্বীপ, পুর, নগর, গ্রাম ও রাষ্ট্র প্রভৃতি নানাস্থান পর্য্যটন করিলেন। উদ্ধতস্বভাব মৃত্যু প্রোক্ত প্রকারে সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কোনও স্থানে আকাশজ ব্রাহ্মণের কোনও প্রকার কর্ম্ম দেখিতে পাইলেন না। যেমন কোনও বিজ্ঞ বন্ধ্যাপুত্র দেখিতে পায় না, এক পুরুষ যেমন অন্য পুরুষের মনোরাজ্যস্থ পর্ব্বত দেখিতে পায় না, সেইরূপ[১২।১৩]। তখন তিনি দুঃখিত মনে ধর্ম্মকোবিদ ধর্ম্মরাজ সমীপে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। নিয়ম এই যে, প্রভুরাই অনুজীবী দিগের সংশয়চ্ছেদের অদ্বিতীয় উপায়। সুতরাং মৃত্যু প্রভু সকাশে আসিয়া বলিলেন, প্রভো! আকাশজ বিপ্রের কর্ম্ম সমুদায় কোথায়? নির্দ্দেশ করুন।

ধর্ম্মরাজ অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, মৃত্যো! আকাশজ বিপ্রের কর্ম্ম নাই। এই ব্রাহ্মণ আকাশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সে জন্য ইহার কোনও প্রকার কর্ম্ম নাই[১৬।১৮]। যে আকাশ হইতে জন্মে, সে-ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হয়। সেই জন্য ইহার কোনও রূপ কর্ম্ম বা সহকারী লক্ষিত হইতেছে না[১৯]। প্রাক্তন কর্ম্মের সহিতও ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। * ইহার কোনও প্রকার আকার উৎপন্ন হয় নাই এবং ইহার উৎপত্তিও বন্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তির অনুরূপ[২০]। ইহার জন্মের প্রতি আকাশ ব্যতীত উপাদান না থাকায় ইহাকে আকাশ ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। ইনি কেবল আকাশ হইতে জন্মিয়াছেন সুতরাং ইনিও কেবল আকাশ। যেমন আকাশে মহাবৃক্ষ থাকে না, তেমনি, ইহাতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অভাব দৃষ্ট হয়[২১]। কর্ম্ম না থাকায় ইহার চিত্তও অবশীভূত নহে। কি শরীর কি মানস সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অভাব

---

* মুক্ত হইলে পূর্ব্বের কর্ম্ম (পুণ্য পাপ) দগ্ধ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে তাহার আশ্লেষ হয় না। জল যেমন পদ্ম পত্রে লিপ্ত হয় না, তেমনি, মুক্তাত্মাতে পুণ্য পাপ লিপ্ত হয় না। ব্রহ্মা মুক্তাত্মা।

থাকায় ইনি নির্ম্মল আকাশরূপী ও স্বকারণ আকাশে (ব্রহ্মে) অবস্থিত[২২।২৪]। আমরা ভ্রমবশতঃই ইঁহার প্রাণস্পন্দনাদি দর্শন করিয়া থাকি; বস্তুতঃ ইহার কর্ম্মবুদ্ধি নাই[২৫]। কাষ্ঠপুত্তলিকাকে আপাত দৃষ্টি দ্বারা পুত্তলিকা বলিয়া বোধ হইলেও তাহা যেমন কাষ্ঠ হইতে অভিন্ন; তেমনি, এই দ্বিজও চিদাকাশে উৎপন্ন ও অবস্থিত হওয়ায় ও থাকায় চিদাকাশ হইতে অভিন্ন। যেমন জলে তরলতা, আকাশে শূন্যতা ও বায়ুতে স্পন্দতা স্বভাবতঃই অবস্থিত, তেমনি, ইনিও স্বভাবতঃ পরম পদে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বতন ও অদ্যতন কোনও প্রকার কর্ম্ম না থাকায় ইনি সংসারের অন্তর্গত (সংসারের বশ্য) নহেন। ইনি আপনিই আপনার কারণ। যে সহকারী কারণের সাহায্যে উৎপন্ন হয় না সে স্বকারণ হইতে অভিন্ন। কোন পৃথক্ কারণ বা সহকারী কারণ না থাকায় ইনি স্বয়ম্ভূ নামে বিখ্যাত। (স্বয়ম্ভূ=আপনিই হন)[২৬।৩০]। ইহার পূর্ব্বের ও এক্ষণকার কোন প্রকার কর্ম্ম নাই। অতএব, তুমি কি প্রকারে ইহাকে আক্রমণ করিবে তাহা বল। যে ব্যক্তি আপনাকে স্বীয় কল্পনায় পৃথিব্যাদিভূতবিশিষ্ট অর্থাৎ দেহী বলিয়া জানে; সেই পার্থিব ব্যক্তিকে তুমি গ্রহণ করিতে সমর্থ[৩১।৩২]। এই ব্রাহ্মণ আপনাকে পৃথিব্যাদিময়দেহবিশিষ্ট বলিয়া জানে না। সে প্রকার কল্পনাও কখন করে না। সেই কারণে ইনি সাকার নহেন। সেই কারণে অর্থাৎ নিরাকারতা বিধায় তুমি ইহাকে মারিতে পার না। রজ্জু দৃঢ় হইলেও কোন্ ব্যক্তি আকাশকে বন্ধন করিতে পারে?[৩৩]

মৃত্যু জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আকাশ ও শূন্য একই কথা। শূন্য হইতে কি প্রকারে জন্ম হইল এবং কি প্রকারে তাহার অস্তিতা সিদ্ধ হয়? পৃথিব্যাদি ভূত কাহার থাকে ও কাহার না থাকে তাহাও আমাকে বলুন[৩৪]। যম বলিলেন, মৃত্যো! এই দ্বিজ কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং মরণগ্রস্তও হন না। (অর্থাৎ ইনি মুক্তাত্মা, জন্ম-মরণ-রহিত নিত্যসিদ্ধ অনাদি অনন্ত চিদ্বস্তু)। ইনি কেবল মাত্র বিজ্ঞানপ্রভা। সেই কারণে ইনি নিরাকাররূপে অবস্থিত[৩৫]। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে তখন এই জন্মাদিরহিত সূক্ষ্ম নিরুপাধি সনাতন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তৎপরে অর্থাৎ সৃষ্ট্যারম্ভ কালে তাঁহার পুরোভাগে অদ্রির (অদ্রি=পর্ব্বত) ন্যায় অনিবার্য্য তেজোময়

বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হন। এই দ্বিজ সেই বিজ্ঞানময় বিরাট পুরুষ। সেই সময়ে যে ইহার যৎ কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি উদিত হয়, সেই স্ফূর্ত্তি লক্ষ্য হওয়ায় আমরা মনে করি, ইনি আকারবান্। ফলতঃ আমাদের সে দর্শন বা সে জ্ঞান স্বপ্নসদৃশ অসৎ; তাহা পরমার্থ সৎ নহে[৩৬।৩৮]। ইনি সেই ব্রাহ্মণ—যিনি সৃষ্টিপ্রারম্ভে পরমাকাশের উদরে নির্ব্বিশেষ চিদাকাশরূপে অবস্থান করেন[৩৯]। ইহার দেহ, কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্ব বা প্রাক্তন কর্ম্ম, বা বাসনা, কিছুই নাই। ইনি বিশুদ্ধ চিদাকাশ, কেবল ও জ্ঞানঘন[৪০]। যেমন তেজের প্রভা; তেমনি ইনি বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের প্রভা। অর্থাৎ প্রকাশ[৪১]। সেইজন্য ইনি আকাশ। ইনি সকলেরই অধিগম্য; অথচ কেহই ইহাকে দেখিতে পায় না। যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষাৎ চৈতন্য, তাঁহাকে আবার কে কি দিয়া দেখিবে? যেমন চিদাকাশ, তেমনি ইনি; এবং ইহাকে যে আমরা জানি, আমাদের সে জানাও তদ্রূপ[৪২]। অতএব, কিরূপে ইহাতে পৃথিব্যাদির অবস্থান হইবে এবং কিরূপেই বা ইহার সম্ভব (উৎপত্তি) হইবে? অতএব হে মৃত্যো! ইহার আক্রমণ বিষয়ে তুমি যত্ন পরিত্যাগ কর[৪৩]। কোন্ ব্যক্তি আকাশকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়? অনন্তর মৃত্যু ঐ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ও নিজ ভবনে গমন করিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমার বোধ হয়, আপনি সেই স্বয়ম্ভূ, অজ, একাত্মা, বিজ্ঞানস্বরূপ প্রপিতামহ ব্রহ্মারই কথা বলিলেন[৪৪।৪৫]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! হাঁ আমি তোমাকে সেই সনাতন ব্রহ্মার কথাই বলিয়াছি। পূর্ব্বে মৃত্যু ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে যমের সহিত তাঁহার ঐরূপ কথোপকথন হইয়াছিল[৪৬]। মন্বন্তরকালে মৃত্যু যখন সর্ব্বভক্ষ হইয়া সমুদায় প্রজা বিনষ্ট করিতেছিলেন, সেই সময়ে বলপূর্ব্বক ব্রহ্মাকেও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন[৪৭]। যে যাহা নিত্য করে, সে অভ্যাস বশতঃ অনুদিন তাহাই করিতে উদ্যত হয়। মৃত্যুও অভ্যাস বশতঃ অমৃত্যু ব্রহ্মার আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাই ধর্ম্মরাজ মৃত্যুকে শাসন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে[৪৮] এই ব্রহ্মা আকাশশরীর, ইহাকে তুমি কিরূপে আক্রমণ করিবে? ইনি সঙ্কল্পপুরুষের ন্যায় অবস্থিত ও পৃথিব্যাদিরহিত সুতরাং আকারবর্জ্জিত[৪৯]। যিনি কেবল মাত্র চিদাকাশ ও অনুভবরূপী, তিনি চিদাকাশ (ব্রহ্ম)

ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। তাঁহার কারণ (জনক) নাই এবং তিনি কাহার কার্য্যও (উৎপদ্য) নহেন[৩০]। যেমন এই ভৌতিক আকাশে পার্থিব আকার (যেন ইন্দ্রনীল নির্ম্মিত কটাহ উপুড় করা আছে বলিয়া) প্রকাশ পায়, যেমন মনোমধ্যে সঙ্কল্পরচিত মহাপুরুষ মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি পায়, তেমনি, ইনিও আপনিই আপন চিদাকাশে পৃথিব্যাদিবর্জ্জিত অনির্দ্দেশ্য আকারে প্রকাশমান হন। সেই কারণে ইঁহাকে স্বয়ম্ভূ বলা হয়[৩১]। এই স্বয়ম্ভূ নির্ম্মল আকাশে মুক্তাশ্রেণীর অনুরূপে অথবা স্বাপ্ন ও মনোরাজ্যস্থ পুরুষের অনুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন[৩২]। ইনি পরমাত্মাই, সেই কারণে ইঁহাতে দৃশ্য নাই, দ্রষ্টা নাই, এবং অন্য কিছু নাই; অথচ ইনি ভাসমান বা প্রকাশমান থাকেন। ইনি কেবলমাত্র সঙ্কল্পশরীর; সেইজন্য ইঁহাকে মনোব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই পুরুষ সেই সঙ্কল্পাকাশরূপী; সেই কারণে ইঁহাতে পরভবিক (যাহারা পরে হয় তাহারা পরভবিক) পৃথ্যাদি নাই[৩৩।৩৪]।

যেমন চিত্রকরের অন্তঃকরণে দেহহীন পুত্তলিকা উদিত হইতে থাকে, তেমনি, এই ব্রহ্মাও নির্ম্মল চিদাকাশে উদিত বা রাজমান হন[৩৫]। আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত একমাত্র চিদাকাশরূপে প্রকাশমান এই স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বকীয় চিত্তের (বিষয়প্রকাশক সামর্থ্যের) দ্বারা সঙ্কল্পশরীরী হইয়া আকাশীয় পুরুষের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন সত্য; পরন্তু ইঁহার শরীর বন্ধ্যাসুতের ন্যায় মিথ্যা[৩৬]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি মন'কে, (এ মন মহত্তত্ত্ব ইন্দ্রিয়াত্মক মন নহে) শুদ্ধ অর্থাৎ পৃথ্ব্যাদি বর্জ্জিত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু মহর্ষে! যেমন তোমার, আমার এবং অন্যান্য ভূতগণের প্রাক্তনী স্মৃতি (পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার) শরীরাদি উৎপত্তির কারণ হয়, তেমনি, ব্রহ্মার উৎপত্তিতে প্রাক্তনী স্মৃতি কারণ না হয় কেন? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১।২]। বশিষ্ঠ কহিলেন, যাহার পূর্ব্বকর্ম্ম-সমন্বিত আদিশরীর (লিঙ্গদেহ) বিদ্যমান থাকে, তাহার পক্ষেই প্রাক্তনী স্মৃতি সংসারস্থিতির কারণ হয়[৩]। যখন ব্রহ্মার পূর্ব্বসঞ্চিত কোন কর্ম্মই নাই, (সমস্তই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে), তখন তাঁহার প্রাক্তনী স্মৃতি কোথা হইতে আসিবে? অতএব, ইনি আপনিই আপনার কারণ, ইঁহাতে অন্য কোন কারণের অবসর নাই[৪।৫]। হে রামচন্দ্র! স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আতিবাহিক নামে একই শরীর লক্ষ্য হয়, আধিভৌতিক শরীর ইঁহার নাই[৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সকল প্রাণিরই আতিবাহিক এবং আধিভৌতিক এই দুইটী শরীর আছে; কিন্তু ব্রহ্মার এক শরীর। ইহার কারণ কি তাহা বিশেষ করিয়া বলুন[৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সমুদায় সকারণ (পঞ্চীকৃতভূতোৎপন্নদেহাদিবিশিষ্ট) প্রাণীর আতিবাহিক ও আধিভৌতিক এই দুই শরীর আছে; পরন্তু কারণাভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মার আধিভৌতিক শরীর নাই। তাঁহার একই শরীর[৮]। ইনি সকল ভূতের কারণ; অথচ ইঁহার কোন কারণ নাই। তাই ইনি একদেহী, দ্বিদেহী নহেন[৯]। ইঁহার ভৌতিক দেহ নাই, ভৌতিক দেহ না থাকায় ইনি কেবল মাত্র আতিবাহিক শরীরে আকাশের সমানে ভাসমান আছেন[১০]। পৃথ্ব্যাদিরহিত চিত্তমাত্রশরীর (চিত্ত=সঙ্কল্প) প্রজাপতি যে সকল প্রজা সৃজন করিয়াছেন,[১১] সেই সমস্ত প্রজাও চিদাকাশ স্বরূপ প্রজাপতি ভিন্ন অন্যকারণসম্ভূত নহে। কারণ এই যে, যে যে বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় সে সেই বস্তুরই অনুরূপ

হয়[১২]। চিৎশরীর ও বোধস্বরূপ নির্ব্বাণ পুরুষ সমুদায় সংসারী জীবের আদি প্রস্পন্দ; এবং তাহা হইতেই প্রথম অহংভাবের উদয় হইয়া থাকে[১৩।১৪]। যেমন সূক্ষ্ম অনিল হইতে স্থূলতর প্রতিস্পন্দ উৎপন্ন হয়, তেমনি, সেই প্রাচীন বা প্রথম প্রতিস্পন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে এই সমস্ত প্রজা বিস্তৃত হইয়াছে[১৫]। পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি প্রতিভাসিক আকার বিশিষ্ট ব্রহ্মা হইতে জন্ম লাভ করায় প্রতিভাসিক আকার বিশিষ্ট সত্য; পরন্তু ইহা সত্য বলিয়া জীবের গোচরে অবস্থিত আছে। অথবা চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে জন্ম লাভ করায় চিদ্রূপী হইলেও ইহা জড়াকারে প্রকাশ পাইতেছে[১৬]। অসদ্বস্তু যে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নান্তর্গত স্বপ্নমৈথুন। যেমন স্বপ্নে স্ত্রীসঙ্গম স্বপ্ন দেখা যায়, তাহাতেও ধাতুক্ষয় ঘটনা হয়, তেমনি, ব্যবহার ও প্রয়োজন নিষ্পত্তি দৃষ্টে অসত্য পদার্থেও সত্যতুল্য ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে। অতএব, স্বপ্নে স্ত্রীসঙ্গম-স্বপ্ন সম্পূর্ণ অলীক বা মিথ্যা হইলেও তাহা হইতে যেমন সত্যবৎ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয়, তেমনি, প্রতিভাসমাত্র আকৃতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন প্রতিভাসরূপী এই সৃষ্টিও সত্যবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন করিতেছে[১৭]। সমুদায় ভূতের ঈশ্বর ব্যোমশরীর স্বয়ম্ভূ দেহবিহীন হইয়াও সৃষ্টিবিস্তার দ্বারা দেহীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন[১৮]। ইনি সঙ্কল্পরূপতা ও স্বীয় স্বরূপের স্বায়ত্ততা প্রযুক্ত কখন অনুদিত ও কখন সমুদিত হন[১৯]। ঈদৃশ স্বভাব পৃথ্ব্যাদিরহিত চিত্তমাত্রাকৃতি সঙ্কল্পপুরুষ ব্রহ্মাই ত্রিজগৎ স্থিতির কারণ[২০]। প্রাণিগণের কর্ম্ম অনুসারে তাঁহার সঙ্কল্প যখন যে আকারে বিকসিত হয় তখন তিনি সেই আকারেই প্রতিভাত হন। যেমন তোমার সঙ্কল্পে (মন যখন পর্ব্বত ভাবে তখন সে পর্ব্বতরূপে প্রতিভাত হয়) তুমি প্রতিভাত হও, তেমনি,[২১] সংসারস্থ জনগণ দৃঢ় অন্তর্ব্বিস্মৃতির দ্বারা স্বীয় আতিবাহিক দেহ (আপনার নিরাকারতা) ভুলিয়া গিয়া পিশাচাবিশিষ্টের ন্যায় বৃথা আধিভৌতিক দেহের বোধে বিমোহিত হইতেছে[২২]। বিরিঞ্চির উক্তপ্রকার রূপ সেই বিশুদ্ধ মহাচৈতন্যাত্মক পরব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ মায়ার সম্বলনে (সাহায্যে) প্রথম উদ্ভূত এবং তাহা সমুদায় স্থূলপ্রপঞ্চের মূল কারণ। অপিচ, এই বিরিঞ্চি মূর্ত্তি-ই পরব্রহ্মের সত্য সঙ্কল্পপ্রধান আবির্ভাব, সেই কারণে ইনি অস্মদাদির ন্যায় আতিবাহিক বিস্মৃত নহেন[২৩]। প্রথমে আধিভৌতিক সমূহ উৎপন্ন হয় না।

সেই কারণে আধিভৌতিক সমূহের দ্বারা তাঁহাতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা জড়তার আবেশ অসম্ভব[২৭]। যেহেতু প্রজাবীজ ব্রহ্মা মনোমাত্র ও পৃথ্ব্যাদিময় নহেন, সেই হেতু তদুৎপন্ন এই বিশ্বও বস্তুতঃ মনোময় ভিন্ন অন্য কিছু নহে[২৫]। যেহেতু সেই বাস্তব জন্ম রহিতের কোনও কিছু সহকারী কারণ নাই, সেইহেতু তাঁহা হইতে যাহারা সমুৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগেরও সহকারী থাকার সম্ভাবনা নাই[২৬]। যেহেতু কার্য্য-কারণের বাস্তব ভেদ নাই; যাহা কার্য্য তাহাই কারণ; সেই হেতু এই জগৎ কার্য্য বাস্তবপক্ষে কারণাতিরিক্ত নহে (কারণ=ব্রহ্ম)। অহে রামচন্দ্র! এই জগতে যখন কার্য্য ও কারণ পদার্থের সত্য পার্থক্য নাই, তখন অবশ্যই ইহা সেই ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত। যেমন জলের আন্দোলনে তরঙ্গ, তেমনি, ব্রহ্মার সঙ্কল্পে বিশ্ব। যেমন মনে নগরের সৃষ্টি ও গন্ধর্ব্বপুর প্রভৃতি অলীক বিষয় উদিত হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মার মনন দ্বারা এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে[২৭।৩০]। প্রবুদ্ধমতি (অজ্ঞানমুক্ত) ব্রহ্মার আধিভৌতিক দেহের কথা দূরে থাকুক, বাস্তবপক্ষে তাঁহার আতিবাহিক দেহও নাই। ব্রহ্মা কেন? যাঁহারা প্রবুদ্ধ—তাহাদের কাহারও নাই। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গের অভাব, সেইরূপ, তাঁহাদের চিতি-শক্তিতে দেহের (দেহাভিমানের) অভাব অবধারিত হ্য়েছে[৩১।৩২]। এই জগৎ বিরিঞ্চ্যাকারধারী মনোনামক আদি জীবের মনোরাজ্য বা মনের বিজৃম্ভণ হইলেও ইহা অজ্ঞ দিগের দর্শনে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে[৩৩]। যেহেতু মনঃই বিরিঞ্চি, সেইহেতু তিনি কেবল সঙ্কল্প। সঙ্কল্পবপুঃ বিরিঞ্চি সঙ্কল্প বিস্তার করিয়াই এ সকল সৃজন করিয়াছেন[৩৪]। মনই ব্রহ্মার রূপ বা বপু; সেইজন্য তাঁহাতে পৃথ্ব্যাদি ভূতের অবস্থান নাই; পরন্তু তাঁহারই দ্বারা এই সকল পৃথিব্যাদি ভূত কল্পিত হইয়াছে[৩৫]। যেমন পদ্মমধ্যে (বীজ) পদ্মান্তর, তেমনি, মনের মধ্যে দৃশ্য। মন ও দৃশ্যদ্রষ্টা একই বস্তু; বিভিন্ন বস্তু নহে[৩৬]। যেমন তোমার মনোমধ্যে সঙ্কল্প ও চৈত্তরাজ্য অবস্থান করে, এবং তোমার হৃদয় দৃশ্যের আধার, তেমনি তাঁহারও মনোমধ্যে দৃশ্যের অবস্থিতি এবং ইহারই হৃদয় হইতে দৃশ্যের (জগতের) উৎপত্তি[৩৭]। অতএব, যেমন বালকচিত্তকল্পনাসমুথ পিশাচ (ভূত) বালককে বিভীষিকা দেখায়, তেমনি, দ্রষ্টারই অন্তঃকল্পিত দৃশ্য দ্রষ্টাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে। যেমন বীজের অন্তরস্থ অঙ্কুর দেশ-

কালপ্রাপ্তে বৃহদাকার ধারণ করে; তেমনি, স্বীয় অন্তঃস্থ দৃশ্যবোধই দেশ কাল প্রাপ্তে স্থূল হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়[৩৮।৩৯]।

হে রামচন্দ্র! দৃশ্য যদি সত্যসত্যই থাকে তাহা হইলে কদাচ দৃশ্য-দুঃখের শান্তি হয় না। আবার দৃশ্য দুঃখের শান্তি না হইলেও দ্রষ্টা কেবল হন না। পণ্ডিতগণ বলেন, দৃশ্য দর্শন না হইলেই বোদ্ধৃবোধ্যভাব-বিনাশ প্রাপ্ত হয়, বোদ্ধৃবোধ্যভাব অভাব গ্রস্ত হইলে দ্রষ্টা তখন এক হয়। দৃশ্য থাকে থাকুক, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, পরন্তু তাহার জ্ঞানের উপশম আদরণীয়। কেননা দৃশ্যজ্ঞানের উপশম (বা অদৃশ্যের অদর্শন) হওয়াই মোক্ষ[৪০]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।
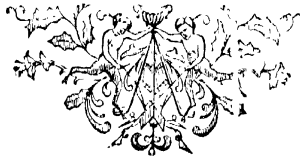
চতুর্থ সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, বৎস ভরদ্বাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ যখন এইরূপ জ্ঞান-গর্ভ উৎকৃষ্ট বচনপরম্পরা কহিতে ছিলেন তখন তৎশ্রবণে উপস্থিত জনগণ তুষ্ণীম্ভূত ও একতানমনা হইয়াছিলেন[১]। স্পন্দহীনতা প্রযুক্ত তাঁহাদিগের কটিতটস্থিত কিঙ্কিণীজাল শব্দরহিত হইয়াছিল। অপিচ, পিঞ্জরস্থিত হারীত (একপ্রকার পক্ষী) ও শুকপক্ষী সকল ক্রীড়াবিরত হইয়াছিল[২]। বিলাসপরায়ণ রমণীগণ বিলাস বিস্মৃত হইয়া এমন স্থির-ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল যে যেন তাঁহারা এক একটা চিত্রনির্ম্মিত পুত্ত-লিকা। অধিক কি বলিব, রাজসদ্মসহিত যাবতীয় প্রাণী ভিত্তিন্যস্ত চিত্রের ন্যায় অবস্থিত ছিল[৩]। ক্রমে বেলা মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট রহিল দেখিয়া রবিকিরণ ও লৌকিক ব্যবহার অস্তভাব ধারণ করিল[৪]। প্রফুল্ল-কমল-সুরভিবাহী সমীরণ যেন বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণার্থ সমাগত হইয়া মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল[৫]। সূর্য্যদেব যেন বশিষ্ঠবাক্যের অর্থাবধারণার্থ জগদ্‌ভ্রমণ পরিহার পূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশস্থ গিরিতটে গমন করিলেন[৬]। সমভাব বা শান্তিদেবতা যেন জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অন্তঃশীতল হইয়া সর্ব্বত্র সমশীতল করিলেন[৭]। জনগণ মনোযোগের সহিত বশিষ্ঠবাক্য শুনিবার জন্য নিশ্চেষ্ট হওয়ায় বোধ হইল, যেন লোক সকল সত্ত্বশূন্য হইয়াছে[৮]। তৎকালে সকল বস্তুরই ছায়া দীর্ঘ হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যে, যেন তাহারা উন্নতস্কন্ধ হইয়া বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিতেছে[৯]।

এই সময়ে রাজপুরকর্ম্মচারী প্রধান ভৃত্য সভা মধ্যে উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে মহারাজ দশরথকে কহিল, দেব! স্নান পূজার সময় অতিক্রান্ত হইতেছে; গাত্রোত্থান করুন[১০]। এই সময়ে ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠদেবও প্রস্তাবিত বাক্য উপসংহার করতঃ "মহারাজ! আজ্ এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলেন,[১১] অবশিষ্ট কল্য প্রাতে বলিব।" এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন রাজা দশরথও তদীয় বাক্য শ্রবণ করতঃ "তাহাই হইবে" বলিয়া ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকামনায় পুষ্প, পাদ্য, অর্ঘ ও দক্ষিণা

দান ও যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনাদির দ্বারা সমাদর পূর্ব্বক দেব, ঋষি, মুনি ও দ্বিজ দিগকে পূজা করিলেন[১২।১৩]। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল। সভাস্থ রাজন্যগণ, মুনিগণ ও অন্যান্য সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন, দান করিতে লাগিলেন। সভ্য দিগের মুখমণ্ডল রাজাদিগের আভরণ রত্নের প্রভায় উদ্ভাসিত হইল। পরস্পরের অঙ্গসজ্ঘট্টনে কেয়ূর ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারের মনোহর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। সকলেরই বক্ষঃ ও স্তনান্তরাল হার ভারে ও স্বর্ণজড়িত বসনে সুখ-মান্বিত[১৪।১৫]। বশিষ্ঠ বাক্যের অর্থাবধারণার্থ তত্রস্থ সমুদায় লোকের ইন্দ্রিয় নিচয় যেন প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল এবং মধুপগণ তাঁহাদের শিরোপরি কুসুমদাম বিরাজিত কেশপাশপ্রসরে বিশ্রান্ত মনে উপবিষ্ট হইয়া গুণ গুণ ধ্বনি করাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই সমস্ত কেশকলাপ মৃদু মধুর গীতধ্বনি করিতেছে[১৬]। আরও দেখা গেল, দিঙ্-মণ্ডল যেন প্রদীপ্ত কনকাভরণ কিরণে সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল হইয়াছে[১৭]। দেখিতে দেখিতে বিমানচারিগণ আহ্নিক কৃত্য করণার্থ বিমানে ও ভূতল-বাসিগণ ভূপৃষ্ঠস্থ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন[১৮]। যেমন মধ্যযৌবনা নারী জনকোলাহল নিবৃত্ত হইলে ধীরে ধীরে পতিমন্দিরে গিয়া দেখা দেয়, তেমনি, সভাস্থ জনগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলে শ্যামবর্ণা রজনী জগন্ম-ন্দিরে আগমন করতঃ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগিলেন[১৯]। দিবস-নায়ক (সূর্য্য) এখন অন্য দেশে আলোক প্রদান করিতে গিয়াছেন। সর্ব্বত্র আলোক প্রদান করা সৎপুরুষের ব্রত[২০]।

ক্রমে তারানিকরধারিণী সন্ধ্যা সমাগতা হইলেন। কিংশুক প্রভৃতি কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়াতে বনরাজি বসন্তসদৃশশোভা ধারণ করিল। যেমন চিত্তবৃত্তি সকল নিদ্রায় বিলীনা হয়, তেমনি, পক্ষিগণ এখন চূত ও কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষের পল্লবান্তরালে বিলীন হইল[২১।২২]। মেঘখণ্ডে প্রভাকর-প্রভা নিপতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, তাহা যেন কুম্কুমরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। আরও বোধ হইল, শ্রীমান্ পশ্চিম পর্ব্বত (অস্তগিরি) যেন সূর্য্যকিরণরূপ পীতবস্ত্র ও তারা-হার পরিধান করতঃ আকাশে প্রবেশ করিতেছেন[২৩]। ক্রমে সমাগতা সন্ধ্যা দেবী যথাবিধি পূজাভাগ গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিগ্রহবান্ ভূতের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার আসিয়া দেখা দিলেন। নীহারকণবাহী শীতল সমীরণ মৃদুমন্দ

সঞ্চার দ্বারা পল্লব ও কুসুম সমূহ সঞ্চালন করতঃ বহমান হইতে লাগিল। তারকাবৃন্দ নীহারপাতে আচ্ছন্ন হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন দিগঙ্গনাগণ পতিবিয়োগবিধূরা দীর্ঘকৃষ্ণকেশী বিধবা রমণীর ন্যায় দিবাকরবিরহে কাতরা হইয়া নীহাররূপ অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে (কাঁদিয়া কাঁদিয়া) অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর দেখিতে পাইতেছেন না[২৪।২৬]। দেখিতে দেখিতে ভুবন অমৃতময়াকার চন্দ্রের কিরণরূপ দুগ্ধ প্রবাহে প্রপূরিত হইল। জ্ঞানোপদেশ শ্রবণে অজ্ঞতারূপ তিমির পটল কোথায় পলাইয়া গেল তাহার চিহ্নও থাকিল না[২৭।২৮]। ঋষিগণ, দ্বিজগণ ও ভূমিপালগণ স্ব স্ব স্থানে গমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন[২৯]। ক্রমে যমশরীরসমা শ্যামবর্ণা তিমিরমাংসলা বিভাবরী দেশান্তরে গমন ও নীহারবিপুলা উষা আগমন করিলেন[৩০]। নভোমণ্ডলস্থ তারকাগণ তখন অন্তর্হিত হইল ও নিপতিত কুসুমরাশি তখন প্রভাত পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইতে লাগিল[৩১]। যেমন মহাত্মাদিগের অন্তঃকরণে বিবেকবৃত্তি (বুদ্ধি) অভিনবরূপে উদিত হয়, তেমনি, সর্ব্বলোকলোচন প্রভাকর পুনর্ব্বার অভিনবরূপে লোকপঞ্জের নয়নগোচর হইলেন[৩২]। উদয়াচল এখন পূর্ব্বোক্ত অস্তকালীন অস্তাচলের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন[৩৩]। এ দিকে পুনর্ব্বার সেই সকল নভশ্চর ও মহীচরগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বানুক্রমে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত ও পূর্ব্বের ন্যায় সন্নিবেশে উপবেশন করিলেন[৩৪]। সভা পূর্ব্ববৎ নীরব ও নিস্পন্দ হইল—বায়ুসঞ্চারশূন্য সরোবরস্থ পদ্মিনী সমূহের ন্যায় সুদৃশ্য হইল[৩৫]।

অনন্তর রামচন্দ্র কথা প্রসঙ্গ অবলম্বন করতঃ বাগ্মিপ্রবর বশিষ্ঠদেবকে বিনয়নম্র মধুর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, ভগবন্! যাহা হইতে এই অশেষ দোষাকর বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে সেই মনের স্বরূপ কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন[৩৬।৩৭]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! প্রস্তাবিত মনের কোনও প্রকার রূপ দৃষ্ট হয় না। কেবল তাহার নামই শুনা যায় এবং তজ্জনিত একপ্রকার বিকল্প জ্ঞানও + হইয়া থাকে। যেমন আকাশ। আকাশের কোনও প্রকার রূপ ও আকার নাই। অথচ তাহার নাম আছে। উক্ত উভয়ই শূন্যাকার ও জড়[৩৮]। প্রস্তাবিত মন

+ বিকল্পজ্ঞান — [illegible] অথচ নাম আছে, এরূপ শাব্দ জ্ঞান। শব্দ শ্রবণের পর যে এক [illegible] তাহা। যেমন [illegible] পৃথক্ নহে শিরই রাহু, অথচ শব্দানুসারে বোধ

কি বাহিরে কি হৃদয়ে কোথাও সদ্রূপে বিদ্যমান নহে। অথচ তাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রই অবস্থিত আছে[৩৯]। তাদৃশ মন হইতে মৃগতৃষ্ণিকা সলিলের ন্যায় এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার রূপ দ্বিচন্দ্র দর্শনের ন্যায় ভ্রান্ত। অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানই তাহার আকার[৪০]। * পূর্ব্বে নহে, পরেও নহে; মধ্যে যে সৎ অথবা অসৎ বস্তু বিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাই মনের আকার, ইহা অবগত হও। অর্থাৎ যাহা অন্তরে ও বাহিরে বস্তুর আকারে প্রকাশ পায় তাহাই মন। এতদ্ব্যতীত মনের অন্য আকার নাই[৪১।৪২]। অথবা সঙ্কল্পই মন। যেমন দ্রবত্ব হইতে সলিল ও স্পন্দতা হইতে বায়ু ভিন্ন নহে, সেইরূপ, মনও সঙ্কল্প হইতে ভিন্ন নহে[৪৩]। যাহাতে সঙ্কল্প তাহাই মন সুতরাং সঙ্কল্প ও মন ভিন্ন নহে[৪৪]। সত্য হউক অথবা অসত্য হউক, পদার্থাকারে প্রকাশ হওয়াই মন এবং এই মনঃই লোকপিতামহ[৪৫]। আতিবাহিক দেহরূপী (আতিবাহিক=কল্পনাময়) লোকপিতামহ ব্রহ্মা শাস্ত্রে মন নামে উক্ত হইয়াছেন এবং ইনিই আধিভৌতিকী বুদ্ধি (স্থূল দেহের জ্ঞান) বিধান করেন[৪৬]। † সেইজন্য এই দৃশ্য প্রপঞ্চের অবিদ্যা, সংসৃতি, চিত্ত, মন, বন্ধন, মল এবং তমঃ প্রভৃতি অনেক নাম আছে[৪৭]। হে রামচন্দ্র! এতদ্দৃশ্য ব্যতিরেকে মনের অন্য কোনপ্রকার রূপ নাই। এবং দৃশ্যও বাস্তব পক্ষে উৎপন্ন হয় নাই; একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার বলিতেছি,[৪৮] যেমন কমলবীজে কমলবল্লরী অবস্থিতি করে, সেইরূপ, চিৎপরমাণুর মধ্যে দৃশ্য অবস্থিতি করে। যেমন প্রকাশ্য বস্তুতে আলোক, বায়ুতে চপলতা, এবং জলে তরলতা, সেইরূপ, দ্রষ্টাতে অর্থাৎ নিতান্ত দুর্লক্ষ্য পরমাত্মায় দৃশ্যবুদ্ধির অবস্থান নৈসর্গিক বলিয়া জানিবে[৪৯।৫০]। সুবর্ণে বলয়, মৃগনদীতে (রৌদ্রের সময় মরুভূমিতে যে জলপ্রবাহের ভ্রম হয়, তাহাই মৃগনদী) জল এবং স্বপ্নদৃষ্ট অট্টালিকার ভিত্তি যদ্রূপ অলীক, দ্রষ্টাতে দৃশ্যবুদ্ধি তদ্রূপ অলীক[৫১]। অহে রামচন্দ্র! দৃশ্য সকল যে দ্রষ্টায় উক্ত প্রকার অভিন্নভাবে অবস্থিতি

হয়, যেন তাহা একটা পৃথক্ বস্তু।

* অর্থাৎ পারমার্থিক রূপ না থাকিলেও ব্যবহারের উপযুক্ত কল্পিত রূপ আছে। কল্পিত রূপ পরশ্লোকে বলা হইবে।

† আগে সূক্ষ্মপ্রপঞ্চ, তৎপরে স্থূলপ্রপঞ্চ। সূক্ষ্ম ভূত দীর্ঘকাল সত্তাবস্থান করায় ক্রমনিয়মে পঞ্চীকৃত হইয়া (পাঁচে পাঁচ মিশিয়া) এই স্থূল ভূত ও তদাকারা বুদ্ধি জন্মিয়াছে ও জন্মাইয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মক মনোনামক ব্রহ্মাই স্থূলপ্রপঞ্চের কর্ত্তা অর্থাৎ স্রষ্টা।

করিতেছে, তাহা তুমি অচিরাৎ বোধগম্য করিতে পারিবে। শীঘ্রই আমি তোমার চিত্তদর্পণের উক্ত মালিন্য উন্মার্জ্জন করিব। (তোমার চিত্ত যে দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ দেখিতেছে তাহাই তোমার চিত্তের মালিন্য। তাহা পরিমার্জ্জিত হইলে তখন আর দৃশ্য দর্শন হইবে না এবং তখন তুমি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইবে)[৫২]। দৃশ্য দর্শনের অভাব হইলে দ্রষ্টা যে (দ্রষ্টা=দর্শনকর্ত্তা) অদ্রষ্টা হয়, তাহাকেই তুমি কৈবল্য বলিয়া জানিবে। কৈবল্যকালে এ সমস্তই সদ্রূপ আত্মায় অবশেষিত হয়[৫৩]। যেমন বায়ুর স্পন্দন স্থগিত হইলে বনলতাদি নিষ্কম্প হয়, স্থির হয়, তেমনি, কেবল হইলে অর্থাৎ একাত্মনিমগ্নতা বশতঃ চিত্তস্পন্দন অপগত হইলে তখন চিত্তস্থ রাগদ্বেষাদি ও তদ্বাসনানিচয় অন্তর্হিত হইয়া থাকে[৫৪]।

যে প্রকাশে (চৈতন্যময়জ্ঞানে) দিক্, ভূমি, আকাশ, ইত্যাদি প্রকাশ্য (জ্ঞেয়) প্রকাশ পাইতেছে, সে প্রকাশ প্রকাশ্যহীন অর্থাৎ দিগাদিহীন হইলে মদুক্ত নির্ম্মল আত্মপ্রকাশের উদাহরণ হইতে পারে[৫৫]। যখন তুমি, আমি, এজগৎ, সমুদায় দৃশ্য অসৎ বলিয়া বোধগম্য হইবে তখনই জানিবে, দর্শক মলশূন্য ও কেবল হইয়াছেন[৫৬]। যেমন দর্পণে শৈল প্রভৃতি বহিঃপদার্থের প্রতিবিম্ব না পড়িলে দর্পণ কেবল হয়, তেমনি, দ্রষ্টায় তুমি, আমি, জগৎ, এ ভাব উন্মার্জ্জিত হইলে বা এ দর্শন না থাকিলে দ্রষ্টারও আত্মকৈবল্য জন্মে[৫৭,৫৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যাহা সৎ অর্থাৎ আছে, তাহা নষ্ট হইবার নহে। যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহারও ভব অর্থাৎ উৎপত্তি অসম্ভব। এই অশেষদোষপ্রদায়ী দৃশ্য যে অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহা আমি বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। * সেইজন্য আমার জিজ্ঞাসা—কি প্রকারে আমার ভ্রমকারিণী ও দুঃখসন্ততিদায়িনী দৃশ্যবিসূচিকার শান্তি হইবে?[৫৯,৬০] বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে দৃশ্যপিশাচ নিবারণের মন্ত্র বলি, শ্রবণ কর। শুনিলে সমুদায় দৃশ্য পিশাচ তিরোহিত হইবে[৬১]। রাঘব! যাহা আছে তাহা আত্যন্তিক বিনষ্ট হয় না

* ভাবার্থ এই যে, বিশ্ব অসৎ হইলে সৃষ্টি অসম্ভব এবং সৎ হইলে বাধ অসম্ভব। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, বিশ্ব আছে, তখন কি প্রকারে ইহা উন্মার্জ্জিত হইতে পারে? কি প্রকারেই বা ইহাকে নাই বলিয়া ভাবিতে পারি?

সত্য, পরন্তু দৃশ্যের স্বতঃসিদ্ধ অস্তিতা অসম্ভব। যাঁহারা বলেন, কোনও বস্তুর আত্যন্তিক বিনাশ হয় না, পর পর অবস্থার দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা আচ্ছন্ন বা পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র, তাঁহাদের মতে অদর্শন প্রাপ্ত দৃশ্যের বীজ (সংস্কার) বুদ্ধিতে (সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিতে এবং মহাপ্রলয়ে প্রকৃতিতে) অবস্থিত থাকে[৬২]। সেই বীজ (সেই সংস্কারীভূত জগৎ) আবার চিদাকাশে পুনর্ব্বার লোক ও শৈল প্রভৃতি সহ পূর্ব্ববৎ দোষাকর দৃশ্য প্রকাশ করায় (দেখায়)[৬৩]। সুতরাং তন্মতে মোক্ষ অসম্ভব হইয়া উঠে। অথচ অনেক জীবন্মুক্ত দেবতা, ঋষি ও মুনিদিগের অবস্থান দৃষ্ট হয়[৬৪]। অতএব, জগৎ যদি সত্য সত্যই থাকিত তাহা হইলে কদাচ কাহার মোক্ষ হইতে পারিত না। দৃশ্য বাহিরে থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; পরন্তু তাহা থাকাই নাশের কারণ। (অর্থাৎ অন্তরে দৃশ্য দর্শন হওয়াই মোক্ষের প্রতিবন্ধক)[৬৫]। অতএব হে রাঘব! আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞার বিষয় সাবধানে শ্রবণ করিবে— যাহা আমি পশ্চাৎ বক্তব্য শ্লোক দ্বারা বলিব। তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে, জগতের পারমার্থিক অবস্থা কি?[৬৬] পুরোভাগে এই যে ভৌতিক আকাশ প্রভৃতি ও অন্তরে অহং প্রভৃতি লক্ষ্য হইতেছে, তৎসমুদায় ব্যবহার দশায় জগৎ; কিন্তু পরমার্থদশায় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত, বাস্তবপক্ষে জগৎশব্দের বাচ্য বস্ত্বন্তর নাই। যে কিছু দৃশ্য দেখা যায়, সমস্তই অজর অমর অব্যয় ব্রহ্ম; অন্য কিছু নহে[৬৭।৬৮]। পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ, শান্তে শান্তের অবস্থান, আকাশে আকাশের উদয়, সুতরাং ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই অবস্থান। * বস্তুতঃই দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন নাই। ইহা শূন্যও নয়, জড়ও নয়; পরন্তু কেবল ও শান্তিময় (ব্রহ্মময়)[৬৯।৭০]।

---

* পূর্ণ পদার্থের প্রবেশ ও নির্গম অসম্ভব। ব্রহ্মের বা আত্মার একীভাব বুঝিতে পারিলেই পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ (প্রবেশ) হইয়াছে বলা যায়। যত দিন ব্রহ্মতত্ত্ব অবুদ্ধ থাকে ততদিন তাঁহাতে রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় জগদ্দর্শন হইতে থাকে। রজ্জুতে সর্পের যদ্রূপ অবস্থিতি, ব্রহ্মে জগতের তদ্রূপে অবস্থিতি, এই অবস্থিতি জগৎ। জগৎ নাই বলিয়াই শান্ত, সুতরাং শান্তে শান্তের অবস্থান বলিবার যোগ্য। প্রথম শান্ত শব্দে ব্রহ্ম, দ্বিতীয় শান্ত শব্দে জগৎ। ঘটাদি উপাধি নষ্ট হইলেই আকাশে আকাশের উদয় হইয়াছে বলা যায়। তেমনি জগৎ দর্শন লুপ্ত হইলে ব্রহ্মে ব্রহ্মের উদয় হইল বলা যায়। ব্রহ্মেই ব্রহ্মের অবস্থান, এ কথার অর্থ—জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। রজ্জুসর্প যেমন রজ্জুর অতিরিক্ত নহে, তেমনি।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বন্ধ্যাপুত্র শৈলপেষণ করিতেছে, শশ-শৃঙ্গ গান করিতেছে, শিলা সকল ভুজবিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে, সিকতাময় পর্ব্বত হইতে ধাতু নিস্রুত হইতেছে, উপলপুত্রিকা অধ্যয়ন করিতেছে, চিত্রিত মেঘ গভীর গর্জ্জন করিতেছে, এ সকল কথা যেরূপ, আপনি যাহা বলিতেছেন আমার বোধে তাহাও সেইরূপ[১১।১২]। হে প্রভো! যদি এই জরামরণাদিদুঃখসমন্বিত শৈলাকাশাদিময় জগৎ না-ই থাকে, তবে এ সকল দেখা যায় কি! এবং আপনিইবা আমাকে কাহার জন্য কি করিতে বলিতেছেন? ব্রহ্মন্! এই বিশ্বমণ্ডল নাই কেন? কেনইবা উৎপন্ন হয় নাই? তাহা বিশেষ করিয়া বলুন। যাহাতে আমি ভবদুক্ত রহস্য অনায়াসে বুঝিতে পারি তাহার উপায় বিধান করুন[১৩।১৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহার কিছুই অসঙ্গত নহে। সত্য সত্যই ইহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক। অলীক হইলেও ইহা যে কারণে প্রতিভাত হইতেছে বা প্রকাশ পাই-তেছে, তাহাও বলি, শ্রবণ কর[১৫]। এই বিশ্ব কোনও কালে উৎপন্ন হয় নাই। সেইজন্য ইহা নাই। ইহা কেবল মনের প্রকাশ বা মনের মায়িক আবির্ভাব। ইহা স্বপ্নে স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ[১৬]। মনও বাস্তব-পক্ষে অনুৎপন্ন ও অসদ্রূপ। যাহা বলিলে এ রহস্য বুঝিবে, তাহাও বলি, প্রণিহিত হও[১৭]। নশ্বরতম মনই এই নশ্বরতম ও দোষাকর বিশ্ব বিস্তার করিয়াছে। স্বপ্ন যেমন স্বপ্নান্তর বিস্তার করে, (জন্মায়), তেমনি, স্বরূপশূন্য মনও স্বরূপশূন্য জগৎ বিস্তার করিয়াছে[১৮]। (মন স্বপ্নের ন্যায় নিতান্ত অসৎ হইলেও জগৎকে সতের আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে)। মন স্বকীয় ইচ্ছার আগে আপনার দেহ কল্পনা করে, পরে তাহারই দ্বারা ইন্দ্রজাল শোভার ন্যায় জগৎ শোভা বিস্তৃত করে[১৯]। একমাত্র চলৎশক্তিমান্ মনই স্ফুরিত হইতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, যাতায়াত করিতেছে, প্রার্থনা করিতেছে, নিমগ্ন হইতেছে, সংহার করিতেছে, নীচ-গামী হইতেছে ও মোক্ষ লাভ করিতেছে। সমস্তই মনের ক্রীড়া। মনই বিশ্বসংসার, মন ছাড়া পৃথক্ বিশ্ব নাই। (মন মূলে মিথ্যা, সেইজন্য তদ্বিজৃম্ভণ বিশ্বও মিথ্যা)[২০]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিশার্দ্দূল! ভ্রম কল্পিত মনের মূল কি? ঐ ভ্রম কিসে হয়? মন কি প্রকারে ও কোথা হইতে হইল এবং উহার মায়াময়ত্বই বা কেন ও কিম্প্রকার? তাহা আমাকে বলুন। আগে সংক্ষেপে সম্প্রতি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলুন; পরে অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বিশেষরূপে বলিবেন১।২।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। মহাপ্রলয় হইলে সে সময়ে কোনও পদার্থ থাকে না। সকল পদার্থই লয় পায়। লয়ের পর ও ভাবী সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র শান্ত (অগাধ অচল নিত্য নির্ব্বিকার ও নিত্য প্রতিষ্ঠ) ব্রহ্মই অবশেষিত থাকেন। (শান্ত=নির্ব্বিশেষ বা বিক্ষেপশূন্য) তিনি জন্মরহিত, স্বপ্রকাশ, নির্ব্বিকার, নিত্য, সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বকৃৎ, পরমাত্মা ও মহেশ্বর৩।৪। এই শান্তব্রহ্ম বাক্যের অগোচর (বাক্যের দ্বারা বুঝান যায় না) পরন্তু যোগগম্য এবং ইহারই আত্মা, ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর, ইত্যাদি নাম কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ সকল নাম তাহার স্বাভাবিক নহে; কিন্তু কল্পিত৫।

যিনি সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, শূন্যবাদীর শূন্য, এবং যিনি সূর্য্য-চন্দ্রাদি তেজোময় পদার্থের প্রকাশক, যিনি শরীরে অবস্থান করতঃ বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও স্মর্ত্তা হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন এবং যিনি সত্য বা সৎস্বরূপ, যিনি নিত্য হইয়াও এই অনিত্য জগতে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি দেহস্থ হইয়াও দূরে অবস্থিতি করেন, প্রভাকরের প্রভার ন্যায় যাঁহা হইতে বিষ্ণ্বাদি দেবতা সমুৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি দীপের ন্যায় আপনাকে ও বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছেন; সমুদ্রে বুদবুদ উৎপন্ন হওয়ার ন্যায় যাঁহা হইতে অসংখ্য ও অনন্ত জগৎ উৎপন্ন হইতেছে; প্রলয়কালে দৃশ্যবৃন্দ যাহাতে সমুদ্রে জলপ্রবাহ প্রবেশের ন্যায় প্রবেশ করিয়া থাকে, যিনি আকাশে, আমাদিগের শরীরে, প্রস্তরে, জলে, লতাসমূহে, ভস্মে, পর্ব্বতে, সমীরণমধ্যে ও পাতালে অবস্থিতি করিতেছেন,৬।১১ যিনি কর্ম্মে-

ন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অবিদ্যা ও কাম প্রভৃতিকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেছেন; মূক ব্যক্তিরা স্বীয় অসৌভাগ্য নিবন্ধন যৎকর্তৃক মূক হইয়াছে; যিনি শিলা সকলকে অচল, আকাশকে শূন্য, শৈলকে কঠিন ও জলকে তরল করিয়াছেন; যিনি দীপে ও সূর্য্যে আলোক প্রদান করিয়াছেন;[১২।১৩] যিনি অমৃতপূর্ণ (অমৃত=জল) বারিদ মণ্ডল হইতে বৃষ্টিধারা বর্ষণের ন্যায় এই সংসারের প্রতি বিচিত্র অসার দৃষ্টি প্রবর্ষণ করিতেছেন; অতিবিস্তীর্ণ মরুভূমিস্থিত মরীচিকার ন্যায় এই ত্রিভুবন যাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব; যিনি অবিনশ্বর হইয়াও প্রপঞ্চ-রূপে নশ্বর; যিনি সূক্ষ্মভাবে সকল জীবের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন; যিনি আপন চিদাকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফল, চিৎস্বরূপ মূল, এবং আত্মারূপ বায়ু কর্তৃক নর্তনশীলা ইন্দ্রিয়দলশালিনী প্রকৃতিরূপা লতা সৃজন করিয়াছেন; এবং যিনি প্রত্যেক দেহরূপ সম্পুটক (পেটরা) মধ্যে চিৎস্বরূপ মণি স্থাপিত করিয়াছেন, যাঁহার প্রশান্তচিদ্গগনে অর্থাৎ চিদাকাশরূপ মেঘে সৃষ্টিরূপ তড়িৎ আবির্ভূত ও প্রাণরূপ জলধারা নিপতিত হইয়া থাকে; যাঁহার আলোকে সমুদায় বস্তু চমৎকারজনক হইয়াছে, যিনি অসদ্বস্তুর সৃষ্টি করেন নাই; সদ্বস্তু সকল যাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়াছে; যাঁহার প্রসাদে এই জড়শরীর প্রচলিত ও দেশকালানুযায়ী চলন স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতেছে; যিনি শুদ্ধসম্বিন্মাত্রস্বভাব, অথচ ব্যোমচিন্তায় (আমি ব্যোম হইব, এইরূপ আলোচনা করিয়া) আকাশ ও পদার্থ চিন্তায় পদার্থ ভাব ধারণ করিয়াছেন; যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াও কিছুই করেন নাই এবং যিনি নির্ব্বিকল্পস্বরূপ ও উদয়-প্রলয়-স্থিতি গতি রহিত, বিজ্ঞানাত্মা, অদ্বৈত ও এক; প্রলয়কালে কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছু থাকে না।[১৬।২৬]

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহার কথা বলিলাম, সেই দেবদেব পরাৎপর পরমাত্মাকে জ্ঞানযোগে সাক্ষাৎকার করা ব্যতীত সিদ্ধি লাভের অন্য উপায় নাই। নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশকর কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎসাক্ষাৎকারাত্মিকা পরাসিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করা যায় না[১]। যেমন মরুমরীচিকায় জ্ঞান তদগত জলভ্রান্তির নিবারক, তেমনি, মৃগতৃষ্ণিকাসদৃশ-সংসারভ্রান্তি নিবারণের জন্য একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই উপযুক্ত; অন্য কোন অনুষ্ঠান উপযুক্ত নহে[২]। হে রাঘব! তিনি দূরেও নহেন, নিকটেও নহেন, সুলভও নহেন, দুর্লভও নহেন। সাধনকৌশলে আপন আপন দেহেই সেই পূর্ণানন্দ পরমাত্মাকে পাওয়া যাইতে পারে[৩]। তপস্যা, দান, ব্রত, এ সকল তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে (অসাধারণ) সাধন নহে। স্বরূপে বিশ্রাম লাভ ব্যতীত অন্য কিছুই তৎপ্রাপ্তির উপায় নহে[৪]। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা এবং যাহার যাহার দ্বারা মোহজাল ছিন্ন হয় তাহা তাহাও তৎপ্রাপ্তির উপায়[৫]। "এই সেই পরাৎপর পরমাত্মা" এতদ্রূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান হইবামাত্র জীবগণ দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে[৬]। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি বলিলেন যে, বুদ্ধিযোগে সেই দেবদেব পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে তখন হইতে আর মরণাদি দুঃখ হইবে না। এই স্থলে আমি জানিতে চাহি, কিসে ও কিরূপ বুদ্ধিযোগে সেই দেবদেবকে শীঘ্র পাওয়া যায়। কত দূরে, কত ক্লেশে, কত দিনে ও কোন্ তপস্যায় তাঁহাকে জানা যায়[৭।৮]। বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাঘব! বিবেকবিকাশী স্বীয় যত্নাধিকারূপ পৌরুষের অর্থাৎ উৎকট বিবিদিষার (জানিবার বা পাইবার ইচ্ছার) দ্বারা তাঁহাকে শীঘ্রই এই শরীররূপ উপাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত অন্য ক্রিয়াতে অর্থাৎ স্নান, দান ও তপঃ প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। হে রাঘব! রাগ, দ্বেষ, তম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য

পরিত্যাগ ব্যতীত তপস্যা ও দানাদি সমস্তই ব্যর্থ ও ক্লেশকর[১০]। রাগ-দ্বেষাদির বশ্য হইয়া পরবঞ্চনাদির দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করা যায়, সে ধনের দানে দাতা ফলভাগী হয় না। পরন্তু যিনি প্রকৃত ধনস্বামী তিনিই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন[১১]। অপিচ, যে সকল ব্রতাদি লোভ ও অভিমানাদি প্রযুক্ত অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল ব্রতাদির অল্পমাত্রও ফল হয় না। তাহাতে কেবল মাত্র দম্ভ প্রকাশ হয়; অন্য কিছু হয় না[১২]। অতএব, পৌরুষ প্রযত্ন আশ্রয় করিয়া সংশাস্ত্রানুশীলন ও সৎসঙ্গ, সংসার-ব্যাধির এই দুই মহৌষধ আহরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। লিখিত আছে যে, পৌরুষপ্রযত্ন ব্যতীত আত্যন্তিক দুঃখশান্তির অন্য উপায় নাই[১৩।১৪]। সে পৌরুষ কীদৃক তাহাও বলি, শ্রবণ কর। আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যে পৌরুষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য—যাহা অবলম্বন করিলে রাগদ্বেষাদিরূপ বিসূচিকার (ব্যাধিবিশেষের) শান্তি হইবে, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর[১৫]। লোক ও শাস্ত্র উভয়ের অবিরোধী যথাসম্ভব বৃত্তিতে (জীবিকায়) সন্তুষ্ট থাকা, ভোগবাসনাপরিহার ও দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত উদ্বেগ পরিত্যাগ করা, সম্ভবানুযায়ী উদ্যোগ সহকারে সাধুসঙ্গের ও সৎশাস্ত্রের আশ্রয় লওয়া অতীব কর্ত্তব্য। এইগুলি জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রথম সোপান[১৬।১৭]। যিনি যথাসম্ভব অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হন এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয় উপেক্ষা করেন, তাহাকেই আমরা যথার্থ সাধুসঙ্গী ও সৎশাস্ত্রনিরত বলিয়া বর্ণন করি। এই সকল লোকেরাই শীঘ্র মুক্তি লাভের অধিকারী হয়[১৮]। যে মহামতি বিচার দ্বারা উত্তমরূপে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহা-দিগের প্রতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শঙ্কর, ইঁহারাও অনুকম্পান্বিত থাকেন[১৯]। সুজন লোকেরা যে প্রকার ব্যক্তিকে (বিশিষ্ট বৈরাগ্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিকে) সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, প্রযত্ন সহকারে সেইরূপ সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য[২০]। রাঘব! অধ্যাত্মবিদ্যাই বিদ্যা এবং সৎশাস্ত্রই শাস্ত্র। সেইজন্য, মনোযোগের সহিত অধ্যাত্মবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত আছে। কেননা, ঋষিগণ বলিয়াছেন, সৎশাস্ত্রের আলোচনায় ও অধ্যাত্মবিদ্যার বিচারে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে[২১]। যেমন কতক সংযোগে (কতক—নির্ম্মলীফল। এই ফল ঘষিয়া জলে দিলে জল পরিষ্কার হয়) জলের মালিন্য ও যোগা-ভ্যাসে মনের মালিন্য বিনষ্ট হয়, তেমনি, সাধুসঙ্গমজনিত বিবেক দ্বারা

সংসারবীজ অবিদ্যা * বিনষ্ট হইয়া থাকে। অবিদ্যা অর্থাৎ আত্মার আবরক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেই সংসার অতিক্রম পূর্ব্বক দুঃখাতীত হওয়া যায়[২২]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

* সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণ পরব্রহ্মের আশ্রিত। উক্ত তিন গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি কহে। প্রকৃতি দুই প্রকার। মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্ব গুণের নির্ম্মলতাকে মায়া ও মলিনতাকে অবিদ্যা কহে। মায়া ঈশ্বরের উপাধি এবং অবিদ্যা জীবের আশ্রয়। ফলিতার্থ—প্রতি ব্যক্তিতে অবস্থিত পরিচ্ছিন্ন মায়াই অবিদ্যা।

সপ্তম সর্গ।
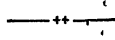
রাম কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যাহার কথা বলিলেন ও যাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব সংসার মুক্ত হয়, সেই দেব কোথায় অবস্থিতি করেন? এবং আমিই বা তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিতে পারি? তাহা বলুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি যাঁহার কথা বলিলাম সেই দেব দূরে অবস্থিত নহেন। তিনি চৈতন্যরূপে সতত আমাদিগের শরীর মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন[২]। বৎস! এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বিশ্বই তিনি, পরন্তু সেই সর্ব্বগ কোনও কালে বিশ্ব নহেন। ইনি অদ্বিতীয়; সেই কারণেই বিশ্ব নামক পৃথক দৃশ্য নাই[৩]। যাঁহাকে চন্দ্রশেখর মহাদেব বলিয়া জান, তিনিও সেই চিন্মাত্র; যিনি গরুড়েশ্বর বিষ্ণু, তিনিও সেই চিন্মাত্র; যিনি ভুবনপ্রকাশক সূর্য্য, তিনিও সেই চিন্ময় দেব, এবং কমলোদ্ভব ব্রহ্মাও সেই চিন্ময় দেবতা[৪]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! জগৎ যদি চেতনমাত্র হইত, তাহা হইলে বালকেরাও তাঁহাকে জানিতে পারিত। যাহা আপনা আপনি জানা যায় তাহার আবার উপদেশ কি?[৫]

মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম! যদি তুমি বিশ্বকে চিন্মাত্র বা চেতন বলিয়া জানিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি অল্পমাত্রও ভবনাশন উপায় জানিতে পার নাই। কেন? তাহা বলিতেছি[৬]। *

এই যে জীবরূপ নামক চেতন, (অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চেতনাভাস), এই চেতনই সংসার। এই জীবচেতন বহির্ম্মুখী বৃত্তির দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্বাগত হইয়া) বিষয় দর্শন করে এবং বিষয়কেই সার ভাবে। সেই কারণে তিনি পশু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অপিচ, এই জীবভাব হইতেই জরামরণাদি ভয় আবির্ভূত হয়[৭]। এই জীব বস্তুতঃ অমূর্ত্ত; পরন্তু অজ্ঞতা বিধায় সে আপনার অমূর্ত্ততা পরিজ্ঞাত নহে। জীব আপনাকে

---

* ভাবার্থ এই যে, জগতের জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে মোক্ষের উদয় হয় না। জগদ্জ্ঞান লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলেই মোক্ষ হয়। সুতরাং ব্রহ্মই জগৎ, এই বিশ্বাস ব্যতীত জগৎ ব্রহ্ম, এ বিশ্বাসে জগদ্জ্ঞান লুপ্ত হয় না।

জানে না বলিয়াই দুঃখভাজন হয়। জীব নিজ চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত অন্তঃকরণে অবস্থিত থাকাতেই বৃথা অনর্থ ফল অনুভব করিতেছে[৮]। অতএব, পূর্ণস্বভাব ও নিত্যচেতন আত্মার চেত্য দর্শন অর্থাৎ জগদ্দর্শন নিবৃত্ত হইলে, অথবা বহির্ম্মুখী গতি রুদ্ধ হইয়া অন্তর্ম্মুখী গতি (আত্মাবগাহী জ্ঞান) উৎপন্ন হইলে, তখন যে তাঁহার পূর্ণাবস্থা প্রকটিত হয়, অর্থাৎ পরিচ্ছেদভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়, সেই নিবৃত্তির নাম তত্ত্বসাক্ষাৎকার, এবং তাদৃশ তত্ত্বসাক্ষাৎকার (তত্ত্বজ্ঞান) হইলে তখন আর তাহাকে শোক মোহ আক্রম করে না[৯]। পরাবর পরমাত্মার দর্শন হইলে হৃদগ্রন্থি * ভাঙ্গিয়া যায়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সঞ্চিত কর্ম্ম সকল পরিক্ষীণ হইয়া যায়[১০]। ভাবিতে পার যে, চিত্তনিরোধ দ্বারা চেত্য (দৃশ্য) দর্শন লুপ্ত হইতে পারে; বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব। দৃশ্য সকল মিথ্যা, ভ্রান্তির পরিণাম, এ বোধ না হইলে, অন্য উপায়ে কদাচ চিত্তের চেত্যোন্মুখতা নিরুদ্ধ করা যায় না। সুতরাং দৃশ্য দর্শনের শান্তি হওয়াও অসম্ভব হয়। (যোগের দ্বারা চিত্তনিরোধ করিলেও যোগ ভঙ্গের পর পুনর্ব্বার যথা পূর্ব্বং তথা পরে ঘটনা হয়)[১১]। দৃশ্য মাত্রেই অসম্ভব অর্থাৎ ইন্দ্রজালতুল্য, মিথ্যা, এ বোধ ব্যতীত দৃশ্যাতীত চিৎস্বরূপ মোক্ষের সম্ভাবনা কি? যোগের দ্বারা দৃশ্য দর্শন লুপ্ত করিলে কি হইবে? তাহাতে জগতের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইবে না। তাহা না হইলেও মোক্ষ হইবে না[১২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যাঁহাকে জীব বলিয়া জানায় সংসার যন্ত্রণার মোচন হইতেছে না অর্থাৎ ব্রহ্মভাব ভুলিয়া গিয়া ভ্রমে জীব বলিয়া অবগত হওয়ায় এতদ্বিধ সংসার সংঘটন হইয়াছে, এবং যে জীব ব্যোমরূপী (আকাশের ন্যায় কল্পিত রূপাদি বিশিষ্ট), সে জীব কিরূপ ও কোন্ আধারে অবস্থিত তাহা আমাকে বলুন[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব। এই যে চেতন জীব, যিনি জন্মরূপ জঙ্গলে (নির্জ্জন ও নির্জ্জল অরণ্যে) পরিক্ষিপ্ত ও বিশীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে যাঁহারা পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও

* হৃদ্গ্রন্থি=বুদ্ধির গেরো বা গাইট্। বুদ্ধিতে যে আমিত্ব স্থাপন করা আছে, তাহার নাম হৃদ্গ্রন্থি। তাহা তখন ভাঙ্গিয়া যায়। অর্থাৎ বুদ্ধি তখন পৃথক্ হইয়া যায়। পৃথক্ হইয়া যায় কোথায়? প্রকৃতিতে মিশিয়া যায় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়।

মূর্খ[১৪।১৫]। কেননা, জীববুদ্ধিই সংসার ও দুঃখপ্রবাহের কারণ। সুতরাং জীবকে জানায় কিছুমাত্র ফল নাই[১৬]। যদি পরমাত্মাকে জানা যায়, অর্থাৎ তাঁহার জীবভাব বিদূরিত হইয়া পরমভাব প্রস্ফুরিত করা যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, দুঃখসন্তান (প্রবাহ) ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন বিষবেগ নিবৃত্ত হইলে তজ্জনিত বিষূচিকা উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি, জীবত্ব বোধের অভাবে ও ব্রহ্মত্বের অববোধে সংসার দুঃখ নিবৃত্ত হয়[১৭]। 23,373.

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! যাঁহাকে জানিতে পারিলে, মন সমস্ত মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই ব্রহ্মের রূপ কি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১৮]। বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যে সম্বিদের (জ্ঞানের) বপু অর্থাৎ শরীর নিমেষ মধ্যে দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে, সেই সম্বিদ্ই পরমাত্মার রূপ[১৯]। * যে বোধরূপ মহাসমুদ্রে এই অত্যন্তাভাবগ্রস্ত অর্থাৎ ত্রিকাল মিথ্যা জগৎ নামক সংসার ভাসমান আছে, সেই বোধ সমুদ্রই পরমাত্মার রূপ[২০]। যাহাতে দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, এ সকল ক্রম থাকিয়াও নাই অর্থাৎ নিত্য অস্তমিত, যাহা আকাশ না হইয়াও বিপুলত্ব প্রযুক্ত আকাশের তুলনায় তুলিত হয়, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২১]। জগৎ শূন্যস্বভাব হইয়াও যদাধারে আপাত দর্শনে অশূন্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, অথবা এই মিথ্যা জগৎ যাহাতে অবভাসিত হইতেছে, কিম্বা সৃষ্টি যাহাতে প্রবাহাকারে প্রবাহিত হইতেছে, অথবা এই সকল মিথ্যার বিজৃম্ভণ যদাধারে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২২]। যিনি মহাচিন্ময়রূপী হইয়াও বৃহৎ পাষাণের ন্যায় জড়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, অর্থাৎ পাষাণাদি আকারে প্রকাশিত হইতেছেন, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২৩]। যাহার দ্বারা বাহ্য (অধিভূত) ও আভ্যন্তরস্থ (অধিদৈব) বস্তু সকল "আছে" এই ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই পরমাত্মার রূপ[২৪]। যেমন প্রকাশক পদার্থে আলোক এবং আকাশে শূন্যতা অবস্থিত, তেমনি, যাহাতে এই সকল অবস্থিত তাহাই পরমাত্মার রূপ[২৫]।

---

* অর্থাৎ মনোবৃত্তি সমারূঢ় হইয়া প্রকাশ পায় বা মনোবৃত্তি উদিত হইলে তাহাতে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়, সেই চৈতন্য নামক বোধই পরমাত্মা ও ব্রহ্ম। বৃহৎ অর্থাৎ পূর্ণ বলিযা ব্রহ্ম।

রাম বলিলেন, ভগবন্! পরমাত্মা "সৎ—আছেন" এতন্মাত্ররূপী, ইহা কি প্রকারে বোধগম্য করা যাইতে পারে? এবং জগৎ-নামধেয় এই সকল দৃশ্যের অসম্ভব ভাবই (মিথ্যাত্বই) বা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে? তাহা আমাকে দৃষ্টান্ত সহকারে বলুন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিউন[২৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! রূপহীন আকাশে যেমন নীলপীতাদি রূপ দেখা যায়, তাহার ন্যায় সেই চিন্ময় ব্রহ্মে এই জগৎ দেখা যাইতেছে, ইত্যাকার নিশ্চয় জ্ঞানের উদয় হইলেই ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়[২৭]। দৃশ্যমাত্রেই মিথ্যা, অর্থাৎ ভ্রমদৃষ্ট, এ বোধ দৃঢ় ও অসন্দিগ্ধ না হইলে অন্য কিছুর দ্বারা ব্রহ্মের উক্তপ্রকার মহান্ রূপ জানা যায় না[২৮]। তাঁহাকে জানিবার জন্য ভাবা উচিত যে, প্রলয়কালে একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, ও ছিলেন, এ সকল কিছু থাকে না, ও ছিল না। সেই সময়ে যিনি থাকেন বা ছিলেন, তিনি বোধস্বরূপ, পরে সেই বোধ হইতে এ সকল মায়িকরূপে উৎপন্ন হইয়াছে[২৯]। রাঘব! এই রহস্য হৃদিস্থ করিয়া বিবেচনা কর, ভাবিয়া দেখ, যদি দৃশ্য বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তিনি অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম (চৈতন্য) কিসে প্রতিবিম্বিত হইবেন? আবার ইহাও দেখা যায়, আদর্শ অল্প কিছু প্রতিবিম্ব গ্রহণ না করিয়া অবস্থিতি করে না। (ভাবার্থ এই যে, দ্বৈতাক্রান্ত বুদ্ধিতে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না এবং বুদ্ধি ও বিনা প্রতিবিম্বে থাকে না। অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যায়) সেইজন্য, এ পর্য্যন্ত কেহই জগৎ-নামক দৃশ্যের অসত্তাবধারণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরম তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই[৩০।৩১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! এই মূর্ত্তিমান্ প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড চক্ষুর উপর দীপ্যমান থাকিতে কিরূপে ইহার অসত্তাবধারণ হইতে পারে? অপিচ, এই অত্যন্ত বিস্তৃত জগৎ-নামক স্থূল প্রপঞ্চ সূক্ষ্মরূপ চিন্মাত্র পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সর্ষপোদরে কি সুমেরুর সমাবেশ হয়?[৩২]

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যদি তুমি কিছু দিন অবিক্ষিপ্ত চিত্তে সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর থাকিতে পার, তাহা হইলে আমি এক দিনেই তোমার চিত্তস্থ দৃশ্যভ্রান্তি প্রমার্জ্জিত করিতে পারিব। তখন বুঝিবে, সমুদায় দৃশ্যই মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা। মরুভূমিনিপতিত

সূর্য্যকিরণে জলভ্রান্তি হয় বটে; পরন্তু সূর্য্য কিরণের জ্ঞান হইলে তখন আর তাহাতে জল জ্ঞান থাকে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, জগদাধার ব্রহ্ম-চৈতন্যের জ্ঞান হইলেও তদাধেয় দৃশ্যের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকে। যখন দৃশ্যজ্ঞান পরিমার্জ্জিত হইবে, তখনি দ্রষ্টৃত্বজ্ঞানও লুপ্ত হইবে। "দেখা যাইতেছে ও দেখিতেছি" এ বোধ পলায়ন করিলে তখন কেবল বোধ অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্য অবশিষ্ট থাকিবে। অন্য কিছু থাকিবে না[৩৩।৩৭]। "দেখা যাইতেছে" এ বোধ থাকিলেই "দেখিতেছি" এ বোধ থাকিবে। "দেখিতেছি" বোধ থাকিলেও "দেখা যাইতেছে" এ বোধ থাকিবে। অর্থাৎ দর্শক দৃশ্যেরই অন্তর্গত। যেমন দুএর অন্তর্গত এক, তেমনি, এক দুএর অন্তর্গত না হইলেও দুএর অধীন হইতে দেখা যায়। এক, আর এক, যোগে দুই হয় বলিয়াই এক দুএর অন্তর্গত। অভিপ্রায় এই যে, দশ্যজ্ঞান অর্থাৎ দ্বৈতবোধ প্রলুপ্ত হইলে তৎসঙ্গে একত্ব বোধও প্রলুপ্ত হইয়া যায়[৩৫]। আরও দেখ, যদি এক না থাকে, তাহা হইলে দুইও থাকে না। অতএব, যেমন একত্বযোগী দ্বিত্বের অভাবে কেবলমাত্র তদনুবিদ্ধ অস্তিতা (অস্তি আছে, মাত্র এই ভাবটুকু) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি, দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-ভাব অন্তর্হিত হইলে তদ্দ্বয়ের আশ্রয়ীভূত কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্তা সুস্থিরা হয়[৩৬]। বৎস! আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি, শীঘ্রই আমি তোমাতে জগতের মিথ্যাত্ববোধ সঞ্চারিত করিয়া তোমার মনোমুকুর হইতে "অহং" হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় দৃশ্যমল উন্মার্জ্জিত করিতে সক্ষম হইব[৩৭]। যাহা বস্তুতঃ অসৎ অর্থাৎ যাহা কোনও কালে নাই তাহার অস্তিতাও নাই। যাহা সৎ, তাহারও অসত্তা অসম্ভাব্য। সুতরাং যাহা অবাস্তব, মিথ্যা, যাহা কোনও কালে নাই, তাহার উন্মার্জ্জনে পরিশ্রম কি?[৩৮] এই যে বিস্তৃত জগৎ দেখিতেছ, এ জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা সেই নির্ম্মল ব্রহ্ম চৈতন্যেই উপবৃংহিত অর্থাৎ কল্পিত। যখন জগৎ নামধেয় বস্তু নাই, কস্মিন্ কালে উৎপন্ন হয় নাই, তখন তাহার বিদ্যমানতাও নাই। নাই বলিয়াই তাহা দৃশ্যও হয় না। যাহা নাই ও প্রকৃত দৃশ্য নহে, তাহা পরিমার্জ্জন করিতে কি শ্রম?[৩৯।৪০] বৎস রাম! যে ভাবে বলিলে তুমি সেই অবাধিত ব্রহ্মতত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারিবে, আমি তোমাকে তাহা সেই ভাবে বহু যুক্তি সংযোগে বলিব। অর্থাৎ বুঝাইয়া দিব[৪১]।

বৎস! জগৎ যখন পূর্ব্বে উৎপন্ন হয় নাই, তখন ইহার বিদ্যমানতা কোথায়? কোথায় দেখিয়াছ—মরুভূমিতে জলাশয় এবং চন্দ্রে দ্বিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে?[৪২] যেমন বন্ধ্যাপুত্র নাই, মরুভূমিতে জলপ্রবাহ নাই, আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি, ব্রহ্মেও সত্য জগৎ নাই। সেইজন্যই বলি-তেছি, জগদ্দর্শন ভ্রান্তিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৩]। রাম! তুমি যাহা যাহা দেখিতেছ, সমস্তই নিরাময় ব্রহ্ম। এই বিষয়টী আমি তোমাকে পশ্চাৎ বলিব এবং বুঝাইয়া দিব। কেবল বাক্যে নহে, যুক্তির দ্বারাও তাহা বুঝাইব[৪৪]। হে উদারমতি রাম! তত্ত্বজ্ঞানীরা যুক্তি সহকারে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন, সে সকল উপদেশ অবহেলা করা উচিত নহে। যে মূঢ়চেতা যুক্তিযুক্ত বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক অযৌক্তিক বিষয়ে মনোনিবেশ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন[৪৫]।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।
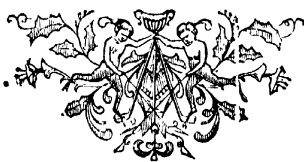
অষ্টম সর্গ।

---*---

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! তাহা কোন্ যুক্তিতে জানা যায় এবং কি প্রকারেই বা তাহা বিদিত হওয়া যায় তাহা আমাকে বলুন। তাঁহাকে যদি যুক্তি পথে পাওয়া যায়, অনুভূতি গোচর করা যায়, তাহা হইলে আমার জ্ঞানপিপাসা শেষ হইবে, কিছুই অবশেষ থাকিবেক না[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যাহার একটী নাম জগৎ এবং আর একটী নাম মিথ্যাজ্ঞান, সেই অবিচাররূপিণী বিষূচিকা (এক প্রকার রোগ) বহুকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে কদাচ তাহার শান্তি হইবে না[২]। হে সাধো! হে রামচন্দ্র! আমি তোমার বোধসিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল আখ্যায়িকা বলিব; যদি তুমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, তুমি মুক্তস্বভাব; বদ্ধস্বভাব নহ[৩]। আর যদি তুমি উদ্বেগ বশতঃ তাহার কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াই ক্ষান্ত হও, তাহা হইলে, তুমি সৎশাস্ত্র শ্রবণের অযোগ্য পশুধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে; কাযেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না[৪]। যে যে-বিষয়ের প্রার্থনায় যত্নাতিশয় প্রকাশ করে, সে সেই প্রযত্নের সাহায্যে তাহার ফল পায়; তাহার অন্যথা হয় না। আর যে তাহাতে যত্ন প্রকাশ করিতে পরিশ্রান্ত হয়, সে কদাচ প্রার্থিত বস্তু লাভে সমর্থ হয় না[৫]। রাম! যদি তুমি যথার্থতঃই সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র পরায়ণ হইতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এক দিনে, না হয় এক মাসে, সেই পরম পদ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে[৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, গুরো! আপনি শাস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ। আপনি বলুন, আত্মজ্ঞান বিকাশের নিমিত্ত কোন্ শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ এবং যাহা জানিলে শোকমুক্ত হওয়া যায় তাহা কি[৭]। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহামতে! আত্মজ্ঞান প্রতিপাদক যে সকল শাস্ত্র আছে, সে সকলের মধ্যে এই মহারামায়ণই উত্তম। এই মহারামায়ণ কেবল অধ্যাত্ম শাস্ত্র নহে, ইহা ইতিহাসের মধ্যেও উত্তম ইতিহাস। কেননা ইহা শুনিলে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয়[৮]। যেহেতু এই বাক্যসন্দর্ভাত্মক (বাক্যময়) গ্রন্থের

শ্রবণে অক্ষয় জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়, সেইহেতু ইহা পরম পবিত্র[১০]। যেমন স্বপ্নদর্শনের পর "ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তাহার সত্যতা অপগত হয়, তেমনি, এতজ্জগৎ দর্শন পথে থাকিলেও এই শাস্ত্র অবলম্বনে বিচারের পর তাহার সত্যতা অস্তমিত হইয়া থাকে[১১]। এই শাস্ত্রে যাহা আছে; তাহা অন্য শাস্ত্রেও আছে এবং ইহাতে যাহা নাই, তাহা অন্য কোন শাস্ত্রে নাই। পণ্ডিতগণ জানেন, এই শাস্ত্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোষস্বরূপ[১২]। যে ব্যক্তি নিত্য এই শাস্ত্র শ্রবণ করে, সেই উদারমতি পুরুষের গ্রন্থান্তরপাঠজনিত বোধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বোধ উৎপন্ন হয়[১৩]। দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহার এই শাস্ত্রে রুচি না হইবে, তাহার উচিত—প্রথমতঃ অন্য কোন সৎশাস্ত্রের আলোচনা করা। তাহা হইলে তিনি যোগ্য কালে সুকৃতের উদয়ে এই শাস্ত্রে অধিকারী হইতে পারিবেন[১৪]। রোগী যেরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবনে রোগমুক্ত হয়, সেই-রূপ, যিনি এই শাস্ত্র শ্রবণ করেন তিনি নিঃসন্দেহ জীবন্মুক্তি অনুভব করিতে পারেন[১৫]। এই শাস্ত্র শ্রবণ করিলে শ্রোতা জানিতে পারি-বেন, আমাদিগের এই উক্তি বরের অথবা অভিশাপের ন্যায় অনিবার্য্য ফলজনক[১৬]। হে রামচন্দ্র! আত্মবিচার ও তৎকথা ব্যতীত অন্য উপায়ে সংসার দুঃখ নিবারিত হয় না। ধনদান, তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, কি গ্রন্থান্তরের আলোচনা, এ সকল সংসার যন্ত্রণা নিবারণের মুখ্য উপায় নহে[১৭]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

—*—

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যাহাদের চিত্ত পরমাত্মাতেই অভিনিবিষ্ট প্রাণ পরমাত্মলাভের জন্য ব্যাকুল, যাহারা সতত পরমাত্মকথাতেই পরিতুষ্ট, এবং যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পরমাত্মতত্ত্ব বুঝাইতে আনন্দিত, সেই সকল মহাপুরুষেরাই ব্রহ্মবিচারপরায়ণ, ব্রহ্মবিজ্ঞাননিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞ। অপিচ, যাহা জীবন্মুক্তি তাহাই বিদেহমুক্তি বলিয়া গণ্য[১।২]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! বিদেহমুক্তের ও জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। আমি তাহা শুনিয়া শাস্ত্র, যুক্তি ও বুদ্ধিব দ্বারা সেইরূপ হইতে যত্নবান্ হইব[৩]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে মহামতে! যে ব্যক্তি অনিষিদ্ধ ব্যবহারে অর্থাৎ সদ্ব্যবহারে থাকিয়া এই দৃশ্য বিশ্বকে আকাশের ন্যায় স্বরূপশূন্য বোধ করেন, অথবা যেমন দর্পণপ্রতিবিম্বিত নগর প্রতীয়মান হইলেও তাহা অসত্য, সেইরূপ এই প্রতীয়মান বিশ্বকে অসত্য বলিয়া জানেন, সেই মহাপুরুষ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত[৪]। যিনি সর্ব্বদা জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেবলমাত্র ব্যবহারসম্পাদক অথচ কর্ত্তৃত্ববোধশূন্য এবং যিনি জাগ্রৎ কালেও সুষুপ্তের ন্যায় নির্ব্বিকার, তিনিও জীবন্মুক্ত[৫]। যাঁহার মুখপ্রভা সুখে ও দুঃখে সমান থাকে, সুখকালে প্রফুল্ল ও দুঃখকালে ম্লান না হয়, এবং যিনি যথাপ্রাপ্ত জীবিকায় অবস্থিত, তিনিও জীবন্মুক্ত[৬]। যিনি নির্ব্বিকার আত্মায় সুষুপ্তের ন্যায় থাকিয়াও অবিদ্যারূপ নিদ্রার বিনাশ হেতু আত্মাতে জাগ্রৎ থাকেন এবং যাঁহার লোকপ্রসিদ্ধ জাগ্রৎ নাই অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়ের অধীনে থাকিয়া কোন কিছু করেন না ও দেখেন না, তাঁহাকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়। অপিচ, যাঁহার বোধ বাসনাপরিহীন, তিনিও জীবন্মুক্ত[৭]। নট যেমন রাগদ্বেষাদির অভিনয় করে, সেইরূপ যিনি বাহিরে রাগ, দ্বেষ ও ভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিয়াও অন্তরে রাগ-দ্বেষাদিবর্জ্জিত হন এবং নিতান্ত স্বচ্ছ ব্যোমতুল্য চিৎস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহাকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়[৮]। যাহার অহং নাই ও বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা পাপপুণ্যাদিতে প্রলিপ্ত না হয়, মনীষিগণ তাঁহাকে

জীবন্মুক্ত বলিয়া জানেন[৯]। যে চিদাত্মার উন্মেষে ও অর্দ্ধ নিমেষে যথাক্রমে লোকত্রয়ের প্রলয় ও উৎপত্তি হয়, সেই চিদাত্মাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত[১০]। * যে মহাপুরুষ হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না ও যে মহাপুরুষ লোক হইতে উদ্বিগ্ন না হন, এবং যিনি হর্ষক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত, তিনিও জীবন্মুক্ত[১১]। যাঁহার সংসারের প্রতি আস্থা নাই, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় থাকিলেও যিনি সে সকলের অনধীন, এবং চিত্ত থাকিলেও যিনি চিত্তরহিতের ন্যায়, তিনিও জীবন্মুক্ত[১২]। যিনি বিষয়-ব্যবহারে বিদ্যমান থাকিয়াও রাগ, দ্বেষ এবং হর্ষাদিপরিশূন্য ও সুশীতল, যিনি সমুদায় পদার্থে আপনার পূর্ণতা (আপনার সর্ব্বময়তা) অনুভব করেন, তিনিও জীবন্মুক্ত[১৩]। এবম্বিধ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি দেহপাতের পর জীবন্মুক্তিপদ ত্যাগ করিয়া স্থির গম্ভীর বিদেহমুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। যদ্রূপ পবন চাঞ্চল্য পরিহারের পর স্থিরভাব অবলম্বন করেন তদ্রূপ[১৪]। *বিদেহমুক্ত ব্যক্তি পুনর্ব্বার উদিত হন না ও অস্তগতও হন না। তিনি ব্যক্তও নহেন, অব্যক্তও নহেন, দূরস্থও নহেন, নিকটস্থও নহেন। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। আরও লক্ষণ এই যে, তিনি অহং ও তদন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি, উভয়বিধ ভেদবর্জ্জিত*[১৫]। তিনি তখন সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম। যেহেতু ব্রহ্ম, সেই হেতু বলা যায়, তিনিই সূর্য্য-স্বরূপে উত্তাপ প্রদান, বিষ্ণুস্বরূপে জগত্রয়ের রক্ষা, রুদ্ররূপে সকলের সংহার ও প্রজাপতিরূপে সৃষ্টি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিধান করি-তেছেন[১৬]। এমন কি, তিনিই আকাশ হইয়া বায়ুস্কন্ধ (উপরি উপরি অবস্থিত ৪৯ সংখ্যক বায়বীয় স্তর) বিধারণ করিতেছেন, ঋষিত্ব সুরত্ব ও অসুরত্ব বিধান করিতেছেন এবং কুলপর্ব্বত হিমা-লয়াদি ৮ (বর্ষপর্ব্বত) হইয়া লোকপালদিগকে ধারণ করিতেছেন[১৭]। তিনি ভূমি হইয়া লোকমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, তৃণ, গুল্ম ও লতা হইয়া ফলাদি প্রদান দ্বারা প্রাণধারিগণের হিতসাধন করিতেছেন, জল ও অনলাকার ধারণ করিয়া দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব বহন করিতেছেন, এবং

* অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গে চিদাত্মার উন্মেষ এবং আবরণের অর্দ্ধ অবস্থিতিতে তাঁহার অর্দ্ধ নিমেষ। অর্দ্ধ=অসম্পূর্ণ। ভাব এই যে, বিদেহমুক্তি কালে জ্ঞানের কিছুমাত্র আবরণ থাকে না। কারণ এই যে, সাক্ষিচৈতন্যের আবরণ সম্পূণ অসম্ভব। অপিচ, জীবন্মুক্তিতে আবরণ দগ্ধ হইয়া যায় বটে; পরন্ত তাহার লেশ বা আভাস থাকে। যেমন বস্ত্র দগ্ধ হইলেও বস্ত্রের আভাস (বস্ত্রাকার ভস্ম) থাকে, সেইরূপ।

চন্দ্রমা হইয়া অমৃত (জ্যোৎস্না) বর্ষণ করিতেছেন[১৮।১৯]। হলাহল হইয়া মৃত্যু বিস্তার, দিক্ হইয়া তেজঃপ্রকাশ ও তমঃ হইয়া অন্ধকার বিস্তার করিতেছেন। ইনি শূন্যভাবে ব্যোম (ফাঁক) ও পর্ব্বতভাবে অবরোধ (নীরেট্)[২০]। ইনিই অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা জঙ্গমের ও অনভিব্যক্ত চৈতন্যের দ্বারা স্থাবরের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইনিই সমুদ্র হইয়া ভূরূপা রমণীর বলয়াকৃতি ভূষণ হইয়াছেন[২১]। ইনিই পরমার্কবপুঃ অর্থাৎ অনাবৃত চিদাত্মরূপে এই বিস্তৃত বিশ্ব প্রকাশ করতঃ স্বয়ং শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অধিক কি বলিব—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ে অবস্থিত দৃশ্য মাত্রেই তিনি[২২।২৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনুষ্যের পক্ষে সমদৃষ্টি বা অদ্বয় জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ এবং তাহাদের চিত্তও নিতান্ত অস্থির। সেইজন্য আমার বোধ হয়, ঐরূপ মুক্তি মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ দুষ্প্রাপ্য[২৪]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! সাধু ব্যক্তিরা ব্রহ্মকেই মুক্তি ও নির্ব্বাণ বলিয়া বর্ণন করেন। তাহা যে প্রকারে লাভ করিতে পারা যায়, সম্প্রতি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২৫]। হে রামচন্দ্র! তুমি আমি তাহা ও ইহা ইত্যাদি ভাব বিশিষ্ট এই জগৎ প্রতীয়মান হইলেও ইহাকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিতান্ত অলীক বোধ করিতে পারিলে বর্ণিত প্রকারের মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়[২৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে বেদবিদ্‌শ্রেষ্ঠ! আপনি বলিলেন, বিদেহমুক্ত ব্যক্তিরাই ত্রৈলোক্য সম্পাদন করিতেছেন। আপনার ঐ উক্তিতে আমার মনে হইতেছে, তাঁহারাই এবম্প্রকার সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন[২৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই ত্রিভূবন যদি বাস্তবতঃ থাকে, তাহা হইলে সেই বিদেহমুক্ত ব্যক্তিরা ঐভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন। পরন্তু ত্রৈলোক্যশব্দশব্দিত বা ত্রৈলোক্য নামে কোন বস্তু নাই। ব্রহ্মের সংসারভাব প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? জগৎশব্দ কেবল কল্পনায় অবস্থিত। বস্তুতঃ এ সমুদায় সেই অদ্বিতীয় শান্ত ও প্রকাশমান্ সত্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সত্য সত্যই নির্ম্মল আকাশস্বরূপ পরব্রহ্মই জগৎ। রাম! আমি বিচার করিয়া দেখিয়াছি, সুবর্ণময় বলয়ের "বলয়" এই শব্দটি নামমাত্র অর্থাৎ কল্পিত সংজ্ঞামাত্র, বস্তুকল্পে তাহার স্বরূপ নির্ম্মল সুবর্ণ। অর্থাৎ বলয় সুবর্ণাতিরিক্ত নহে[২৮।৩১]। যেমন জলতরঙ্গে জল ব্যতীত অন্য

কিছু দৃষ্ট হয় না; যেমন স্পন্দন বায়ু হইতে অভিন্ন; তেমনি, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যেরূপ আকাশে শূন্যত্ব, মরুভূমিতে তাপ এবং আলোকে তেজঃ স্বভাবতঃই অবস্থিতি করে, সেইরূপ, এই ত্রিজগৎ সেই পরব্রহ্মেই অবস্থিতি করিতেছে[৩২।৩৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! যে অত্যন্তাভাব জ্ঞানে (কোনও কালে জগৎ নাই, ইত্যাকার অবিচলিত জ্ঞানে) জগদ্‌দ্রষ্টৃত্ব হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, আমাকে যুক্তি সহকারে সেই জ্ঞানেব উপদেশ করুন। হে ব্রহ্মন্! পরস্পরসাপেক্ষ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের অভাব হইলে যে প্রকারে নির্ব্বাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এবং জগতের অত্যন্তাসম্ভব-জ্ঞান দ্বারা যে স্বভাবাবস্থিত ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায়, এবং যে যুক্তির দ্বারা তাঁহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, এবং যাহা পাইলে আর সাধনের প্রয়োজন থাকিবেক না, সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৩৫।৩৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বুদ্ধিমান্ রাম! "জগৎ" এই মিথ্যা জ্ঞানটী বহু-কাল (অনাদি কাল) হইতে মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে বটে; পরন্তু বিচার দ্বারা তাহা নির্ম্মূল হইতে পারে। মিথ্যা জ্ঞান এক প্রকার রোগ, বিচার তাহার শান্তিমন্ত্র[৩৯]। যেমন পর্ব্বতশিখরোপরি আরোহণ ও তাহা হইতে অবরোহণ করা সুসাধ্য নহে; সেইরূপ, ঐ বদ্ধমূল অজ্ঞানকে সহসা সমুৎসাদন করা নিতান্ত সুকর নহে[৪০]। অতএব অভ্যাসযোগ, যুক্তি, ন্যায় ও উপপত্তির দ্বারা অথবা ন্যায়সঙ্গত উপদেশ দ্বারা যে প্রকারে জগদ্‌ভ্রান্তির শান্তি হইতে পারে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[৪১]। হে রামচন্দ্র! হে সাধো! তোমার বোধসিদ্ধির নিমিত্ত আমি যে আখ্যায়িকা বর্ণন করিব; তুমি যদি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুক্ত হইতে পারিবে[৪২]। আপাততঃ আমি তোমার নিকট উৎপত্তি প্রকরণ (জগৎ যে প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ক্রম) কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে অবশ্যই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে[৪৩]। ভ্রান্তিময় জগৎ জন্মবান্ না হইয়াও ও জন্মরহিত শূন্যের ন্যায় হইয়াও যে প্রকারে প্রতিভাত হইতেছে, এই প্রকরণে আমি তোমার নিকট তাহাই বলিব। তাহা

শ্রবণ করতঃ হৃদয়ে ধারণ করিবে। করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে[৪৪]।

সর্ব্বপ্রকার বস্তু সমন্বিত সুরাসুর কিন্নরাধিষ্ঠিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই জগৎ—যাহা দৃষ্ট হইতেছে—মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে ইহার কিছুই থাকিবে না। সকলই বিনষ্ট হইবে। তখন না তেজঃ, না অন্ধকার, না কোন আখ্যা, কিছুই থাকিবে না। থাকিবে কি? থাকিবে—কেবলমাত্র এক অনির্দ্দেশ্য সৎ। অর্থাৎ যাহা অখণ্ডসত্তা তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে[৪৫।৪৭]। তাহা শূন্য নহে, আকৃতিবিশিষ্ট নহে, দৃশ্য ও দর্শন নহে, পূর্ণ ও অপূর্ণ নহে, সৎ ও অসৎ নহে, ভাব ও অভাব নহে। তবে তাহা কি? তাহা কেবল, চিন্মাত্র, অজর, অমর, আদি মধ্য ও অন্ত বিহীন ও চিত্তরহিতচিৎ[৪৮।৫০]। পরে তাদৃশ সৎ (ব্রহ্ম) পদার্থ হইতে জগতের প্রস্ফুরণ হইয়া থাকে। মুক্তা ও মুক্তাভোজী হংস যেরূপ; জগৎকারণ সৎ ও জগৎ ঠিক সেইরূপ। * সেই সৎ "ইহা বা তাহা" বলিবার অযোগ্য। সুতরাং তাহা সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক[৫১]। সেই সদ্বস্তু চিরকালই কর্ণ, জিহ্বা, নাসা ও নেত্রাদি বিহীন অথচ শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও দর্শন করিয়া থাকেন[৫২]। যে আলোকে আলোকনীয় আছে বা নাই বলিয়া জানা যায়, সেই চৈতন্য নামক আলোক তিনি। অপিচ, অজ্ঞান কালে যাঁহাতে বিচিত্র সৃষ্টি এবং অজ্ঞান নিবৃত্তিতে যিনি অনাদি নিধন চিৎপ্রকাশ, তিনিও ইনি[৫৩]। যোগীরা অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কৃষ্ণতারক (চক্ষুর কাল মণি) দ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রের মধ্যগামী করিয়া যাঁহাকে দেখেন, সেই ব্যোমাত্মা ইঁহার অনতিরিক্ত[৫৪]। যে বিভুর কারণ (জনক) শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক, এবং তরঙ্গভঙ্গ যদ্রূপ সমুদ্রের কার্য্য, এই জগৎ যাঁহার তদ্রূপ কার্য্য, এবং যিনি চিত্তস্থানে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে (চিত্তকে) নিরন্তর উজ্জ্বলিত করিতেছেন, যাঁহার চৈতন্যাত্মক দীপের দীপ্তিতে ত্রিজগৎ ভাসমান, যাঁহার অভাবে এই সকল প্রকাশ পদার্থ অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ তিমিরতুল্য হয়, এবং যাঁহা হইতে

* হংসেরা মুক্তাভোজী অর্থাৎ মুক্তাকর শুক্তি ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের শরীর বৃদ্ধি পায়। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, বলিতে পারা যায়, হংসশরীর মুক্তারই পরিণাম। সে ভাবে আগে মুক্তা ও পরে হংস এবং মুক্তাই হংস, এরূপ বলা যাইতে পারে। তাহা যেমন বলা যাইতে পারে, তেমনি, আগে সৎ পরে জগৎ সুতরাং সৎই জগৎ, এরূপ বলা যাইতে পারে।

এই ত্রিজগৎরূপ মৃগতৃষ্ণিকা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,[৫৫।৫৭] যিনি মনো-ভাবাপন্ন হইলে এই জগৎ সমুদিত হয় ও যাঁহার অস্পন্দে অর্থাৎ মনোভাব ত্যাগে এ সকল বিলীন হয়, জগতের নির্ম্মাণ ও বিলয় যাঁহার বিলাস; যিনি সর্ব্বব্যাপক, স্পন্দ ও অস্পন্দরূপী, যাঁহার স্বভাব নির্ম্মল ও অক্ষয়,[৫৮।৫৯] যাঁহার সত্তা ব্যবহার দশায় স্পন্দাস্পন্দরূপী; পরন্তু বস্তু দর্শনে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বব্যাপিনী,[৬০] যিনি সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ ও সর্ব্বদা সুষুপ্ত, যিনি সুপ্তও নহেন, প্রবুদ্ধও নহেন,[৬১] যাঁহার অস্পন্দে শান্ত ও শিব (পরম মঙ্গল), যাঁহার প্রস্পন্দে ত্রিজগৎ অবস্থিতি করি-তেছে, যিনি এক ও পূর্ণ,[৬২] যিনি পুষ্পস্থ সুগন্ধের সহিত উপমিত হন, নশ্বর পদার্থের নাশেও যাঁহার অবিনাশস্বভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে, যিনি শুক্ল পটের শুক্লত্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ হইয়াও অপ্রত্যক্ষ, যিনি মূকের তুল্য হইয়াও অমূক, যিনি নিত্যতৃপ্ত হইয়াও ভক্ষণ করেন ও ক্রিয়াতীত হইয়াও সকল কার্য্যের কর্ত্তা হন,[৬৩।৬৪] যিনি অনঙ্গ হইয়াও সর্ব্বাঙ্গযুক্ত, করচরণাদি না থাকিলেও শাস্ত্রে যাঁহাকে সহস্রকর বলে, চক্ষুঃ না থাকিলেও যাঁহাকে সহস্রলোচন বলা হয়, কোন প্রকার সংস্থান অর্থাৎ গঠন নাই অথচ যাঁহার দ্বারা এই ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত,[৬৫] যিনি ইন্দ্রিয়-বিহীন হইয়াও অশেষেন্দ্রিয়ক্রিযাকারী, যাঁহার মন নাই অথচ মানস কার্য্য (মানস কার্য্য=মায়িক সংকল্প) আছে, অর্থাৎ যাঁহার সৃষ্টি মানস সৃষ্টির (মনোরাজ্যের) অনুরূপ,[৬৬] যাঁহার অনবলোকনে এই সংসাররূপ উরগভয় উপস্থিত হইয়াছে, যাঁহার দর্শনে সর্ব্বকামনা ও সর্ব্বভয় তিরোহিত হয়,[৬৭] যেমন নট সকল দীপ থাকায় নাট্যক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়, তেমনি, যাঁহার বিদ্যমানতায় চিত্তের স্পন্দপূর্ব্বক চেষ্টা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে,[৬৮] যেমন বারিধি হইতে তরঙ্গরাশি, নানা আকারের কল্লোল ও অসংখ্য ক্ষুদ্র লহরী উৎপন্ন হয়, তেমনি, যাঁহা হইতে ঘটপটাদি বিবিধ বস্তু সমুৎ-পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে,[৬৯] সেই একই চিদাত্মা অজ্ঞানোত্থ ভেদ বৃত্তির প্রভাবে নানা জড় প্রপঞ্চে নানা রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন একই কাঞ্চন কটক, অঙ্গদ ও কেয়ূর প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি, সেই একই চিদাত্মা সেই সেই ভ্রমময় শত শত ও সহস্র সহস্র পদার্থের আকারে সমুদিত হইতেছেন[৭০]। হে রামচন্দ্র! অজ্ঞান ত্যাগ হইলেই সেই বোধাত্মা তোমাতে, আমাতে ও অন্যত্র, সর্ব্বত্রই এক

বলিয়া অবধৃত হইবে। যে আত্মাকে তুমি জানিতেছ, আমি ও এই সকল লোক সেই আত্মাকেই জানিতেছি ও জানিতেছে। চিদাত্মা এক বৈ দুই নহে। আর যাহারা অজ্ঞানাত্মা (অজ্ঞানপরিছিন্ন জীব) তাহারা তুমি, আমি ও এই সকল, এবংক্রমে ভেদ দর্শন করে[১১]। সলিল হইতে তরঙ্গের ন্যায় তাঁহা হইতে এই ভঙ্গুর ও দৃশ্য জগৎ প্রস্ফুরিত হইয়াছে সত্য বটে, এ সকল আপাততঃ তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় বটে; পরন্তু তাহা বাস্তব নহে[১২]। তাঁহা হইতেই হেমন্ত, শিশির ও বসন্তাদি কালের উৎপত্তি ও পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাঁহারই দ্বারা দৃশ্য সকল দর্শনের গোচর হইতেছে, এবং তাঁহারই প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত হইতেছে[১৩]। রাঘব! তুমি যে ক্রিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং চেতনাদি জানিতেছ, সে সমস্তই সেই দেব। এবং যাঁহার দ্বারা ঐ সমস্ত জানিতেছ, তিনিও সেই দেব[১৪]। হে সাধো! দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, এই তিনের মধ্যে প্রকাশরূপে অবস্থিত যে দর্শন—তাহাই চৈতন্যের স্বরূপ—তাঁহাকে অবগত হইতে পারিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়[১৫]। সেই ব্রহ্ম অজ, অজর, অনাদি, শাশ্বত, অমল ও মঙ্গলময়, অথচ শূন্যপ্রায়। অর্থাৎ অমূর্ত্ত। তিনিই সকল কারণের কারণ, অনুভবরূপী, অথচ অবেদ্য। অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না পরন্তু তিনি এই চরাচর বিশ্ব জানিতেছেন[১৬]।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনিবর! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যাহা অবশেষ থাকে তাহা আকার ও নামাদি রহিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু তাহা যে শূন্য নহে, প্রকাশ নহে, তমঃ নহে, ভাস্য (প্রকাশার্হ) নহে, চৈতন্যরূপী নহে এবং জীবও নহে, এ সকল কথার অর্থ কি? এবং কি প্রকারেই বা ঐ সকল কথার অর্থ সঙ্গত হইতে পারে?১।২ অপিচ, তাহা কিজন্য বুদ্ধিতত্ত্ব ও মন নহে? ও কি নিমিত্তই বা তাঁহাতে তুমি আমি, এ সকল প্রভেদ নাই, আপনি একবার বলিলেন, তাহা কিছুই নহে, আবার বলিলেন, তাহাই সমস্ত। আপনার তদ্বিধ বাক্‌ভঙ্গী আমাকে যেন মুগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে যাহাতে আমার মোহভঙ্গ হয় তাহার উপায় বিধান করুন৩।৪।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বিষম হইলেও, যেমন অংশুমালী (সূর্য্য) সমুদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ, আমি অনায়াসে তোমার ঐ সমস্ত সংশয় ছেদন করিব৫। হে রামচন্দ্র! আমি যাহা বলি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, সেই যে সৎ অবশিষ্ট থাকেন, তিনি যে নিমিত্ত শূন্য নহেন, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর৬। যেরূপ অনুৎকীর্ণ স্তম্ভে (খোদাই করা হয় নাই এমন প্রস্তরের অথবা কাষ্ঠের থামে) কাষ্ঠপুত্তলিকা অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় এই জগৎ সেই পরব্রহ্মেই অবস্থিতি করে, সেজন্য তাহা শূন্য নহে। (শূন্য নাম-রূপ-আখ্যা-রহিত, অভাব বা বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় মিথ্যা পদার্থ, সুতরাং তাহাতে কোন কিছুর অবস্থান অসম্ভব)। এই জগৎ নামক মহাভোগ সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, যাহাতে অবস্থিতি করতঃ প্রতিভাত হইতেছে, তাহাকে কি প্রকারে শূন্য বলিতে পারা যায়?৭।৮ যেমন অনুৎকীর্ণপুত্তলিক স্তম্ভ পুত্তলিকাশূন্য নহে, সেইরূপ, ব্রহ্মও জগৎশূন্য নহেন। শিল্পীর শিল্পক্রিয়ায় স্তম্ভলুক্কায়িত পুত্তলিকা সকল স্তম্ভ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যায়। তাহার ন্যায় ব্রহ্ম হইতেই মায়ার কৌশলে

জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই কারণে বলিয়াছি, সে পদ অর্থাৎ পরব্রহ্ম পদ শূন্য নহে[৯]। যেমন সুস্থির সলিলে তরঙ্গের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব উভয়ই আছে, তেমনি, পরব্রহ্মে জগতের শূন্যতা ও অশূন্যতা উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে[১০]। অন্যান্য উপকরণ থাকিলেও যেমন কর্ত্তার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা না থাকিলে পুত্তলিকার রচনা সম্পন্ন হইতে পারে না, তেমনি, সর্ব্বধ্বংস মহাপ্রলয়ের পরেও জগৎ সর্জ্জন হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করতঃ বিপরীতবুদ্ধি জনগণ স্তম্ভ-স্থিত পুত্তলিকার দৃষ্টান্তে বিমুগ্ধ হন অর্থাৎ তাহা বুঝিতে অপারক হন[১১]। তাঁহারা ভাবেন, জগৎ অনন্ত পরমাত্মায় বিলীন হইলে কে তাহা হইতে পুনর্ব্বার তাহার আবির্ভাব করিবে? কে তাহার কর্ত্তা হইবে? কেহই-ত থাকে না? কিন্তু রাম! পরমার্থ পক্ষে জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে ঐ দৃষ্টান্ত একাংশে, সর্ব্বাংশে নহে। অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্ত কেবল আবির্ভাবাংশে, কর্ত্তাদি অংশে নহে[১২]।

বস্তুতঃই এই জগৎ সেই ব্রহ্ম হইতে কোনও কালে সত্য সত্যই উদিত ও অস্তমিত হয় না। কেবল ও সৎস্বরূপ সেই পরব্রহ্মই বর্ণিত প্রকার স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন[১৩]। তাঁহাকে যে শূন্য বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা অশূন্য অপেক্ষা। নচেৎ একমাত্র অশূন্য হইতে শূন্য ও অশূন্য উভয়ের উৎপত্তি অসম্ভব হয়[১৪]। সেই ব্রহ্ম সূর্য্য, অনল, ইন্দু এবং তারাদি ভূত সকল দ্বারা প্রকাশিত হন না। বস্তুতঃ সেই অব্যয় পরমাত্মায় সূর্য্যানলাদির প্রকাশ সম্বন্ধ সর্ব্বথা অসম্ভব। রাম! এই ভাবের ভাবুক হইয়া আমি বলিয়াছি, তিনি ভাস্য নহেন অর্থাৎ প্রকাশ্য নহেন[১৫]। কোন কিছুতে ভৌতিক প্রকাশের অভাব দেখিলে তাহাকে আমারা তমঃ বলি। কিন্তু তাঁহাতে (পরব্রহ্মে) পৃথ্ব্যাদি প্রকাশক অগ্ন্যাদি ভূতের প্রকাশ প্রসর প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যুত সেই ব্যোমরূপী স্বপ্রকাশ পরমাত্মার নিকট ভৌতিক প্রকাশ অভি-ভূত হইয়া যায়। সেই কারণে বলিয়াছি, তাহা তমঃ নহে[১৬]। তিনি যে স্বপ্রকাশ পদার্থ, পরপ্রকাশ্য নহেন, সে বিষয়ে এক মাত্র অনুভূতিই প্রমাণ। তিনি বুদ্ধ্যাদি পদার্থেরও অন্তরে অবস্থান করতঃ বুদ্ধ্যাদিকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ অনুভূতিস্বরূপ; সেজন্য তাঁহারই দ্বারা অন্যান্য পদার্থ অনুভবগম্য হয়। অথচ তিনি নিজে অননুভবনীয়[১৭]।

তিনি কথিতপ্রকারের তমঃ ও প্রকাশ, উভয়েরই অতীত। সেই কারণে বলিয়াছি, ব্রহ্মপদ অজর অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয়। তিনিই এই জগৎস্থিতি-রূপ ধনের আগার এবং তাঁহাকে তুমি আকাশের উদরের ন্যায় বাধা-রহিত, অসীম ও স্বচ্ছ বলিয়া জানিবে[১৮]। রামচন্দ্র! যেমন বিল্বফলের সহিত তাহার অভ্যন্তরের বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই, (উপরেও স্থূল, ভিতরেও স্থূল), সেইরূপ, ব্রহ্মের সহিত জগতের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই[১৯]। যেমন সলিলের অন্তর্গত বীচি (বীচি=ক্ষুদ্র লহরী), যেমন মৃত্তিকার অন্তর্গত ঘট, তেমনি, এই জগৎ যাহার অন্তর্গত বা যাহাতে অবস্থিত, কিরূপে তাহাকে শূন্য (নাই অথবা মিথ্যাপদার্থ) বলিতে পারি?[২০] যদি বল, জলান্তর্গত মৃত্তিকাকে জলীয়স্বভাব এবং ঘটান্তর্গত জলকে ঘটের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মান্তর্গত জগতেরও ব্রহ্মস্বভাবতা কিরূপে বা কি দিয়া বুঝা যাইবে? এই বিষয়ে আমার বক্তব্য—ঐ দৃষ্টান্ত বিষম। অর্থাৎ অতুল্য বা সমান নহে। মৃত্তিকা ও জল সাকার পদার্থ, পরন্তু ব্রহ্ম নিরাকার বস্তু। সাকার পদার্থের ব্যবস্থা অন্যরূপ, নিরাকার বস্তুর ব্যবস্থা অন্যবিধ। বিশদাকার ব্রহ্ম নিরাকার বিধায় তদন্তর্গত জগৎও নিরাকার[২১]। আকাশ অপেক্ষা অধিক সুনির্ম্মল চিদাকাশ, যাহা তদন্তর্গত, তাহাও তদ্রূপ। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত চিদাকাশকে জগৎ বলিতে পার সত্য, পরন্তু তাহা বস্তুকল্পে জগৎ নহে[২২]। যেমন মরীচির (সূর্য্য কিরণের) অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণতা ব্যতীত অনুভব কর্ত্তা অন্য কিছু অনুভব করেন না, তেমনি, চিদাকাশেও (চৈতন্যরূপ আকাশেও) চেত্য অর্থাৎ চিতিগ্রাহ্যতা (চিতি=জ্ঞান) ব্যতীত অন্য কিছু থাকা লক্ষ্য হয় না। ভাবার্থ এই যে, দর্শন বা জ্ঞান দৃশ্যের বা জ্ঞেয়ের অনতিরিক্ত[২৩]। সেই কারণে বলা যায়, চিৎ অচিৎ উভয়রূপই প্রোক্ত পরমাত্মার অবস্থিত। অর্থাৎ তিনিই দর্শন এবং তিনিই দৃশ্য। অথচ তাঁহাতে বাস্তব দৃশ্যতা নাই। যেমন বাস্তব দৃশ্যতা নাই তেমনি বাস্তব জগৎও নাই[২৪]। রূপালোক অর্থাৎ বাহ্যিক দর্শন এবং মনস্কার অর্থাৎ অন্তঃস্থ বিজ্ঞান, সমস্তই তিনি। কিছুই তদতি-রিক্ত নহে। বিশ্ব যেমন ভাবেই থাকুক, অবশেষে হয় সুষুপ্ত না হয় তুরীয়[২৫]। * অজ্ঞেরা ইহাকে যেরূপ দৃষ্টিতে দেখেন শান্তবুদ্ধি সুষু-

* সুষুপ্তিতেও দৃশ্য জগৎ থাকে না, নির্ব্বাণেও থাকে না। সুষুপ্তিতেও ব্রহ্মে জগতের

প্তাত্মা যোগীরা ব্যবহারপরায়ণ হইলেও তাঁহারা ইহাকে ঠিক্ তদ্রূপ দেখেন না অর্থাৎ তাঁহারা অজ্ঞ দিগের ন্যায় ব্যবহারকারী নহেন। ব্যবহারনিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞানের আধার স্বরূপ নিরাভাস পরব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া থাকেন[২৬]। রামচন্দ্র! যেমন আকারবিশিষ্ট সুস্থির সলিলে আকার-বিশিষ্ট মহোর্ম্মিমালা অবস্থিতি করে, সেইরূপ, নিরাকার পরব্রহ্মে তৎসদৃশ জগৎ অবস্থিতি করিতেছে[২৭]। যাহা সেই পূর্ণ ব্রহ্মে ঔপাধিক ভেদা-বভাসে প্রকাশিত, তাহাও পূর্ণ। এ রহস্য যৌক্তিক অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞেয়। যাহা পূর্ণ তাহা নিরাকার। ব্রহ্ম পূর্ণ; সেজন্য ব্রহ্ম নিরাকার সুতরাং তৎপ্রকাশিত জগৎও পূর্ণতা বিধায় নিরাকার। ইহার যে আকার, তাহা মিথ্যা। সুতরাং নিরাকার দিক্‌টাই সত্য[২৮]। হে রাঘব! পূর্ণ হইতে বিসৃত হইয়া যাহা অবস্থিতি করে; তাহাও পূর্ণ। অতএব, এই বিশ্ব চিরকালই পৃথক্ ভাবে অনুৎপন্ন। যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৯]। সেই পরম পদে যাহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে জগৎ নাই। যদি অনুভব কর্ত্তা না থাকে তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, মরীচিমালার তীক্ষ্নতা কোথায় থাকে?[৩০] রাম! সেই পরব্রহ্ম কথিত প্রকারেই প্রতিভাত হইতেছেন, এ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ প্রত্যয় আহরণ করিবে। এই সমস্ত জীব তাঁহারই প্রতিবিম্ব। তাঁহার প্রতিবিম্ব ভাব ব্যতীত কদাচ জীব ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রোক্তকারণে তাঁহাকে জীববান্ বলা যায়। তিনি পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র এবং আকাশ হই-তেও বৃহৎ। তিনি শুদ্ধ ও শান্তস্বরূপ[৩১।৩২]। দিক্‌কালাদির দ্বারা অন-বচ্ছিন্ন বলিয়া তাঁহার স্বরূপ অতিবিস্তৃত। সেই আদ্যন্তরহিত পরমাত্মা নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ[৩৩]। যে স্থানে চৈতন্যের আবির্ভাব নাই সে স্থানে জীবতা, বুদ্ধিতা, চিত্ততা, ইন্দ্রিয়ত্ব এবং অনিলবায়ুরূপিণী বাসনা প্রভৃতি কিছুই নাই (বাসনা কি? বাসনা এক প্রকার বায়ুপ্রভেদ অর্থাৎ বাতিক বিশেষ)[৩৪]। হে রাঘব! এই প্রকারে সেই পূর্ণ, অজর, শান্ত ও আকাশ অপেক্ষা অধিক নির্ম্মল পরমাত্মা আমাদিগের দৃষ্টিগোচরে অব-স্থিতি করিতেছেন[৩৫।৩৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! সেই অনন্ত চিদাকৃতি পরমার্থের রূপ

প্রলয় এবং মোক্ষেও জগতের প্রলয়। এ স্থলে প্রলয় শব্দের অর্থ অদর্শন।

কিম্বিধ তাহা বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৩৭]। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে সেই মূল কারণ ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তাঁহার স্বরূপ যাহাতে তোমার বোধগম্য হইতে পারে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৩৮]। সমাধির দ্বারা সমুদায় মনোবৃত্তি বিলীন হইলে মন তখন ইন্ধনশূন্য অনলসদৃশ নিঃস্বরূপ ও আখ্যারহিত হইয়া যায়। তৎকালে যে সৎ অর্থাৎ সত্তা থাকে, সেই অবিনাশিনী কূটস্থ সত্তা সেই মূলকারণ ব্রহ্ম বস্তুর স্বরূপ[৩৯]। "দৃশ্য কিছুই নাই এবং দৃশ্যের অভাব হেতু দ্রষ্টাও বিলীনবৎ হইয়াছে" এরূপ হইলে তৎকালে যে বোধ বিদ্যমান থাকে, সেই বোধই পরমাত্মার রূপ[৪০]। চৈতন্যের জীবভাবরহিত হইয়া গেলে যে নির্ম্মল প্রশান্ত চিন্মাত্র বিদ্যমান থাকে, সেই পূর্ণ চিন্মাত্র ভাবই পরমাত্মার রূপ[৪১]। জীবদেহে জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সংলগ্ন হইলে যদি চিত্তে স্পর্শজনিত বিকার (দুঃখাদি) না জন্মে, তাহা হইলে সেই নির্ব্বিকার চিত্তের যেরূপ রূপ অনুভূতি গোচর হয়, সেইরূপ রূপ পরমাত্মার[৪২]। মন স্বপ্নবর্জ্জিত জাড্যরহিত অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ও চিরসুষুপ্ত হইলে তাহার স্বরূপ যেরূপে অনুভবনীয়, প্রলয়াবশিষ্ট ব্রহ্ম সেইরূপে অনুভবনীয়[৪৩]। আকাশের রহস্য, শিলার হৃদয় ও পবনের হৃদয় যেরূপ অচেত্য; চিৎস্বরূপ ব্যোমাত্মা পরমাত্মার রূপ সেইরূপ[৪৪]। * জীবের চেত্য (জ্ঞান গ্রাহ্য) বস্তু বিষয়ক জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে যে পরমা শান্তি ও নির্ব্বিশেষ সত্তা বিদ্যমান থাকে, সেই শান্তিময়ী সত্তাই আদিবস্তুর রূপ[৪৫]। যাহা চিৎপ্রকাশের অন্তরে (আনন্দময় কোষ), যাহা আকাশ প্রকাশের (মায়াকাশের) অন্তরে এবং যাহা ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তরে প্রস্ফূরিত হয়, তাহাই পরব্রহ্মের রূপ[৪৬]। যাহার দ্বারা বহিরবস্থিত দৃশ্য ঘটপটাদি ও অন্ধকার প্রভৃতি ও অন্তঃস্থ মনোবৃত্তি প্রভৃতি প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, যাহা জীবের ও জ্ঞানের সাক্ষী এবং যাহা বেদান্তাদি শাস্ত্রে চিৎ নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই সেই পরমাত্মার রূপ[৪৭]। নিত্য অনুদিতরূপী হইলেও যাহা হইতে জগৎ সমুদিত হইয়াছে ও হইতেছে, ভিন্ন হউক, আর অভিন্ন হউক, তাহা পরমাত্মার রূপ ব্যতীত অন্য

---

* আকাশের রহস্য শূন্যাকারত্ব। বায়ুর হৃদয় অর্থাৎ রহস্য অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণতা। পাষাণের হৃদয় নিবিড়ত্ব।

কিছু নহে[৪৮]। যিনি ব্যবহার কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়াও আপনাকে পাষাণবৎ (নির্লিপ্ত ও অন্তরে বাহিরে একরূপ) বোধ করেন এবং যাহা ব্যোম না হইয়াও ব্যোম, তুমি অবগত হও যে তাহা পরমাত্মার রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৯]। যাহাতে বেদ্য (ঘটাদি), বেদন (জ্ঞান), এবং বেত্তৃত্ব (জ্ঞাতার ধর্ম্ম), এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম উদিত ও অস্তমিত হই-তেছে, তাহা পরমাত্মার রূপ[৫০]। মহান্ আদর্শে প্রতিবিম্বপাতের ন্যায় যাহাতে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতৃত্ব প্রতিবিম্বিত হইতেছে তাহাই পরমতত্ত্বের রূপ[৫১]। মন যদি স্বপ্নাদি ও ইন্দ্রিয়োপলক্ষিত জাগ্রদবস্থা বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে মহাচৈতন্যের স্থিতি যেরূপে পর্য্যবসিত হয়, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে মহাচৈতন্য প্রায় সেইরূপে অবস্থিতি করেন[৫২]। যাহাকে তুমি স্থাবর বলিয়া জান, তাহা যদি বোধময় বা চিদ্ঘন বস্তু হয়, আর তাহাতে যদি মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সংযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থিরভাবে অবস্থিত চিদ্ঘন পদার্থের সহিত পরমাত্মার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে[৫৩]।

হে রাঘব! ব্রহ্মা, অর্ক, বিষ্ণু, হর, ইন্দ্র ও সদাশিবাদি ঈশ্বরবৃন্দ শান্তি প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ প্রলয়গ্রস্ত হইলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন, তিনি পরম শিব এবং তিনিই ঐ সকল সংহার পূর্ব্বক বিশ্বসংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসংজ্ঞায় একাদ্বয়রূপে অবস্থিতি করেন[৫৪]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেব, নর, অসুর এবং তির্য্যগাদি বিবিধ জীবপূর্ণ এই দৃশ্যমান জগৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে কোথায় যাইবে? এবং কিসেই বা অবস্থিতি করিবে? তাহা বর্ণন করুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন কোথা হইতে আইসে? কোথায় গমন করে? এবং তাহাদের আকৃতি কিরূপ? এই সকল অগ্রে আমাকে বল, পশ্চাৎ তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিব[২]। রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন নাই। যাহা কোন পদার্থ নহে তাহার আবার দৃশ্যতা কি? নাস্তিতা কি? অস্তিতাই বা কি?[৩] বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! বন্ধ্যাপুত্র ও ব্যোমবন যদ্রূপ, এই দৃশ্যমান জগৎও তদ্রূপ। যাহা কস্মিন্ কালেও হয় নাই, যাহা কেবল মাত্র ভ্রান্তি, তাহার আবার উৎপত্তি ও বিনাশ কি?[৪।৫]

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বন্ধ্যাপুত্র ও নভোবৃক্ষ কল্পনাময়। পরন্তু জগৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব, বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত ইহা কিরূপে উপমিত হইতে পারে? বরং ঐ দৃষ্টান্তের বলে এমন প্রতীতি হইতেও পারে যে, বন্ধ্যাপুত্রাদি বৈকল্পিক ও অলীক হইলেও তাহাতে উৎপত্তিবিনাশাদি জগদ্ধর্ম্ম আছে[৬]। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! যাহার [illegible] তুলনা অন্যত্র প্রাপ্ত না হওয়া যায়, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে তাহারই দ্বারা তুলিত করিয়া থাকেন। সেরূপ তুলনা অলঙ্কার শাস্ত্রে অনন্বয় নামে বিখ্যাত। * তাহার ন্যায় আমরাও বন্ধ্যাপুত্রাদির সহিত জগৎ সত্তার তুলনা করিয়া থাকি। সে সকল তুলনার তাৎপর্য্য—বন্ধ্যাপুত্রাদির অস্তিত্ব যদ্রূপ, জগতের পৃথক্ সত্তাও তদ্রূপ[৭]। যেমন সৌবর্ণ কটকে (কটক=বালা নামক হস্তাভরণ) সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, এবং যেমন আকাশে শূন্যতা ব্যতীত অন্য কিছু অনুভূত হয় না, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞানে পরব্রহ্মে পৃথক্ জগৎ নাই ও অনুভূতও হয় না[৮।৯]।

---

* আলঙ্কারিক দিগের উদাহরণটী এই—"গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ" ইত্যাদি। এইরূপ তুলনায় সাগরের অনুপমত্বমাত্র ব্যক্ত করা হয়।

যেমন কজ্জলের সহিত শ্যামতার, শৈত্যের সহিত হিমের ও শিশিরের সহিত শীতলতার প্রভেদ নাই; সেইরূপ, পরব্রহ্মের সহিতও জগতের প্রভেদ নাই[১০।১১]। এই জগৎ আপাত দর্শনে প্রতীত হইলেও যেমন ভ্রান্তিদৃষ্ট নদীতে জলের ও দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্রমায় চন্দ্রত্বের অভাব পশ্চাৎ সুস্পষ্ট হয়, সেইরূপ, সেই অমলাত্মা ব্রহ্মেও জগতের অভাব সেইরূপে অবধারিত হইয়া থাকে[১২]। যাহা আদৌ নাই, তাহার আবার উৎপাদক কারণ কি? অপিচ, যাহা পূর্ব্ব হইতেই নাই, বুঝিতে হইবে তাহা এখনও নাই। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, বর্ত্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবেক না, তাহার আবার বিনাশ কি?[১৩] জড়ই জড়পদার্থের কারণ (উৎপাদক), ইহা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম জড় নহেন, সেজন্য তৎ-কার্য্য জগৎও জড় নহে। যেমন ছায়া ও আতপ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, তেমনি, চিৎ ও জড় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। (ভাবার্থ এই যে, চেতন ব্রহ্মে অচেতন জগতের প্রকৃত সত্তা যুক্তিবিরুদ্ধ)[১৪]। ব্রহ্ম ব্যতীত কারণ না থাকায় ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কার্য্যও নহে। যে কারণ নিত্যাবস্থিত, সেই কারণই এই জগদ্ভাবে বিবর্ত্তিত রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, এ সকল দৃশ্য ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৫]। অবিদ্যা কারণের কথা বলিবে, তাহাও সত্য জগৎ সৃজন করে না। তাহা সেই সৎচিৎব্রহ্মবস্তুকে আভাসিত অর্থাৎ জগদাকারে অবভাসিত করে মাত্র; অল্প মাত্রও বিকৃত করে না। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ যদ্রূপ, এই জাগ্রদ্দৃষ্ট জগৎও তদ্রূপ[১৬]। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নগরাদি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয় অথচ তাহা নাই, সেইরূপ, স্বাশ্রিত অজ্ঞানের কুহকে পরমাত্মায় জগৎ না থাকিলেও জগদ্দর্শন হইয়া থাকে[১৭]। এই যে-কিছু দেখিতেছ, সমস্তই আপনাতে অর্থাৎ আত্মায় অবস্থিত। জগৎ কোনও কালে সত্য সত্য উদয় ও অস্ত প্রাপ্ত হয় না ও হইবেও না[১৮]। যেমন সলিল দ্রব ভাবে, বায়ু স্পন্দনরূপে ও প্রকাশ আভার আকারে পরিচিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মও ত্রিজগৎ আকারে পরিচিত হইতেছেন[১৯]। যেমন স্বপ্ন দ্রষ্টার অন্তঃস্থ-বিজ্ঞান নগরাদি আকারে বিবর্ত্তিত হয়, তেমনি, বিজ্ঞানঘন পরমাত্মা জগদাকারে অবভাসিত হইতেছেন[২০]।

রঘুবীর রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিষময় দৃশ্য (জগৎ) যদি সত্য সত্যই স্বপ্নানুভবের ন্যায় অলীক হয় তাহা হইলে ইহাতে মনু-

ষ্যের কল্প কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী দৃঢ় প্রত্যয় (সত্য বলিয়া বিশ্বাস) নিবদ্ধ আছে কেন?[২১] * আমার অন্য সংশয় এই যে, দৃশ্য থাকা সত্ত্বে দ্রষ্টার অপলাপ এবং দ্রষ্টা থাকায় দৃশ্যের অপলাপ নিতান্ত অসম্ভব। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, একতর থাকিলেই উভয়ের দ্বারা বদ্ধ থাকিতে হয়, পরন্তু একের সঙ্ক্ষয় হইলে উভয়ভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়[২২]। অতএব, যাবৎ না বুদ্ধিতে দৃশ্যজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে তাবৎ দ্রষ্টা (আত্মা) দৃশ্য (জগৎ) দর্শন করিবেই করিবে। সুতরাং মোক্ষবুদ্ধি সমুদিত হইবে না[২৩]। যদি দৃশ্য জ্ঞান উদিত হইয়া পশ্চাৎ তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও অনর্থ নিবারণ হয় না। কারণ, পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ পুনর্ব্বার সংসার-ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং তাহাতেও বন্ধের অনি-বৃত্তি[২৪]। আদর্শ যে কোন অবস্থায় থাকুক, থাকিলেই তাহাতে বস্তুপ্রতিবিম্ব সংলগ্ন হইবে। তাহার ন্যায় চিদাদর্শ (চেতনরূপ আদর্শ, আয়না) যে কোন অবস্থায় থাকিবেক, থাকিলেই তাহাতে সংসার-প্রতিবিম্ব সংলগ্ন হইবে[২৫]। দৃশ্য যদি আদৌ উৎপন্ন না হইয়া থাকে, অথবা দৃশ্য যদি সত্য সত্যই না থাকে, তাহা হইলে দৃশ্যের অভাব-স্বভাবতা হেতু দ্রষ্টা তাহা হইতে স্বভাবতঃ মুক্ত হইতে পারেন, পরন্তু তাহা নিতান্ত অসম্ভব। হে আত্মবিদশ্রেষ্ঠ! প্রোক্ত কারণে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে আমার দৃশ্যজ্ঞানের অত্যন্তাসম্ভব বুদ্ধি জন্মে ও ঐ সকল সংশয় অপনীত হয়, আপনি তাহা আমাকে যুক্তি সহকারে উপদেশ করুন[২৬।২৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অসত্য হইলেও এই সাঙ্গোপাঙ্গ জগৎ যে প্রকারে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, আমি দীর্ঘ উপাখ্যান দ্বারা তাহা তোমার নিকট বর্ণন করি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর[২৮]। যাবৎ না আমি পূর্ব্বকালের ব্যবহার প্রসিদ্ধ বহুবিধ দৃষ্টান্ত বাক্য দ্বারা তোমার নিকট ঐ বিষয় বর্ণন করিব, তাবৎ, যেরূপ হ্রদ হইতে ধূলিকণা

---

* জগতের জ্ঞান সুঘন অর্থাৎ নিতান্ত দৃঢ়, কিন্তু স্বাপ্নজ্ঞান অদৃঢ় অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎকাল-স্থায়ী। সুতরাং ইহার স্বপ্নতুল্যতা মনোমধ্যে ধারণা করা যায় না। অপিচ, দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যে সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক। কৃত্রিম বা কল্পিত নহে। সেই কারণে সে জ্ঞান অনিবার্য্য। প্রোক্ত কারণদ্বয়ে কথিত প্রকারের মুক্তি অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ইহাই রাম প্রশ্নের নিগূঢ় অর্থ।

উড্ডীয়মান হয় না, সেইরূপ, তোমার হৃদয় হইতে দৃশ্যজ্ঞান কদাচ অপনীত হইবে না[২৯]। রাম! এই জগৎ নিতান্ত অলীক ও ভ্রমময়, ইহা মনে রাখিয়া ব্যবহার রত হইবে[৩০]। তাহা হইলে সায়ক যেমন পর্ব্বত ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, প্রয়োজন বোধে গ্রহণ, অপ্রয়োজন বোধে ত্যাগ এবং বিবিধ স্থূল সূক্ষ্মাদি বিষয়ে সত্যতা বোধ ও সত্য বলিয়া ব্যবহার, এ সকল তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না[৩১]। রাঘব! আত্মা দ্বিতীয়বর্জ্জিত, অসঙ্গ ও ব্যাপক। তাদৃশ আত্মায় যেরূপে জগতের উৎপত্তি হয় তাহা তোমার নিকট এই মুহূর্ত্তেই কীর্ত্তন করিব। এই চরাচর বিশ্ব সেই এক মাত্র পরমাত্মা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেই পরমাত্মাই বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাবলোকন প্রকারের আস্পদ-স্বরূপ (অর্থাৎ বাহ্য জগৎ) এই জগতের মননপ্রকারাস্পদ (অর্থাৎ অন্তর্জ্জগৎ) হইয়া উদিত ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৩২,৩৩]। *

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* ভাবার্থ এই যে, তিনিই ব্যষ্টি, তিনিই সমষ্টি, তিনিই স্থূল, তিনিই সূক্ষ্ম, তিনি বাহ্য-প্রপঞ্চ এবং তিনিই অন্তঃপ্রপঞ্চ। তিনি নিজে নিজ মায়ায় দৃশ্যভাবে উদিত ও অদৃশ্যভাবে অস্তমিত হইতেছেন বা ভ্রান্তি বশতঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় দেখিতেছেন।
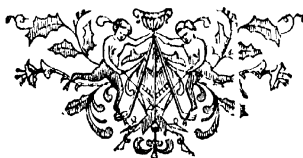
দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, সেই পরম পবিত্র শান্তপদ (তুরীয় ব্রহ্ম) হইতে যে প্রকারে এই অনন্ত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, তুমি তাহা উত্তম (নির্ম্মল) বুদ্ধি অবলম্বনে শ্রবণ করিবে[১]। যেরূপ সুষুপ্ত্যবস্থা স্বপ্নবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, সেই-রূপ, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মও সৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া প্রতিভাত হন। এ বিষয়ে যে ক্রম বা প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২]।

এই বিস্তীর্ণ বিশ্ব সেই অনন্তপ্রকাশ অনন্তমহিম পরমাত্মরূপ চিৎনামক রত্নের বিচিত্রসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩]। তিনি আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ; এবং নির্ম্মল। তাদৃশ নির্ম্মল আত্মায় প্রথমে আপনা আপনি (নিজ মায়াশক্তির উদয়ে) যৎকিঞ্চিৎ চেত্যতার (জ্ঞেয় ভাবের) উদয় হয়। সে চেত্যতা অর্থাৎ বিজ্ঞেয় ভাব—অহম্। এই অহংএর গর্ত্তে সমুদায় সৃজ্যমান পদার্থের অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসংস্কার অবস্থিত থাকে। তাহা অস্মদাদির সংস্কারবিশিষ্ট চিত্তের (স্মরণবৃত্তির) উদ্বোধের অনুরূপ[৪,৫]। অনন্তর সেই চিত্তবৃত্তির ন্যায় বৃত্তিবিশিষ্ট চেতনাত্মক ব্রহ্মসত্তার অনতিরিক্ত পরম-সত্তা চিন্নামযোগ্যা অর্থাৎ পরমেশ্বর সংজ্ঞার উপযুক্তা হইয়া থাকে[৬]। পশ্চাৎ তিনি যখন চিরানুবৃত্ত ঈক্ষণ সম্বেদন বশতঃ * জ্ঞানঘন হন, তখন তিনি আত্মস্বভাব বিস্মৃত ও পরমপদ পরিত্যাগ করতঃ ভাবিপ্রাণধারণো-পাধিক জীবভাব প্রাপ্ত হইতে থাকেন[৭]। জীবভাব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার ব্রহ্মভাবের অপচয় হয় না। কারণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসত্তাই ভাবনাবিশেষ (এক প্রকার মায়িক ইচ্ছা) দ্বারা সংসরণোন্মুখী হয়, তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার স্বরূপ বিকৃতি হয় না[৮]। ব্রহ্মস্বভাব অপরিচ্যুত থাকিয়া

---

* ব্রহ্মসত্তা=ব্রহ্মতত্ত্ব। চিত্তে যেমন জ্ঞানসংস্কার থাকে, তাহার ন্যায় প্রকৃতিতে অর্থাৎ মায়াশক্তিতে প্রলয়প্রাপ্ত জগতের সংস্কার থাকে। পরে পুনঃ সৃষ্টির প্রথমে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। তখন ব্রহ্মে সৃজনশক্তির উদয় হয়, তাহাতেই তিনি ঈশ্বর হন। ঈশ্বর প্রথমে আমি বহু হইব, এইরূপ সঙ্কল্প করেন। তাঁহার ঐরূপ সঙ্কল্পের নাম ঈক্ষণ—সম্বেদন।

জীবভাব প্রাপ্ত হইলে পর প্রথমে তাঁহাতে খসত্তার (খ=আকাশ) আবির্ভাব হয়। সেই খসত্তা এক্ষণে আকাশ ও শূন্য নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বত্র প্রকাশমান বলিয়া আকাশ নাম এবং অন্যান্য ভূতের স্থান দানার্থ শূন্যপ্রায় বলিয়া শূন্য নাম দেওয়া হয়। এই খসত্তা, শূন্য বা আকাশ, সূর্য্যাদি সৃষ্টির পর আকাশ নামে প্রথিত হয় এবং ইহাই শব্দাদি গুণের বীজ স্বরূপ[৯]। অনন্তর তাহা হইতে কালসত্তার সহিত (কালসত্তা=কালের অস্তিত্ব। এই সময় হইতে কালের অস্তিত্ব বোধগম্য হইতে থাকে) অহংএর উদয় হয়। এই অহং ভাবি সৃষ্টির ও তাহার স্থিতির মূল কারণ। (ইহা হিরণ্যগর্ব্তের অহঙ্কার বা মূলীভূত সমষ্টি অহঙ্কার)। হে রাঘব! এইরূপে সেই পরমসত্তায় (ব্রহ্মে) অসদ্রূপ জগজ্জাল সমুৎপন্ন হইয়া সতের আশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে[১০।১১]। অপিচ, সেই অহং ও আকাশ উভয়ান্বিত সম্বিৎ (অর্থাৎ অহং তত্ত্ব ও আকাশ উভয় সম্বলিত ব্রহ্ম চৈতন্য) সঙ্কল্পরূপ কল্পবৃক্ষের (সঙ্কল্প আকাশেরই কার্য্য) বীজ। সেই যে অহঙ্কার, তাহারই এক দেশ হইতে স্পন্দনধর্ম্মী বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে[১২]। সেইজন্য সেই অহম্ভাববিশিষ্ট আকাশরূপ পরমসত্তা শাস্ত্রীয় ভাষার শব্দতন্মাত্র। এই শব্দতন্মাত্রা হইতে স্থূল শব্দের বিবিধ উৎপত্তি হইয়াছে[১৩]। অভিহিত শব্দতন্মাত্রা শব্দৌঘশাখীর (শব্দৌঘশাখী=শব্দময় বৃক্ষ, বেদ) পরম বীজ। সেই বীজ হইতে ভবিষ্যৎ নাম ও আকার এবং পদ, বাক্য ও প্রমাণযুক্ত বেদ, সমস্তই উদিত হইয়াছে[১৪]। সেই বেদভাবাপন্ন পরমাত্মা এই পরিণামপ্রসারী নিখিল জগৎ প্রকাশিত করিয়াছেন[১৫]। পূর্ব্বে যে বায়ু প্রভৃতির কথা বলিয়াছি, তদ্‌যুক্ত চিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য জীবনামের অভিধেয় অর্থাৎ বোধ্য। (জীবে প্রাণ সংযোগ আছে বলিয়া তাহা বায়ুযুক্ত)। এই জীব নিখিল মূর্ত্তাকারের বীজ[১৬]। সেই প্রাণনামক মহাবায়ু হইতে তদ্ব্যাপ্ত চতুর্দ্দশ (সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বর্গ) ভুবন ও চতুর্ব্বিধ প্রাণী (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) ও তৎসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত হইবে[১৭]। সেই বায়্বভিমানপ্রাপ্ত চৈতন্যের প্রস্পন্দে যে বপুঃ (আকারবিশেষ) প্রস্ফুরিত হয়, তাহাকে স্পর্শতন্মাত্র কহে। তাহারই বিস্তারে একোনপঞ্চাশৎ বায়ুস্কন্ধ বিস্তৃত হইয়াছে। এবং তাহা হইতেই সমুদায় স্পন্দনক্রিয়া প্রসৃত হয়[১৮।১৯]। তাহাতে যে পরম চৈতন্যের প্রকাশাত্মক ভাবনা (সঙ্কল্প) বিস্তৃত আছে, তাহারই দ্বারা তেজস্তন্মাত্রার উৎপত্তি এবং সেই তেজস্তন্মাত্রা আলোক-শাখীর

(আলোকরূপ মহাবৃক্ষের) বীজ[২০]। এই বীজ হইতে বিদ্যুৎ, সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রমাদি উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারই রূপ ভেদে এতৎ সংসার বিস্তৃত হইয়াছে[২১]। অনন্তর সেই তেজ (তেজঃস্কন্ধাভিমানী আত্মা) "আমি জলময় হইব" ইত্যাকার সঙ্কল্পের (ভাবনার) বলে জলশরীরী হন। তাহারই বিকাশ আস্বাদ। এই আস্বাদ রসতন্মাত্রা নামে ব্যপদিষ্ট[২২]। এই রসতন্মাত্রা সমুদায় জলের (দ্রবপদার্থের) ও অম্ল মধুরাদি বিস্পষ্ট আস্বাদের বীজ এবং এ বীজও সংসার বিস্তারের কারণ[২৩]। পূর্ব্বোক্ত জলভাবাপন্ন পরমাত্মা "আমি পৃথিবী হইব" এইরূপ ভাবনা করতঃ ভাবিরূপনামা হইয়া স্বীয় সঙ্কল্পগুণদ্বারা আপনাতে গন্ধ-তন্মাত্রতা দর্শন করেন[২৪]। সেই গন্ধতন্মাত্রা ভাবিভূগোলকের (স্থূল পৃথিবীর) মূল। অপিচ, তদ্ধেতুক তাহা মনুষ্যাদি-আকৃতি-শাখীর বীজ ও সে সকলের আধার[২৫]। তাপ ও বায়ু সংযোগে জল যেমন বুদ্বুদে পরিণত হয়, তেমনি, পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কারযুক্ত চৈতন্যের বিভাবনায় (সঙ্কল্পের প্রতাপে) তন্মাত্রা (উৎপন্ন সূক্ষ্মভূত) সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডা-কারে পরিণত হইয়াছে[২৬]। হে রামচন্দ্র! বর্ণিত প্রকারেই পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়, হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে। অর্থাৎ যাবৎ না সর্ব্ব-বিনাশাত্মক মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎ এ সকল বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ চিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না। এই জগৎ পূর্ব্বে অব্যাকৃত (অব্যাকৃত= ঐশী শক্তি বা মায়া) আকাশে সঙ্কল্পের ন্যায় ভাবরূপে অবস্থিত ছিল, সেই ঈশ্বর সঙ্কল্পস্থিত ভাবরূপী জগৎ এক্ষণে যেমন সূক্ষ্ম বটবীজ হইতে স্থূল বটবৃক্ষের আবির্ভাব হয়, তেমনি, স্থূলাকারে আবির্ভূত হইয়াছে[২৭।২৮]। মায়িক সৃষ্টির দর্শন যদ্রূপ, তাহা যেমন পরমাণু মধ্যেও সম্ভবে, * জগৎসৃষ্টির দর্শন ঠিক্ তদ্রূপ। এ সৃষ্টি ক্ষণমধ্যে আবির্ভূত ও ক্ষণমধ্যে তিরোভূত হইয়া থাকে[২৯]। এই যে স্থূলতা দেখিতেছ, ইহা বাস্তব নহে। এরূপ অবাস্তব স্থূলতায় বাস্তব সূক্ষ্মতার ক্ষতি হয় না। কারণ এই যে, সৃষ্টি বৈকারিক নহে; পরন্তু বৈবর্ত্তিক। (বিকার=সত্য সত্য অন্যথা হওয়া। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি। বিবর্ত্ত=মিথ্যা অন্যথা হওয়া যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প)। অর্থাৎ ভ্রমপ্রতীতির অনুরূপ। ভ্রমপ্রতীতির অনুরূপ

---

* মায়িক সৃষ্টিতে দেখা যায়, পরমাণুতুল্য একটী ক্ষুদ্র বীজে ক্ষণমধ্যে শত শত বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। মায়িক সৃষ্টি=ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি।

বলিয়াই পরমচৈতন্যরূপ আধারে ইহা কখন স্থূলরূপে প্রকাশ পাইতেছে কখন বা সম্পিণ্ডিত হইয়া স্থিতি করিতেছে এবং কখন বা স্বীয় আধারে (চৈতন্যে) লুক্কায়িত হইয়া যাইতেছে[৩০]।

হে রাঘব! দৃশ্য জগতের বীজ তন্মাত্রাপঞ্চক। সে সকলের বীজ পরমাত্মার পরা শক্তি অর্থাৎ মায়াশক্তি। এই মায়াশক্তি শাস্ত্রান্তরের আদ্যাশক্তি। সেই আদ্যাশক্তি হইতেই জগৎশ্রী বিস্তৃত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখ, সেই এক পরমাত্মতত্ত্ব মায়াশক্তির প্রস্ফুরণে জগদ্বীজ এবং জগৎ তাহার (সেই বীজের) অঙ্কুরাদি শাখাপ্রশাখান্ত মহাবৃক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেই কারণে আমি বলিয়াছি, জগৎ অজ, অনন্ত ও চিন্মাত্র। চিন্মাত্র তাই ইহার রহস্য বা তত্ত্ব। এই তত্ত্ব আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকি[৩১,৩২]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতেছেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। নভঃ, তেজঃ, তমঃ, সমস্তই অনুৎপন্ন ঐ সকলের সত্তার কারণ (আছে বলিয়া প্রতীত হইবার হেতু) চিদাত্মা অর্থাৎ বিকারকৃতবৈষম্যশূন্য পরব্রহ্ম। চিদাত্মা মায়াকাশে প্রস্ফুরিত হইলেই তাঁহাতে প্রথমে চেত্যবিষয়িনী কল্পনা উদিত হয়। পরে তৎসংযোগে জীবভাবের আবির্ভাব, তৎপরে অহংএর কল্পনা[১।৩]। অনন্তর অহং হইতে বা অহম্ভাবের পরিণামে বুদ্ধির উদয় হয় এবং বুদ্ধি হইতে মনন-ধর্ম্মী মন জন্মে। * মনের অন্তর্গর্ত্তে শব্দাদিবিষয়মাত্রার (তন্মাত্রার) পূর্ব্বসংস্কার অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ বুদ্ধিই শব্দতন্মাত্রকাদিবিশিষ্ট হইয়া মন হন[৪]। এই মন তন্মাত্রাপঞ্চকের ভাবনায় অর্থাৎ মেলনে বা পঞ্চীকরণে আধ্যাত্মিক মহাভূতরূপে প্রবর্দ্ধিত বা উপচিত হওয়ায় এই জগৎ নামক মহাগুল্ম বিলোকিত হইতেছে। অর্থাৎ মনই কল্পনার দ্বারা আপনাকে স্থূলদেহস্থ মনে করিতেছে ও জগৎ দেখিতেছে[৫]। স্বপ্নদ্রষ্টা যদ্রূপ স্বপ্নে অকৃত বা অনুৎপন্ন গ্রাম নগরাদি দর্শন করে, চিদাত্মাও তদ্রূপ মনের আবেশে জগৎ দর্শন করিতেছেন। সেইজন্য বলা যায়, ইহা স্বপ্নের ন্যায় চিৎনামক মহাকাশে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে[৬]। চিদাত্মাই জগৎরূপ করঞ্জকুঞ্জের অনুপ্ত বীজ। (করঞ্জ=একপ্রকার বৃক্ষ)। এ বীজ ক্ষিতি, বারি ও তেজঃ, কিছুরই অপেক্ষা করে না, অথচ অঙ্কুরিত হয়[৭]। যাহা কেবল চিৎ তাহাই স্বাপ্নসৃষ্টির ন্যায় চিন্ময় পৃথ্যাদি সৃজন করে। যাহা কেবল চিৎ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাহা যে খানেই থাকুক, সর্ব্বত্রই বাস্তব জগদঙ্কুর বর্জ্জিত। অর্থাৎ অসঙ্গস্বভাব। স্থূল জগতের বীজ পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চতন্মাত্রার বীজ অক্ষয় অব্যয় চিৎ[৮।৯]। যাহা বীজ, তাহাই ফল; সে ভাবেও এ জগৎ ব্রহ্মময়।

হে রামচন্দ্র! সৃষ্টির আদিতে চিৎ-ই কথিতপ্রকারে চেত্যবিস্তারকরণ সামর্থ্যের দ্বারা আপনাতে তন্মাত্রাপঞ্চক (শব্দতন্মাত্রা প্রভৃতি) কল্পনা

---

* বুদ্ধি শব্দের অর্থ এখানে মহত্তত্ত্ব এবং মন শব্দের অর্থ সঙ্কল্পবিকল্পকারী অন্তঃকরণ।

করেন, সেজন্য তাহা বাস্তব নহে। সেই কল্পিত তন্মাত্রাপঞ্চক উচ্ছূন বা উপচিত (পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট বা পরস্পর বিমিশ্রিত) হইয়া এই স্থূল জগৎ বিস্তার করিয়াছে[১০।১১]। সুতরাং যাহা কেবল ও কল্পনাধিষ্ঠান, তাহাতে স্বপ্ন কল্পনার ন্যায় কল্পিত ভাবে অবস্থিত থাকায় এ সমস্তই তৎস্বরূপ; তাহার অতিরিক্ত নহে[১২]। যাহা কেবলমাত্র কল্পনা, তাহার স্বরূপসত্যতা কোথায়? পঞ্চতন্মাত্রা যেমন ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তেমনি, তন্মাত্রা-প্রভব স্থূলভূত সমূহও ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত। সেই জন্যই বলিতেছি, ব্রহ্মই ত্রিজগৎ[১৩।১৪]। এই স্থানে বলিতে পার যে, ব্রহ্মই কারণ ও ব্রহ্মই কার্য্য, ইহা কি প্রকারে সুসম্ভব হয়? একের কারণ ও কার্য্য উভয় ভাব লোক মধ্যে যুক্তিবহির্ভূত? তাহার প্রত্যুত্তর এইযে, আদি সৃষ্টিকালে যে প্রকারে তন্মাত্রা পঞ্চকের স্ফুরণ হয় সেই প্রকারে স্থূলভূতেরও স্ফুরণ হয়। (অভিপ্রায় এই যে, মায়াবী যেমন নিজেই নিজ মায়িক সৃষ্টির কারণ ও কার্য্য; অথবা স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন নিজেই নিজ স্বাপ্ন সৃষ্টির কারণ ও কার্য্য। তেমনি, ব্রহ্মও জগদ্বিবর্ত্তের কারণ ও কার্য্য। আরও বিশদ কথা এইযে, যেমন মৃত্তিকা ও মৃত্তিকার কার্য্য কুম্ভ ব্যবহার দৃষ্টিতে ভিন্ন হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন, তেমনি, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মকার্য্য জগৎও ব্যবহার দৃষ্টি ভিন্ন হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন)। অতএব, জগৎ নামে কোন পৃথক্ পদার্থ এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই ও জন্মিতে দেখাও যায় নাই[১৫]। যেমন স্বপ্নসৃষ্ট ও সঙ্কল্পনির্ম্মিত নগর অসৎ হইলেও অর্থাৎ না থাকিলেও সতের ন্যায় প্রতীত হয়, তেমনি, পরমপ্রকাশ ব্রহ্মাকাশ নামক পরমাত্মায় জীবাকাশের বাস্তব অভাব থাকিলেও অজ্ঞের দৃষ্টিতে তাহার ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। কথিতপ্রকারে পরম নির্ম্মল পরমাত্মায় বাস্তব পৃথ্ব্যাদির অবস্থান অসম্ভব; সুতরাং ব্রহ্মে ভৌতিক সৃষ্টির উদয় যদ্রূপ, জীবের উদয়ও তদ্রূপ[১৬।১৭]।

হে রাঘব! সেই পরমাকাশ ব্রহ্মকাশে উক্ত জীবাকাশ স্বপ্ন ও সঙ্কল্প পুরীর ন্যায় অসৎ হইয়াও সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সেই নির্ম্মলাত্মা পৃথিব্যাদি উপাধিশূন্য হইলেও তাঁহাতে যে আকাশোদরে গন্ধর্ব্ব-নগরাদির ন্যায় আকাশাত্মা স্বরূপে উদিত হয়, তাহাকেই আমরা জীব নামে অভিহিত করি। হে রামচন্দ্র! অভিহিত জীবাকাশ (জীব নামক আকাশ। জীবভাব আকাশের ন্যায় আকারহীন বলিয়া আকাশ) যে

প্রকারে আপনাকে দেহী বলিয়া জানিয়াছে তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পরমেশ্বরে সমষ্টি জীবাকাশ কল্পিত হয়। অনন্তর সেই সুবিস্তৃত সমষ্টি জীবাকাশে (জীবঘন বা জীবসঙ্ঘরূপ আকারহীন পদার্থে) বিচ্ছিন্নভাবে "আমি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অল্প" ইত্যাকার অসংখ্য ভাবনার উদয় হয়। তাদৃশ ভাবনার উদয়ে ব্যষ্টি জীবের জন্ম হয়; সুতরাং তাহা সমষ্টির অনতিরিক্ত। যেমন সঙ্কল্পিত (মনঃকল্পিত) চন্দ্র অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সতের ন্যায় বোধারূঢ় হয়, তেমনি, ঐ ভাব অসৎ হইলেও অর্থাৎ অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় ভাবিত হইয়া থাকে। অনন্তর তাদৃশ ভাবনার প্রভাবে তিনি ক্রমেই দৃশ্যরূপী হন[১৮।২০]। অনন্তর সেই অণুতেজঃ কণভাব অর্থাৎ সূক্ষ্মভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে তারকার ন্যায় (ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন) অনুভব করেন, তাহাতে তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থূল হন। সেইরূপ স্থৌল্যই ভূতমাত্রাসম্বলিত লিঙ্গভাব এবং তাহাই শাস্ত্রান্তরের লিঙ্গদেহ[২১]। সেই লিঙ্গদেহ জ্ঞান ও চিত্তকল্পনা বশতঃ স্থূল শরীর পরিগ্রহ করে। জ্ঞান ও শরীর উভয়ই চিত্তকল্পনার বশে প্রাদুর্ভূত হয়। জীব সেই সেই কল্পনানুভবের বশে সেই সেই উপাধিতে সোঽহং ভাবে ভাবিত হয়। তাঁহার যে সেই তারকাকার লিঙ্গভাব, তাহাই তাহার ভবিষ্যৎ করচরণাদিমান্ স্থূল দেহের কারণ। স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন স্বপ্নে আপনার পথিকত্ব অনুভব করে, তেমনি, এই জীবও আপনাকে তারকাকার অর্থাৎ শরীরী ও পরিচ্ছিন্ন মনে করে। চিত্ত যেমন যেমন চেত্যাকার অর্থাৎ বিষয়াকার ধারণ করে, জীব তেমনি তেমনি সেই সেই উপাধির পক্ষানুসারী হয়। অর্থাৎ জীব বাস্তব পক্ষে সর্ব্বগামী হইলেও উক্তপ্রকারে অন্তঃস্থের ন্যায় ও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় হইয়াছেন। পর্ব্বত যেমন বহিঃস্থ হইয়াও দর্পণাদির প্রভাবে তদন্তরে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সর্ব্বত্র ব্যবহার অর্থাৎ গমনাগমনাদি করিতে সমর্থ এই দেহ যেমন কূপপতিত হইলে কূপ মাত্রে গতিবিধি করে, সর্ব্বগামী হয় না, অপিচ দূরপ্রচরণযোগ্য উচ্চৈঃস্বর যেমন আবরকের মধ্যে উৎপন্ন হইলে তন্মধ্যেই অবস্থিতি করে, বাহিরে আইসে না, তেমনি, সর্ব্বগামী আত্মাও তারকা কোঠরে অর্থাৎ লিঙ্গশরীরাদির অন্তরস্থ কল্পিতাকাশে অহং-অভিমান ধারণ করিয়া যেন তিনি তন্মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন, মনে করেন[২২।২৫]। যদ্রূপ

স্বপ্নদর্শন ও সঙ্কল্প দেহমধ্যেই সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ, স্ফুলিঙ্গতুল্য উপাধিতে অহঙ্কারের আরোপে জীব তত্রস্থের ন্যায় হইয়া থাকেন এবং বাসনাময় দেহাদি অনুভব করেন[২৬]। প্রথমে বাসনাময় দেহাদির ব্যবহার করেন, অনন্তর তিনি ক্রমক্রমে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, সঙ্কল্প বিকল্পরূপী মন, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু, এবং চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকেন। আমি দেখিব, এই ভাবের প্রভাবে দেখিবার জন্য ছিদ্রদ্বয় প্রসারিত হইয়াছে। সেই দুই ছিদ্রের নাম নেত্র, তাহারই দ্বারা দর্শন লালসা পূর্ণ হয়। আমি স্পর্শ করিব, এই ভাবের প্রভাবে স্পর্শনেন্দ্রিয় ত্বক্ উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রবণ করিব, এই ভাবের প্রভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, ঘ্রাণ লইব, এই ভাবের প্রভাবে ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসারন্ধ্রস্থিত), এবং আস্বাদ গ্রহণ করিব, এই ভাবনায় রসনেন্দ্রিয় জিহ্বা বিস্তৃত হইয়াছে[২৭।৩০]। যাহা স্পন্দন তাহা বায়ু। চেষ্টা ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ তাহার কার্য্য। বাহ্যজ্ঞান ও অন্তর্ব্বিজ্ঞান উক্তপ্রকারে সুসম্পন্ন হইতেছে এবং উক্ত সমস্তই বর্ণিতপ্রকারে ব্রহ্মে অধ্যস্ত। অর্থাৎ বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই সেই মূল চৈতন্যের বিবর্ত্ত[৩১]। এইরূপে ব্রহ্মই প্রথমে আতিবাহিকদেহী, * পরে স্থূলাকৃতি, তৎপরে এই সকল স্থূল দর্শন অনুভব করেন। ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে স্ফুলিঙ্গাকারাদি বাহ্য বিষয় পর্য্যন্ত কল্পনা করতঃ তন্মধ্যে আকাশের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। এবং কথিতপ্রকারে আপনার সূক্ষ্ম আকারকে উচ্ছূন অর্থাৎ স্থূল করিয়াছেন[৩২]। এ সকল ব্যবহারে সত্যের ন্যায় অথচ অসত্য। অতএব, ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে জীব হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[৩৩]। স্ববুদ্ধিকল্পিত উপাধির অন্তঃস্থ হইয়া স্ববুদ্ধিকল্পিত অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) অবলোকন করিতেছেন[৩৪]। কেহ জলগত, কেহ বা সম্রাট এবং কেহবা ভাবিব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও অনুভব করিতেছেন[৩৪।৩৫] †

হে রামচন্দ্র! দেশকালাদিশব্দনির্ম্মাণকর্ত্তা আতিবাহিক দেহী জীব চিৎস্থানে অবস্থিতি করিয়া দেশকালাদিভাবনা করতঃ সেই সেই শব্দের

---

* আতিবাহিকদেহ=চিত্তদেহ অর্থাৎ ভাবময় দেহ। এ দেহের দৃশ্যতা নাই। কেবল ভাব আছে।

† ইহার দ্বারা একই ব্রহ্মের প্রকারদ্বৈবিধ্য বলা হইল। প্রথমে জলান্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডশরীরাভিমানী, তৎপরে চতুর্ম্মুখব্রহ্মশরীরাভিমানী। মহর্ষি মনু যে বলিয়াছেন, "অপএব সসর্জ্জাদৌ" এ সেই কথা।

দ্বারাও বদ্ধ হইয়া আছেন। (শব্দের অর্থাৎ নামের) বস্তুতঃ ইহা (জগৎ) স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় অসৎ। অসৎ বলিয়া তুচ্ছ অর্থাৎ অত্যন্ত অলীক। সেই কারণে বলা যায়, ইহা অনুৎপন্ন। বাস্তব অনুৎপন্ন হইলেও বিরাট-রূপী আতিবাহিকদেহী আদ্য প্রজাপতি প্রভু স্বয়ম্ভু কথিতপ্রকারে উৎ-পন্ন হইয়াছেন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়[৩৬।৩৮]।

হে রামচন্দ্র! ব্রহ্মাণ্ডাকার বিভ্রমে এমন কিছু নাই যাহাকে সম্পন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তু (সিদ্ধ=যাহা সত্য সত্যই থাকে তাহা) বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই জন্মে নাই এবং দৃশ্যতাও নাই। অথচ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই মহান্ ব্রহ্মাকাশ কোশে অবস্থিত আছে বলিয়া মনে হয়[৩৯।৪০]। ইহা সৎ (আছে) বলিয়া প্রতীত হইলেও সঙ্কল্প নগরের ন্যায় নিতান্ত অসৎ, এবং ইহা কোন দ্রব্যের দ্বারা নির্ম্মিত, রঞ্জিত ও প্রযত্ন সহকারে প্রস্তুত হয় নাই। প্রস্তুত বা কৃত না হইলেও ইহা সেই সৎস্বরূপে বিরাজিত আছে। যেহেতু মহাকল্প কালে ব্রহ্মাদিরও লয় হয়, সেই হেতু ইহা পূর্ব্ব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রাক্তনী স্মৃতির ফল নহে। * যিনি ইহার স্রষ্টা তিনি যেরূপ, এই জগৎও সেইরূপ[৪১।৪৩]। পৃথিব্যাদি সৃষ্টি বিষয়ে যে নিত্যজ্ঞান পরমাত্মা কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, এই জগৎস্বপ্ন তিরোহিত হইলে তিনি কেবল হন অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্ম ভাবে অবস্থিতি করেন। তখন এ সকল দৃশ্য থাকে না। স্বপ্নের পর যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পৃথিব্যাদি, মাত্র স্মৃতির আকারে অনুভূয়মান হইতে থাকে, ব্যোমরূপী জগৎকারণ ঠিক্ তদ্রূপরূপী হন এবং জগৎও তদ্রূপরূপী হইয়া থাকে। দ্রবত্ব যেমন জলের অনতিরিক্ত, তেমনি, সৃষ্টিও পরমাত্মার অনতিরিক্ত[৪৪।৪৬]। ইহা নিরাধার, নিরাধেয়, দ্বৈতরহিত সুতরাং একত্ববর্জ্জিত। † ইহা নির্ম্মল পরমাকাশে (ব্রহ্মে) জন্মিয়াছে অথচ জন্মে নাই[৪৭।৪৮]। সুতরাং বাস্তব

---

* এক এক মহাকল্প শেষ হয় আর সেই সেই কল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হন। সুতরাং নূতন কল্প নূতন ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়। তাহার সহিত পূর্ব্ব ব্রহ্মার কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং এ জগৎ পূর্ব্ব ব্রহ্মার সংস্কার প্রভব নহে। সুতরাং স্বীকার করা উচিত যে, জগৎ নূতন ব্রহ্মারই অবিদ্যাসমদ্ভূত। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে জীব পূর্ব্ব কল্পে উপাসনা বিশেষে সিদ্ধ হয় সেই জীব পরকল্পে ব্রহ্মা হয়।

† একত্ববর্জ্জিত কথার তাৎপর্য্য এই যে, দ্বিত্ব থাকিলেই একত্বজ্ঞান হয়, নচেৎ কোন বস্তু "এক" এ রূপে কল্পনা করা যায় না। তাদৃশ ভাবে একত্ববর্জ্জিত।

কল্পে সংসার নাই। ইহাতে দৃশ্য বা দ্রষ্টা কিছুই নাই। ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি কিছুই নাই[৪৯।৫০]। স্থাবর বল, জঙ্গম বল, জগৎ বল, সমস্তই ব্রহ্মের বিকাশ। যেমন সলিলে আবর্ত্তের আবির্ভাব, তেমনি, ব্রহ্মেই ব্রহ্মের আবির্ভাব। ব্রহ্মস্বভাবের আবর্ত্তে এবম্প্রকার জগতের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা বাস্তব অসৎ (অলীক) হইলেও আধারের অনুবর্ত্তী; সেই কারণে ইহা সতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে[৫১।৫২]। যেমন স্বপ্ন তিরোহিত হইলে স্বপ্নদ্রষ্টার স্বীয় মরণ অলীক বোধ হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই জগৎ সেইরূপ অলীক বলিয়া প্রতীত হইবে। সুতরাং ইহার স্বরূপ সেই অনাময় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৩]।

হে রাঘব! প্রজাপতি স্বয়ম্ভূ সেই পরম আকাশে (পরমাত্মায়) উক্ত আকারে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তিনিও পরমাকাশস্বরূপ। এই জগৎ সেই মনোময় বা আতিবাহিক শরীরী ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পে সমুৎপন্ন সুতরাং ইহা সঙ্কল্পসদৃশ নিস্তত্ত্ব[৫৪]।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।
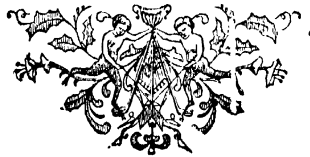
চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অহং প্রভৃতি দৃশ্য কথিতপ্রকারেই কল্পিত হইয়াছে। কল্পিত হইয়াছে, জন্মে নাই। এ সকলের জন্ম নাই বলিয়া ইহার বিদ্যমানতাও নাই। তবে যে বিদ্যমান বলিয়া বোধ হইতেছে সে বিদ্যমানতা পরম পদের অর্থাৎ সর্ব্বময় ব্রহ্মের[১]। যেমন নিস্পন্দ সাগরগর্ভে জলস্পন্দের অর্থাৎ তরঙ্গমালার আবির্ভাব, তেমনি, সেই পরমাকাশে আকাশরূপ অপরিত্যাগে জীববৃন্দের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথমে এক জীব; পরে তাহা হইতে অসংখ্য জীব। প্রথমাবির্ভূত জীব ব্রহ্মা। সেই বিরাটাত্মা প্রজাপতির পৃথ্ব্যাদিরহিত চিন্মাত্রস্বরূপ নভোময় যে দেহ, তাহা আতিবাহিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। তাহা অক্ষয় অথচ স্বপ্নশৈলের ন্যায় আভাসিত মাত্র। যদি স্বপ্ননগর চিরস্থায়ী হয়, চিত্রকর যদি মনে মনে একাগ্র চিত্তে যুদ্ধোদ্যোগী সৈন্যদলের চিত্র কল্পনা করে, তাহা হইলে তাহার সেই চিত্তস্থ সংস্কারময় সেনাদল সেই জীবঘন ব্রহ্মার সহিত উপমিত হইতে পারে[২।৫]। যদি কোন এক মহাস্তম্ভে অনুৎকীর্ণ শালভঞ্জিকা (শালভঞ্জিকা=ছবি। খোদাই করা নহে, এরূপ ছবি) বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত এই বিরাট্ পুরুষের তুলনা হইতে পারে। বিরাট্ পুরুষও ব্রহ্মস্বরূপ মহাস্তম্ভের অনুৎকীর্ণ ছবি[৬]। এই আদ্য প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বকার্য্যের অভাব হেতু কারণবিহীন[৭] (অর্থাৎ তাঁহার সাধারণ জীবের ন্যায় উৎপাদক কারণ নাই)। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপ্রলয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতামহগণ মুক্ত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্ম নাই[৮]। আদ্য প্রজাপতি ব্রহ্মা দর্পণপ্রতিবিম্বিত কুড্যের (দেওয়ালের) ন্যায় দৃশ্য হইলেও পৃথক সত্তা না থাকায় দর্শনের অযোগ্য। বস্তুতঃই তিনি দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, স্রষ্টা, সৃষ্ট ও সৃজন, ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ, ইত্যাদির কিছুই নহেন অথচ সকলিই তিনি[৯]। ইনিই প্রত্যগাত্মা (দেহীর অন্তরাত্মা) এবং ইনিই সর্ব্বপ্রকার পদার্থ ও সে সকলের বোধক শব্দ। যদ্রূপ দীপ হইতে দীপ সমূহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ, আদ্য প্রজাপতি হইতে নিখিল জীবের

উৎপত্তি হইয়াছে[১০]। যেরূপ সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্পের ও স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরের উৎপত্তি, সেইরূপ, বিরাডাত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। যেরূপ বৃক্ষ হইতে শাখা নিঃসৃত হয়, সেইরূপ, বিরাডাত্মা ব্রহ্মার প্রতিস্পন্দ হইতে জীববৃন্দ বিসৃত হইয়াছে। সহকারী কারণ না থাকায় তাহারা তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে[১১]। সহকারী কারণ না থাকিলেই কার্য্য ও কারণ উভয়ে এক অর্থাৎ অভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে[১২।১৩]। যাঁহা হইতে পৃথ্ব্যাদি অলীক বস্তু পরম্পরা সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি জীবাকাশস্বরূপ আদি ব্রহ্মা এবং তিনিই বিরাডাত্মা বলিয়া শাস্ত্রে পরিচিত[১৪]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! জীব কি পরিমিত? (পরিমিত=পরিচ্ছিন্ন বা পরিমাণবিশিষ্ট) না অপরিমিত? অসংখ্য? না নির্দ্দিষ্টসংখ্যাবিশিষ্ট? অথবা অসংখ্য হইলেও অচলপিণ্ডের ন্যায় পরস্পরাশ্লেষে এক? * আপনি বলিলেন যে, আদ্য প্রজাপতি হইতে জীববৃন্দ নিঃসৃত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা অবাস্তব। মূল যদি সত্য সত্যই অবাস্তব হয় তাহা হইলে বারি হইতে বারিধারার উৎপত্তির ন্যায় হউক, আর বারিধি হইতে অম্বুকণার উৎপত্তির ন্যায় হউক, আর তপ্তলোহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গমের ন্যায় হউক, জীবপুঞ্জ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা বর্ণন করুন[১৫।১৬]? হে ভগবন্! আমি জীববৃন্দের তত্ত্ববিনির্ণয় যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারি, আপনি তাহাই আমার নিকট উপদেশ করুন[১৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুকুলপাবন রাম! যখন এক জীবও নাই, তখন জীবরাশি কোথায়? কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইবে? তোমার প্রশ্ন শশশৃঙ্গকে অতিক্রম করিতেছে[১৮]। রাঘব! জীবও নাই, জীবরাশিও নাই এবং পর্ব্বতের ন্যায় জীবপিণ্ডও নাই[১৯]। জীব কি? জীব প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, শুদ্ধচিন্মাত্রস্বরূপ সর্ব্বগ অমল ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সেই হেতু তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনাকৌশল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন লোক সকল বিচিত্র ফুল্লিত লতা দর্শন

* ভাব এই যে, সমষ্টি মিথ্যা হয় হউক, ব্যষ্টি জীবের মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষবাধিত। সকলেই 'আমি' ইত্যাকারে আপনাকে সত্য বলিয়া বিজ্ঞাত আছে।

করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মও সঙ্কল্পবৃত্তি অনুসারী চিন্মাত্রের আভাসে অনুপ্রবেশ দ্বারা আপনাকে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সন্দর্শন করেন[২০।২২]। যিনি চিন্ময় ব্রহ্ম তিনি আপনিই আপনাকে জীব, বুদ্ধি, ক্রিয়া বা প্রস্পন্দ, মন, দ্বিত্ব ও একত্ব প্রভৃতি নানা প্রকারে অবগত হন। সেরূপ অবগতির কারণ অবিদ্যা। তিনি স্বাশ্রিত অবিদ্যার বা অবোধতার দ্বারা ঐরূপ হন। আবার সম্যক্ বোধোদয় হইলে অর্থাৎ অবিদ্যা তিরোহিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়[২৩।২৪]। যখন আত্মপ্রবোধ উপস্থিত হয় তখনই সেই অবুদ্ধতা দূরীকৃত হয়। অন্ধকার যেমন দীপ দ্বারা দৃষ্ট হইবা মাত্র পলায়ন করে, তেমনি, অজ্ঞানও আত্মজ্ঞানোদয়ে পলায়ন করে। অজ্ঞান যে কি? তাহার স্বরূপ বা তত্ত্ব কিম্বিধ? তাহা নির্ণীত হয় না[২৫]। ব্রহ্মই কথিতপ্রকারে জীব। তিনি বিভাগরহিত, সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি, অনন্ত, মহাচৈতন্য ও সম্পন্নরূপী[২৬]। সর্ব্বব্যাপিত্ব-প্রযুক্ত তাঁহার কোন ভেদ কল্পনা নাই, যে কিছু ভেদকল্পনা সে সমস্তই তাঁহার মায়িক-বিভূতি[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! যদি একই মহাজীব এবং তাহা হইতেই যদি পৃথক্ পৃথক্ সংসারী জীব, তাহা হইলে তাহারা কেন মহাজীবতুল্য নহে? অর্থাৎ সংসারী জীবেরা কিজন্য অল্পজ্ঞানী ও ব্যর্থসঙ্কল্প হয়?[২৮] বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, যিনি মহাজীবের আত্মা, তিনি ব্যষ্টি বিভাগের পূর্ব্বে "আমি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাকার ইচ্ছায় বিদ্যমান থাকেন। তখন তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ সুসম্পন্ন হয়। বিভাগের পূর্ব্বে, ব্যষ্টি ভাব উদয়ের পূর্ব্বে, তাঁহাতে সঙ্কল্পের উদয় হয়, পরে তাহা হইতে দ্বৈতপ্রপঞ্চের আবির্ভাব হয়। যেমন কুম্ভকারের দণ্ড, চক্র ও চক্রভ্রমণাদি ক্রমিক ক্রিয়ার দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হয়, তেমনি, দ্বৈতবিভাগও ক্রমিক ক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল বিভাগ তাঁহার অংশ-স্বরূপ ও জীবরূপে কল্পিত (অংশ=ভাগ বা ঔপাধিক বিভাগ)[২৯।৩১]। মহর্ষিদিগের বিনা ক্রিয়াক্রমে কেবল মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহাও সেই প্রধান পুরুষের ইচ্ছার দ্বারা। "ইহার এই ইচ্ছা বা এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক" প্রধান পুরুষের এই অভিনিবেশের বলে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে[৩২]। এই যে অল্প

শক্তিমান্ জীব, ইহাও সেই মহাজীবের শক্তি। তিনি মহাশক্তি, জীবেরা তাঁহার অংশ শক্তি। * সুতরাং মহাশক্তির নিয়মন ব্যতীত কেবল ক্ষুদ্র শক্তিতে কোন কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। মহাশক্তির অনুগ্রহ থাকিলে ইচ্ছার ফল হয়, নচেৎ হয় না। রাম! কথিতপ্রকারে সেই অনাদ্যনন্তস্বরূপী মহাজীব ব্রহ্মই সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে প্রতিপ্রকাশিত হইতেছে[৩৩।৩৫]। চিৎশক্তিই বিষয়ানুভব দ্বারা জীব হয় ও সংসার অনুভব করে। অপিচ, সেই চিৎশক্তি বিষয়ানুভব বর্জ্জিত হইলে সম-ব্রহ্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়[৩৬]। তাম্র যেমন পারদের অথবা ঔষধ বিশেষের দ্বারা পাক বিশেষে অথবা স্পর্শ বিশেষে সুবর্ণাকার ধারণ করে, তেমনি, কনিষ্ঠ জীবেরাও শ্রেষ্ঠ জীবের উপাসনায় মহাজীবত্ব (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩৭]। জীবভাব ও জগদ্ভাব বিচার করিয়া দেখিলে পৃথক্ বস্তু লব্ধ হয় না, কেবল মাত্র চেতনের অদ্ভুত লীলাই অবগত হওয়া যায়। রাম! শরীরাবৃত আত্মায় অর্থাৎ চৈতন্যনামক মহাকাশে এ সকল না থাকিলেও কথিতপ্রকারে সত্যবৎ উদিত হইতেছে[৩৮]।

রামচন্দ্র! চিতের যে স্বাভাবিক চমৎকারিতা (অদ্ভুত সৃষ্টি সামর্থ্য), তাহাই ভবিষ্যৎ নামের ও দেহাদির অবভাস। অপিচ, তাহাই অহংভাবের উৎপাদক[৩৯]। চিত্ত চিৎস্বরূপ রসের আস্বাদনে অনুরক্ত ও তন্ময়াত্মহেতু অনন্ত; অথচ তাহা চিৎ হইতে প্রস্ফুরিত। তাদৃশ চিত্তে এই ত্রিভুবন প্রতিবিম্বিত[৪০]। † সেই চিৎ যদিও অক্ষয় অব্যয় নিত্য নির্ব্বিকার ও একরূপ, তথাপি, তদীয় বিচিত্র শক্তির উদ্ভবে তিনি পরিণাম ও বিকার প্রভৃতি ভাবের দ্বারা বিভিন্নের ন্যায় প্রতীতি গোচর হইতেছেন[৪১]। চিতের ও চিৎপ্রকাশ্য চেত্য নিবহের (বিষয় সমূহের) যে স্বাভাবিক অথবা স্বতঃসমুত্থ মিলিত প্রকাশ, (বিমিশ্র প্রকাশ) তাহাই এক্ষণে জগৎ[৪২]। চিতের যে শক্তি উক্তপ্রকারে বিস্তৃত হইয়াছে সে শক্তি আকাশ অপেক্ষাও দুর্লক্ষ্য। সেই দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব চিৎশক্তিই অহং দেখিতেছে[৪৩]। আত্মাতেই আত্মার দ্বারা বারিতে বারিতরঙ্গের ন্যায় প্রস্ফুরিত এবং ক্রমশঃ উৎকর্ষ পরম্পরা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত

---

* যেমন এক বিস্তীর্ণ বহ্নিশক্তি মহাশক্তি; স্ফুলিঙ্গ তাহার অংশশক্তি, সেইরূপ।

† জগৎ-সংস্কার-সংস্কৃত মায়ায় প্রতিফলিত আত্মচৈতন্যেই বিশ্বমণ্ডল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ জগৎস্ফূর্ত্তি অনাদিপ্রবাহে চলিতেছে।

এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সেই অহং দর্শনের সীমা অর্থাৎ সেই অহং ভ্রমই ঈদৃশ জগদ্ভ্রমের মূল[৪৪]। চমৎকারকারিণী চিৎশক্তির যে চিচ্চমৎকারিতা তাহাই জগৎ; তদ্ভিন্ন পৃথক্ জগৎ নাই[৪৫]। রাঘব! চিতের যে প্রথম চেত্য (প্রথম দৃশ্য বা প্রথম অবগাহ্য) তাহাই অহং এবং তাহা (অহংতা) কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহার বীজ কল্পিত অবশ্য তাহার ফলও কল্পিত। এ নিয়ম অনুসারেও এই জগৎ কল্পিত। অতএব, কল্পনায় দ্বিত্ব একত্ব অবস্থানের বিচার বিফল[৪৬]। জীবভাব অবস্থানের কারণ—পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার—যাহার অন্য নাম অদৃষ্ট ও বাসনা। তাহা ত্যাগ হইলে পর তুমি আমি ইত্যাকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়। যতই কল্পনা আছে তৎসমুদায়ের মধ্যে "তুমি আমি" এই কল্পনা অত্যন্ত দুস্ত্যজ। তুমি আমি কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সুতরাং তখন সর্ব্ব কল্পনার অভাবে নির্ব্বিকল্প অবস্থা স্থায়ী হয় সুতরাং তখন অপরিচ্ছিন্ন কেবল আত্মসত্তা অবশিষ্ট থাকে[৪৭]। জ্ঞানের প্রভাবে দৃশ্যসত্তা তিরোহিত হইলে দৃশ্য দর্শনের আধার যে চৈতন্য, তদীয় নির্ম্মল সত্তা তদবধি সতত উদিত থাকে, কদাচ অন্যথা হয় না। মেঘের তিরোধানে নির্ম্মল ব্যোম-সত্তা যদ্রূপ, দৃশ্যসত্তার তিরোধানে দৃক্‌সত্তাও তদ্রূপ। বস্তুতঃই নির্ম্মেঘ সমেঘ আকাশের ন্যায় চিত্ত ও চিৎ উভয়ের সত্তা অভিন্ন[৪৮]। মন চেষ্টাত্মক তাহা শূন্যাকার, জগৎ তদাত্মক সুতরাং শূন্য (সূক্ষ্ম জগৎ বা অন্তর্জ্জগৎ শূন্য অর্থাৎ নিরাকার) এবং ইন্দ্রিয়রূপ প্রপঞ্চ দেবগণের আলয়স্বরূপ যে সাকার জগৎ (বিরাট ও বিশ্ব) তাহাও শূন্য। পরন্তু চিচ্চমৎকারিতা প্রযুক্ত ঐ সকল আকার বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ফল কথা, চিৎচমৎকার ব্যতীত অন্য কিছু নাই। নিয়ম এই যে, যাহা যাহার বিলাস (লীলা), তাহা তদাত্মক। কদাচ তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে। এ নিয়ম সাবয়ব পক্ষে দেদীপ্যমান, নিরবয়বের পক্ষে ত কথাই নাই[৪৯।৫০]। নামাদিরহিত সর্ব্বসাক্ষিণী চিতির যে রূপ, তাহাই এই জগতের তাত্ত্বিক রূপ। এ বিষয়ের বিশদ কথা এই যে, চিতির যে নামরূপাদি নিকৃষ্টভাব—তাহাই চেত্য এবং সেই চেত্য হইতে জগৎ প্রস্ফুরিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, অপরিচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ হইতে এই স্ফুরণরূপী জগতের নাম রূপাদি কল্পিত ও প্রকাশিত হইয়াছে)[৫১]। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ ভূত, তদ্বাচক বাক্য ও

দিক্ প্রভৃতির রচনা সমস্তই চিতি হইতে হইয়াছে এবং চিৎই কথিত-প্রকারে জগৎস্থিতির কারণ হইয়াছে[৫২]। চিতের চিত্বই জগৎ; অজগৎ চিত্ব (চিত্তের ধর্ম্ম বা সামর্থ্য বিশেষ) নাই। চিৎ ও চিত্ব উভয়ের কল্পনারূপ ভান (প্রতীতি) অনুসারেই ভেদ প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু সে ভেদ বাস্তব নহে। ভাবিয়া দেখ, চিত্তের কল্পনা ব্যতিরেকে জগৎ কোথায়?[৫৩] চিদ্ব্রহ্মের যে অর্থপ্রথন সামর্থ্য অর্থাৎ বিষয় দেখিবার শক্তি, সেই শক্তিই অর্থাৎ সেই অর্থপ্রথনসামর্থ্যই জীব ও জীবভোগ্য ভূত ও ভৌতিক আকারে অর্থাৎ জগদাকারে অবস্থান করিতেছে[৫৪]। চিৎ হইতে চিত্তের ও চিত্ত হইতে যে অহং ভাবের স্ফুরণ হয়, সেই স্ফুরণ স্পন্দনক্রিয় প্রাণের যোগে জীব শব্দের অভিধেয় হইয়াছে[৫৫]। চিৎ পদার্থ চিত্তনামক ধর্ম্মের উদ্রেক হওয়ায় তদ্বিকার অহন্তাবাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব হইয়াছে সত্য, পরন্তু তাহা হইলেও সে সকল (উপাধি) মিথ্যা বা বৃথা অবভাস বলিয়া তদ্দ্বারা চিৎস্বভাবের অন্যথা ঘটনা হয় না[৫৬]। কোনও বস্তু আপনার ক্রিয়ায় আপনি ভিন্ন হয় না। যদি তাহা না হয় তবে অহঙ্কার-প্রধান চিৎ হইতে স্পন্দপ্রধান প্রাণ ভিন্ন হইবে কেন? যে চিৎ সে-ই প্রাণ, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় স্থির হয় যে, স্পন্দশক্তিসম্বলিত চিৎই পুরুষ ও আত্মা অর্থাৎ জীব[৫৭]। অপিচ চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় ভাব প্রাপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা বাস্তব জীব ভেদ সিদ্ধ হয় না। জীবের উপাধি মন, তাহা গোলক ভেদে (গোলক=স্থান) বিভিন্নপ্রায়; কিন্তু গোলকের অভাবে এক[৫৮]। কথিতপ্রকারে জীবের ও জগতের অবাস্তবত্ব অবগত হওয়া যায় এবং ইহাও বুঝা যায় যে, অতিতুচ্ছ কার্য্য-কারণাদি ভাবময় এই জগৎ চিৎপ্রকাশের ছটা অর্থাৎ প্রান্তভাগস্থ অন্য এক প্রকার প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এ প্রকাশ তদাশ্রিত মায়ার বিলাস; তাহার (মায়ার) উপশমে তাহা (চিৎ) নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা[৫৯]। ইহারই নাম পরমাত্মদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন। এ দর্শনের ফল অনর্থ নিবৃত্তি। অনর্থ নিবৃত্তি এইরূপে অনুভূত হইতে থাকে—

আমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচলের ন্যায় এক ও এক ভাবে অবস্থিতি করিতেছি[৬০]। অজ্ঞ জীব এ তত্ত্ব জানে না, না জানিয়া বিবাদ করে। তাহারা নিজে ভ্রান্ত হইয়া অন্যকেও ভ্রমে নিপাতিত করে[৬১]। ইহা দৃশ্য, ইহা মূর্ত্তি, এ সকল

ভাব অজ্ঞ দিগেরই জ্ঞানে রূঢ় থাকে। অজ্ঞ দৃষ্টিতেই পৃথক্ পৃথক্ বিকার দৃষ্ট হয়, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নহে। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দ্বৈত, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অদ্বৈত[৬২]। চিৎ একটী তরু, তাহাতে বিষয়াশক্তিরূপ জলসিঞ্চন, তদ্দ্বারা বসন্তকান্তির অনুরূপ তদীয় অনির্ব্বাচ্য মায়াশক্তির বিলাস, তদ্দ্বারা অতিবিশদ কাল প্রভৃতি সম্বলিত জগৎ নাম্নী মঞ্জরী বিস্তৃত হয়[৬৩]। চিৎ-ই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে, চিৎ-ই অণ্ডজাত্মক বায়ু অর্থাৎ (সূত্রাত্মা), চিৎ-ই বারিরূপে প্রস্ফুরিত। সে বারি তড়াগাদি খনন দ্বারা সমুৎপন্ন নহে। অর্থাৎ তাহা প্রথমোৎপন্ন চতুর্থ ভূত। সেই চিৎ-পদার্থই বিচিত্র স্বর্ণরজতাদি ধাতুরূপী; তাহা হইতেই দেব, অসুর ও মনুষ্যাদির দেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে[৬৪,৬৫]। তিনিই বিচিত্র ওষধি প্রভৃতির প্রকাশক জ্যোৎস্না রূপে সমুদিত হইয়া থাকেন। এই চিৎ স্বয়ম্প্রকাশ। সমুদায় বাহ্য বস্তু অস্তগত হইলেও ইনি (চিৎ) স্বপ্রভাবে সমুদিত থাকেন। ইনিই জাড্যভাব দ্বারা স্থাবরাদি জড় বস্তুতে সুষুপ্তি-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন[৬৬,৬৭]। * ইনি যখন অবিচারপরায়ণ হন, অজ্ঞানাবিষ্ট হন, তখন স্বকল্পিত স্পন্দস্বভাব প্রাণাদিতে আত্মভাব কল্পনা করতঃ সংসারী হন। যখন বিচারপরায়ণ হন, আপনার অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গ করিয়া স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন স্বীয় স্বভাবে অবস্থিতি করেন। সুতরাং এই জগৎ চিত্তর অবস্থা অনুসারে বিদ্যমান ও অবিদ্যমান উভয়রূপী। বিচারারূঢ় চিত্ত জগৎ নাই বলিয়া জানে এবং অবিচারাক্রান্ত চিত্ত জগৎ আছে বলিয়া জানে[৬৮]। চিৎ-ই শূন্য, চিৎ-ই মহালোক, চিৎ-ই স্পন্দনশীল সমীরণ, চিৎ-ই অন্ধকার, চিৎ-ই সূর্য্যের আলোক; এইরূপ বিবেচনা করিলে চিতের অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব গ্রাহ্য করিতে হয়, অন্যথা ঐ সকলের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম দৃষ্টিতে জগৎ নাই। জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এরূপ বিবেচনায় জগতের অন-স্তিত্ব। যেমন তৈল দগ্ধ হইলে কজ্জল হয়, তেমনি, এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে চিন্মাত্রে অবশেষিত হয়। পরমাণু অপেক্ষাও সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য চিৎ-ই উক্তরূপে জগতের উৎপত্তি-পরম্পরায় বিরাজিত রহিয়াছে[৬৯,৭১]। চিৎ-ই অগ্নির উষ্ণতা, চিৎ-ই জগতের চিহ্ন, চিৎ-ই জগৎ, চিৎ-ই শব্দের

---

* প্রস্তরাদিতেও চৈতন্য আছে, পরন্তু তাহা অব্যক্ত। আধার বিশেষে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি ও অস্ফূর্ত্তি। মন থাকিলে তাহাতেই চৈতন্যের প্রদীপ্ত প্রকাশ প্রকাশ পায়।

ধবলতা, চিৎই শৈলের জঠর, চিৎ-ই জলের দ্রবত্ব, জগদ্রূপিনী চিৎ-ই ইক্ষুরসের মাধুর্য্য, ক্ষীরের মধুরতা, জলের স্নিগ্ধতা, হিমের শীতলতা, অনলের শিখা, সর্ষপের স্নেহ, সরোবরের বীচি, মধুর দ্রব্যের মাধুর্য্য, কনকের অঙ্গদ এবং পুষ্পের সৌগন্ধ। এই জগৎ সেই চিদ্রূপিনী লতার ফল। চিৎসত্তাই জগতের সত্তা, পৃথক্ জগৎসত্তা নাই। জগতের যে অস্তিতা, তাহা চিতেরই বপুঃ অর্থাৎ শরীর[১২।১৫]। তুমি, আমি, অগ, নগ, নদ, নদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও সে প্রতীতি অবস্তু অর্থাৎ সত্য নহে। অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন আকাশে নীলিমার প্রতীতি হয় অথচ তাহা আকাশে অনবস্থিত, তেমনি, ভুবনত্রয় প্রতীত হয় বটে; পরন্তু তাহা নাই। (পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। আধারের অস্তিত্বে, আছে বলিয়া প্রতীত হয়। আবার চিদ্রূপ)[১৬]।

পরমাত্মা অবিকল্প অর্থাৎ নির্ভেদ। সেইজন্য তাঁহার সত্তা ও অসত্তা উভয়ই তুল্য। যেমন অবয়ব অবয়বীর, শব্দের ও অর্থের প্রভেদ নাই, সেইরূপ, চিতের ও জগতের প্রভেদ নাই। বস্তুতঃ অবয়ব অবয়বী, শব্দ ও অর্থ, সমস্তই শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক। যেহেতু অলীক সেই হেতু সাগর ও পৃথিব্যাদি সমেত এতজ্জগৎ বস্তুকল্পে নাই[১৭।১৮]।

রাঘব! চিৎ এক ও একরস। সেজন্য তাহাতে অবয়বাদি বিন্যাসের প্রশক্তি বা সম্ভাবনা নাই। ইনি সর্ব্বকাল স্বীয় নির্ম্মল স্বভাবে অবস্থিত। যেমন স্ফটিকশিলা নগরাদি প্রতিবিম্বের সন্নিবেশ ধারণ করে, তেমনি, নির্ম্মল চিৎ এই অসৎ জগতের প্রতিভাস মাত্র ধারণ করিতেছে। পল্লব যেমন তরু হইতে পৃথগ্‌ভাবে অনিরূঢ় ও অনন্যাত্মা এবং তাহা যেমন স্বীয় অভেদে শিরাদি ধারণ করে, চিৎ সেইরূপে এই জগৎকে ধারণ করিতেছে। এই চিৎ কারণ সমূহের পিতামহ[১৯।৮২]। চেত্য (চিতের বিষয় অর্থাৎ চৈতন্যের বিজ্ঞেয় বা প্রকাশ্য) নাই বলিলাম, এ কথায় যেন মনে কারও না যে, চিৎও নাই। চিৎ নাই, এ কথাটাও অযুক্ত। কারণ, চিৎ (চৈতন্য) স্বানুভবসিদ্ধ। যাহা কিছুতে থাকে, অদৃশ্য হইয়া থাকে, তাহাতেই দৃশ্যতা উদয় প্রাপ্ত হয়। বীজে অঙ্কুর থাকে বলিয়াই বীজ হইতে অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয়[৮৩।৮৪]। দৃশ্য নাই বলিয়াছি, যদি তাহা তুমি ধারণ করিতে না পার, (তাহাতে যদি বিশ্বাস আগমন না করে) এবং দৃশ্য থাকা পক্ষে যদি বিশেষ আগ্রহই থাকে, তাহা হইলে

সূক্ষ্ম অনুভব দ্বারা চিত্তনিরূঢ় ভেদজ্ঞান দূরীকৃত কর। করিয়া "এ সকল সেই পরমপদাত্মক ও চিন্ময় এবং চিৎ আছে বলিয়াই এ সকল আছে" এইরূপে ইহার অস্তিত্ব অর্থাৎ থাকা স্বীকার কর৮৫।

বাল্মীকি কহিলেন, মহর্ষে! (ভরদ্বাজ!) বশিষ্ঠ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে দিবা অবসান ও সাংকাল উপস্থিত হইল। তখন সায়ন্তন-কার্য্য সমাধানার্থ মুনিগণ এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণ প্রস্থান করিলেন। পরে রজনী অতিক্রান্ত ও দিবাকর সমুদিত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন৮৬।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহা জগৎ নহে; কিন্তু চিদাকাশ। চিদাকাশ ও আত্মা সমান কথা। যেমন নির্ম্মল গগন-মণ্ডলে মুক্তাশ্রেণীর ভ্রম হয়, (মেঘখণ্ডের ভঙ্গী বিশেষে) তেমনি, সেই নির্ম্মল আত্মায় জগৎ ভ্রম হইতেছে[১]। যেন চিদ্রূপ স্তম্ভে ত্রিজগদ্রূপ অনুৎকীর্ণ শালভঞ্জিকা (কেহ খোদাই করে নাই এরূপ .আকৃতি) বিরাজ করিতেছে। অথচ ইহা উৎকীর্ণ নহে এবং ইহার উৎকর্ত্তাও কেহ নাই[২]। সমুদ্র যেমন স্বকীয় স্বভাবে প্রস্পন্দিত হয়, তরঙ্গের বেগ প্রসৃত হয়, তেমনি, পরব্রহ্মে জগৎ প্রতীতি হইয়া থাকে[৩]। মূঢ়েরা এই জগৎকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে করে সত্য; পরন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। পর্ব্বত ও পরমাণুতে যেরূপ প্রভেদ, চৈতন্যে ও চৈতন্যে ভাসমান জগতে সেইরূপ প্রভেদ। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে গবাক্ষ ছিদ্রে নিঃসৃত প্রাতঃকালের সূর্য্য কিরণের সহায়তা ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না[৪]। যেমন গবাক্ষ ছিদ্রাগত প্রাতঃসূর্য্যকিরণে ভাসমান পরমাণু সকল তৎকিরণের অভাবে অনুভবগম্য হয় না, তেমনি, স্বচৈতন্যে ভাসমান জগৎ স্বচৈতন্যের ব্যতিরেকে অভাবাপন্ন হইয়া থাকে। কথা-গুলির ভাবার্থ—স্বাত্মভ্রান্তিই জগদ্দর্শনের মূল। বিস্পষ্ট স্বাত্মদর্শন হই-লেই জগদ্দর্শন তিরোহিত হয়[৫]। এই পৃথ্বী প্রভৃতি জগৎ অনুভূত হইলেও স্বপ্নসঙ্কল্পাদির ন্যায় অলীক। (যেমন পর্ব্বত কোথায় তাহার স্থিরতা নাই অথচ মন স্বপ্ন কালে ও কল্পনাকালে পর্ব্বত দেখে)। জগৎ বস্তুতঃ বিজ্ঞানাকাশরূপী। তাহাতে যে স্থূল পিণ্ডাকার জগৎ দেখা যায় তাহা যদ্রূপ মরুভূমিতে সরিৎভ্রান্তির দর্শন তদ্রূপ। অর্থাৎ ভ্রান্তি[৬,৭]। এই যে দৃশ্যতা, ইহা ভ্রান্তিবিশেষ। জগৎ মূর্ত্তও নহে, অমূর্ত্তও নহে, কিছুই নহে। অথচ ইহা মরুভূমিতে নদীপ্রবাহের ন্যায় ও মনোরথময় নগরের ন্যায় কেবল মাত্র অন্তরেই দেখা দেয়[৮]। যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদবস্থায় অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ, সারাসারবিবেচনাশালী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দিগের নিকট এই জগতের দৃশ্যশ্রী অসৎস্বরূপে প্রতিপন্ন

হইয়া থাকে। তাঁহারা জানিতে পারেন যে, জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্মস্বরূপের অনতিরিক্ত[৯]। অবিবেকী ব্যক্তিরাই ব্রহ্ম শব্দের পরিবর্ত্তে জগৎ শব্দ কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু বিবেকীরা ও তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে অদ্বয় ব্রহ্ম বলিয়াই জানেন। রাম! আমি তোমাকে সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি অজ্ঞদিগের জ্ঞানের অনুগামী হইও না। বস্তুতঃই জগৎ, ব্রহ্ম, আমি, এ সকল শব্দের অর্থে কোন প্রকার ভিন্নতা নাই[১০]। যেমন শূন্যাত্মক আকাশ ও সূর্য্যের আলোক, যেমন সূক্ষ্ম মেঘ ও মনঃকল্পিত মেঘ, তেমনি, জগৎ ও তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টি। অর্থাৎ তত্ত্বদর্শীর জগদ্দর্শন আর ব্রহ্মদর্শন তুল্য। তত্ত্বদর্শীরা দেখেন, এ সমস্তই সেই অচেত্য চিৎ (ব্রহ্ম)[১১]। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট নগর ও জাগ্রদ্দৃষ্ট নগর তুলনায় সমান, তেমনি, এই জগৎ ও সঙ্কল্পিত জগৎ তুলনায় সমান[১২]। সুতরাং জগৎ কেবল চিন্ময় ব্যোম। শূন্য, ব্যোম, জগৎ, এ সকল চিন্ময় ব্রহ্মের নাম ভেদ[১৩]। প্রোক্ত কারণে স্থির হয়, জগৎ প্রভৃতি যে কিছু দৃশ্য—তত্তাবতের কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। ইহার প্রকৃত নামাদিও নাই। যাহা ছিল তাহাই আছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না[১৪]। জগৎ কথিতপ্রকারে মায়ারূপ মহাকাশে অবস্থিতি করিতেছে সুতরাং চিদাকাশ (ব্রহ্ম) তাহাতে বস্তুতঃ আবৃত হন নাই। এই কল্পিত জগৎ চিদাকাশের অণুমাত্রও আবৃত করিতে সমর্থ নহে[১৫]। ইহা আকাশসম নির্ম্মল এবং ইহার কোন বাস্তব মূর্ত্তি নাই। যেমন ব্যোমে ব্যোমময় চিত্ত ও সঙ্কল্পনগর অবস্থান করে, ইহা সেইরূপে অবস্থান করিতেছে[১৬]। এই বিষয়ে আমি মণ্ডপোপাখ্যান নামে একটী আখ্যান তোমাকে বলিব। তাহা শুনিতে মধুর। বিশেষতঃ তাহা শুনিলে তোমার চিত্তে উপদিষ্ট কথা সকলের অর্থ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতীত হইবে[১৭]।

মণ্ডপোপাখ্যান।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি শীঘ্র আমার নিকট সংক্ষেপে বোধ বৃদ্ধির উপায়ীভূত সমুদায় মণ্ডপোপাখ্যান কীর্ত্তন করুন—যাহা শ্রবণ করিলে আমার বোধ বিবৃদ্ধ হইবে[১৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। এই মহীমণ্ডলে কুলরূপ কমলের বিকাশক বিবেকশালী শ্রীমান্ ও বহুপুত্রবান্ পদ্মনামে এক নর-

পতি ছিলেন। তিনি শত্রুরূপ তিমিরের ভাস্কর, কান্তারূপ কুমুদিনীর চন্দ্রমা, বিবুধবৃন্দের সুমেরু, সদ্‌গুণরূপ হংসরাজির সরোবর, দোষরূপ তৃণের হুতাশন, যশোরূপ চন্দ্রের অর্ণব, সংগ্রামরূপ লতার পবন, মনোমোহরূপ মাতঙ্গের কেশরী, বিদ্যারূপিণী প্রিয়ার প্রিয়, সর্ব্বপ্রকার গুণের আধার, বিলাসরূপ পুষ্প সমূহের বসন্তকাল, সৌভাগ্যরূপ কুসুমের আয়ুধ, লীলারূপিণী লতার সমীরণ, এবং সৌজন্যরূপ কৈরবের চন্দ্রচন্দ্রিকা[১৯।২৪]। এই গুণগণভূষণ ভূপতি পদ্ম ধরণ্যাদি উদ্ধার বিষয়ে কেশবের ন্যায় সাহসী ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার দুশ্চেষ্টাকে বিষবল্লীর ন্যায় দগ্ধ করিতে পারিতেন। ইহার লীলা নামে সৌভাগ্যশালিনী প্রিয়া ভার্য্যা ছিল[২৫]। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন সাক্ষাৎ কমলা মানুষী বেশে অবনীতলে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এই লীলা স্বামীর ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সেবায় সতত অনুরক্তা থাকিতেন। সানন্দ-মন্থর-গামিনী বদনাম্ভোজশালিনী সহাস্যবদনা লীলার অলকারূপ অলিকুল দ্বারা মুখকমল সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত। এই লীলা পদ্মকর্ণিকার ন্যায় গৌরবর্ণা ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন একটী গতিশীল পদ্ম। অনেকেই কল্পনা করিত, লীলা ভূতলস্থ কুসুমধন্বা কন্দর্পের পরিচর্য্যার নিমিত্ত দ্বিতীয় রতিরূপে অবনীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। লীলা স্বামীর প্রতি এরূপ অনুরক্তা ছিলেন যে, স্বামী উদ্বিগ্ন হইলে তিনিও সাতিশয় উদ্বিগ্না, স্বামী আনন্দিত হইলে আনন্দিতা, স্বামী ব্যাকুলিত হইলে অত্যন্ত ব্যাকুলিতা এবং স্বামী ক্রোধান্বিত হইলে সাতিশয় ভীতা হইয়া তাঁহার রোষাপনোদনে যত্নবতী হইতেন। অধিক কি বলিব, এই লীলা ছায়ার ন্যায় নিরন্তর স্বামীর অনুগতা থাকিতেন[২৬।৩১]।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতেছেন—নরপতি পদ্ম ভূতলবিহারিণী অপ্সরার অনুরূপা লীলার অকৃত্রিম প্রেমরসে সার্দ্রচিত্ত হইয়া কখন উদ্যানে, কখন তমাল-বনে, কখন রমণীয় পুষ্পমণ্ডপে, কখন লতাকুঞ্জে, কখন অন্তঃপুরস্থপুষ্প-শয্যায়, কখন ক্রীড়াপুষ্করিণীতে, কখন চন্দন, কখন কদম্ব ও পারিভদ্র প্রভৃতি বৃক্ষের তলদেশে, কখন কোকিলধ্বনিসমাকুল বসন্তবনরাজিতে, কখন বিবিধ তৃণরাজিপরিপূর্ণ বনস্থলীতে, কখন শীকরাসারবর্ষী নির্ঝর প্রদেশে, কখন মণিমাণিক্যাদিসুশোভিত শৈলতটে, কখন দেবায়তনে, কখন বা মুনি ও মহর্ষিগণের পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন[১।৮]। তাঁহারা রজনীতে প্রফুল্ল কুমুদ্বতী সকাশে ও দিবাভাগে প্রফুল্ল নলিনী-সমীপে বিবিধ লৌকিক পরিহাস কথা ও পুরাণপ্রসঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ মনোহর আখ্যান সকল কীর্ত্তন করিতেন। এবং পুষ্পমালায় পরি-বেষ্টিত হইয়া বিবিধ সুস্বাদু ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতেন। কখন মৃদুমন্দপাদ-সঞ্চারে, কখন জলযানে, কখন হস্তিপৃষ্ঠে এবং কখন বা অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতেন এবং ইচ্ছানুসারে জলকেলি, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রসন্ন করিতেন ও বিহার করিতেন[৯।১৭]।

একদা শুভসঙ্কল্পশালিনী লীলা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আমার এই নরপতি স্বামী প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। অতএব, এই যৌবনো-ল্লাসশালী শ্রীমান্ রাজা কি প্রকারে অজর ও অমর হইতে পারেন এবং আমিই বা কি প্রকারে এই প্রিয় স্বামীর সহিত শতযুগ পর্য্যন্ত বিহার করিতে পারি?" পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন—"আমি সেই প্রকার যত্নে তপঃ জপ নিয়ম ও দেব পূজাদি করিব—যাহা করিলে আমার চন্দ্রবদন প্রিয় স্বামী অজর ও অমর হইতে পারেন[১৮।২১]। আমি এ বিষয়ের জন্য অগ্রে পূজনীয়, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্বান্ ও তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিব যে, এই অবনীতে মানবগণ কি উপায়ে অমর হইতে পারে"[২২]।

অনন্তর লীলা চিন্তার দ্বারা ঐ প্রকার স্থির করিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দিগকে আহ্বান করতঃ তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা ও প্রণাম পূর্ব্বক

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। "হে ভূদেবগণ! এই পৃথিবীতে মানবগণ কি উপায়ে অমরত্ব লাভ করিতে পারে?"[২৩]

ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন, দেবি! তপঃ ও জপাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রায় সমুদায় কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অমরত্ব লাভ হইতে পারে না[২৪]।

লীলা দ্বিজমুখে ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ ভর্ত্তৃবিয়োগভয়ে সাতিশয় ব্যাকুলিতা হইলেন এবং পুনর্ব্বার প্রজ্ঞার দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন[২৫]। "যদি দৈবাৎ শুভাদৃষ্ট বশতঃ ভর্ত্তার অগ্রে আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমার কোন দুঃখই ভোগ করিতে হইবে না। প্রত্যুত পরম সুখে কাল যাপন করিয়া যাইব। কিন্তু আমার স্বামী যদি সহস্র বৎসর পরেও আমার সম্মুখে লোকান্তর যাত্রা করেন তাহা হইলে আমি এরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন প্রিয়পতির বিয়োগজনিত দুঃখ কখনই সহ্য করিতে পারিব না। আমার এই ভর্ত্তার জীব যদি আমার এই গৃহ হইতে অন্যত্র না যান তাহা হইলেও আমি এই অন্তঃপুর মণ্ডপে তাঁহা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব[২৬।২৮]। অতএব, আজ হইতেই আমি তদর্থে অর্থাৎ সংকল্পিত কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তপঃ, জপ, উপবাসাদি ও নিয়মাদির দ্বারা ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবীর অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্তা হই[২৯]।"

অনন্তর রাজমহিষী লীলা পতির অজ্ঞাতসারে শাস্ত্রানুসারী উগ্রতর তপস্যাদির দ্বারা ভগবতী জ্ঞপ্তি দেবীর আরাধনায় নিযুক্তা হইলেন। * নিয়মশালিনী রাজ্ঞী লীলা সর্ব্বাস্তিক্যজ্ঞান (সকল বিষয়ে শ্রদ্ধা) সহকারে সদাচারপরায়ণা ও স্নান, দান, তপস্যা ও ধ্যান নিরতা থাকিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও চতুর্থ দিবসে পারণ, পুনশ্চ ত্রিরাত্র উপবাস ও চতুর্থ দিবসে পারণ, এতদ্বিধ নিয়ম অবলম্বন করতঃ তপশ্চর্য্যায় নিযুক্তা থাকিলেন। ব্রাহ্মণ, গুরু, প্রাজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণের সেবায় এবং যোগ্য সময়ে

---

* যদিও শাস্ত্র আছে, স্ত্রী পতির বিনা অনুমতিতে উপবাসাদি করিবেক না। "যা স্ত্রী ভর্ত্রা'হননুজ্ঞাতা উপবাসব্রতং চরেৎ। আয়ুষ্যং হরতে ভর্ত্তু র্মৃতা নরকমৃচ্ছতি।" তথাপি "প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা সদা ভর্ত্তৃহিতং চরেৎ। ব্রতোপবাসনিয়মৈরুপচারৈশ্চ লৌকিকৈঃ।" এই শাস্ত্রের দ্বারা স্থির করা যায় যে নারীরা ভর্ত্তৃহিতকর ব্রতাদি ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকেও স্বাধীন ভাবে করিতে পারে।

উচিত উদ্যোগের সহিত শাস্ত্রানুসারে ভর্ত্তার সন্তোষ সাধনে নিযুক্তা রহিলেন[৩০,৩৩]। ঐরূপে ত্রিশত নিশা অতিবাহিত হইল। ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবী রাজমহিষীর উক্তবিধ পূজায় পরিতুষ্টা হইয়া তদীয় দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইলেন। বলিলেন,' বৎসে! আমি তোমার নিরন্তরিত তপস্যায় ও অকপট পরিচর্য্যায় প্রীতা হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা' কর[৩৪,৩৬]।

রাজমহিষী লীলা সানন্দিত চিত্তে বলিলেন, দেবি! আপনি জন্ম ও জরারূপ দহনে দগ্ধকল্প জীবের দাহনিবারিণী চন্দ্রপ্রভা এবং হৃদয়ান্ধকার-নিবারিণী রবিপ্রভা। আপনার জয় হউক[৩৭]। আপনিই এই ত্রিজগতের জননী। মাতঃ! আপনি এই দুঃখিনী কন্যাকে বরদ্বয় প্রদান করতঃ পরিত্রাণ করুন[৩৮]। আমার এক বর—আমার স্বামী দেহবিহীন হইলে, তাঁহার জীবন যেন আমার এই অন্তঃপুরমণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়। অপর বর—আমি ইচ্ছানুসারে আপনার দর্শন প্রার্থনা করিলে যেন তন্মুহূর্ত্তে আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি[৩৯,৪০]।

জগন্মাতা স্বরস্বতী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করতঃ বলিলেন, "তাহাই হইবে।" ভগবতী জ্ঞানদেবী স্বরস্বতী ঐরূপ বলিয়া সাগরে সাগর-সমুত্থিত তরঙ্গমালার ন্যায় সেই স্থলেই অন্তর্হিতা হইলেন[৪১]। অনন্তর রাজমহিষী লীলা ইষ্টদেবতার সন্তোষ সাধন করতঃ বর লাভ করিয়া হরিণী যেমন গীত শ্রবণে আনন্দিতা হয় সেইরূপ আনন্দিতা হইলেন[৪২]। পরে পক্ষ, মাস ও ঋতু যাহার বলয়, দিন যাহার অংশ, বর্ষ যাহার দণ্ড, ক্ষণ যাহার নাভি, স্পন্দ যাহার মধ্যভাগ, সেই কাল চক্রের ক্রম-পরিবর্ত্তনে তাঁহার স্বামীর আয়ুঃশেষ হইল। মৃত্যু তদীয় সকাশে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তদীয় দেহ হইতে চেতনা অন্তর্হিত হইল। এ দিকে রাজমহিষী লীলা ভর্তৃবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন এবং শুষ্করস পত্রের ন্যায় ও সলিলবিহীন কমলিনীর ন্যায় ম্লানা হইয়া পড়িলেন[৪৩,৪৫]। তাঁহার অধরপল্লব অত্যুষ্ণ নিশ্বাস-পবনে বিবর্ণীকৃত হইল, শরীর দিন দিন কৃশ ও ধূষরবর্ণ হইতে লাগিল, তিনি পতিবিয়োগশোকে চক্রবাকবিয়োগিনী চক্রবাকীর ন্যায় ও শল্যাহতা মৃগীর ন্যায় মৃতকল্পা হইলেন। কখন রোদন, কখন বা মৌনাবলম্বন, কখন মূর্চ্ছিতা, কখন অঙ্গতাড়ন, কখন বা উন্মত্তার ন্যায় বিকট হাস্য করিতে লাগিলেন[৪৬,৪৯]।

অনন্তর যদ্রূপ শুষ্ক হ্রদস্থিত শফরীর প্রতি প্রথমা বৃষ্টি অনুকম্পা-ন্বিতা হয়, তদ্রূপ, কৃপাময়ী অশরীরিণী বাণী (দৈববাণী) সেই অতিশয়িত শোকবিহ্বলা বালা লীলার প্রতি অনুকম্পান্বিতা হইলেন৫৫।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

লীলাকে সম্বোধন করতঃ আকাশরূপিণী সরস্বতী বলিলেন, বৎসে! তুমি তোমার এই ভর্ত্তার মৃত শরীর পুষ্পগুচ্ছে আচ্ছাদন করতঃ রক্ষা কর, পুনর্ব্বার ইহাকে প্রাপ্ত হইবে[১]। শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, একটীও পুষ্প ম্লান হইবে না এবং তোমার এই শবীভূত ভর্ত্তৃদেহও বিনষ্ট হইবে না। অধিকন্তু শীঘ্রই ইনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া পুনর্ব্বার তোমার ভর্ত্তৃত্ব করিবেন[২]। অপিচ, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এতদীয় জীবাত্মা তোমার এই অন্তঃপুরমণ্ডপ হইতে অন্য কোথাও গমন করিবেক না[৩]।

লীলা তদ্বিধ আকাশবাণী শ্রবণ করতঃ কথঞ্চিৎ আশ্বাসিতা হইলেন। এবং পুষ্পমণ্ডপ মধ্যে স্বামীর দেহ সংস্থাপিত করতঃ অন্তঃপুর মধ্যে পরিজনবর্গের সহিত অতি দীনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৪।৫]। পরে অর্দ্ধ রাত্র সময়ে, যখন সকলে নিদ্রাভিভূতা হইয়াছে তখন, সেই দীনা বালা ধ্যানপরায়ণা হইয়া ভগবতী জ্ঞপ্তিরূপা সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। ভগবতী সরস্বতী সমাধিযোগে আহূতা হইয়া লীলার পুরোবর্ত্তিনী হইলেন। বলিলেন, বৎসে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছ? তোমার শোকের কারণ কি? কেন তুমি শোক করিতেছ? সংসার ভ্রান্তির বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহা বাস্তব নহে; মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা[৬।৮]। লীলা বলিলেন, দেবি! আমার ভর্ত্তা এক্ষণে কোন স্থানে ও কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছেন এবং কিরূপ কর্ম্ম করিতেছেন তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া চলুন। আমি একাকিনী জীবন ধারণে সমর্থ হইতেছি না[৯]।

দেবী বলিলেন, বরাননে! চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও মহাকাশ, এই তিন প্রকার আকাশের মধ্যে চিত্তাকাশ বাসনাময়। আর এই যে ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ আকাশ, ইহা মহাকাশ নামে প্রসিদ্ধ। এই দুই ভিন্ন যে আকাশ, তাহাই চিদাকাশ। চিদাকাশে চিত্তাকাশ ও মহাকাশ, উভয়ই লয় প্রাপ্ত হয়। (চিদাকাশ=সর্ব্বব্যাপী মহান্ চৈতন্য।

অপর নাম ব্রহ্ম ও পরমাত্মা। সেই আকাশেই সমুদায় সৃষ্টি, এবং সমুদায়ের অবস্থিতি ও লয়। ইহলোক পরলোক সমস্তই চিদাকাশে। চিদাকাশ দেখ, অনুসন্ধান কর, ভর্ত্তা ও ভর্তৃস্থান দেখিতে পাইবে)[১০]। * তোমার ভর্ত্তার অবস্থিতি স্থান সেই চিদাকাশ কোষে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং তন্মনা হইয়া চিদাকাশ ভাবিতে পারিলে শীঘ্রই সে স্থান দেখিতে পাইবে। অনন্তর ইচ্ছা করিলে সে স্থানে গমন করিয়া সাক্ষাৎকার করিতেও পারিবে[১১]। হে বরবর্ণিনি! নিমেষ পরিমিত সময়ের মধ্যে চিত্ত মহাকাশ অতিক্রম করতঃ দূর হইতেও দূর দেশে যায় এবং যত দূর যায় তত দূর চিদাকাশ তাহাকে (সেই চিত্তবৃত্তিকে) প্রকাশিত করে। সেই যে প্রকাশ, তাহার নাম সম্বিৎ ও জ্ঞান। মহাকাশ ও চিত্তাকাশ উভয়ের প্রকাশক ও উভয়ের আধার সেই সম্বিৎ নামক আকাশকেই তুমি চিদাকাশ বলিয়া অবগত হইবে[১২]। যদি তুমি চিত্তস্থ সমুদায় সঙ্কল্প নিরোধ অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশে স্থিতি লাভ করিতে পার, তাহা হইলে সেই সর্ব্বাধার সর্ব্বাত্মক তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে[১৩]। তত্ত্ব লাভ দ্বারা দ্বৈত দর্শন নিবারিত করিতে না পারিলে অর্থাৎ প্রভেদবহুল কল্পিত জগৎকে আত্যন্তিকরূপে বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন করিতে না পারিলে সে পদ পাওয়া যায় না। হে সুন্দরি! তাহা উৎকট শ্রমসাধ্য হইলেও আমার প্রসাদে তুমি তাহা সহজে লাভ করিতে পারিবে[১৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! জ্ঞপ্তিরূপিণী সরস্বতী দেবী সেই রাজমহিলা লীলাকে ঐরূপ কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর লীলাও সরস্বতীর আদেশানুসারে অবলীলাক্রমে সমাধিস্থা হইলেন[১৫]। অপিচ, পক্ষিণী যেমন স্বীয় বাসস্থান (নীড়) পরিত্যাগ করতঃ উড্ডীনা হয়, তেমনি, লীলাও নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা নিমেষ মধ্যে অন্তঃকরণরূপ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়স্থ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশস্থ হইলেন[১৬]। তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভর্ত্তা রাজমণ্ডলমণ্ডিত রাজধানীস্থ পুরীমধ্যে সিংহাসনোপরি অবস্থান করিতেছেন[১৭]। তত্রস্থ গৃহ সকল পতাকামণ্ডলীতে পরিব্যাপ্ত এবং পুষ্প, কর্পূর ও ধূপাদির সুগন্ধে সতত আমোদিত রহিয়াছে।

* অভিপ্রায় এই যে, এই বিশ্বমণ্ডল সর্ব্বব্যাপী আত্মচৈতন্যে কল্পিত, সুতরাং সমাধিযোগে আত্মচৈতন্য দর্শন করিতে পারিলে সমস্তই তাহাতে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ দেখা যায়।

ভৃত্যেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে উপায়নাদি আহরণ করতঃ তাহা পরিপূর্ণ করিতেছে। শুভ্রবর্ণপর্ব্বতসদৃশ প্রাসাদের স্তম্ভ সকল স্বর্গস্পর্শী; তাহা স্বীয় প্রভায় প্রভাকর প্রভাকেও পরাজিত করিয়াছে। সামন্তগণ ও স্থপতিগণ ব্যগ্রচিত্তে গুরুতর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে। এই পুরীর পূর্ব্ব দ্বারে অসংখ্য দেব ও মহর্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন। দক্ষিণ দ্বারে ভূপালগণ ও পশ্চিম দ্বারে অসংখ্য ললনা অবস্থিতি করিতেছেন। উহার উত্তরদ্বারস্থিত প্রভূত রথ, হস্তী ও অশ্ব সমুদয় ধূলিপটলে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতেছে। উহার চতুর্দ্দিক্ গীত ধ্বনিতে, বাদ্যধ্বনিতে, বন্দিগণের উল্লাসসূচক কোলাহলধ্বনিতে পরিপূর্ণ এবং সে সকলে বনকুঞ্জ ও গগনান্তরাল ধ্বনিত করিতেছে। লীলা রাজসভায় রাজগণমণ্ডিত সিংহাসনে বিরাজমান স্বীয় ভর্ত্তাকে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, বন্দিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছে, স্তব স্তুতি করিতেছে, অন্যান্য পরিচারকগণ তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যসকল পরম সমাদরে সম্পন্ন করিতেছে।

রাজমহিলা লীলা এই সমস্ত দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই রাজসভায় এক জন ভৃত্য উপস্থিত হইয়া কহিল; মহারাজ! দাক্ষিণ্যাত্যপ্রদেশে যুদ্ধ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে[১৮।২১]। আর এক দূত আগমন করতঃ কহিল, কর্ণাটাধিপতি পূর্ব্বদেশে ব্যবহারমর্য্যাদা স্থাপন করতঃ তদ্দেশীয় দিগকে বশীভূত করিয়াছেন। অপর দূত আসিয়া বলিল, মহারাজ! মালবাধিপতি তঙ্গন দেশ সম্যক্‌রূপে আক্রমণ করিয়াছেন। অন্য সংবাদ সুরাষ্ট্রাধিপতি উত্তর দেশস্থ যাবতীয় ম্লেচ্ছদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ মহাসমুদ্রের তট হইতে এক জন দূত আসিয়া লঙ্কাপুরী আক্রমণের বিষয় নিবেদন করিল[২২।২৩]। অনন্তর পূর্ব্বাব্ধিতট হইতে এক জন সিদ্ধ (তপস্বী) পুরুষ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! যে স্থানে ত্রিপথগা ভাগীরথী সহস্রমুখে প্রবাহিত হইতেছেন; সেই সিদ্ধগণের আবাস স্থান মহেন্দ্র পর্ব্বতে মহান্ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সময়েই উত্তরাব্ধিতটসমীপস্থ দেশ হইতে এক জন দূত আসিয়া বলিল, মহারাজ! যে স্থানে কুবেরানুচর গুহ্যকেরা বাস করেন, সেই স্থানে মহান্ বিদ্রোহ হইতেছে। এবং পশ্চিমাব্ধি তট হইতে অপর এক জন দূত উপস্থিত হইয়া বলিল, নরনাথ! পশ্চিম দেশেও বিগ্রহ ঘটনা হইয়াছে। আরও দেখিলেন, চত্বরে অনেক শত যুদ্ধজিত ভূপাল, যাগ-গৃহে

বেদধ্বনি ও বাদ্যনির্ঘোষ, পার্শ্ব দেশে বন্দিগণের সোল্লাসশব্দ ও গান বাদ্যের মধুর শব্দ সমুত্থিত হইয়া গগনতল ধ্বনিত করিতেছে। অশ্বের হ্রেষা, মাতঙ্গের বৃংহিত, রথের ঘর্ঘর শব্দ মেঘধ্বনির অনুকার করিতেছে[২৬।২৭]। পুষ্পের, কর্পূরের ও ধূপের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। মণ্ডলেশ্বর নৃপগণ শাসন ভয়ে ভীত হইয়া নানাবিধ উপঢৌকন আনয়ন করিতেছে[২৮]। সুধাধবলিত অত্যুচ্চ সৌধশ্রেণী, (চূণকাজ করা অট্টালিকা) তৎসংলগ্ন গগনস্পর্শী স্তম্ভরাজি, নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। কিঙ্করকুল কার্য্যে ব্যগ্র, শিল্পীরা নগরনির্ম্মাণে তৎপর রহিয়াছে[২৯।৩০]।

ব্যোমরূপিণী লীলা এই সমস্ত দর্শন করিয়া, পরে, যেরূপ অম্বর হইতে নীহারকণা আপতিত হয়, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় সহসা অসংখ্য দলবদ্ধ ভূপালগণের উজ্জ্বল কান্তিসুশোভিত সেই রাজসভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তত্রস্থ জনগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। যেমন অন্যসঙ্কল্পরচিতা কামিনী ও নগরী অন্যে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সেই পুরোবর্ত্তিনী ভ্রমণশীলা ব্যোমরূপিণী লীলাকে কেহই দেখিতে পাইল না[৩১।৩৩]। লীলা দেখিলেন, সেই রাজা, সেই রাজ্য, সেই সকল ভৃত্য, সেই অমাত্য, সমস্তই সেই। যেন তাঁহার ভর্ত্তা নগর হইতে নগরান্তরে আসিয়াছেন। লীলা প্রত্যক্ষবৎ দেখিলেন—সেই দেশ, সেই আচার, দেশীয় আচার ব্যবহার সম্পন্ন সেই সমস্ত বালক, বালিকা, মন্ত্রী, ভূপাল, পণ্ডিত, রহস্যবেত্তা ভৃত্য, স্বজনগণ ও অন্যান্য পণ্ডিত, সজ্জন, সুহৃদ ও পৌরজনগণ। সমস্তই সেই, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই[৩৪।৩৭]। সেই মধ্যাহ্নকাল, সেই দাবানল দগ্ধ দিক্‌, সেই চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ ও পবনধ্বনি। সেই মহীরুহ, নদী, শৈল, পুর, পত্তন, বিবিধ লতানিকুঞ্জ, গ্রাম ও অরণ্যসুশোভিত দেশপ্রান্ত এবং সেই রমণীয় পুরী। কেবল রাজা প্রাক্তন জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া এক্ষণে ষোড়শ বর্ষীয় হইয়া রাজত্ব সুখ অনুভব করিতেছেন। তথায় পূর্ব্বতন নগরবাসী দিগকেও দেখিলেন[৩৮।৪০]। লীলা এই বর্ণিতপ্রকার বাসনানগরে পূর্ব্বসদৃশ নগরবাসী দিগকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন। এ-কি! পূর্ব্ব নগরবাসীগণ কি সকলেই মরিয়াছে? কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার চিন্তায় সমাকুল হইলেন[৪১]।

এই অবসরে দেবী সরস্বতীর কৃপায় তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। দেখি-

লেন, তিনি ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্ব নগরে ও পূর্ব্ব বাসগৃহে আসিয়াছেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। সখিগণ ও পুরবাসিগণ সকলেই নিদ্রায় অচেতন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, এখানেও পূর্ব্ববর্ণিত সমুদায় লোক ও সমুদায় দ্রব্য যথাবৎ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অনন্তর তিনি সেই নিদ্রাক্রান্তা সখীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সখীগণ! আমার সাতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তোমরা আমাকে রাজসভায় লইয়া যাও। আমি স্বামীর সিংহাসনের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া যদি সেই সভ্যদিগকে দেখিতে পাই তাহা হইলে জীবিতা থাকিব, নচেৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিব[৪২।৪৪]। অনন্তর রাজপরিবারবর্গ রাজমহিষীর নিদেশক্রমে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যত্নসহকারে স্ব স্ব সমুচিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিল[৪৫]। যষ্টিধারী ভৃত্যেরা পৌরজনগণকে ও সভ্যদিগকে আনয়ন করিতে গমন করিল, পরিচারকগণ যত্নসহকারে আস্থান ভূমি অর্থাৎ সভাস্থান মার্জ্জনা করিতে লাগিল[৪৬।৪৭]। উজ্জ্বল দীপ সকল চত্বর ভূমিতে প্রজ্বালিত হওয়ায় চত্বরভূমি পীতবর্ণ সলিলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল, নক্ষত্রগণ যেন এই সকল আশ্চর্য্য দর্শনার্থ গগনমণ্ডলে সমুদিত হইল[৪৮]। যেমন শুষ্ক সমুদ্র জলবর্ষণে পরিপূর্ণ হয়, তেমনি, অনতিবিলম্বে সেই অজিরভূমি জনতায় আকীর্ণ হইল[৪৯]। মন্ত্রিগণ ও সামন্তবর্গ আগমন করিলেন এবং আপন আপন স্থান অধিকার করিলেন। দেখিলে বোধ হয়, ত্রৈলোক্য যেন প্রলয়ান্তে পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাই যেন দিক্পতিগণ আপন আপন দিক্পরিগ্রহ করিতেছেন[৫০]। কর্পূরসদৃশ শুভ্র নীহারকণা প্রচুর পরিমাণে নিপতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক শোভাময় হইয়াছে। প্রফুল্ল কুসুমসুরভিবাহী সমীরণ মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে[৫১]। যেমন সূর্য্যময়ুখ প্রতপ্ত ঋষ্যমূক পর্ব্বতবাসী দিগের শান্তিবিধানার্থ মেঘমালা উদিত হয়, তেমনি যেন আজ্ দ্বারপালগণ শুভ্র বসন পরিধান পূর্ব্বক সেই আস্থানের পর্য্যন্ত দেশে শোভমান হইল[৫২]। যেমন প্রলয়কালে প্রচণ্ড বায়ুর তাড়নায় তারকানিকর বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার ন্যায় আজ্ লীলাপতির সভাভূমিতে কুসুমনিকর নিপতিত হইয়া তমোরাশি তিরোহিত করিল[৫৩]। যেমন প্রফুল্ল কমলশোভিত সরোবর মরালমালায় শোভমান হয়, তেমনি, আজ্ লীলা-

নাথের আস্থান ভূমি মহীপালানুযায়ী জনগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ ও শোভমান হইল[৫৪]। রতি যেমন কামহৃদয়ে অথবা শৃঙ্গার-রস-চেষ্টা যেমন কামাতুরের চিত্তে উপবেশন করে, তেমনি, লীলা ভর্ত্তৃসিংহাসনের পার্শ্বাবস্থিত হৈম সিংহাসনে উপবেশন করিলেন[৫৫]। দেখিলেন, পূর্ব্বে যাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন তাহারা সকলেই আছে ও আসিয়াছে। লীলা সেই সকল ভূপাল, সেই সকল গুরুগণ, আর্য্যগণ, সখীগণ, সুহৃদগণ, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ দেখিয়া অনুপম আনন্দ লাভ করিলেন এবং স্থির করিলেন, রাজা ব্যতীত আর সকলেই জীবিত আছে[৫৬।৫৭]।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! লীলা বর্ণিতপ্রকারে ভর্ত্তার সভাস্থান দেখিয়া আশ্বাসিতা হইলেন এবং আকার ইঙ্গিত দ্বারা সমাগত সভ্য-দিগকে "আমি আশ্বাসিতা হইয়াছি" এইরূপ বুঝাইয়া দিয়া সভা স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন[১]। পরে অন্তঃপুরমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে ভর্ত্তার শরীর পুষ্পকরণ্ডকে সুরক্ষিত হইতেছে সেই স্থানে গিয়া ভর্ত্তার পার্শ্বদেশে উপবেশন করতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন[২]। "একি অদ্ভুত মায়া!" আমার এই পুরমানবগণ বাহিরে ও অন্তরে, সেখানে ও এখানে, উভয় স্থানেই সমান দেখিলাম![৩] মায়ার এ-কি অদ্ভুত বিলাস! তাল, তালী, তমাল, হিন্তাল প্রভৃতি বৃক্ষমালায় পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতগুলিকেও সেখানে ও এখানে সমান দেখিলাম[৪]। কি আশ্চর্য্য! পর্ব্বত যেমন বাহিরে ও আদর্শ মধ্যে তুল্যানুতুল্য রূপে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি, সৃষ্টিকেও কি চিদ্রূপ আদর্শের অন্তরে ও বাহিরে সমান সমান দেখিলাম[৫]। যাহাই হউক, উভয়ের মধ্যে কোন্ সৃষ্টি ভ্রান্তিকৃত এবং কোন্ সৃষ্টি সত্য তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। যেহেতু পারি-লাম না, সেই হেতু আমি বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা করিয়া এ বিষয় তাঁহা-কেই জিজ্ঞাসা করিব, করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইব[৬]।

লীলা ঐ প্রকার স্থির করিয়া দেবী বাগ্বাণীর আরাধনা করিলেন। এবং কুমারীরূপধারিণী দেবীও তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃষ্টিপথে উপনীতা হই-লেন[৭]। দেবী লীলার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া ভদ্রাসনে উপবেশন করিলেন। লীলা ভূতলে অবস্থিতি করতঃ মহাশক্তিস্বরূপিণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৮]। লীলা বলিলেন, পরমেশ্বরি! আপনিই সৃষ্টির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার সাতিশয় উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি-তেছি, আপনি অনুকম্পান্বিতা হইয়া যদি আমার সন্দেহ নিরাস পূর্ব্বক উদ্বেগ বিদূরিত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ আছে তাহা সফল হয়[৯।১০]। বুঝিয়াছি, যাহা জগতের আদর্শ (দর্পণ),

যাহাতে জগৎ দেখা যায়, তাহা আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল এবং তাহার নিকট কোটি কোটি যোজন বিস্তীর্ণ দৃশ্য জগৎ অতি ক্ষুদ্র[১১]। * তাহাই বেদোক্ত মহাবাক্যোত্থ অখণ্ডার্থ বোধ বা প্রজ্ঞার জ্যোতিঃ অর্থাৎ তাহা প্রকাশ। ঘন অর্থাৎ অত্যন্ত নিবিড় (সৈন্ধব ঘনের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে সমান)। কাঠিন্য না থাকায় মৃদু, তাপ শান্তি করে বলিয়া শীতল, ভেদ বা আবরণ না থাকায় নির্ভিত্তি এবং অচেত্যচিৎ অর্থাৎ কোন কিছুর প্রকাশ্য নহে, অথচ সমুদায় বিষয়ের প্রকাশক। এই সূক্ষ্ম বস্তু সমুদায় ব্যবহারের অগ্রে অগ্রে স্ফুরিত হইয়া থাকে[১২]। দিক্, কাল ও তদন্তর্গত কার্য্য নিচয়ের উৎপত্তি, আকাশাদি পদার্থের স্ফূরণ অর্থাৎ প্রকাশ, নিয়ম ও পরিণামক্রম, এ সমস্ত তাহাতেই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। আমি দেখিয়াছি, ত্রিজগতের প্রতিবিম্বশ্রী সেই চিদাদর্শের বাহ্যে ও অন্তরে উভয়ত্রই সংস্থিত রহিয়াছে। হে দেবি! উক্ত উভয় স্থানস্থ প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন্‌টা কৃত্রিম ও কোন্‌টী অকৃত্রিম তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না[১৩।১৪]।

দেবী বলিলেন, সুন্দরি! সৃষ্টির কৃত্রিমত্বই বা কি? অকৃত্রিমত্বই বা কি? অগ্রে আমার নিকট বর্ণন কর, পরে আমি তোমার নিকট ঐ দুই প্রশ্নের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিব[১৫]। লীলা বলিলেন, অম্বিকে! এই যে আমি এবং আপনি, আমরা উভয়ে এখানে যে অবস্থিতি করিতেছি, আমার মনে হইতেছে, এই সৃষ্টিই অকৃত্রিম[১৬]। আর আমার ভর্ত্তা যে স্থানে এখন অবস্থিতি করিতেছেন, আমার বিবেচনা হয়, সেই সৃষ্টি কৃত্রিম[১৭]। কারণ, শূন্যে দেশকালাদির সংস্থান, স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বতাদির ন্যায় অলীক, বস্তুসৎ নহে। দেবী বলিলেন, লীলে! অকৃত্রিম সৃষ্টি হইতে কৃত্রিম সৃষ্টি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ এই যে, কোনও কালে কারণ হইতে তদ্বিসদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয় না[১৮]। লীলা বলিলেন, অম্বিকে! কারণ হইতে অসদৃশ কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃৎপিণ্ড সলিলধারণে সমর্থ না হইলেও তদুৎপন্ন ঘট সলিলধারণ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে উৎপন্ন ঘট ও মৃৎপিণ্ড এক ও একরূপ নহে; সুতরাং উক্ত উভয়ের বৈসাদৃশ্য অবশ্যই স্বীকার্য্য[১৯]।

---

* লীলা যাহা সমাধিযোগে দেখিয়াছেন তাহার সহিত ব্যুত্থানদৃষ্ট জগতের তুলনা করিবার জন্য প্রথমে ভূমিকা-কথা বলিতেছেন।

দেবী বলিলেন, লীলে! সহকারিকারণের যোগে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যে কারণের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে[২০]। বল দেখি, তোমার সেই ভর্ত্তার উৎপত্তিতে এমন কারণভেদ কি আছে—যাহা থাকাতে তিনি এখানে একরূপ ও সেখানে অন্যরূপ হইতে পারেন? এই সৃষ্টির পৃথ্ব্যাদি ভূত কি তোমার সেই ভর্ত্তৃসৃষ্টির কারণ যে তন্থলে বৈলক্ষণ্য ঘটিবে? যদিও তোমার স্বামীর সৃষ্টি ভৌতিক হয়, তাহা হইলেও বৈষম্যের কারণ নাই। সেখানেও ভূমণ্ডল ও ভূত ভৌতিক, এখানেও ভূমণ্ডল ও ভূত ভৌতিক[২১]। যদি বল, এই ভূমণ্ডলে জন্মিয়া সেই ভূমণ্ডলে যায়, তাহা বলিলেও বুঝিতে হইবে, এ ভূমণ্ডল কোথায়! এখানকার মৃত্তিকা ভূতাদি সেখানে যায় কি না। যাওয়াও অসম্ভব অথচ না গেলে কি প্রকারে সেখানে তদনুরূপ সৃষ্টি হইতে পারে? অতএব, তোমার ভর্ত্তার উৎপত্তি বিষয়ে ভিন্নতাকারক পৃথক্ সহকারী কারণ কিছুই দেখা যায় না[২২]। সেইজন্যই বলিতেছি, অত্রত্য সহকারী কারণ না থাকায় ইহাই স্থির করিতে হইবে অর্থাৎ অনুমান করিতে হইবে যে, যাহার যাহার উৎপত্তি হয়, পূর্ব্ব সর্গীয় কাম কর্ম্ম বাসনাদিই তাহার কারণ। সেই কারণে সৃষ্টির অবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এ রহস্য বোধ হয় অল্প মনোনিবেশ করিলে সকলেই বোধগম্য অর্থাৎ অনুভব করিতে পারেন[২৩]।

লীলা বলিলেন, দেবি! এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার স্বামীর উৎপত্তির কারণ স্মৃতি। স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান সংস্কার সেখানে সেই প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে[২৪]।

দেবী বলিলেন, অবলে! স্মৃতি আকাশস্বরূপ। সেজন্য তদুৎপন্ন তোমার ভর্ত্তার সৃষ্টিও আকাশরূপিণী। তাহা অনুভূত হইলেও ব্যোম-রূপী। লীলা বলিলেন, ভগবতি! এখন আমার বোধ হইতেছে, স্মৃতি হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা আকাশস্বরূপ। যেমন আমার স্বামী। এই যে দৃশ্যমানা সৃষ্টি, বোধ হয় ইহাও সেই স্মৃতি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাও শূন্যরূপী। এ সৃষ্টি যে শূন্যাত্মক তাহার নিদর্শন সেই সৃষ্টি[২৫।২৬]।

দেবী বলিলেন, পুত্রি! তুমি যাহা অনুভব করিয়াছ তাহাই সত্য। তোমার ভর্ত্তা যেমন আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া প্রতিভাত হইতেছিলেন, তেমনি এই পরিদৃশ্যমান ভাস্বর সৃষ্টিও সেইরূপে প্রতিভাত হইতেছে[২৭]।

লীলা বলিলেন, ভগবতি! মূর্ত্তিবর্জ্জিত এতৎ সৃষ্টি হইতে যে প্রকারে আমার ভর্ত্তার সেই ভ্রমাত্মক সৃষ্টি হইয়াছে, জগদ্‌ভ্রম নিবৃত্তির নিমিত্ত তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[২৮]।

সরস্বতী বলিলেন, লীলে! এ সৃষ্টিও পূর্ব্বসৃষ্টি অনুভব জনিত সংস্কার-সচিব (সচিব=সহায়) ভ্রান্তির বিলাস। স্বপ্নভ্রমসদৃশ এতৎ সৃষ্টি যে প্রকারে উদিত হইয়াছে ও প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর[২৯]।

চিদাকাশের কোন এক স্থানে (অজ্ঞানাবৃত অংশে) ও কোন এক অংশে (সৃষ্টিকর্ত্তার অন্তঃকরণ প্রদেশে) আকাশরূপ কাচ খণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদিত সংসারমণ্ডপ অবস্থিত আছে। এই মণ্ডপের স্তম্ভ সুমেরু, চতুর্দ্দশ ভুবন অন্তর্গৃহ, ভানু দীপ; স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল, এই ভুবনত্রয়ের অন্তরাল উহার গর্ত্ত, লোকপালেশগণ ঐ গৃহের প্রতিমা প্রাণী সকল ঐ গৃহের কোণ-স্থিত বল্মীক এবং পর্ব্বতসকল লোষ্ট্র। এই মণ্ডপ বহুপুরীপরিব্যাপ্ত ও বহুপুত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা এই গৃহের ব্রাহ্মণ। যে সমস্ত কীট কোশ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনা আপনি বদ্ধ হয়, জীবগণ এই গৃহের সেই সমস্ত কীটের অনুরূপরূপী। ব্যোমার্দ্ধতল ও মেঘরাজি ঐ গৃহের কোণস্থিত ধূমকালিমা (ঝুল), নভোমণ্ডলবাসী সিদ্ধগণ উহার ঘুম্ ঘুম্ শব্দকারী মশক, এবং বাতমার্গ * সকল উহার শব্দায়মান মহাবংশ। এই গৃহের প্রাঙ্গনে সুরাসুরাদি বালক নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে। লোকান্তর ও গ্রামাদি সকল ঐ মণ্ডপান্তর্গত ভাণ্ডের উপস্কর স্বরূপ[৩০।৩৫]। উহা তরঙ্গসঙ্কুল অব্ধিরূপ সরোবর জলে পরিষিক্ত। এই সংসারমণ্ডপের এক একটী কোণে পর্ব্বতরূপ লোষ্টের তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরূপ অসংখ্য গর্ত্ত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

হে শুচিস্মিতে! এই নদী, শৈল ও বনসঙ্কুল দেশে এক সাগ্নিক, সপুত্র, রোগবিহীন, রাজভয়ানভিজ্ঞ, অক্ষুব্ধচিত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন[৩৬।৩৮]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* আবহ প্রবহ প্রভৃতি বায়ুচক্র—যাহা জ্যোতির্গণের বহনকারী বলিয়া জ্যোতিষে বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল বিশেষ বিশেষ বায়ুস্থান অর্থাৎ বাতমার্গ। পৃথিবীতল হইতে উর্দ্ধে প্রত্যেক চতুর্যোজনান্তে ক্রমিক ভিন্ন ভিন্ন বায়ুবীয় স্তর আছে। তাহার শেষ স্তরে স্থির বায়ু—সেই স্থির বায়ু কূটবৎ নির্ব্বিকার নিশ্চল ও মূলতত্ত্ব।

উনবিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, বৎসে! এই ব্রাহ্মণ বিত্ত, বেশ, বয়স, কর্ম্ম ও বিদ্যা, সর্ব্বাংশে সাক্ষাৎ বশিষ্ঠ দেবের ন্যায় ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব ইক্ষ্বাকুবংশের পৌরহিত্য কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন, তিনি কেবল তাহাই করেন নাই[১]। তাঁহারও নাম বশিষ্ঠ এবং তাঁহারও সুধাংশুসমসৌন্দর্য্যশালিনী অরুন্ধতী নাম্নী ভার্য্যা ছিল। এ অরুন্ধতীও সর্ব্বপ্রকারে প্রসিদ্ধা বশিষ্ঠভার্য্যা অরুন্ধতীর সমান। বিশেষ এই যে, প্রসিদ্ধা বশিষ্ঠভার্য্যা অরুন্ধতী স্বর্গাকাশে অবস্থিতা, ইনি ভূম্যাকাশে অবস্থিতা[২]। প্রস্তাবিত অরুন্ধতী চিত্ত, বিভব, বেশ, বয়স, কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, কার্য্য ও চেষ্টা, সর্ব্বাংশেই প্রসিদ্ধা অরুন্ধতীর সমান, কেবল চেতনসত্ত্বে অর্থাৎ জীবভাবে অসমান। * ব্রাহ্মণপত্নী অরুন্ধতী উক্ত ব্রাহ্মণের অকৃত্রিম প্রেমের আস্পদ ও সংসারের সার স্বরূপ ছিলেন[৩।৪]।

সেই ব্রাহ্মণ একদা তত্রত্য শৈলসানুস্থিত হরিদ্বর্ণ তৃণ ক্ষেত্রে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে দেখিলেন, সেই অচলের অধোভাগে এক মহীপতি সমগ্র আত্মীয়স্বজন ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে মৃগয়াবিহারে গমন করিতেছেন। নরপতির সৈন্যগণের গভীর কোলাহল নির্ঘোষ যেন সুমেরুশৈলকেও বিদীর্ণ করিতেছে। ইহারা চামর দ্বারা লতানিকুঞ্জ, পতাকার দ্বারা চন্দ্রকিরণ, এবং রৌপ্যমণ্ডিত শ্বেত ছত্র দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করতঃ গমন করিতেছিলেন[৫।৭]। অশ্ব সমুদয়ের পাদত্রাণ দ্বারা মেদিনী উৎখাতিত হওয়াতে রজোরাশি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছিল[৮] এবং সৈন্যগণের মহাকোলাহলে দিক্‌সমূহ প্রপূরিত হইতেছিল। অপিচ, তন্মণ্ডলস্থ জনগণের সকলেই মণিমাণিক্যাদি খচিত কাঞ্চনাভরণে শোভা পাইতেছিল[৯]।

অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই সৌভাগ্যশালী রাজাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! রাজপদ কি রমণীয়! ইহাই সর্ব্বসৌভাগ্যের

* অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অরুন্ধতী জীবন্মুক্তা এবং প্রস্তাবিত অরুন্ধতী জীবন্মুক্তা নহে।

সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত[১০]। পরে ভাবিতে লাগিলেন, আমি কত দিনে এই-রূপ মহাপতি হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, পতাকা ও চামর দ্বারা দশ দিক্ প্রপূরিত করিব? কত দিনে কুন্দ-মকরন্দ-সুগন্ধি-বাহী সমীরণ মৃদুমন্দ সঞ্চারে বাহিত হইয়া আমার অন্তঃপুরস্থ সীমন্তীনীগণের সুরত-শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু অপনীত করিবে? এবং কতদিনেই বা আমি কর্পূর ও চন্দনাদি দ্বারা পুরন্ধ্রীবর্গের মুখমণ্ডল সুশোভিত ও নির্ম্মল যশোদ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুপ্রকাশিত করিব?[১১,১৩]

লীলে! ধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কেবল ঐ প্রকার চিন্তায় অর্থাৎ সঙ্কল্পে কালযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। * অনন্তর যেমন হিমরূপ অশনি সলিলস্থিত অম্ভোজ-দিগকে জর্জ্জরীভূত করে, সেইরূপ, তিনি কালক্রমে জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিলেন[১৪,১৫]। তখন তদীয় ভার্য্যা স্বামীর মৃত্যু সন্নিহিত দেখিয়া বসন্তকালীন লতা যেমন আসন্ন গ্রীষ্মের ভয়ে ম্লান ভাব অবলম্বন করে, তদ্রূপ, দিন দিন ম্লানা হইতে লাগিলেন[১৬]।

লীলে! সেই বরাঙ্গনা অমরত্ব সুদুর্লভ জানিয়া তোমার ন্যায় আমার আরাধনা করতঃ আমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে "দেবি! আমার স্বামীর মৃত্যু হইলে, যেন তাঁহার জীব আমার এই মণ্ডপ হইতে বহির্গত না হয়।" অনন্তর আমিও "তাহাই হইবে," বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়াছিলাম[১৭,১৮]। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ কালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তদীয় পূর্ব্ববাসনাবিশিষ্ট অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবাকাশ সেই গৃহাকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং উৎকট পূর্ব্বসঙ্কল্পের প্রভাবে তিনি সেই আকাশেই দেবমানুষশক্তিসম্পন্ন ত্রিভুবন-জয়ী রাজা হইলেন[১৯,২০]। তিনি স্বপ্রভাবে পৃথিবী জয়, প্রতাপে স্বর্গ আক্রমণ, ও দয়ায় পাতালতল পালন করতঃ ত্রিলোকজয়ী হইলেন[২১]। তিনি তখন শত্রুরূপ আধিব্যাধি বৃক্ষের কল্পাগ্নি, কামিনীগণের মকরকেতন, বিষয়রূপ বায়ুর সুমেরু, সাধুরূপ সরোজের দিবাকর, সকল শাস্ত্রের আদর্শ, অর্থিগণের কল্পপাদপ, ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় ও অমৃত জ্যোতিঃ নিশাকরের পূর্ণিমাতিথিরূপে কালাতিপাত করিতে লাগি

* অর্থাৎ তদবধি তাঁহার সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম ঐ কামনায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

লেন[২২।২৩]। ব্রাহ্মণ মৃত হইয়া অর্থাৎ ভৌতিক স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশে সেই দিনে আপনার পূর্ব্বসঙ্কল্পসংস্কার প্রদীপ্ত চিত্তাকাশময় শরীরে সুতরাং আকাশতুল্য শরীরে ঐরূপ রাজা হইলেন, ও ঐরূপ রাজত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন, (কেবল বিবাহ বাকি রহিল)[২৪]। এ দিকে তাঁহার পত্নী পতিবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতরা হইলেন। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক মাসশিম্বির ন্যায় দ্বিধা হইয়া গেল অর্থাৎ ফাড়িয়া গেল; সুতরাং তিনিও প্রায় ভর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় আধিভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আতিবাহিক দেহে * তাঁহার সেই আকাশরূপী ভর্ত্তার সন্নিহিতা হইলেন এবং সমুদায় শোক বিস্মৃতা হই-লেন[২৫।২৬]। নদী যেমন নিম্নবাহী হইয়া সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ, তিনিও অনুগমনের দ্বারা ভর্ত্তার সমীপস্থা হইলেন। এবং বাসন্তীলতিকার ন্যায় হর্ষোৎফুল্লা হইলেন[২৭]। আজ্ আট দিন গত হইল, সেই ব্রাহ্মণ দম্পতী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানে (সেই গিরিগ্রামে) তাঁহা-দের সেই গৃহ, সেই ভূমি, সেই সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও ধনাদি সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে। এবং তাঁহাদের জীবাত্মাও তাঁহাদের সেই গৃহ মণ্ডপে রহিয়াছে ও তথায় তাঁহারা ঐরূপ রাজা ও রাণী হইয়াছেন[২৮]।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

* আতিবাহিক দেহ=জীব যে দেহে পরলোকে যায় সেই দেহ বা ভাবময় দেহ।

বিংশ সর্গ।

—*—

দেবী বলিলেন, অঙ্গনে! সেই ব্রাহ্মণ—যে ব্রাহ্মণ আজ্ আট দিন হইল, রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন—তিনিই তোমার স্বামী এবং তাঁহার যে অরুন্ধতী নাম্নী ভার্য্যা, সেই ভার্য্যা তুমি। তোমরাই ইতঃপূর্ব্বে চক্রবাকমিথুনসদৃশী বিপ্রদম্পতী ছিলে, সম্প্রতি তোমরা পৃথিবী-জাত হরপার্ব্বতীর ন্যায় এই রাজত্ব করিতেছ।

হে চারুহাসিনি লীলে! পূর্ব্বসৃষ্টি যে প্রকারে ভ্রমময়—তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। উভয় সৃষ্টিই স্বপ্ন তুল্য ও প্রাতিভাসিক। সমস্তই জীবের স্বরূপে কল্পিতাকারে অবস্থিত১।৩। সেই ভ্রম ইইতে অর্থাৎ পূর্ব্বভ্রম হইতে এতদভ্রম, আবার এতদভ্রম হইতে ভবিষ্যদভ্রম হইবে। সেই সকল ও এই সকল ভ্রম চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ সকল আত্মদৃষ্টিতে অসত্য (মিথ্যা) হইলেও আশ্রয় দৃষ্টিতে সত্য। (আশ্রয়=চেতন আত্মা। তাহা সত্য, সুতরাং তদাশ্রিত এ সকল আমি, এই ভাবে সত্য)। যখন এ রহস্য বুঝিবে তখন আর এ সকল কিছুই দেখা যাইবে না। সেই জন্য বলিতেছি, কেই বা ভ্রান্তিময় এবং কেই বা ভ্রান্তিবর্জ্জিত। অর্থাৎ সংসার, ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি ভ্রান্তি পরিত্যাগে পলায়ন করিয়া থাকে। অধিক কি বলিব, ইহলোক পরলোক সমস্তই ভ্রমবিজৃম্ভিত৪।৫।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! লীলা সরস্বতীর ঐ প্রকার মৃদুমধুর শ্রবণ মোহন বাক্য শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা হইয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর তিনি বিনয়নম্র বচনে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,৬ দেবি! আপনার বাক্য মিথ্যা কি সত্য তাহা আমার বোধগম্য হইতেছে না। যদি আমরাই সেই বিপ্রদম্পতী, তাহা হইলে, কি প্রকারে আপনার বাক্য সঙ্গত হইতে পারে? (সেই ব্রাহ্মণের জীবই বা কোথায় এবং আমরাই বা কোথায়? সেই বিপ্রজীব সেই ক্ষুদ্রায়তন গৃহাকাশে) কিন্তু আমরা এই বিস্তৃত ভূমণ্ডলে। অতএব, তত্রস্থ বিপ্রদম্পতী যে আমরা এবং সেই আমরাই যে রাজত্ব করিতেছি, ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও নিতান্ত

বিরুদ্ধ কথা। আমি যে সমাধিযোগে ভর্ত্তৃরাজ্য দেখিয়াছি, তাহাও যে, এতদগৃহাভ্যন্তরে, সে কথাও অসম্ভব। আমার ভর্ত্তা এক্ষণে যে লোকে আছেন দেখিলাম, কি প্রকারে এতদগৃহ মধ্যে সেই লোকান্তর, সেই পৃথিবী, সেই শৈল ও সেই দশদিক সন্নিবেশ প্রাপ্ত হইতে পারে? তাহার সম্ভাবনাই বা কি? সর্ষপ মধ্যে মত্ত ঐরাবত বদ্ধ, অণুকোটরে মশকের সহিত মহাসিংহের তুমুল সংগ্রাম, ভৃঙ্গশাবক কর্ত্তৃক পদ্মচক্রমধ্যস্থিত সুমেরু শৈলের গ্রাস এবং স্বপ্নদৃষ্ট মেঘের গর্জ্জন শ্রবণে ময়ূরের নৃত্য যেরূপ অসম্ভব, গৃহাকাশমধ্যে পৃথ্বীর ও শৈলাদির অবস্থিতি তদপেক্ষাও অসম্ভব। হে সর্ব্বেশ্বরি! আপনার প্রসাদে কাহারও কোন বিষয়ে উদ্বেগ থাকে না। অতএব, আপনি আমাকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে যোজনা করুন, সন্দেহ দূরীভূত করতঃ আমার উদ্বেগ অপগত করুন[৭।১২]।

সরস্বতী বলিলেন, সুন্দরি! যাহা বলিলাম, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কেন তাহা পুনর্ব্বার বলি, শ্রবণ কর। হে বরাঙ্গনে! "কেহ যেন অনৃত বাক্য না বলে" এ নিয়ম আমাদেরই সংস্থাপিত; সুতরাং আমরা তাহা কি প্রকারে অন্যথা করিতে পারি? বরং অন্য কর্ত্তৃক ঐ নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে আমরা তাহার শাসন করিয়া থাকি। যদি আমাদিগের দ্বারা নিয়তি অর্থাৎ নিয়ম ভেদ প্রাপ্ত হয়, ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আর কে তাহার পালন করিবে?[১৩।১৪]

হে লীলে! গিরিগ্রামবাসী সেই ব্রাহ্মণের জীবাত্মা আকাশ-শরীরে গৃহাকাশে অবস্থিতি করতঃ পূর্ব্বসংসার (পূর্ব্বজন্মাদি) বিস্মরণ পূর্ব্বক রাজবাসনাব্যাপ্ত অন্তঃকরণোপহিত চিদাত্মায় তাদৃশ ব্যোমাকৃতি মহারাজ্য সন্দর্শন করিতেছেন[১৫]। যেমন স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ স্মৃতির লোপ হইয়া যায়, তেমনি, মৃত্যু হইলে জীবের আর পূর্ব্বসংসার অনুভূত হয় না। হে বরাননে! তোমরাও জীব, সে জন্য তোমাদিগেরও প্রাক্তনী স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া অন্য প্রকার স্মৃতি সমুদিত হইয়াছে[১৬]। স্বপ্নে ও মনোরাজ্যে ত্রিভুবন দর্শন যেরূপ, এবং মরুভূমিতে তরঙ্গমালাসমাকুল স্রোতস্বিনী অবলোকন যেরূপ, গৃহাকাশে গৃহাকাশস্থিত ব্রাহ্মণের সশৈলবনপত্তনা পৃথিবী দেখাও সেইরূপ। ক্ষুদ্রতম আদর্শে বৃহত্তম বস্তু ও সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি বৃহৎ ত্রিজগৎ দর্শন যেমন মিথ্যা অর্থাৎ স্বচ্ছতার প্রতিফলন মাত্র, সেইরূপ, তত্রত্য পৃথিব্যাদিও সেই সত্যস্বরূপ চিদ্ব্যোমের প্রতিফলন

মাত্র। সুতরাং উহার রহস্য এই প্রকারে বুঝিতে হইবে যে, নির্ম্মল-ব্যোমরূপী পরমাত্মার অন্তঃক্রোড়ে সমুদায় অসত্য সৃষ্টি সত্যবৎ প্রতিভাত হয় এবং জগৎকে যে সত্য বলিয়া বোধ হয় সে সত্যতা জগতের নহে; সে সত্যতা চিদাত্মার। পঞ্চকোষান্তর্গত চিদাত্মার সত্যতাই তদারোপিত জগতে প্রতিফলিত হয়[১৭।১৯]। হে লীলে! যেমন মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণীর তরঙ্গ সৎ নহে, তদ্রূপ অসত্য স্মৃতি হইতে সমুৎপন্ন এই পৃথ্ব্যাদিও সৎ নহে[২০]। এই যে তোমার গৃহ এবং এই যে গৃহাকাশ, এতন্মধ্যে যে তুমি আমি ও অন্যান্য বস্তু, এখানে যাহা কিছু আছে বা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, স্ব স্ব অনুভবনীয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এ সমস্তই সেই চিদ্ব্যোম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২১]। দৃশ্য-মিথ্যাত্বের উদাহরণ—স্বপ্ন, সম্ভ্রম ও মনোরাজ্য প্রভৃতি। অর্থাৎ স্বপ্নাদিদৃষ্ট জগৎ ও জাগ্রদ্দৃষ্ট জগৎ তুল্যানুতুল্যরূপে মিথ্যা। দীপ যেমন অন্ধকারাবৃত বস্তু বোধের প্রতি মুখ্য প্রমাণ, তেমনি, উক্ত উদাহরণ মূলক অনুমান জগন্মিথ্যাত্ব বোধের মুখ্য প্রমাণ[২২]। হে বরাঙ্গনে! ষট্পদ যেমন পদ্মৈক-দেশে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায়, সেই ব্রাহ্মণের জীব তদীয় গৃহাকাশের কোন এক প্রদেশে (যে প্রদেশে তাহার চিত্ত সেই প্রদেশে) সমুদ্র, বন ও পৃথ্ব্যাদির সহিত অবস্থিতি করিতেছে[২৩]। সেই আকাশের এক কোণে অর্থাৎ সূক্ষ্মতম চিত্তাকাশে এই সাগরাম্বরা পৃথিব্যাদি কেশোণ্ড্রকের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে[২৪]। * হে তন্বি! সেই বিপ্রসদন, সেই তুমি, সেই আমি, এ সমস্তই এক চিদাকাশের অন্তর্গত চিত্তাকাশে কেশোণ্ড্রকের ন্যায় রহিয়াছে। যখন এক ত্রাসরেণুর মধ্যে জগতের অবস্থান সম্ভব হয়, তখন গৃহকাশ মধ্যে তাহার অবস্থান অসম্ভব হইবে কেন? †

লীলা বলিলেন, জননি! অদ্য অষ্টম দিবস হইল, সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখানে বহুকাল অবস্থিতি করিতেছি।

---

* নির্ম্মল আকাশে কখন কখন ভ্রম বশতঃ নীল কুঞ্চিত কেশকলাপাকার পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার নাম কেশোণ্ড্রক। এই কেশোণ্ড্রক মেঘের ছটা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অন্তর্নিরূঢ় বিশ্বচ্ছবি তাহারই অনুরূপ অর্থাৎ তাহার ন্যায় অলীক ও চিদ্ভ্রান্তির প্রতিচ্ছায়া।

† ত্রাসরেণু শব্দের অর্থ এখানে মন। নৈয়ায়িকেরা মন'কে পরমাণু তুল্য বলেন। মনোমধ্যে এমন লক্ষ লক্ষ জগৎ সহজেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। যখন এত বড় পৃথিবী মনোমধ্যে দেখা যায় তখন ইহা অপেক্ষাও অনেক ও বড় পৃথিবী দেখা না যাইবে কেন?

সই কারণে বলিতেছি, কি প্রকারে উহা সম্ভব হইতে পারে? দেবী কহিলেন, বৎসে! যেমন দেশের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব নাই, তেমনি, কালেরও হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব নাই। কেন নাই তাহা বলি, শ্রবণ কর[২৭।২৮]। যেমন জগৎ এক প্রকার প্রতিভাস মাত্র, অন্য কিছু নহে (জ্ঞানের প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে), তেমনি ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, মাস, অব্দ, যুগ, কল্প, এ সকলও বোধপ্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। (অভিপ্রায় এই যে, কেবল মাত্র ভ্রান্তির দ্বারাই দেশ ও কাল ও তাহাদের হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অল্পক্ষণও বহুশত বর্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, ভ্রান্তিসময়ে অল্পকালও বহুকাল বলিয়া বোধ হয়)। লীলে! ক্ষণাদি কল্পান্ত কাল, তদন্বিত ত্রিজগৎ, তন্মধ্যবর্ত্তী তুমি আমি প্রভৃতি, এ সমস্তই আত্মসমুদ্ভূত প্রতিভাস (ভ্রান্তিজ্ঞান)। যে ক্রমে এ সকল উৎপন্ন ও উপপন্ন হয় সে ক্রম আমি তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর[২৯।৩০]। হে সুব্রতে। জীব ক্ষণকাল মাত্র মিথ্যা মরণ মূর্চ্ছা অনুভব করতঃ প্রাক্তনভাব বিস্মৃত হইয়া অন্য এক প্রকার ভাব (সংসার) অনুভব করে[৩১]। তখন সেই ব্যোমাকার কল্পিতাকৃতি জীব পূর্ব্ব কর্ম্মাদি সংস্কারের উদ্বোধ অনুসারে অনুভব করিতে থাকে, "এই দেহ আমার আধার;" আমি হস্তপদাদিবিশিষ্ট, এবং আমি এই দেহা-ধারের আধেয়, ইহাতে আমি অবস্থিতি করিতেছি, আমি এই পিতার পুত্র, আমার এই পরিমিত বয়স; এই আমার রমণীয় বান্ধব কুল, এই আমার মনোরম আস্পদ (গৃহ), আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, এখন আমি যুবা হইয়াছি, আবার বৃদ্ধ হইব," ইত্যাদি[৩২।৩৫]।

হে লীলে! চিত্তাকাশের প্রভাব হেতুক ঐ প্রকার বিভ্রম অর্থাৎ আপনাতেই ঐ ঐ ভ্রান্তিজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় হয়, তেমনি পরলোকাবস্থাতেও হয়। সেই জন্যই বলিয়াছি, দ্রষ্টা ও দৃশ্য সমস্তই চিৎ। বস্তুতঃই এ সকল নির্ম্মল ব্যোম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেই সর্ব্বগা অদ্বিতীয়া চিৎই স্বপ্নদ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপে বিকসিত হন। তিনি যেমন স্বপ্নে সমুদিত হন, তেমনি পরলোকেও সমুদিত হন। পর-লোকে যেরূপ সমুদিত হন, ইহলোকেও সেইরূপ সমুদিত থাকেন। যেমন জল, বীচি, তরঙ্গ, তিনের প্রভেদ নাই, সেইরূপ, ইহলোক, পরলোক ও স্বাপ্নলোক, এ তিনেরও কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। প্রভেদ বোধ ভ্রান্তির

মহিমা। যেহেতু জগদ্ভাব ভ্রান্তিবিশেষের ক্রীড়া, সেইহেতু তাহা নাই। নাই বলিয়াই বিশ্ব অজাত এবং অজাত হেতুক অনশ্বর। এ সমুদায় স্বরূপতঃ চিৎ। কিছুই চিতের অতিরিক্ত নহে। চিৎ সকল অবস্থাতেই ব্যোমস্বরূপ। সেই কারণে তাহার সহিত ব্যোমরূপ মনের অভেদ[৩৬।৪১]।

হে লীলে! দৃশ্য সকল দ্রষ্টায় আরোপিত রূপে অবস্থিত, বস্তুসৎ রূপে অবস্থিত নহে। শুক্তিরৌপ্য যে ভাবে অবস্থিত, সেই ভাবে অবস্থিত। সেইজন্য আরোপিত দৃশ্যের দ্বারা চিদাকাশের বিকৃতি হয় না। যদ্রূপ তরঙ্গ জলের অনতিরিক্ত, তদ্রূপ, এই আরোপিত সৃষ্টিও চিদাকাশের অনতিরিক্ত[৪২]। যেমন জল হইতে পৃথক্, এরূপ তরঙ্গ নাই। এবং তরঙ্গ যেমন নিত্যমিথ্যা, তেমনি, চিদাকাশ হইতে পৃথক্ সৃষ্টি নাই এবং তাহা নিত্যমিথ্যা। একমাত্র চিদাকাশই স্বকীয় স্বভাবে (মায়িক আবরণে) জগদাকারে বিভাবিত হইতেছেন। সেইজন্যই বার বার বলিতেছি, দৃশ্য পরমার্থিকরূপে নাই। জীবের মরণমোহের পর নিমেষ মধ্যেই দেশ ও জগদ্রূপ দৃশ্যশ্রী দর্শন হইয়া থাকে। তাহা পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারী। অর্থাৎ জীব পূর্ব্বে যেমন কাল, যেমন আরম্ভ ও যেমন ক্রমে জগৎ দেখিয়াছিল, অবিকল তদনুযায়ী ক্রমে দৃশ্য দর্শন করে। সেই চিদ্বপুঃ জীব পূর্ব্বের ন্যায় "আমি জন্মিয়াছি" "এই আমার মাতা, এই আমার পিতা, আমি বালক" ইত্যাদি প্রকার অনুভব করে। তাহা তাহার পূর্ব্বস্মৃতি বলে সমুদিত হয়[৪৩।৪৭]। যেমন হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রিকে দ্বাদশ বৎসর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এবং যেমন কান্তাবিরহিত ব্যক্তি এক দিবসকে এক বৎসর বোধ করে, তাহার ন্যায় নিমেষমাত্র কাল তাহার নিকট কল্প বলিয়া অনুভূত হয়। তখন তাহার অভুক্ত ব্যক্তির ভোজনভ্রান্তির ন্যায় আমি জাত, আমি মৃত, এই আমার পিতা, এই আমার মাতা, এইরূপ এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্না হয়। হে লীলে! মরীচিকার অন্তর্গত তীক্ষ্ণতার ন্যায় ও স্তম্ভের অন্তর্গত অরচিত পুত্রিকার ন্যায় এই দৃশ্য সমূহ সেই অজে নিহিত রহিয়াছে বটে; পরন্তু তাহা পৃথক্ সত্তায় নাই। সমস্তই ব্রহ্মের স্বাশ্রিত ও স্ববিষয়ক অজ্ঞানের বিলাস[৪৮।৫৪]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, বৎসে! যেমন চক্ষু উন্মীলন করিলে শ্বেত পীতাদি নানা বর্ণ[১] দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি, জীবের মরণমূর্চ্ছার পরেই পর-জগৎ (পরলোক) দর্শন হইয়া থাকে। দিক্, কাল, আকাশ ও ধর্ম্মকর্ম্মময় সৃষ্টি এবং কল্লান্তস্থায়ী বস্তু তাহার চিদাত্মায় প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। (ধর্ম্মময় সৃষ্টি স্বর্গাদি, কর্ম্মময় সৃষ্টি গৃহাদি ও কল্লান্তস্থায়ী বস্তু পৃথিবী পর্ব্বতাদি)[১]। কস্মিন কালেও কেহ আত্মমরণ দেখে নাই। না দেখি-লেও স্বপ্নে যেমন আত্মমরণ দেখা যায়, সেইরূপ, জীবগণ মৃত্যুর পরে জগৎ (স্মৃতিময় বা বাসনাময়) দর্শন করে[২]। হে তন্বি! "এই জগৎ, এই সৃষ্টি" এ সকল মায়াকাশে কাল্পনিক নগরীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে[৩।৪]। আছে, হইতেছে, যাইতেছে, এ সমস্তই বাসনাবিশেষের বিস্তার, অন্য কিছু নহে। দূব, নিকট, কল্প, যুগ, বৎসর, মাস, এ সমস্তই বিপর্য্যয়ের অর্থাৎ ভ্রমের রূপ[৫]। অনুভূত ও অননুভূত উভয় প্রকার দর্শনই চিৎস্বরূপে অবস্থিত ও চিৎস্বরূপে প্রবর্ত্তিত[৬]। যাহা কখন অনুভূত হয় নাই তাহাকেও "ইহা আমার অনুভূত" এরূপ ভ্রম হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত স্বাপ্ন ভ্রম তাহার দৃষ্টান্ত[৭]। এই বাসনা-পুঞ্জাত্মক সংসার প্রথমে প্রজাপতির জ্ঞানে বাসনার আকারে অবস্থিত ছিল, পরে তাহাই স্থূলতায় পরিণত হইয়া বিভক্তক্রমে প্রকাশ পাই-তেছে[৮]। এই ত্রিভুবনাদি দৃশ্যজাত কাহার অনুভূত রূপে, কাহারও বা অননুভূতরূপে স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, এবং কাহার বা বিনা সংস্কারে আকস্মিক রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। * হে বালে! এই বাসনাময় সংসারের যে অত্যন্ত বিস্মৃতি তাহাই মোক্ষ। সেইজন্য ইহাতে (সংসারে) পারমার্থিক প্রার্থনীয় অপ্রার্থনীয় কিছুই নাই[৯।১১]। আমিত্ব ও জগৎ

---

* অভিপ্রায় এই যে, অনুভূত পদার্থই স্মৃত্যাকারে প্রতিভাত হইবে, অননুভূত দেখা যাইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। প্রজাপতি আপনার প্রজাপতিত্ব পূর্ব্বে কখন অনুভব করেন নাই, অথচ তাহা সৃষ্টি সমকালে অনুভব করেন।

উভয়ের অবস্থিতি অবিদ্যামূলা। সুতরাং তাহার অর্থাৎ অবিদ্যার (আত্মবিষয়ক মিথ্যা জ্ঞানের) আত্যন্তিক বিনাশ ব্যতীত নিত্যসিদ্ধা মুক্তির সম্ভাবনা কি?[১২]। সর্প শব্দ ও সর্পশব্দের অর্থ যাবৎ রজ্জুরূপে অবস্থান করিবে তাবৎ সর্পভয় অনিবারিত থাকিবেক[১৩]। যোগাদির দ্বারা যে বিশ্বের শান্তি, (বিশ্বের বিস্মরণ), তাহাকে সম্পূর্ণ শান্তি বলা যায় না। যেমন মূঢ় ব্যক্তিরা এক পিশাচের পরিত্যাগে অন্য পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তেমনি, সমাধি হইতে উত্থিত হইলে তাহাদের পুনর্ব্বার সংসারান্তর হইয়া থাকে। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করা নিতান্ত অসম্ভব জানিবে[১৪]। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখন নিশ্চয় হয়, সংসার পরম পদের বিবর্ত্ত মাত্র; সুতরাং যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে সমস্তই পরম পদ (ব্রহ্ম)। সংসারের উপাদান অজ্ঞান, তাহার বিনাশে ঐরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে[১৫]।

লীলা বলিলেন, দেবি! আমি আপনার প্রসাদে পরমাশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি আপনি আমার বক্ষ্যমাণ উৎকণ্ঠা বিনাশ করুন। আপনি বলিলেন যে, সৃষ্টি বা জগৎ দর্শনের প্রতি পূর্ব্বসংস্কারই কারণ। কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীরূপ সৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহার সংস্কার আমার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কৈ! আমি-ত পূর্ব্বে আর কখন ঐরূপ সৃষ্টি দেখি নাই? অনুভবও করি নাই?[১৬]। দেবী বলিলেন, লীলে! বাসনা সৃষ্টিকারণ বটে; পরন্তু তাহা সংস্কাররূপিণী নহে। অর্থাৎ কেবল পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারই যে সৃষ্টি দর্শনের কারণ তাহা নহে। মায়া নামক বাসনা বিশেষও সৃষ্টির কারণ, তাহা তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও বলিতেছি। ভাবিয়া দেখ, আদি পিতামহ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি সমূহের জ্ঞান বিদ্যমান থাকায় সমুদায় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি তদ্বাসনা প্রভব, ইহা সুসম্ভব হইতে পারে কিন্তু তাহা তদীয় দেহাদি সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। পূর্ব্বকল্পীয় ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায় তাঁহার ঐ সংস্কার অভাবগ্রস্ত, সেজন্য তদীয় সংস্কারও এতৎকল্পীয় ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ নহে[১৭]। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, মায়ায় পূর্ব্বকল্পীয় হিরণ্যগর্ভের দেহাদির বাসনা বা সংস্কার সংলগ্ন হইয়া ছিল, সেই মায়া এতৎকল্পে স্বোপহিত চৈতন্যকে অভিনব পদ্মযোনি ব্রহ্মাকারে বিবর্ত্তিত করিয়াছে[১৮]। এবংক্রমে ও কাকতালীয় ন্যায়ে পূর্ব্ব প্রজাপতি হইতে

অন্য প্রজাপতি উৎপন্ন হয়। সে প্রজাপতিও প্রতিভাময় অর্থাৎ শুদ্ধ-চেতন। তদ্দৃষ্টিতে তাঁহার ও সৃষ্টির সত্যতা প্রতিভাত হয় না। তাঁহার এই মাত্র প্রতিভা স্ফুরিত হইতে থাকে যে, আমি প্রজাপতি হইয়াছিলাম[১৯]। লীলে! সৃষ্টি সকল ঐরূপে অর্থাৎ মিথ্যাভাবে চৈতন্যাকাশে উদিত হয়, দৃষ্ট হয়, অথচ সত্যরূপে কোন কিছু হয় না বা জন্মে না[২০]। পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারজা স্মৃতির ও অনাদি অনির্ব্বাচ্য হিরণ্যগর্ভের অবিদ্যাশক্তি নাম্নী মূল বাসনার উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ মায়াবিশিষ্ট মহাচৈতন্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম[২১]। * ইহা কার্য্য, ইহা কারণ, এ ভাব বিশুদ্ধ ব্রহ্মে নহে; কিন্তু মায়ান্বিত ব্রহ্মে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মে সকল কল্পনার অভাব দৃষ্ট হয়। অবিচারময়ী মায়া তিরোহিত হইলে কার্য্য, কারণ, সহকারী, সমস্তই এক হইয়া যায়। তোমার স্বরূপ মহাচৈতন্য। তোমাতে যে স্মরণকারী অন্তঃকরণ সংলগ্ন আছে, সেই অন্তঃকরণ সৃষ্টি দর্শনের মুখ্য কারণ। পরন্তু তাহা নাম মাত্রে আছে, বস্তুগতিতে নাই[২২]। সেইজন্যই বলিয়াছি ও বলিতেছি, এই জগদাদি কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। আপনাতে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যরূপ মহাকাশে চৈতন্যাকাশই অবস্থিত আছে, অন্য কিছু নাই[২৩।২৪]। লীলা বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি কৌতুক! হে দেবি! আপনি আমাকে অদ্ভুত জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করিলেন। কিন্তু হে দেবি! যাবৎ আমার এই জ্ঞান দৃঢ় না হয় তাবৎ আপনি আমাকে নিঃশঙ্কা করুন। আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে, তাহা সফল করুন। ব্রাহ্মণ যে স্থানে স্বীয় পত্নীর সহিত অবস্থিতি করিতেছেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তথায় লইয়া চলুন; আমি তাঁহাদিগের সেই সর্গ ও সেই গৃহ প্রাতঃকালে চক্ষুঃ যেমন আলোকের সাহায্যে জগদ্দর্শন করে, তেমনি আমিও দর্শন করিব। আমি আপনার সাহায্যে সেই গিরিগ্রাম দেখিব, দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইব[২৫।২৭]।

---

* দেবী লীলার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর যাহা দিলেন, তাহার সার সঙ্কলন এই যে, পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারের প্রভাবে পূর্ব্ব সদৃশ দর্শন হয় এবং মূল মায়ার প্রভাবেও অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দেখা যায়। তুমি যে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপ সৃষ্টি দেখিয়াছ, তাহা তোমার পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কার মূলক নহে। তাহা তোমার আত্মাশ্রিত মূল অজ্ঞানের প্রভাব। মূলে আত্মভ্রান্তি থাকিলে যে কত শত অনির্ব্বাচ্য অননুভূত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব দেখা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

দেবী বলিলেন, লীলে! যদি সমাধির দ্বারা এই ভৌতিক দেহ বিস্মৃত হইয়া সেই অচেত্যচিদ্রূপময়ী পবিত্র দৃষ্টি অর্থাৎ প্রচুর চৈতন্য স্ফূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অমলা হইতে পার, তাহা হইলে চিদাকাশস্থিত সেই ব্যোমাত্মস্বরূপ সাত্বিক সর্গ দর্শন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই[২৮।২৯]। অপিচ, তুমি তাহা পারিলে, তুমি ও আমি, আমরা উভয়েই সেই সর্গ দর্শন করিতে পারিব। পরন্তু তোমার এই দেহ সেই সর্গ দর্শনের মহান্ প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ দেহ জ্ঞান থাকিলে তাহা পরলোক দর্শন দ্বারের অর্গল[৩০]। লীলা কহিলেন, পরমেশ্বরি! এই দেহ দ্বারা কি নিমিত্ত অন্য জগৎ দর্শন করিতে পারা যায় না তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া যুক্তি সহকারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৩১]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! এই সমুদয় জগৎ বস্তুতঃ অমূর্ত্ত। পরন্তু মোহের বশে তোমরা মূর্ত্ত বলিয়া বোধ কর। যেমন সুবর্ণ অঙ্গুরীয়-কাদিরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ, প্রকৃত বোধের অভাবে আপনাতে এই জগৎ মূর্ত্তিমান্‌রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে[৩২]। সুবর্ণ অঙ্গুরীয়াকার ধারণ করিলেও যেমন তাহার অঙ্গুরীয়কত্ব নাই, তদ্রূপ, জগৎ প্রতিভাত হইলেও পরব্রহ্মে ইহার সত্তা নাই। ফলতঃ যাহা যাহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে; সমস্তই সেই ব্রহ্ম। তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছু নাই। মায়া যেমন সমুদ্রেরও কুল দর্শন করায়, তেমনি, অমূর্ত্ত ব্রহ্মেও মূর্ত্ত জগৎ দর্শন করায়। প্রপঞ্চ মিথ্যা এবং একাদ্বয় ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ আমি মাত্র সত্য, এ বিষয়ে বেদান্ততাৎপর্য্যব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ, গুরু ও ব্রহ্মজ্ঞগণের অনুভব প্রমাণ[৩৩।৩৫]। ব্রহ্মই ব্রহ্ম দর্শন করেন। যে ব্রহ্ম নহে, সে ব্রহ্ম দেখিতে পায় না। অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মত্বজ্ঞানই ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মভিন্নত্ব জ্ঞান (আমি অন্য, ব্রহ্ম অন্য, এ জ্ঞান) ব্রহ্মদর্শন নহে। ব্রহ্মের স্বভাব এই যে, তিনি স্বকল্পিত সৃষ্ট্যাদির নামে প্রথিত হন। অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-সত্তা মায়ার আবরণে আবৃত হইলেই তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি প্রকাশ পায়[৩৬]। ব্রহ্মে কোনও প্রকারে বাস্তব কার্য্যের ও কারণের উদয় (উৎপত্তি) হয় না। তিনি সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার সহকারী কারণের অভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ জগতেও বস্তুতঃ কার্য্যকারণভাব নাই। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের অনতিরিক্ত[৩৭]। হে অঙ্গনে! অভ্যাসযোগ দ্বারা যাবৎ না তোমার ভেদবুদ্ধি শমতা প্রাপ্ত হইবে, তাবৎ তুমি ব্রহ্মরূপিণী

হতে পারিবে না। অপিচ, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকায় পরব্রহ্ম দর্শনে র্থ হইবে না[৩৮]। আমরা যদি অভ্যাস বৈরাগ্যাদির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কারের ব্রহ্ম দর্শনে দৃঢ় ব্যুৎপন্না হই, তাহা হইলে ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়া হ্ম দর্শন করিতে পারি[৩৯]। বৎসে! আমার এই শরীর সঙ্কল্প নগরের য় ও শুদ্ধচিত্তাকাশ ময়। সেইজন্য আমি এতদ্দেহের অন্তরে পরম দ ব্রহ্ম দেখিতে পাই[৪০]। লীলে! অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদি না থাকায় তোমার আকার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এখনও তোমার অন্তঃকরণে দাভাস (জীবভাব) নিরূঢ় আছে। অর্থাৎ এখনও তুমি আপনাকে দ্র ও অজ্ঞ জীব বলিয়া জানিতেছ। সেই কারণে তুমি তাহা (ব্রহ্ম, রলোকাবস্থিত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ও তাহাদের আবাস) দেখিতে সমর্থ [৪১।৪২]। তুমি যখন নিজ দেহে নিজের সঙ্কল্পিত নগর দেখিতে পাও , তখন কি প্রকারে অন্যের সঙ্কল্পিত সৃষ্টি দেখিতে সমর্থা হইবে?[৪৩] লীলে! সেইজন্যই বলিতেছি, তুমি এই দেহ (দেহের অভিমান) রিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশরূপিণী হও। যদি তাহা পার, তাহা হইলে ই মুহূর্ত্তেই সে সমুদায় দেখিতে পাইবে[৪৪]। অতএব, যাহাতে তুমি তদ্দেহ (দেহে আত্মাভিমান) পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশরূপিণী হইতে র, শীঘ্র তাহার জন্য যত্নবতী হও। সঙ্কল্পিত নগরের ব্যবহার ও পভোগ বিষয়ে সঙ্কল্পই অর্থক্রিয়াকারী হয়, অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ নস শরীরেই মানস নগর সন্দর্শন করা যায়, পার্থিব শরীরে নহে[৪৫]।

লীলা বলিলেন, দেবি! আপনি কহিয়াছেন যে, আমরা উভয়েই ই দ্বিজদম্পতীর সংসারে গমন করিব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমি ন এই দেহ এই স্থানে স্থাপিত করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তদেহ অবলম্বন র্ব্বক সেই পরলোকে গমন করিব। পরন্তু হে দেবি! আপনি কি কারে গমন করিবেন তাহা আমাকে বলুন[৪৬।৪৮]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! যেমন তোমার অন্তঃস্থ সাঙ্কল্পিক বৃক্ষ থাকি- ও নাই, তেমনি, আমার দেহ তোমার দৃষ্টিতে থাকিলেও আমার ষ্টিতে নাই। যাহা কুড্যের ন্যায় মূর্ত্ত তাহাই মূর্ত্ত কুড্য ভেদ করে, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত প্রতিবন্ধী হয় না[৪৯]। আমার এই দেহ একমাত্র সত্ত্বগুণ রা নির্ম্মিত এবং ইহা সেই চিৎস্বরূপের প্রতিভাস মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত ইহার অত্যল্প প্রভেদ। (যেমন সূত্রভস্ম সূত্রাকারে দৃষ্ট

হইলেও তাহা সূত্র নহে, তেমনি, আমার এই দেহও দেহ নহে) সেই কারণে আমার দেহ পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইবে না আমি এতদ্দেহেই অভিলষিত স্থানে যাইব। যেমন অনিল গন্ধের সহিত সলিল সলিলের সহিত, অনল অনলের সহিত এবং বায়ু বায়ুর সহি মিলিত হয়, তেমনি, আমার এই মনোময় দেহও অন্য মনোময় দেহে সহিত মিলিত হইবে[৫০।৫২]। পার্থিবতাজ্ঞান কখন অপার্থিব-জ্ঞানের সহি মিলিত হয় না। কোথায় দেখিয়াছ যে, কাল্পনিক শৈল ও প্রকৃত শৈ উভয়ে পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে?[৫৩] যদ্যপি দেহ মাত্রেই মূ আতিবাহিক অর্থাৎ মনোময়, তথাপি, চিরকাল তাহাকে আধিভৌতি জ্ঞানে ভাবিয়া আসিয়াছ এবং সেই ভাবনায় উহা পার্থিব অর্থা ভৌতিকপ্রায় হইয়া গিয়াছে। ভাবনার প্রভাবে যে ভাব-শরীর নিষ্প হয় তাহার নিদর্শন বা দৃষ্টান্ত—স্বপ্ন, দীর্ঘকাল ধ্যান, * ভ্রম, মনোরাজ্য গন্ধর্ব্বনগর দর্শন[৫৪।৫৫]। অতএব হে বৎসে! যখন তোমার বাসনা সক ক্ষীণ হইবে, তখন তোমার এই স্থূল দেহ পুনর্ব্বার সমাধি অভ্যাসে দ্বারা আতিবাহিকে পরিণত হইবে[৫৬]।

লীলা বলিলেন, দেবি! আতিবাহিক-দেহত্ব-জ্ঞান সমাধি প্রভৃতি দ্বারা সুদৃঢ় হইলে তখন এ দেহ কি হয়? বিনষ্ট হইয়া যায়? বি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়?[৫৭] দেবী বলিলেন, হে পুত্রি! যাহা সত্য সত্য আছে, তাহাতেই নাশ হওয়া না হওয়ার ব্যবস্থা। যাহা আদৌ নাই তাহার আবার নাশ কি? রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় তাহা তিরোহি হইলে, "সর্প কোথায় গেল, মরিয়া গেল কি অন্যথা হইল" এ সকল কথ যেরূপ, তেমনি, আতিবাহিক জ্ঞানের স্থিরতায় আধিভৌতিক দেহ কি হয় কোথায় যায়, এ কথাও (প্রশ্নও) সেইরূপ[৫৮।৫৯]। প্রকৃত প্রত্যুত্তর এ যে, যেমন সত্যবোধ সমুদিত (রজ্জুজ্ঞান) হইলে রজ্জুতে সর্পজ্ঞা থাকে না, তেমনি, আতিবাহিক ভাবের উদয় হইলে তখন আ ইহার আধিভৌতিকতা থাকে না[৬০]। তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে

---

* ভাবশরীর=মনঃকল্পিত দেহ। মানুষেরাও স্বপ্নে মনের কল্পনায় আপনাকে ব্যা শরীরী দেখে। দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেও মন তন্ময় হইয়া যায় তাহাতে সে আপনাকে তন্ম দেখে। তেলাপোকা কাঁচপোকার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করে ও ভয়ে মনোমধ্যে কেব কাঁচপোকা দেখিতে থাকে। তৎক্রমে সে অল্প দিন পরে কাঁচপোকা হইয়া যায়।

সকল যদি কাল্পনিক হয় তবে অবশ্যই উপদেশ দ্বারা কল্পনার তরোধান সাধিত হইবে। যাহা বাস্তবরূপে নাই (ব্রহ্মে) তাহা অতীব চ্ছ[৬১]। ভদ্রে! আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেহাদি সমস্তই পরব্রহ্মে রিপূর্ণ। সেই কারণে আমরা যাহা পরম সত্য তাহা দেখিতে পাই। স্তু তোমার তদ্রূপ জ্ঞান নাই। তদ্রূপ জ্ঞান (পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞান) না াকাতেই তুমি পরম সত্য ব্রহ্ম দেখিতে পাও না[৬২]। যদি বল, চিৎ- ত্ব অদৃশ্য, কিরূপে তাহা দৃশ্যস্বভাব প্রাপ্ত হইল, তদুত্তরার্থ বলি- তছি, প্রথম সৃষ্টিতেই অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি সমকালেই চিতের চিত্ত ামক ধর্ম্ম (চিতের পরিস্ফুরণের বিষয় বা আধার) প্রকটিত হইয়া- ছল, তদবধি একই সত্তা দৃশ্যের অনুরোধে ভ্রান্ত হইয়া (যেমন একই ন্দ্র জলাশয়ের বহুত্ব অনুসারে বহুর ন্যায় হয় তেমনি কাল্পনিক বহু শ্য প্রতিবিম্বিত হওয়ায় একাদ্বয় ব্রহ্ম ও দৃশ্য অনুসারে দৃশ্য হন) াশ্রিত বিবিধ দৃশ্য দেখিয়া বা প্রকটিত করিয়া আসিতেছে[৬৩]।

লীলা অসহায় একাদ্বয় পদার্থের বহুভাব হওয়া অসম্ভব শঙ্কা করতঃ জ্ঞাসা করিলেন, দেবি! বিভাগের অবিষয়ীভূত শান্তস্বরূপ সেই ক মাত্র পরম তত্ত্ব বিদ্যমান, আর সব অবিদ্যমান। এমত স্থলে ল্পনার অবসর কোথায়? (যে কিছু বিকৃত হয় ও বহু হয়, সমস্তই ন্যের সাহায্যে। একাদ্বয় পদার্থের সহায় কোথায়? সহায় থাকা ীকার করিলে একাদ্বয় বলা সঙ্গত হইবে না)[৬৪]।

দেবী বলিলেন, লীলে! যেমন হেমে কটকতা, জলে তরঙ্গতা এবং প্ন ও সঙ্কল্প নগরাদিতে সত্যতা নাই, সেইরূপ, পরব্রহ্মেও কল্পনা সৃষ্টি) নাই। নাই বলিয়াই সত্যবোধ সমুদিত হইলে পরব্রহ্মে বিভিন্ন প্রকারের কল্পনা তিরোহিত হয়। হে বালে! সেই কল্পনারহিত, াস্তস্বরূপ একমাত্র অজ পরমাত্মা সদা ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে[৬৫।৬৬]। যমন আকাশে ধূলি নাই, তেমনি, পরব্রহ্মে কোন প্রকার বিকার া উৎপত্তি নাই। তাহা শান্ত শিব এক অজ ও অনুৎপত্তিস্বভাব[৬৭]। য কিছু ভাসমান সমস্তই নিরাময় ব্রহ্ম। প্রতিভাস ভাসকের অনতি- রিক্ত। অর্থাৎ মণির প্রতিচ্ছায়া মণি হইতে পৃথক্ বস্তু নহে[৬৮]।

লীলা কহিলেন, দেবি! আমরা এতাবৎ কাল কি নিমিত্ত দ্বৈতাদ্বৈত পরিজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছি? কে আমাদিগকে দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনায়

ভ্রান্ত করিয়াছে? দেবী কহিলেন, তরলে! তুমি এতাবৎ কাল অবিচা রূপ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া ব্যাকুলা ছিলে। যে অবিচার তোমাবে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে সেই অবিচার সদ্বিচার দ্বারা নিমেষ মধ্যে বিনা হইতে পারে। পরন্তু সে অবিদ্যাও অনন্ত ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত নহে অবিচার, অবিদ্যা, বন্ধন এবং নিরাবাধ মোক্ষ, এ সমুদায়ের কিছু নাই। আছে কেবল শুদ্ধবোধ এবং তদ্দ্বারা এই জগৎ পরিব্যা রহিয়াছে[৭১।৭২]। বৎসে! তুমি এ পর্য্যন্ত বিচারপরায়ণা হও নাই বলিয়া ভ্রান্তির দ্বারা ভ্রামিতা ও সমাকুলা হইতেছিল। এখন তোমার চি বাসনাক্ষয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছে, এখন তুমি প্রকৃষ্ট বোধ লাভ করি য়াছ, বিবেক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ ও বিমুক্তবন্ধনা হইয়াছ অর্থা তোমার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে[৭৩।৭৪]। সংসার নামক দৃশ্য আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, ইহা যখন বুঝিয়াছ, তখন আর এতদ্দ্বারা তোমা দ্বৈতবাসনা উৎপন্ন হইবে না। নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় চি একমাত্র পরব্রহ্মে নিরূঢ় হইলে, দ্রষ্টৃ দৃশ্য ও দর্শন অভাব প্রাপ্ত হই যায়। তখন এই হৃদয়ক্ষেত্রে বাসনাক্ষয়াত্মক বীজ থাকিলেও তা দগ্ধকল্প হয়, আর তাহা অঙ্কুরিত হয় না। কিঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইলে তাহা তৎপরিপাক কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। বাসনাক্ষয় হইলেই রা দ্বেষাদি তিরোহিত ও সংসারভাব নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং সংসারভা তিরোহিত হইলেই অমল প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। হে লীলে! তু উপদিষ্ট প্রকারের সমাধি অভ্যস্ত করিতে পারিলে নিশ্চিত অচিরকা মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তির মূল অবিদ্যা বিদূরিত করিয়া নির্ম্মল হই পারিবে[৭৫।৭৯]।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, লীলে! যেমন জাগ্রৎ জ্ঞানের উদয়ে স্বপ্ন দর্শন অবাস্তব অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়, সেইরূপ, বাসনা ক্ষীণ হইলে এই স্থূল দেহ অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে[১]। যেমন স্বপ্ন জ্ঞানের পর স্বাপ্নদেহ থাকে না, তেমনি, বাসনা নাশের পর এই জাগ্রৎ দেহও থাকে না। (অর্থাৎ দেহাভিমান থাকে না)[২]। যেমন সঙ্কল্প ও স্বপ্ন দর্শন শেষ হইলে এতদ্দেহের দর্শন হয়, তেমনি, জাগ্রদ্ভাবনার অন্ত হইলে অর্থাৎ এই স্থূল দেহের অহম্ভাব নিবৃত্ত হইলে তখন সেই আতিবাহিক দেহ সমুদিত হইবে[৩]। যেমন স্বপ্নাবস্থায় বাসনাবীজ বিলীন হইলে সুষুপ্তির উদয় হয়, তেমনি যদি, জাগ্রদবস্থায় বাসনাবীজ প্রক্ষীণ হয় তাহা হইলে বিমুক্ততার উদয় হইয়া থাকে[৪]। জীবন্মুক্ত দিগের বাসনা বাসনা নহে; তাহা কেবল পরিশুদ্ধ সত্ত্ব অথবা সত্তাসামান্য মাত্র। (যেমন দগ্ধ বস্ত্রের অস্তিত্ব, তেমনি)। বাসনা সকল নিদ্রায় সুপ্ত হইলে তাহা সুষুপ্তি; আর জাগ্রৎ অবস্থায় সুপ্ত হইলে তাহা মোহ। নিদ্রায় বাসনা প্রক্ষীণ হইলে তাহা তুরীয় এবং জাগ্রতে জ্ঞানবলে বাসনাপুঞ্জ সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহাও তুরীয়। তুরীয় লাভের অন্য নাম ব্রহ্ম-লাভ। তুরীয় লাভই পরম অর্থাৎ যার পর নাই উৎকৃষ্ট[৫।৭]। যাহাদের বাসনা একবারেই পরিক্ষীণ হইয়াছে তাদৃশ জীবের জীবনস্থিতি জীব-ন্মুক্ত পদের অভিধেয় এবং সেই জীবন্মুক্ত পদ অমুক্ত জীবের (যাহারা সংসারে বদ্ধ তাহাদের) অজ্ঞাত[৮]। হিমানী (বরফ) তাপ সংযোগে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইয়া জল হয়, চিত্তও বাসনা পরিত্যাগের পর সমাধিপটু ও শুদ্ধ সত্ত্বময় হওয়ায় আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়। (স্থূল-পরিচ্ছেদ-ভ্রান্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী হয়)[৯]। জ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ ও আতিবাহিক ভাব প্রাপ্ত যে মন, সেই মনঃই জন্মান্তরীয় ও সৃষ্ট্যন্তরীয় পদার্থ দেখিতে পায় এবং সিদ্ধ শরীরের সহিত মিলিত হইতে পারে[১০]। হে লীলে! তোমার অহম্ভাব অর্থাৎ দেহাভিমান যখন অভ্যাস দ্বারা উপশান্ত হইবে, তখন তোমার এ দৃশ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া স্বাভা-

বিক চিৎস্বরূপতা আপনা আপনি উদিত হইবে[১১]। যখন তোমার আতিবাহিক জ্ঞান অবিনশ্বর ভাবে সমুদিত হইবে অর্থাৎ স্থায়ী ও দৃঢ় হইবে, তখনই তুমি পবিত্র হইয়া অর্থাৎ মুক্ত হইয়া সেই সকল পবিত্র লোক দর্শন করিতে সমর্থা হইবে[১২]। অতএব হে অনিন্দিতে! তুমি বাসনা বিনাশের নিমিত্ত যত্নবতী হও, বাসনাক্ষয় বদ্ধমূল হইলে তুমি জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে[১৩]। অতি সুশীতল বোধচন্দ্রমা যাবৎ না পূর্ণ হয়, তাবৎ তুমি স্থূল দেহ এই স্থানে স্থাপিত করিয়া লোকান্তর দর্শন কর অর্থাৎ সমাধির দ্বারা স্থূল শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া চিত্ত মাত্র অবলম্বনে ও জ্ঞান চক্ষে সেই সেই পরলোক অবলোকন কর[১৪]। তুমি এমন আশা করিও না যে, আমার দেহে মিলিতা হইয়া তুমি সে লোকে গমন করিতে পারিবে। কারণ, মাংসময় দেহ অমাংস দেহে সংশ্লিষ্ট হইবার নহে। মাংসময় দেহ চিত্তময় দেহে মিলিত হইয়া কোনও ব্যবহারিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ নহে এবং চিত্তদেহও ব্যবহারিক কার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইতে সমর্থ নহে[১৫]। আমি যাহা বলিলাম, ইহা অনভিজ্ঞ বালক হইতে সিদ্ধলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকের অনুভবসিদ্ধ। আমরা বর ও শাপ দিয়া যোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি; পরন্তু অযোগ্য বিষয় সম্পন্ন করিতে পারি, না। (দেবীর অভিপ্রায় এই যে, উপদেশানুরূপ কার্য্য না করিলে কোনও ক্রমে আমি তোমাকে স্থূল শরীরে পরলোক দেখাইতে পারিব না)[১৬]। নিবিড়তম (প্রগাঢ়) জ্ঞান অভ্যস্ত হইলে ও বাসনা জাল জীর্ণ হইলে এই দেহেই আতিবাহিক ভাব বা ভাবময় শরীর জন্মিয়া থাকে। * বৎসে! আতিবাহিক দেহ সমুদিত হইলে কেহ তাহা দেখিতে পায় না। লোকে এই মাত্র দেখে, তাহার স্থূল শরীর আবির্ভূত রহিয়াছে[১৭।১৮]। পরন্তু মুক্ত পুরুষেরা দেখেন, দেহমাত্রই অবাস্তব। সেজন্য তাঁহাদের বাস্তব মরণ অথবা জীবন নাই। কোন্ ব্যক্তি স্বপ্ন ও সঙ্কল্পভ্রান্তির দ্বারা মৃত ও জীবিত হয়?[১৯] হে পুত্রি! সঙ্কল্পনির্ম্মিত পুরুষের জীবন মরণ যদ্রূপ অসত্য অথচ ভান হয়, দৃশ্য দেহের উৎপত্তি বিনাশও তদ্রূপ অসত্য

---

* জীব যখন মরে ও পরলোক গমন করে, তখন তাহারা আতিবাহিক শরীরে লোকান্তরগামী হয়। স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে। সেই আতিবাহিক শরীরকে পারলৌকিক শরীর বলে। সে শরীর অনাদি অনির্ব্বাচ্য স্বাজ্ঞানকল্পিত সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

অথচ তাহা তাহার ভান হইয়া থাকে[২০]।

লীলা বলিলেন, দেবি! যাহা শ্রবণ করিলে দৃশ্যদর্শনরূপ রোগ উপশম প্রাপ্ত হয়, আপনি আমাকে তাদৃশ নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করিলেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য—বাসনাক্ষয় বিষয়ে কিরূপ অভ্যাস উপকারী হয় এবং অভ্যাসই বা কি প্রকারে পরিপুষ্ট হয়—তাহা আমাকে বলুন। অভ্যাস পরিপুষ্ট হইলে যে যে ফলের উদয় হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[২১।২২]।

দেবী বলিলেন, বরবর্ণিনি! যে যাহা কিছু করিবে তাহা অভ্যাস ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হইবে না। সেইজন্য বুধগণ বলিয়া থাকেন, অনুক্ষণ ব্রহ্মচিন্তন, পরস্পর ব্রহ্মকথন, পরস্পর ব্রহ্ম বুঝান, এবং সর্ব্বদা ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হওয়ার নাম ব্রহ্মাভ্যাস এবং ঐরূপ ব্রহ্মাভ্যাস তত্ত্বাববোধের কারণ[২৩।২৪]। যাহারা বিষয়বিরক্ত ও মহাত্মা, তাঁহারাই প্রযত্ন সহকারে ভোগবাসনা ক্ষয় করিতে সমর্থ হন। অপিচ, তাঁহারাই জন্ম মরণ জয় করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন[২৫]। যাঁহাদিগের আনন্দপ্রসবিনী মতি বৈরাগ্য রসে সুরঞ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ ত্যাগে লব্ধসৌন্দর্য্য—তাঁহারাই উত্তম অভ্যাসী[২৬]। যিনি যুক্তিসহকৃত অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জ্ঞেয় বস্তুর অত্যন্তাভাব (অনস্তিত্ব) অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাও ব্রহ্মাভ্যাসে অবস্থিত[২৭]। দৃশ্য কখনও বাস্তবরূপে উৎপন্ন হয় নাই, সেজন্য দৃশ্য অর্থাৎ এ সকল নাই। সুতরাং জগৎ নাই, তুমি নহ ও আমি নহি, ইত্যাকার জ্ঞানসন্ততি জ্ঞানাভ্যাস বলিয়া গণ্য হয়[২৮]। দৃশ্য নাই; সে বিধায় তাহার অস্তিত্ব অলীক ও অসম্ভব, এ বোধ যখন অবিচাল্য হয়, যখন রাগদ্বেষাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন মনের বল আত্মগামী হইয়া রমণ করিতে থাকে। ঐ প্রকার আত্মরতিও ব্রহ্মা-ভ্যাস নামে অভিহিত হয়। রাগদ্বেষাদির হ্রাস ও দৃশ্যাত্যন্তাভাবের বোধ (যাহা দেখা যায় তাহা সর্ব্বকাল মিথ্যা, এ বোধ) ব্যতীত যতই তপস্যা কর না কেন সমস্তই অজ্ঞানকল্প ও দুঃখভোগপ্রদ[২৯।৩০]। অপিচ, দৃশ্যের অসম্ভব বোধই বোধ ও সেইরূপ জ্ঞেয়ই জ্ঞেয় বলিয়া অব-ধারণ করিবে। অপিচ, তাহার অভ্যাসই অভ্যাস ও তাদৃশ অভ্যাসই নির্ব্বাণফলদায়ক[৩১]। হে লীলে! চিত্তে অভিহিত প্রকারের বিবেক-বোধাভ্যাসরূপ সুশীতল বারি সর্ব্বদা পরিষেক করিলে নিশ্চয়ই ভবরূপ-

নিশায় প্রবৃত্ত মোহরূপ প্রগাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ হইবে[৩২]।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত কথা ভাগ বলিলে দিবাকর অস্তাচলগত ও সায়ংকাল সমুপস্থিত হইল। তখন রামচন্দ্র ও অন্যান্য সভ্যগণ সায়ন্তন কার্য্য সমাধানার্থ গমন করিলেন। পরে রজনী প্রভাত ও দিবাকর সমুদিত হইলে পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন[৩৩]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

প্রভাতে পুনঃ কথারম্ভ হইল। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই দুই বরাঙ্গনা অর্থাৎ লীলা ও সরস্বতী উভয়ে সেই রজনীতে ঐরূপ কথোপকথন করিয়া, পরিজনবর্গ প্রসুপ্ত হইলে, গৃহের দ্বার ও গবাক্ষাদি সমস্তই বন্ধ, অন্তঃপুরমণ্ডপ পুষ্প গন্ধে আমোদিত ও রাজার মৃত দেহন্যস্ত পুষ্পমাল্যাদি অম্লান রহিয়াছে দেখিয়া সমাধিস্থানে গমন পূর্ব্বক তথায় রত্নস্তম্ভাদিতে সমুৎকীর্ণ পুত্তলিকার ন্যায় (খোদাই করা মূর্ত্তি)। নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সমাধিস্থা হইলেন। * তখন তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তা অন্তর্হিত ও ইন্দ্রিয় সকল সঙ্কুচিত হইল। যেন সায়ংকাল আগতে দিবাপ্রস্ফুটিত দুইটী পদ্মিনী পরিমল (সুগন্ধ) উপসংহার করিতেছে। যেন বায়ুশূন্য শরৎকালে পর্ব্বতোপরি দুই খণ্ড সুশুভ্র মেঘ নিশ্চল নিষ্পন্দ ও পতিত হইয়াছে[১।৬]। তাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা বাহ্যজ্ঞান পরিত্যাগ করায় বোধ হইতে লাগিল, যেন দুইটী কল্পলতিকা নববসন্তসমাগমে পূর্ব্ববসন্তসঞ্চিত রস পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পত্রাদি হইয়াছে। তাঁহাদের স্থূল দেহ সমাধিযোগে বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও ভূমিনিপতিত হইয়াছে। সে দৃশ্যের তুলনা পদ্মিনীর বিশীর্ণতা, নিষ্পন্দ শুভ্র মেঘ ও নিষ্পত্র বনলতিকা। তাঁহারা সমাধিবলে তন্মুহূর্ত্তে জানিলেন, অন্তঃস্থ অহম্ভাব হইতে বাহ্য জগৎ পর্য্যন্ত সমুদায় দৃশ্য ভ্রান্তিসমুদ্ভব। তন্মুহূর্ত্তে তাঁহাদের অন্তর হইতে সমুদায় দৃশ্যপিশাচ অদর্শন গত হইল। হে অনঘ রামচন্দ্র! লীলা ও সরস্বতী সমাধি অবস্থায় দৃশ্যের অত্যন্তাভাব দর্শন করিয়া ছিলেন, পরন্তু আমরা সর্ব্বদাই ইহার ত্রৈকালিক অসত্তা (মিথ্যাত্ব) অনুভব করিয়া আসিতেছি[৭।৯]। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদিগের নিকট শশ-শৃঙ্গের ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অলীকরূপে প্রতিভাত হয়। কারণ, যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা প্রতীত হউক বা না হউক, বর্ত্তমানেও তাহা নাই বলিয়া অবধারণ করা যায়[১০]। রাম! সেই

---

* সরস্বতী লীলার সাহায্যার্থে অর্থাৎ লীলাকে সমাধি শিখাইবার নিমিত্ত সমাধিস্থা হইয়াছিলেন। ঐ সকল কার্য্য গুরুসাপেক্ষ। গুরু না শিখাইলে শিখা যায় না।

ললনাদ্বয় তখন দৃশ্যদর্শনবিমুক্ত হইয়া কেবল ও শান্ত হইলেন। আকাশ যদি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিহীন হয় তবেই সে শান্ত ভাবের উপমা হইতে পারে। যে সময়ে কেবল মাত্র আকাশ হইয়াছে বায়ু উৎপন্ন হয় নাই অথবা প্রলয় কাল আগতে বায়ু পর্য্যন্ত বিনাশ হইয়াছে, কেবল আকাশ অবশিষ্ট আছে, সে অবস্থাও উহার উপমা হইতে পারে[১১]। অনন্তর জ্ঞানদেবতা সরস্বতী জ্ঞানময় দেহে এবং রাজমহিষী লীলা মানব দেহের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান জ্ঞানের অনুরূপ দিব্য দেহ অবলম্বনে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন[১২]। তাঁহারা যে সত্যসত্যই দূরগামী হইলেন তাহা নহে। প্রাদেশ পরিমিত গৃহাকাশে থাকিয়াই সর্ব্বগামী জ্ঞানে আরোহণ ও ব্যোম গমনের অনুরূপ চিদাকাশমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন[১৩]। * অনন্তর ললিতলোচনা ললনাদ্বয় পূর্ব্বসঙ্কল্প সংস্কারের উদ্বোধে † ও জ্ঞানের বিষয়পক্ষপাতিতা প্রযুক্ত অতি দূরতর আকাশে আপনাদের গমন দর্শন করতঃ পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সত্যসত্যই যে স্থানান্তরে গেলেন তাহা নহে। তাঁহারা চিদ্বৃত্তির দ্বারাই কোটিযোজন বিস্তীর্ণ আকাশের দূর হইতে দূরতর প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[১৪।১৫]। ‡ চিদাকাশ দেহেও চিত্তস্থ পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্যের অনুসন্ধান অনুবৃত্ত থাকে.। এই সময়ে তাহারা

---

* এ বিষয়ে মতদ্বয় আছে। এক মত এই যে, যোগীরা সমাধির দ্বারা স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া সূক্ষ্ম দেহে বহিঃ সঞ্চরণ করেন। অন্য মত এই যে, তাঁহারা দেহবহির্গত হন না, কেবল মাত্র তদ্দেহের অভিমান পরিত্যাগ ও হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রাদেশ পরিমিত নাড়ী স্থানে অবস্থান বা আরোহণ করিয়া সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান লাভ করেন এবং সেই জ্ঞানে তাঁহারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

† তাঁহারা সমাধি করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমরা পরলোক দেখিব ও সেখানে সঞ্চরণ করিব। পূর্ব্বের সেই সঙ্কল্প তাঁহাদের চিত্তে সংস্কারীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উদ্বুদ্ধ হইল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানাকারে পরিণত হইল। সাঙ্কল্পিক জ্ঞানের স্বভাব এই যে, তাহা সঙ্কল্পিতের অনুরূপ বিষয় কল্পনা করিয়া লইয়া তাহাতে ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং জ্ঞানস্বভাব প্রভাবে ঐ ঘটনা সুখনিষ্পন্ন হইবার বাধা হয় না।

‡ চিদ্বৃত্তি শব্দের অর্থ চৈতন্য সম্বলিত মনোবৃত্তি। লীলা ও সরস্বতী ইতিপূর্ব্বে মনে মনে "আমরা আকাশ পথে যাইব" এইরূপ সঙ্কল্পবৃত্তি উত্থাপন করিয়া সমাধিগতা হইয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা এক্ষণে তদনুরূপ চিত্তদেহে আকাশে উৎপতিত হওয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

সঙ্কল্পসংস্কার পূর্ণ চিত্তের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে তাহারা পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্য দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। যে কারণ বর্ণনা করিলাম, সেই কারণে সেই সমস্বভাবা ললনাদ্বয় চিদাকাশদেহশালিনী হইয়াও পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দৃশ্যের অনুসন্ধান ও পরস্পর পরস্পরের আকার বিলোকন করতঃ পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্নেহানুরক্ত হইলেন[১৬]।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! ঐরূপে তাঁহারা ঊর্দ্ধস্থানগত হইয়া পরস্পরের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে অদ্ভুত নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূর হইতে দূরে গমন করিতে লাগিলেন[১]। তাঁহারা দেখিলেন, আকাশ প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অতি গভীর, নির্ম্মল, নিরাবাধ (বাধাশূন্য) স্নিগ্ধ, সুকোমল ও কোমলবায়ুসঙ্গী ও সুখভোগপ্রদ[২]। এই শূন্যসমুদ্রে অবগাহন করা বিলক্ষণ সুখাবহ ও আহ্লাদকর। তাহা অত্যন্ত শুদ্ধ, গম্ভীর ও সজ্জন মন অপেক্ষাও প্রসন্ন[৩]। ঈদৃশ আকাশসমুদ্র অবগাহন করিয়া তাঁহারা কখন মেরুশৃঙ্গস্থিত সৌধান্তর্গত মেঘমণ্ডলে, কখন দিক্ সমুদায়ে, কখন বা চন্দ্রমণ্ডলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন[৪]। কখন চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন এবং কখন বা সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব দিগের পারিজাতমালাসুরভিবাহী সুখস্পর্শ সমীরণ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন বর্ষাকালীন সলিল পরিপূর্ণ কোকনদসুশোভিত সরোবরসদৃশ বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত মন্থর মেঘমণ্ডলে ও কখন বায়ুবিতাড়িত বারিদমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যেন দুইটী ভ্রমরী এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে লীলা বিহার করিয়া বেড়াইতেছে[৫।৭]। মধুরগামিনী ললনাদ্বয় ঐরূপে পরিভ্রমণ ও স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরে আকাশগর্ত্তে (শূন্য মধ্যে) অপর এক মহারম্ভ সন্দর্শন করিলেন। মহারম্ভ অর্থাৎ ভুবন ও ভুবনবাসী লোক পুঞ্জ[৮।৯]। দেখিলেন, ব্যোমোদরে অসংখ্য ভুবনাদি অবস্থিতি করিতেছে। এ সকল ভুবন জ্ঞপ্তিদেবীর পূর্ব্বদৃষ্ট, কিন্তু লীলা এ সকল আর কখন দেখেন নাই। কোটি কোটি জগৎ ইহার অন্তর্গত থাকিলেও অসংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সম্যক্ অন্তরাল বিশিষ্ট। আরও অদ্ভুত এই যে, কোটি কোটি ভুবন ব্যোমের উদর পূর্ণ করিতে পারে নাই। সেই সকল বিচিত্রাকার ভুবনের ভূতল সকল পরস্পর পৃথক্ ভাবে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে পদ্মরাগমণি বিরাজিত। আরও দেখিলেন, কল্পান্তকালীন অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল মুক্তাময় শিখরপ্রভার দ্বারা হিমালয়সানুসদৃশ কাঞ্চনসমুদ্ভাসিত ও মহামরকত

মণির প্রভার দ্বারা নীলিমাবিশিষ্ট এবং তাহাতে মেরু প্রভৃতি ভূধর সকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কোন স্থানে সচঞ্চল পারিজাতলতা বৈদুর্য্যময়ী শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে মনের ন্যায় বেগশালী সিদ্ধগণের গমনাগমন দ্বারা পবনসঞ্চারবেগ পরাজিত হইতেছে। কোন স্থানে দেবপত্নী সকল বিমানগৃহে অবস্থিতি করতঃ মনোহর গীতবাদ্য করিতেছে। কোন স্থানে সুরাসুরগণ পরস্পর অদৃশ্যভাবে গমনাগমন করিতেছেন। কোন স্থানে কুষ্মাণ্ড, যক্ষ, এবং পিশাচমণ্ডল বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে মহামেঘের ন্যায় গভীর ধ্বনি করতঃ বিমানসমূহ ও গ্রহ নক্ষত্রাদির ঘনসঞ্চার দ্বারা জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যসন্নিহিত কোন কোন স্থানে অল্পসিদ্ধ সিদ্ধগণ তপনতাপে দগ্ধকলেবর হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের সূর্য্যাতপদগ্ধ বিমান সকল অর্কদেবের অশ্বমুখনির্গত প্রবল সমীরণ দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোন কোন স্থানে লোকপালগণ ও অপ্সরোবৃন্দ সঞ্চরণ করিতেছেন। কোন কোন স্থানে দেবীগৃহ সমুত্থিত ধূমরাশি নভোমণ্ডলে বারিদমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। অপ্সরাগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক সমাহূত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়া "আমি অগ্রে যাইব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ধাবিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে ভূষণ সকল পরিভ্রষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে বারিদমণ্ডল মহাবল সিদ্ধগণের গমনাগমন দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যেন সভয়ে হিমবান্, মেরু ও মন্দর ভূধরের অধিত্যকা আশ্রয় করায় ঐ সকল ভূধর বস্ত্র পরিধানের অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে। কোন কোন স্থান কাক, উলূক ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিসমূহে পরিবৃত। কোন কোন স্থানে ডাকিনীগণ বারিধি-তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতেছে ও যোগিনীগণ অভীষ্টলাভে অকৃতকার্য্য হইয়াও কুক্কুর, কাক ও উষ্ট্র মূর্ত্তি ধারণ করতঃ বৃথা বহুদূর গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইতেছে। কোন স্থানে গগনবিহারী জীব স্বর্গীয় গীতি বাদ্যে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আছে। কোন স্থানে যাহার নিরন্তর পরিভ্রমণ বশতঃ শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষের বিভাগ সম্পন্ন হয়, সেই নক্ষত্রপুঞ্জমালী নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিশ্চক্রের নিম্নদেশে ত্রিপথগা প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিতা হইতেছেন এবং দেববালকগণ হর্ষচিত্তে তাহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কৌতুকী হইতেছে।

কোন স্থানে বজ্র, চক্র, শূল এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বজ্র, চক্র, শূল এবং শক্তিবিশিষ্ট হইয়া স্ব স্ব দেহ সঞ্চালন করিতেছেন। কোন স্থানে ভিত্তিশূন্য ভবন, কোন স্থানে বীণাযন্ত্র সহকারে দেবর্ষি নারদের সুমধুর গীত; কোন মেঘমার্গ প্রদেশে মহামেঘ, এই সকল মেঘ প্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় অবিরল ধারা বর্ষণ করিতেছে ও কোন কোন মেঘ চিত্রন্যস্তের ন্যায় ব্যাপারশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কোন স্থানে কজ্জলবর্ণ অদ্রিশ্রেষ্ঠ হইতে পরম সুন্দর অম্ভোধর উৎপতিত হইতেছে। কোন্ স্থানে বায়ুপ্রবাহ মধ্যে প্রৌঢ় বিমান সকল তৃণপল্লবের ন্যায় বিচলিত হইতেছে, কোন স্থানে অলিকুল প্রচলিত হইতেছে, কোন স্থানে বায়ুসহকারে সমুড্ডীন ধূলিপটল মেরু-নদীর ন্যায় দৃশ্য হইতেছে, কোন স্থানে সুচিত্র বিমান, নর্ত্তনশীল মাতৃমণ্ডল, যোগেশ্বরী ও ক্রোধাদি বিহীন সমাধিনিষ্ঠ মুনিগণ অবস্থিতি করিতেছেন। কোন স্থানে কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী ও সুরপত্নীদিগের মনোহর গীত, কোন স্থান নিস্তব্ধ পুরবর দ্বারা সমাকীর্ণ, এবং কোন কোন স্থানে পুরবর সকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে রুদ্রপুরী, কোন স্থানে ব্রহ্মপুরী এবং কোন স্থানে মায়াকৃতপুরী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কোন স্থানে চন্দ্রচন্দ্রিকার লহরী, কোন স্থানে অমৃতপূর্ণ সরোবর, মায়া সরোবর, এবং কোন স্থানে দৈবী শক্তির দ্বারা ঘনীভূত সলিলময় সরোবর দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে চন্দ্রমা ও কোন স্থানে দিবাকর সমুদিত হইতেছেন। কোন স্থানে গাঢ় তমোময়ী রজনী, কোন স্থানে নীহার পটলা ধূম্রবর্ণা সন্ধ্যা, কোন স্থানে বর্ষণকারী পয়োধর ও ঊর্দ্ধো গমনে সব্যগ্র সুরাসুরগণ দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে দিগ্বিহারিগণ কর্তৃক পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর, এই চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ। কো স্থান লক্ষযোজন পরিমিত ভূধর দ্বারা, কোন স্থানে পর্ব্বতগুহা সদৃ অবিনাশী তমোরাশির দ্বারা, কোন স্থান সূর্য্যের ও অনলের তেজো রাশির দ্বারা ও কোন স্থান মহাহিমরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে কোন স্থানে অত্যুচ্চ দেবগৃহ সকল দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিহত হই পতিত হইতেছে। কোন স্থান বিমান নিপতন দ্বারা বহ্নিরেখার ন্য অঙ্কিত হইতেছে। কোন স্থানে শত শত কেতু (ধূমকেতু) নিপতিত হওয় ঘনসন্নিবিষ্ট শৈলের ন্যায় দেখা যাইতেছে। কোন স্থানে শুভগ্রহগণে

উৎকৃষ্ট মণ্ডল সুশোভিত রহিয়াছে। কোন স্থান অন্ধকারময়ী রজনীর ও কোন স্থান ভাস্বর দিবাভাগ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কোন স্থানে মেঘমণ্ডল গভীর গর্জ্জন করিতেছে এবং কোন স্থানে বা নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে শুভ্রবর্ণ মেঘমণ্ডল বায়ুবেগে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উহা শুভ্র পুষ্পের ন্যায় দেখাইতেছে। কোন কোন স্থানে ময়ূর ও স্বর্ণচূড় পক্ষীর দ্বারা এবং কোন স্থান বিদ্যাধরী ও দেবী দিগের বাহন দ্বারা আকীর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থান অভ্রমণ্ডল মধ্যে কার্ত্তিকেয় দেবের ময়ূর সকল নৃত্য করিতেছে। কোন স্থান শুকপক্ষিগণের প্রতিচ্ছায়ায় হরিদ্বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কোন স্থানে মেঘমণ্ডল প্রেতরাজের মহিষ সদৃশের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। কোন স্থানে অশ্বগণ তৃণরাশি ভ্রমে মেঘমণ্ডল কবলিত করিতেছে। কোন স্থানে দেবপুর ও দৈত্যপুর। কোন স্থানে পর্ব্বতভেদকারী প্রবল বায়ু নগরপরম্পরার অন্তরালে প্রবাহিত হওয়ায় সে সকল তত্রস্থ অধিবাসী দিগের নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। কোন স্থানে কুলপর্ব্বতাকার ভাস্বর ভৈরব, কোন স্থানে পক্ষবিশিষ্ট শৈলেন্দ্রের ন্যায় গরুড়পক্ষী, কোন স্থানে পক্ষশালী পর্ব্বত, তাহারা বায়ুর ন্যায় প্রোড্ডীয়মান এবং কোন স্থানে মায়াকৃত আকাশনলিনী ও চদাধার শীতল সলিল দৃষ্ট হইতেছে। কোন স্থানে সুরভিবাহী আনন্দদায়ক শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। আবার স্থানান্তরে তপ্তানিল দ্বারা দ্রুম, পর্ব্বত ও মেঘমণ্ডল দগ্ধ হইতেছে। কোন স্থানে প্রশান্ত সমীরণ নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইতেছে, কোন স্থানে পর্ব্বতের ন্যায় শত শত শৃঙ্গবিশিষ্ট মেঘ সমুদিত হইতেছে, কোন স্থানে বর্ষাকালের উন্মত্ত জলধর গভীর গর্জ্জন করিতেছে, কোন স্থানে সুরাসুরগণ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন স্থানে ব্যোমকমলবিহারিণী হংসীরা উচ্চৈঃস্বরে অজবাহন হংসকে আহ্বান করিতেছে, কোন স্থানে মন্দাকিনীতীরস্থিত মৃদু অনিল স্বর্গীয় নলিনীর সৌরভ হরণ করিতেছে, কোন স্থানে গঙ্গা প্রভৃতি সরিৎ সন্নিধান হইতে মৎস্য, মকর, কুলীর ও কূর্ম্ম প্রভৃতি জলজন্তুগণ দেবশরীর দ্বারা উড্ডীন হইতেছে, কোন স্থানে সূর্য্য পাতালগামী হওয়ায় চন্দ্রগ্রহণ এবং কোন স্থানে বা অন্য প্রকারের সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। * অপিচ, কোন স্থানে মায়াকুসুমকানন

* সূর্য্য পাতালগামী, এই কথাটীর জ্যোতিষ অনুসারী অর্থ সুগ্রাহ্য। জ্যোতিজ্ঞগণ

(দেবমায়া বিনির্ম্মিত পুষ্পোদ্যান) স্বর্গানিল দ্বারা কম্পিত হইতেছে।

রাঘব! যেমন মশক সকল পক্ক উড়ুম্বর মধ্যে পরিভ্রমণ করে, তেমনি, রাজমহিষী লীলা ও সরস্বতী উভয়ে আকাশোদরে পরিভ্রমণ করতঃ আকাশচরদিগের বৈভব সন্দর্শন করিলেন। পরন্তু তদ্দর্শনে মুগ্ধ হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা পুনর্ব্বার নভোমণ্ডল অতিক্রম করিয়া মহীতলাভিমুখে আগমন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন[১০।৬৫]।

বলেন, সূর্য্য ভূগোল বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন, তৎসঙ্গে ভূচ্ছায়াও ঘুরিতেছে। সূর্য্য যখন ভূচ্ছায়াচ্ছাদিত হন তখন তাঁহাকে পাতালগামী বলা যায়। অপিচ, চন্দ্রগ্রহণ বিষয়ে পাতাল শব্দের অর্থ—চন্দ্রের ব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগ। সূর্য্য তদ্গত হইলে চন্দ্রমণ্ডলে ভূপ্রতি-বিম্ব নিপতিত হয়, হইলে লোকে তাহাকে চন্দ্রগ্রাস নামে অভিধান করে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।
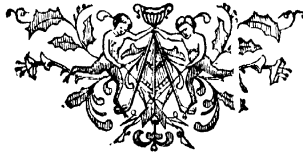
পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রামচন্দ্র! দেবী সরস্বতীর অভিপ্রায়—তিনি লীলাকে ভূমণ্ডল দেখাইবেন। তদনুসারে তাঁহারা উভয়ে নভস্তল হইতে গিরিগ্রামস্থিত মৃতবশিষ্ঠগৃহ দর্শনার্থ গমন করিতে প্রবৃত্তা হইয়া প্রথমতঃ ভূমিতল দর্শন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ড যেন পুরুষ,—বিরাট্ পুরুষ। ভূমণ্ডল তাহার হৃদয় পদ্ম, অষ্টদিক তাহার দল, (পাবৃড়ি), গিরিরাজি তাহার কেশর, সরিৎ তাহার অন্তরশাখা, হিমকণা তাহার মধুবিন্দু, শর্ব্বরী তাহার ভ্রমরী ও অসংখ্য প্রাণিবৃন্দ তাহাতে মশক[১।৩]। ভোগ্য বস্তু ও তদ্গুণ তাহার মৃণালান্তর্গত তন্তু, জলপূর্ণ পাতালাদি ছিদ্র তাহার রন্ধ্র, তাহা দিবসালোক দ্বারা কান্তিবিশিষ্ট[৪] ও শৃঙ্গারাদি রসে আর্দ্র। সূর্য্য ইহার হংস। এই পদ্ম যামিনীযোগে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। পাতাল-পঙ্কে নিমগ্ন নাগনাথ বাসুকি ইহার মৃণাল[৫]। অম্বুনিধি এই কমলের আস্পদ। ভূপদ্মের আস্পদ মহাসমুদ্র কম্পিত হইলে ভূপদ্মও দিগ্দলের সহিত প্রকম্পিত হইতে থাকে। দৈত্য ও দানবগণ এই পদ্মের মৃণাল-কণ্টক[৬]। এই ভূপদ্মের মধ্যস্থলে নগর, গ্রাম ও নদ নদ্যাদি কেশরিকা-নালবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপরূপ মহাকর্ণিকা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাহা সুমেরু প্রভৃতির উৎপাদক, এবং যাহা জীবদেহের মহাবীজ, তাহাই এতৎপদ্মের নালমূলাবস্থিত অসুররমণীবৃন্দের সুখচ্ছেদ্য অসংখ্য মৃণালকলিকা (মৃণালের অঙ্কুর)। উত্তুঙ্গ কুলাচল সপ্তক এই কলিকার মহাবীজ। সেই সাতটী মহাবীজের মধ্যস্থলে মহামেরু প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহা নভঃ আক্রম-কারী[৭।৯]। হিমবিন্দু সকল অত্রস্থ সরোবর, ধূলি সকল পরাগ, শৈল সকল কেশর ও কর্ণিকা, সে সকল জীবরূপ ভ্রমরে পরিব্যাপ্ত[১০]। এই মহাদ্বীপ শতযোজন পরিসর এবং প্রতি পূর্ণিমায় সমুচ্ছলিত সমুদ্র নামক ভ্রমরে ও দিক্চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত[১১]। আট্ দিক্পাল ও সমুদ্রগণ ইহার ষট্পদ। ইহার ভ্রাতৃস্বরূপ নবসংখ্যক রাজাধিরাজ ইহাকে নব ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে[১২]। * এই মহাদ্বীপ লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ, রজঃকণে

---

* পূর্ণিমাতিথি জোয়ার আরম্ভের প্রথম কালকেন্দ্র। সমুদ্রকে ভ্রমর বলার অভিসন্ধি—

আকীর্ণ ও নানা জনপদে পরিপূর্ণ[১৩]। পরিসরে এই দ্বীপের দ্বিগুণিত পরিমাণ লবণসমুদ্র ইহাকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে[১৪]। ইহার পরে দ্বিগুণ পরিমিত শাকদ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ ক্ষীর সমুদ্রের দ্বারা বলয়াকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। অনন্তর এতদ্‌দ্বিগুণ কুশদ্বীপ এবং ঘৃতসমুদ্র তাহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। তৎপরে তদ্‌দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ। এই দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমিত দধিসমুদ্র তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তৎপরে তদ্‌দ্বিগুণ শাল্মলী দ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণ পরিমিত সুরাসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। তাহার পর তদ্‌দ্বিগুণ প্লক্ষদ্বীপ। এই প্লক্ষদ্বীপ তাহার দ্বিগুণ পরিমিত ইক্ষুরস নামক সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎপরে তদ্‌দ্বিগুণ পুষ্কর দ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বীপের দ্বিগুণপরিমিত স্বাদুজল সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। সরোবরে যেমন সনাল পদ্মলতার পত্র পর পর সংস্থানে অসংলগ্ন ভাবে ভাসমান হয়, তেমনি, কথিতপ্রকারে সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র সমন্বিত ভূমণ্ডল জলোপরি ভাসমান রহিয়াছে[১৫]।

অনন্তর ঐ সকল দ্বীপের দশগুণ পরিমিত নিম্নভূমি এবং তাহা গর্ত্তরূপী। (ঐ সকল নিম্নভূমি পাতাল নামে খ্যাত)। এই সমুদায়ের দশগুণ পরিমিত পাতালগামী পথে অবস্থিত সর্ব্বোচ্চ লোকালোক পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের পাদ দেশে দূর গভীর গর্ত্ত সমূহ থাকাতে ইহা ভীষণ বলিয়া বোধ হয়। ইহার উপরিভাগের অর্দ্ধাংশে সূর্য্য প্রকাশিত থাকাতে অপর অর্দ্ধভাগ তমসাচ্ছন্নপ্রযুক্ত বলায়াকার নীলোৎপলমালামণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশ নানাবিধ মাণিক্য ও কুমুদকহ্লার প্রভৃতি কুসুমনিকরে সুশোভিত থাকাতে, উহা বিবিধ কুসুমমালাবেষ্টিত ধম্মিল্লশালিনী ত্রিজগল্লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে[১৬।২৬]। ইহার পরে অন্য কিছু নাই, কেবল শূন্য। এই শূন্যের পরিমাণ বর্ণিত সমুদায় ভূমণ্ডলের দশগুণ। এই শূন্যে ভূতগণের সঞ্চারাদি নাই। ইহাও দশগুণ মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পদ্ম যেমন ভ্রমর কর্ত্তৃক চুম্বিত হয়, তেমনি এই জম্বুদ্বীপও সমুদ্র কর্ত্তৃক জোয়ার উচ্ছ্বাসে চুম্বিত হইতে থাকে। এই জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত। যেমন ভারতবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষ, ইত্যাদি। এই সকল বর্ষ পুর্ব্বকালের রাজাদিগের দ্বারা কৃত ও চিহ্নিত হইয়াছিল। ভরতের বর্ষ ভারতবর্ষ, ইত্যাদি। ঐ সকল রাজা এই দ্বীপের সহোদর সমান। তাঁহারা পৃথিবীর পুত্র। এই দ্বীপও পৃথিবীর পুত্র। এই ভাবের সহোদর।

তৎপরে তদ্দশগুণ পরিমিত মেরুপ্রভৃতি ভূধরের দ্রাবণকারী ও ব্রহ্মাণ্ড শোষণকারী প্রলয় মহাহুতাশন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তৎপরে তদ্দশগুণ মেরুপ্রভৃতি অচল সমূহের বহনকারী মহাবেগশালী প্রলয় মহামারুত বিস্তৃত রহিয়াছে। তৎপরে শতকোটিযোজন বিস্তৃত ঘনরূপী ব্যোম-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে রাঘব! সেই মানবী লীলা এবম্বিধ জলধি, মহাদ্রি, লোকপাল, ত্রিদশালয়, অম্বর ও ভূতলাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ড কটাহ * অবলোকন করিয়া অবশেষে তন্মধ্যগত ক্ষুদ্র নিজ মন্দিরকোটর দর্শন করিলেন[২৭।৩৫]।

* ব্রহ্মাণ্ডকটাহ। কটাহ শব্দের ভাষা নাম 'কড়া।' দুইখানি লোহার কড়া মুখোমুখি রাখিলে যদ্রূপ গোল আকার সম্পন্ন হয়, ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্ব ও আবরণ তদ্রূপ। সেই কারণে শাস্ত্রকারেরা সাবরণ জগত্রয়কে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ বলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশ সর্গ।

---*---

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! সেই বরবর্ণিনীদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া যে স্থানে সেই ব্রাহ্মণের আস্পদ (গৃহ), সেই স্থানে গমন করিলেন[১]। অনন্তর সেই দুই সিদ্ধরমণী লোকের অদৃশ্যভাবে সেই বিপ্রের সদ্ম ও অন্তঃপুরমণ্ডপ পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন[২]। দেখিলেন, তত্রস্থ চিন্তাবিধুর (কাতর) দাস দাসী ও অঙ্গনাগণের মুখমণ্ডলে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত হওয়ায় শীর্ণপর্ণ অম্বুজের ন্যায় বিবর্ণীকৃত হইয়াছে[৩]। এই পুরী আজ্ নষ্টোৎসব পুরীর ন্যায়, অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায়, গ্রীষ্মদগ্ধ উদ্যানের ন্যায়, বিদ্যুদ্দগ্ধ দ্রুমের ন্যায়, বাতবিছিন্ন মেঘের ন্যায়, তুষারম্লান অম্বুজের ন্যায় ও অল্পস্নেহ দীপের ন্যায় যার পর নাই প্রভাহীন হইয়াছে। আসন্নমৃত্যুকাতর মানবগণের মুখমণ্ডল যেরূপ কান্তিবিহীন হয়, তরু সকল জীর্ণ ও তাহাদিগের পত্র সমুদয় বিশীর্ণ হইলে যেমন অরণ্যের কোন শোভাই থাকে না, এবং অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে যেমন দেশাদি ধূষরবর্ণ ও রুক্ষ হয়, তাহার ন্যায় এই গৃহ গৃহেশ্বরের বিয়োগে শোভাবিহীন হইয়াছে[৪।৬]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! কথিতপ্রকার দুরবস্থা দেখিয়া নির্ম্মলজ্ঞানসম্পন্না সত্যসঙ্কল্পা রাজমহিষী লীলা "এই সমস্ত বান্ধবগণ আমাকে এবং এই দেবী সরস্বতীকে সামান্য ললনার ন্যায় দর্শন করুক" মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করিলে পর তত্রস্থ গৃহজন সকলেই সেই রমণীদ্বয়কে সমাগত লক্ষ্মীর ও গৌরীর ন্যায় দেখিতে পাইল। তাঁহারা দেখিলেন, যেন সেই রমণীদ্বয় চন্দ্রিকামৃত (চন্দ্রিকা=জ্যোৎস্না) দ্বারা সেই গৃহ, সেই গ্রাম, এবং গ্রামের নিকটস্থ বন, উপবন ও ওষধি সকল সমুদ্ভাসিতকরতঃ শীতলাহ্লাদ সুখদ চন্দ্রমার ন্যায় সমুদিত হইয়াছেন। কানন যদ্রূপ যুগল বসন্তলক্ষ্মীর দ্বারা সুশোভিত ও আমোদিত হয়, সেই ললনাদ্বয়ের আপাদ লম্বমান বিবিধ অম্লানমালার দ্বারা সেই মন্দির তদ্রূপ সুচিত্রিতা ও সুশোভিতা হইয়াছে[৭।১১]। তাঁহাদিগের নয়ন আন্দোলিত লম্বায়মান লতার সুষুমা তিরস্কৃত করিতেছে এবং চূর্ণকুন্তলের নিতান্ত সমীপে অবস্থিত

থাকায় ভ্রমরশোভা ও নীলোমিশ্র ধবলচ্ছবি কটাক্ষ নিক্ষেপে কুবলয়োমিশ্র মালতীকুসুম বিকীরণের সুষুমা বিস্তার করিতেছে[১২]। তাঁহাদিগের দেহের কান্তি এরূপ যে, যেন বিগলিত সুবর্ণনদীর লহরী ও তাহার প্রভারাশি যেন সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়া সর্ব্বস্থান কনকায়িত করিতেছে[১৩]। এই ললনাদ্বয়ের শরীর শোভা এরূপ যে, যেন লাবণ্য সমুদ্রের তরঙ্গ অথবা বিলাসের দোলা[১৪]। ইঁহাদের চঞ্চল বাহুলতিকার ও অরুণবর্ণ পাণি যুগলের বিন্যাস যেন ক্ষণে ক্ষণে সুবর্ণবর্ণ নব নব কল্পবৃক্ষলতিকার কানন সৃজন করিতেছে[১৫]। এবমাকারে সেই দেবীদ্বয় পুষ্পপল্লবকোমল স্থলাব্জদলমালার শোভাবিকাশকারী অম্লান কুসুমসদৃশ চরণযুগল দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিলেন। তাঁহাদিগের অবলোকনরূপ অমৃতের পরিসেকে যেন পাণ্ডুবর্ণ শুষ্ক বনও বালপল্লবে পল্লবিত হইল[১৬।১৭]।

হে রাঘব! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেই মৃত ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠশর্ম্মা নামক জ্যেষ্ঠপুত্র গৃহজনের সহিত "বনদেবীদিগকে নমস্কার" এই বলিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহাদিগের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন[১৮]। তাঁহাদিগের চরণে কুসুমাঞ্জলি অর্পিত হইলে বোধ হইল, যেন পদ্মবল্লীস্থ পদ্মোপরি তুষারসীকর বর্ষণ হইয়াছে[১৯]। অনন্তর জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদি পুরবাসিগণ সকলেই বলিতে লাগিল, হে বনদেবীদ্বয়! আপনাদিগের জয় হউক। বোধ হয় আপনারা আমাদিগের দুঃখবিনাশার্থ আগমন করিয়াছেন। কেননা, পরপরিত্রাণ করাই সাধুদিগের স্বভাব[২০]।

অনন্তর সেই দেবীদ্বয় জ্যেষ্ঠশর্ম্মার বাক্যাবসানে সস্নেহবাক্যে বলিলেন, এই সকল ব্যক্তি যে দুঃখে দুঃখিত সে দুঃখ কি তাহা তোমরা বল[২১]।

অনন্তর সেই জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রভৃতি সকলেই সেই দেবীদ্বয়ের নিকট দ্বিজদম্পতীর ব্যসনজনিত (ব্যসন=মৃত্যুরূপ বিপদ) দুঃখবর্ণন করিলেন[২২]।

জ্যেষ্ঠশর্ম্মা বলিলেন, হে দেবীদ্বয়! এই স্থানে অতিথিবৎসল এক ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করিতেন। তাঁহারা দ্বিজগণের মর্য্যাদা রক্ষণের একমাত্র আধার ছিলেন এবং তাঁহারা আমার মাতা ও পিতা। সম্প্রতি তাঁহারা পুত্র ও বান্ধব দিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমরা সকলেই এই জগৎ শূন্য দেখিতেছি[২৩।২৪]।

হে দেবীযুগল! ঐ দেখুন, পক্ষিগণ গৃহোপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রতিক্ষণ শূন্যে পক্ষবিক্ষেপ করতঃ করুণস্বরে শোক প্রকাশ করিতেছে[২৫]। পর্ব্বত সকল গুহারূপ বদন দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতঃ সরিৎরূপ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে[২৬]। দুঃখসন্তপ্ত দিগঙ্গনাগণের উত্তপ্ত নিশ্বাস পবন দ্বারা তাহাদিগের মেঘরূপ পয়োধর (স্তন) বস্ত্ররূপ অম্বর (আকাশ) বিহীন হইয়াছে[২৭]। গ্রামবাসী জনগণ উপবাসনিরত, ধুল্যবলুণ্ঠিত ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে[২৮]। প্রতিদিন বৃক্ষদিগের পত্রগুচ্ছরূপ লোচনকোশ হইতে নীহাররূপ উষ্ণ অশ্রু অধোভাগে নিপতিত হইতেছে[২৯]। রথ্যা সকল আনন্দহীনা বিধবার ন্যায় ধূষর বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক বিরলজনসঞ্চার হইয়া যেন শূন্যহৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছে[৩০]। অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা লতা সকল যেন বৃষ্টিরূপ বাষ্পবিহীন হইয়া কোকিল কুজন ও অলিগুঞ্জন দ্বারা নিরন্তর বিলাপ করিতেছে এবং ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লবরূপ পাণির দ্বারা অনবরত স্বীয় শরীর আঘাতিত করিতেছে[৩১]। শোকসন্তপ্ত নির্ঝর সকল যেন আপনাকে শতধা করিবার মানসে প্রবলবেগে বৃহৎ শুভ্র শিলাতলে নিপতিত হইতেছে[৩২]। ঐ দেখুন, গৃহ সকল হর্ষবার্ত্তাবিরহে মূকের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে ও অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন অরণ্যের সমান রহিয়াছে[৩৩]। ভ্রমরগুঞ্জন দ্বারা রোদনশীল উদ্যানখণ্ড হইতে সঞ্চারিত আমোদজনক সৌগন্ধ সকল যেন শোকার্ত্ততা বশতঃ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পীড়াদায়ক পূতিগন্ধ সমানে অনুভূত হইতেছে[৩৪]। চৈত্যদ্রুমবিলাসিনী সুকোমলা লতা সকল গুচ্ছরূপ লোচন সঙ্কুচিত করতঃ দিন দিন বিরস ও বিশীর্ণ হইতেছে[৩৫]। কলধ্বনিকারিণী সরিৎ সকল সমুদ্রে স্বদেহ বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত গমনে সমাকুলা হইয়া ভূতলে দোলায়মান হইতেছে[৩৬]। সচঞ্চল সরোবর সমুদয় এক্ষণে নিষ্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতেছে[৩৭]। হে দেবী যুগল! যে নভঃ প্রদেশে (স্বর্গে) কিন্নরী, গন্ধর্ব্বী এবং সুরাঙ্গনাগণ গান করেন, সম্প্রতি আমার মাতা ও পিতা সেই স্থানে গমন করিয়া সে স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছেন[৩৮]। হে দেবীযুগল! মহতের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না, সেইজন্য আশা করি, আপনারা আমাদিগের শোক অপনোদন করিবেন[৩৯]।

লীলা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার তদ্বিধ বচনপরম্পারা শ্রবণ করতঃ স্বকীয় শীতল

করপল্লব দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। যেমন প্রাবৃট্ কালে মেঘসমাগমে বৃক্ষগণের গ্রীষ্ম বিদূরিত হয়, তেমনি, তদীয় করস্পর্শে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার শোক ও সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্য সঙ্কট তিরোহিত হইল এবং তদীয় পরিজনবর্গও দেবীদ্বয়কে সন্দর্শন করতঃ দুঃখবিমুক্ত ও সর্ব্ব-সৌভাগ্যে বিভূষিত হইল[৪০।৪২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! লীলা কি নিমিত্ত মাতৃশরীর দ্বারা তদীয় পুত্র জ্যেষ্ঠশর্ম্মাকে দর্শন দেন নাই তাহা আপনি বর্ণন করিয়া আমার মনোমোহ নিবারণ করুন[৪৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পিশাচাদির জ্ঞান থাকাতেই বালকেরা তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। যাহারা একবার পিশাচের মিথ্যাত্ব জানিয়াছে, তাহারা আর পিশাচ দেখে না ও পিশাচ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না। রাঘব! এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যে সকল অজ্ঞ লোক মিথ্যাপৃথ্ব্যাদিময় (ভৌতিক) শরীরকে ভ্রান্তিক্রমে সত্য বলিয়া অবগত আছে, সেই সকল ব্যক্তির চিদাত্মাই ভ্রান্তির প্রভাবে পিণ্ডাকার ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী অর্থাৎ যাহাদের ভ্রমনিবৃত্তি হইয়াছে, তাহারা কেবলাদ্বয় চিদাকাশ স্বভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। * বৎস! বাস্তব পক্ষে পৃথ্ব্যাদিভূত না থাকিলেও ভাবনার বলে তাহার সত্তা দণ্ডায়-মান হইয়া থাকে[৪৪।৪৫]। জ্ঞান হইলে তখন আর অজ্ঞান নির্ম্মিত পৃথ্ব্যাদি পৃথ্ব্যাদি আকারে প্রতিভাত হয় না। যেমন স্বপ্নাবস্থায় "ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অদর্শন ঘটনা হয়, তেমনি, জাগ্রৎ কালেও পৃথ্ব্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইলে অপৃথ্ব্যাদি ভাব সমু-দিত হইয়া থাকে[৪৬]। পৃথ্ব্যাদি শূন্য অর্থাৎ নাই, ইত্যাকার জ্ঞান বা ভাবনা সুদৃঢ় হইলে পৃথ্ব্যাদি শূন্যরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ কুড্যকে (কুড্য=গৃহভিত্তি) শূন্য দেখে অথবা ভিত্তিস্থ স্ফটিকাদির গর্ভে শূন্যতা (ফাঁক অথবা দ্বার) দর্শন করে, তেমনি, মনোভাব অনুসারে বাস্তব অশরীরকে শরীর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। স্বপ্নে নগর, সমতল ভূমি ও খাত দেখা যায় এবং অঙ্গনাদর্শনও হয়, অথচ সে সকল না থাকিলেও অর্থাৎ অলীক হইলেও মানবগণের অর্থক্রিয়া-

---

* লীলা প্রপঞ্চ মিথ্যা বোধগম্য করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার পুত্রস্নেহ ছিল না। অপিচ, স্বজ্ঞানে মূলাজ্ঞান দূরীভূত হওয়ায় পূর্ব্বশরীর ধারণের উপায় ছিল না।

কারী হইয়া থাকে, সেইরূপ, পরমাকাশকে পৃথ্ব্যাদি জ্ঞানে জানিলে তাহাও পৃথ্ব্যাদি হইয়া থাকে। কেহ মূর্চ্ছাকালে কেহ বা মরণকালে পরলোক প্রত্যক্ষ করে[৪৭।৪৯]। বালকেরা শূন্যে বেতাল (ভূত) এবং ভীত, উন্মত্ত, অর্দ্ধনিদ্র ও অর্দ্ধজাগরূক লোকেরা ও নৌকারোহী পুরুষেরা সর্ব্বদাই শূন্যে কেশোণ্ড্রুক, মুক্তাশ্রেণী, বেতাল, বন ও বৃক্ষাদি দেখে ও অনুভব করে[৫০।৫১]। ঐ সকলের বপু অর্থাৎ শরীর দর্শকের অভ্যাসজনিত ভাব অনুসারে প্রকাশ পায়, অথচ ঐ সকলের একটীও পরমার্থ সৎ অথবা নিয়ত সত্যরূপী নহে[৫২]। লীলার বস্তুজ্ঞান সমুদিত হইয়াছিল, তিনি বুঝিয়া ছিলেন, পৃথ্ব্যাদি কিছুই নহে। একমাত্র চিদাকাশই ভ্রান্তির দ্বারা নানা আকারধারী বা নানা আকার বিশিষ্ট হয়[৫৩]। একাদ্বয় ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারী মুক্ত ও মুনি ব্যক্তির আবার পুত্র মিত্র ও কলত্রাদি কি?[৫৪] তাঁহাদের বিশ্বাস—কোনও দৃশ্য উৎপন্ন হয় নাই। যাহা প্রতিভাত হয় তাহা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের জ্ঞানে পরমাত্মাতিরিক্ত দৃশ্য নাই। তাঁহাদের অনুরাগ বা বিদ্বেষাদি সম্ভব হয় না[৫৫]। লীলা যে জ্যেষ্ঠশর্ম্মার মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন তাহা পুত্রস্নেহপ্রযুক্ত নহে। তাহা জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পরমার্থজ্ঞানদায়িকা চিতির ফল। *

হে রাঘব! বিশুদ্ধ বোধ সমুদিত হইলে, এই সকল পদার্থ স্বপ্ন এবং সঙ্কল্পপুরস্থিত কল্পিত পদার্থ সমূহের ন্যায় নিতান্ত অলীক ও একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, প্রতীতি হইয়া থাকে[৫৬।৫৭]।

---

* ভাবার্থ এই যে, জ্যেষ্ঠশর্ম্মার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃত ছিল, সেই সুকৃতের স্বভাবে তাহার তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের কাল উপস্থিত হওয়ায় সর্ব্বাধিষ্ঠান চেতনের অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যের সেই প্রকার বিবর্ত্তন ঘটনা হইয়াছিল।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।
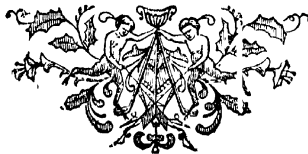
সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সেই দুই সিদ্ধ রমণী সেই গিরি তটস্থিত গিরিগ্রামের সেই ব্রাহ্মণের সেই গৃহে অবস্থিত থাকিলেও অন্তর্হিত হইলেন। অর্থাৎ তত্রস্থ জনগণের অদৃশ্য হইলেন[১]। গৃহজনেরা "দুই বনদেবী আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলেন" মনে করিয়া সুখী হইল। শোকাদি বিদূরিত হওয়ায় তাহারা পুনর্ব্বার নিজ নিজ গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইল[২]। এই সময়ে আকাশলীনা ব্যোমরূপা সরস্বতী ব্যোমরূপিণী লীলাকে মৌনাবলম্বিনী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন[৩]। বালে! তুমি জ্ঞেয়তত্ত্ব নিরবশেষ অবগত হইয়াছ, সংসারভ্রমও প্রত্যক্ষ অবলোকন করিলে, এ সমস্তই যে ব্রহ্মসত্তা, ব্রহ্মের অতিরিক্ত নহে, তাহাও তুমি জানিয়াছ, এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে তাহা বল[৪]।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে সন্দিহান প্রায় অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাঘব! অদৃশ্যা রমণীদ্বয়ের কথোপকথনপ্রচার অসম্ভব মনে করিও না। লোকমধ্যেও দেখিতে পাইবে, যাহাদের দেবতানুগ্রহাদির দ্বারা উষানিরুদ্ধের ন্যায় পরস্পর কথোপকথনরূপ সম্বাদী (সত্যফল) স্বপ্ন অথবা সঙ্কল্প হয়, তাহাদের সেই কথোপকথন পরে কার্য্যে পরিণত ও লোক মধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে। সরস্বতীর ও লীলার পরস্পর কথোপকথন সেইরূপ, ইহা স্থির জানিবে। তাঁহাদের পার্থিব শরীরাদি না থাকিলেও স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের অনুরূপে পরস্পরালাপরূপ চেতনা (জ্ঞান) উদিত হইয়াছিল[৫]। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, লীলে! আর কি বলিতে অথবা করিতে হইবে তাহা শীঘ্র বল।

লীলা বলিলেন, দেবি! আমার মৃত ভর্ত্তার জীব যে স্থানে রাজত্ব করিতেছেন, আমি সে স্থানে যখন গমন করিয়াছিলাম, তখন আমাকে কেহই দেখিতে পায় নাই; কিন্তু এখানে আমার পুত্রেরা আমাকে দেখিতে পাইল, ইহার মর্ম্ম কি তাহা বলুন[৬।৭]।

সরস্বতী বলিলেন, যখন তুমি স্বামিসমীপে গমন করিয়াছিলে তখন তোমার অভ্যাস দৃঢ় হয় নাই সেইজন্য দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়

নাই। যে অদ্বয় হইতে না পারে কি প্রকারে সে অদ্বৈত কর্ম্মে অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পাদিক্রিয়ায় সিদ্ধ হইবে? যে তাপ মধ্যে অবস্থান করে সে কি ছায়ার গুণ (শীতলতা) জানিতে পারে?[৮।৯] তুমি যখন ভর্ত্তৃসকাশে গমন করিয়াছিলে তখন তুমি "আমি রাজমহিষী লীলা" এ ভাব ভুলিতে পার নাই। তাহা না পারায় সত্যকামা (যাহার কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা সফল সে সত্য কামা) হইতে পার নাই[১০]। সম্প্রতি তুমি জ্ঞানাভ্যাসে সিদ্ধ ও সত্যকামা হইয়াছ, সেই কারণে তোমার "পুত্রেরা আমাকে দর্শন করুক" এই কামনা সিদ্ধ হইয়াছে[১১]। এখন যদি তুমি ভর্ত্তৃসমীপে গমন কর, তাহা হইলে এখন তোমার কামনানুরূপ সমুদায় ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে[১২]।

লীলা বলিলেন, দেবি! এই মন্দিরাকাশেই আমার স্বামী বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পরে এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর তিনি এই স্থানেই রাজা হন[১৩]। অপিচ, এই মণ্ডপাকাশেই তাঁহার ভূমণ্ডলান্তর্গত রাজধানী ছিল এবং তৎপুরমধ্যে আমি পুরন্ধ্রী ছিলাম[১৪]। আমার সেই বসুধাধিপ স্বামী মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইলে এই মণ্ডপাকাশেই তিনি ভূপতি হইয়া নানাজনপদের অধীশ্বর হইয়াছেন। জননি! আমার বোধ হইতেছে, যেমন সম্পুটক মধ্যে সর্ষপ সমূহ অবস্থিত থাকে, তাহার ন্যায়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভূমি এই মণ্ডপাকাশেই অবস্থিত রহিয়াছে[১৫।১৭]। আমার ভর্ত্তৃসংসারমণ্ডলও অদূরে অবস্থিত রহিয়াছে। অতএব, যাহাতে আমি তাহা পার্শ্বস্থ বস্তু দর্শনের অনুরূপে দর্শন করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন[১৮]

দেবী বলিলেন, পুত্রি! ভূতলবাসিনি অরুন্ধতি! তোমার ভর্ত্তা অনেক পরন্তু সে সকলের দর্শন অসম্ভব। তবে সন্নিহিত স্বামিত্রয়ের মধ্যে যে স্বামীর মণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা আমি এই মুহূর্ত্তে দেখাইতে পারি। তোমার সাম্প্রতিক ভর্ত্তৃত্রয়ের মধ্যে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া পদ্মনামক নরপতি হইয়াছিলেন, যাঁহার মৃত শরীর তুমি স্বীয় অন্তঃপুরে পুষ্পমণ্ডপে সংস্থাপিত করিয়াছিলে, সেই পদ্মনামক নরপতি এক্ষণে জন্মগ্রহণ করতঃ বিদূরথ নামে তৃতীয় বসুধাধিপ হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে ভ্রান্ত ও সংসার-জলধির মহাকল্লোলে প্রবিষ্ট আছেন। তিনি ভোগতরঙ্গসঙ্কুল সংসারসমুদ্রের ভোগকল্লোলবিক্ষিপ্ত কচ্ছপ সমান হইয়া অবস্থিতি করতঃ জাড্যজর্জ্জরচিদ্বৃত্তিশালী হইয়া রাজকার্য্যাদিতে

াকুল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি জড়ের ন্যায় সুপ্ত আছেন, জাগ-
ত হইতেছেন না[১৯।২৩]। তিনি মনে করিতেছেন, আমি সকলের
ধীশ্বর, আমি উৎকৃষ্টভোগশীল, আমি এই সংসারে অমিতবলশালী ও
ামি মহাসুখী। তিনি ঐরূপ ভাবনায় ভাবিত ও অনর্থসংসারপাশে নিবদ্ধ
হিয়াছেন[২৪]। হে বরবর্ণিনি! আমি তোমার সাম্প্রতিক ভর্ত্তৃত্রয়ের কথা
র্নন করিলাম; এক্ষণে তুমি কোন্ ভর্ত্তৃসমীপে গমন করিতে ইচ্ছা কর,
াহা বল, সমীরণের সুরভি বহনের ন্যায় আমি শীঘ্র তোমায় তথায়
হন করিব[২৫]।

বৎসে! তুমি যে ভর্ত্তৃ সংসার দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা
ন্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপান্তর্গত অন্য সংসার। তথায় অন্যপ্রকার ব্যবহারিক
ার্য্য সকল বিস্তৃত হইয়া থাকে[২৬]। জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই সকল সংসার পার্শ্বে
বস্থিত থাকিলেও সংসার দৃষ্টিতে সে সকল এই সংসার হইতে কোটি
কাটি যোজন দূরে অবস্থিত[২৭]। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঐ সকল
ংসারের শরীর অর্থাৎ আধার চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।
বলোকন কর, একমাত্র ব্যোমরূপ মহাসংসারে কোটি কোটি মেরু
ন্দর অবস্থিত রহিয়াছে[২৮]। যদ্রূপ সূর্য্য কিরণে অনন্ত পরমাণু ভাস-
ান হয় তদ্রূপ মহাচৈতন্যে অনন্ত সৃষ্টি প্রকাশমান হইতেছে[২৯]। ঐ
কল সৃষ্টি যতই মহারম্ভ ও মহাগুণশালী হউক, চিদ্দৃষ্টি তুলনায় বটবীজ
পেক্ষাও ক্ষুদ্র[৩০]। চিৎ-নামক জগতে পৃথিব্যাদি ভেদ নাই। না
াকিলেও চিন্তার প্রভাবে অর্থাৎ সুদৃঢ় আবিদ্যক (মিথ্যা জ্ঞানের)
স্কারের অর্থাৎ ভ্রমবিশেষের প্রভাবে জগৎ দর্শন হয়[৩১]। ভ্রান্তির দ্বারা
গদ্দর্শন আত্মাতেই হয়; পরন্তু তদ্দ্বারা আত্মার জগৎ হওয়া হয় না।
ন্তি দৃষ্ট সর্প কি কখন রজ্জুকে সর্প করিতে পারিয়াছে? তাহা পারে
ই[৩২]। যেমন সরোবরে তরঙ্গমালা পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া তাহা-
েই বিলীন হয়, সেইরূপ, বিচিত্রাকার কাল, কালের অঙ্গ দিবা
াত্রি পক্ষ মাস, বৎসর যুগ কল্প, ও ভুবনাদি দেশ, সমস্তই জ্ঞানরূপ
হাচৈতন্যে পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও লয়প্রাপ্ত হয়[৩৩]।

লীলা বলিলেন, জগন্মাতঃ! যাহা বলিলেন, তাহাই বটে, এখন
মার স্মরণ হইতেছে, আমার এতজ্জন্ম (লীলা জন্ম) রাজসিক। *

* শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে, মর্ত্ত্যজন্ম রাজস, তির্য্যক্‌জন্ম তামস ও দেবতাজন্ম সাত্ত্বিক।

ইহা তামসিক নহে ও সাত্ত্বিক নহে[৩৪]। এখন আমার স্মরণ হই তেছে, হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎপন্ন হওয়া অবধি আমার অষ্টশত জন্ম অতীত হইয়াছে এবং সে সকল জন্ম নানা যোনিতে হইয়াছিল। সে সমস্তই আপনার প্রসাদে আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। সেই সকল জন্মপরম্পরা আমি যেন আমার সম্মুখে প্রকাশিত দেখিতেছি[৩৫]। দেবি পূর্ব্বে আমি এক জন্মে এই সংসারমণ্ডলে বিদ্যাধরলোকরূপ পদ্মের ভ্রমরী স্বরূপ বিদ্যাধরনারী হইয়াছিলাম[৩৬]। পরে দুর্ব্বাসনার দ্বারা কলুষিত হওয়াতে মানুষী হই, তৎপরে অন্য সংসারমণ্ডলে অর্থাৎ অন্য জন্মে পন্নগরাজের পত্নী হই[৩৭]। তাহার পর দুরদৃষ্টের আতিশয্যে কদম্ব-কুন্দ-জম্বীর-বনচরী পত্রাম্বরধারিণী কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডালিনী হইয়া জন্মিয়াছিলাম[৩৮]। সে জন্মে বনবাসনিবন্ধন ধর্ম্মমর্য্যাদায় অনভিজ্ঞা ও অত্যন্ত মূঢ়া ছিলাম, সেই কারণে পরজন্মে বনবিলাসিনী লতা হইয়া এক মুনির পবিত্র আশ্রমে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলাম[৩৯]। সে বা সেই পুণ্যাশ্রমে মুনিসংসর্গে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলাম, সেই কারণে আমার সেই লতা দেহ দাবানলে দগ্ধ হওয়ার পর সেই আশ্রমে সেই মুনির কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলাম[৪০]। তৎপরে আমার অন্য শুভাদৃষ্ট সমুদিত হইলে পুরুষজন্মদায়ক কর্ম্ম সকলের পরিণামে সুরাষ্ট্রদেশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমান্ রাজা হইয়া একশত বৎসর ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াছিলাম[৪১]। পরে পুনর্ব্বার আমার দুরদৃষ্ট প্রবল হইয়া উঠিলে আমি পরস্বাপহরণাদি দুষ্কৃত কার্য্য পরম্পরার দ্বারা কলুষিত হইয়া রাজদেহ পরিত্যাগ করতঃ তালীবৃক্ষতলস্থ কোন জলাশয়ের তীরে কুষ্ঠবিকলাঙ্গী নকুলী হইয়া তথায় নয় বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলাম[৪২]। তৎপরে মোহবশতঃ অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত সুরাষ্ট্রদেশে গো জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দুর্জ্জন অজ্ঞ গোপাল গণের তাড়না সহ্য করিয়াছিলাম[৪৩]। দেবি! আমি যেমন এতজ্জন্মে অতিকষ্টে বাসনা রজ্জু ছিন্ন করিয়াছি তেমনি, অন্য এক জন্মে পক্ষিণী জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বিপিন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাধগণের মহাপাশে নিপতিত হইয়া অতিকষ্টে তাহা ছেদন করিয়াছিলাম[৪৪]। পরে ভ্রমরী হইয়া নির্জ্জনে ভ্রমরের সহিত পদ্মকলিকান্তর্গত কর্ণিকায় বিশ্রাম ও সুকোমল কমলকেশর ভক্ষণ করিয়াছিলাম[৪৫]। অনন্তর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি হরিণী হইয়া তত্র

রম্য বনস্থলীতে বিচরণ করিতে করিতে কিরাত কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলাম[৪৬]। পরে তরঙ্গমালাসমাকুল অব্ধি জলে ভ্রান্তির মহিমায় মৎস্যজন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তরঙ্গ দ্বারা উহ্যমান হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠে নিপতিত হওয়ায় মৎস্যবধীরা যষ্ট্যাঘাত করিয়াছিল, পরন্তু কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে অব্ধি জলে নিপতিত হওয়ায় তাহার সে তাড়না বিফল হইয়াছিল[৪৭]। অনন্তর পুনর্ব্বার দুর্ভাগ্যবশতঃ চম্বণ্বতী নদীর তীরে চণ্ডালিনী হইয়া মধুর স্বরে গান ও সুরতান্তে নারিকেলরসাসব পান করিয়াছিলাম[৪৮]। তাহার পর সারসী হইয়া সীৎকাররূপ সুমধুর গানে সারসাধীশ্বরকে প্রীত করিয়াছিলাম[৪৯]। তৎপরে তালীতমালনিকুঞ্জমধ্যে মদিরাতরলায়িত (মদ্যপানজনিত চল) নেত্রের কটাক্ষে কান্তকে অবলোকন করিয়াছিলাম[৫০]। অনন্তর নানালঙ্কারভূষিতা সুন্দরকান্তিসম্পন্না অপ্সরা হইয়া বদনকমলনির্গত অমৃতকল্প বাক্যরূপ মধুব দ্বারা ষট্‌পদরূপ সুরগণের সন্তোষসাধন করিয়াছিলাম[৫১]। অপিচ, কখন মণি, মাণিক্য ও মুক্তা বিরাজিত ভূতলে, কখন কল্পদ্রুমবনে এবং কখন বা সুমেরূপরি সেই সমস্ত সুরযুবক গণের সহিত বিহার করিয়াছিলাম[৫২]। অনন্তর প্রবলতরঙ্গমালা-সমাকুল জলাশয়ে, কখন বা সমুদ্রতীরস্থিত বনবিরাজিত পর্ব্বতগুহামধ্যে, বহুদিবস কচ্ছপী হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলাম[৫৩]। তৎপরে এক শাল্মলী বৃক্ষের পত্র প্রান্তোপরি কএকটী মশককে দুলিতে দেখিয়া আমার দোলন কামনা উদিত হওয়ায় সে জন্মের অবসানে মশকী হইয়া মশকের সহিত বহুদিন বৃক্ষপত্ররূপ দোলায় দোলায়মান হইয়াছিলাম[৫৪,৫৫]। অনন্তর আমি তরঙ্গসঙ্কুলগিরিনদীতীরে বেতস লতা হইয়া জন্মিয়াছিলাম। তাহাতে আমি নিরন্তর সেই নদীর প্রবল তরঙ্গ দ্বারা সমাকুল হইতাম। তাহার পর আমি গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ মন্দারমন্দিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই জন্মে তত্রস্থ কামাসক্ত বিদ্যাধরগণ আমার পদতলে নিপতিত হইয়াছিল[৫৬,৫৭]। আমার সেই বিদ্যাধরজন্মও সুখের জন্ম নহে। কারণ, সে জন্মেও আমি নানা বিপদ ও দুঃখ অনুভব করিয়াছি[৫৮]।

আমি কথিতপ্রকারে এই সংসাররূপ সুদীর্ঘ সরিতে দুর্ব্বাসনারূপ বায়ুর তাড়নায় সমুদ্ভূত উন্নতাবনত লহরীর ন্যায় কখন অপ্সরা ও বিদ্যাধরী প্রভৃতি উচ্চ যোনিতে কখন বা শত শত দুঃখাবহ ইতর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ বহুবিধ উৎপাতপরম্পরা দ্বারা সমাকুল হইয়াছিলাম[৫৯]।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—*—

এই স্থানে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! সেই অবলাদ্বয় কোটিযোজনবিস্তৃত বজ্রসার ও নিবিড় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! কোথায় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল! কোথায় তাহার ভিত্তি! এবং তাহার বজ্রসারতাই বা কি! বস্তুতঃ সেই রমণীদ্বয় অন্তঃপুরাকাশেই অবস্থিত ছিলেন, কোথাও গমন করেন নাই ও কোন স্থান হইতে নির্গতাও হন নাই[২]। সেই বশিষ্ঠনামক ব্রাহ্মণ সেই গিরিগ্রামস্থিত গৃহাকাশেই বিদূরথ হইয়া রাজত্ব অনুভব করিয়াছেন ও পদ্ম ভূপাল হইয়া সেই মণ্ডপাকাশের কোন এক ক্ষুদ্র কোণে সমুদ্রচতুষ্টয় পরিবেষ্টিত ভূমণ্ডল অনুভব করিয়াছেন[৩।৪]। তদীয় আকাশকল্প চিদাত্মায় ভূমণ্ডল; তদাধারে তাঁহার রাজ্য ও রাজপুরী, ব্রাহ্মণপত্নী, অরুন্ধতী, তাহাতে লীলা, লীলা অর্চ্চনার দ্বারা জ্ঞপ্তিদেবীকে প্রসন্না করিয়াছেন, অনন্তর তৎসহচারিণী হইয়া মনোহর ও অদ্ভুততম আকাশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঐ সকল আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়াছেন[৫।৬]। তাঁহারা কোথাও যান নাই। তাঁহারা প্রাদেশ পরিমিত হৃদয়াকাশে সেই গৃহাকাশ দেখিয়াছিলেন, এবং সেই আকাশেই ব্রহ্মাণ্ড, গিরিগ্রাম, তদন্তর্গত মন্দির, তথা হইতে লোকান্তর গমন, পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে অবতরণ ও গৃহ দর্শন, এই সমস্ত অনুভব করিয়াছিলেন। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা শয্যায় থাকিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ ও দর্শন করে ও অদ্ভুত দেশ দেশান্তর অবলোকন করে, সেইরূপ[৭।৮]। সমস্তই প্রতিভা, অর্থাৎ ভ্রমের বিবর্ত্তন ও সমস্তই আকাশ। সেইজন্যই বলিতেছি, ব্রহ্মাণ্ড নাই, সংসার নাই, তাহার ভিত্তিও নাই, তাহার দূরত্বও নাই[৯]। কেবল মাত্র বাসনার দ্বারা নিজ নিজ চিত্ত সমস্ত ব্যবহার-পরম্পরার সহিত সেই সেই মনোহর দিঙ্মণ্ডলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল[১০]। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড ও সংসার সমস্তই আবরণরহিত অনন্ত অগাধ চিদাকাশ এবং সেই চিদাকাশই তাঁহাদের চিত্তপরিকল্পনায় ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল[১১।১২]। জন্মাদিবর্জ্জিত ও শান্তরূপী মহান্ চিদাকাশ চিত্তের কল্পনায়

জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, এ রহস্য যে ব্যক্তি জ্ঞাত হইতে পারেন, সে ব্যক্তির নিকট এ সমুদায় শূন্য অপেক্ষাও শূন্য। পরন্তু যে ব্যক্তি ঐ রহস্যে অবুদ্ধ, তাহার নিকট এ সমুদায় বজ্র অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য[১৩]। যেমন গৃহস্থিত ব্যক্তি স্বপ্নে চিদাকাশেই এই সমস্ত মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় অবলোকন করে, যেমন মরুভূমিস্থিত মরীচি মালায় জলপ্রবাহ প্রতীতি হয়, অথবা সুবর্ণে কটকের (অলঙ্কারের) জ্ঞান হয়, সেইরূপ, অসৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চও চিদাত্মায় সতের ন্যায় প্রতিভাত হয়[১৪।১৫]।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐরূপে রামপ্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। লীলা বর্ণিতপ্রকারে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করতঃ দেবীসকাশে বর্ণন করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের সম্মুখবর্ত্তী এক পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে তথা হইতে নির্গতা হইলেন। গ্রামস্থ জনগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর গ্রামস্থ জনগণের অদৃশ্যভাবে সেই গৃহ হইতেও নির্গতা হইলেন।

অনন্তর সেই লোকললামভূতা ললনাদ্বয় তথা হইতে বহির্গত হইয়া পুরোভাগস্থিত গিরি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ঐ ভীষণ ভূধরের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সকল যেন গগনমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আদিত্যমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে[১৬।১৭]। ঐ ভূধরের স্থানে স্থানে নানা রঙের ফুল ও নানাবিধ বৃক্ষের বন বিরাজিত রহিয়াছে। কোথাও নির্ম্মল নির্ঝর কল ঝর্ঝর শব্দে নিপতিত হইতেছে। কোন কোন প্রদেশে বনবিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে[১৮]। কোন কোন স্থানে অভ্রভেদী উচ্চ কম্পিতাগ্র বৃক্ষের অগ্রভাগে বিচিত্র সারস পক্ষী বিশ্রাম করিতেছে[১৯]। কোন স্থানে প্রবাহিত পার্ব্বত্য নদীর তীর ভূমি বেতস বনে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। কোন কোন স্থানে সুবিস্তীর্ণ নদীবক্ষে তরঙ্গমালা সমুত্থিত, কোন স্থানে নদীতট বনবৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত, কোন কোন স্থানে বহুল পুষ্পবিরাজিতশিখর দ্রুম সকল আকাশকোশস্থিত বারিদ মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করতঃ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে বনবিরাজিত তরুৎ সকলের অবস্থান প্রযুক্ত সেই সেই স্থানের ছায়া সততই শান্ত ও সুশীতল বলিয়া অনুভূত হইতেছে[২০।২২]।

রাঘব! অনন্তর সেই রমণীদ্বয় সেই পর্ব্বতের অন্যতম প্রদেশে আকাশ হইতে অবতরিত স্বর্গখণ্ডের ন্যায় গিরিগ্রাম দেখিতে পাইলেন[২৩]।

এই গ্রাম নানা প্রকার জলপ্রণালী ও সলিলপূর্ণ সরোবর দ্বারা শোভমা রহিয়াছে, বিহঙ্গমগণ কুচকুচ ধ্বনি করতঃ লীলার্থে সেই সকল সরো বরের তীরে গমন করিতেছে,[২৪] কোন কোন স্থানে গোসমূহ হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া ছায়াবিশিষ্ট ও গুল্মসমাচ্ছন্ন বনকুঞ্জাভিমুখে গমন কর তেছে[২৫]। এই সকল বন সূর্য্যরশ্মির অপ্রবেশ হেতু সততই নীহার ধূসরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, এতন্মধ্যে কোন কোন বৃক্ষে মঞ্জরীপুঞ্জবিশিষ্ট জটাবলম্বী ঊর্দ্ধগামিনী শেখর (অগ্রভাগ) ভারাক্রান্ত হওয়াতে অবনত হইয়া রহিয়াছে[২৬]। এই গিরিগ্রামের অন্য এক স্থানে শিলাকুহর হইতে নিপতিত নির্ঝরধারা শত শত বিম্ব উৎপন্ন করিতেছে, সে সকল দেখিতে মুক্তামালার অনুকারী এবং তাহা দেখিলে দেবাসুরের ক্ষীরোদমন্থনের শ্রীসৌষ্টব স্মৃতি পথাগত হয়[২৭]। এই গ্রামের অনেক স্থানেই দেখা যায়, অজিরস্থিত বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পসম্ভারধারী মান বের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে[২৮]। কোন কোন স্থানে পুষ্পিত বৃক্ষাগ্র হইতে অজস্র পুষ্পবর্ষণ হইতেছে, কোন কোন স্থানে পক্ষিগণ শিলো পরি নির্ঝরজলপতনের কঠোর শব্দ শুনিয়া ধনুষ্টঙ্কারশব্দ ভ্রমে বৃক্ষপত্র মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে, কোন কোন স্থানে রাজহংসগণ নদীলহরী আস্ফালনে এক দিক্ হইতে অপর দিকে নীত হইয়া নক্ষত্রপঙ্‌ক্তির ন্যা পরিবর্ত্তিত হইতেছে[২৯।৩১]। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বালকেরা কাকে ও বিড়ালের ভয়ে ক্ষীর শর ছানা মাখম প্রভৃতি খাদ্য সকল লুকাই রাখিতেছে, আবার অন্য স্থানে দেখা যায়, গ্রামবালকেরা ফুলের বসন ফুলের ভূষণ পরিধান করিয়া বেড়াইতেছে। কোন বালক খর্জ্জুর বনে কোন বালক জম্বীর বনের ছায়ায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছে[৩২।৩৩] দরিদ্র, নীচ, অলস, এই সকল মনুষ্যের রমণীরা ক্ষুধাক্লেশে ক্ষীণাঙ্গি হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, গ্রাম্য জনগণ তাহাদিগকে কী অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেছে, ভিল্ রমণীরা পত্রের ও অতসী ত্বকে বস্ত্র পরিধান ও কর্ণে পুষ্পমঞ্জরী স্থাপন করতঃ ভ্রমণ করিতেছে,[৩৪] অ এক স্থানে ঝঙ্কারকারী মারুতের হিল্লোলে সরিত্তরঙ্গ কম্পিত হইতে ও তাহার কল্লোলের কলকল ধ্বনিতে তত্রস্থ জনগণের পরস্পরালাপ শু যাইতেছে না। এই গ্রামের অপর এক স্থানে ভীরুস্বভাব অনেকগু অলস ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে, অপর এক স্থানে উলঙ্গ বালক

হস্তে, বদনে ও স্কন্ধে দধি ম্রক্ষণ করতঃ হস্তে লতা ও পুষ্প ধারণ করিয়া এবং কোন কোন বালক অঙ্গে গোময়ের ও পঙ্কের রেখাঙ্ক ধারণ করিয়া নৃত্যের ও ক্রীড়ার দ্বারা চত্বরভূমি সমাকুল করিতেছে[৩৫।৩৬]। কোন কোন স্থানে তরঙ্গসঙ্কুল নদীর স্রোতঃপ্রবাহে তীরস্থিত তৃণ সকল কম্পিত হইয়া বালুকাময় তীরে রেখাসমূহ উৎপাদন করিতেছে[৩৭]। কোন কোন স্থানে দধিক্ষীরাদির নিবিড় গন্ধে মন্থর হইয়া মক্ষিকা সকল উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভণ্ ভণ্ শব্দ করিতেছে, কোন স্থানে কৃশ-দুর্ব্বল বালকগণ অভিলষিত বস্তুর নিমিত্ত নয়নবিগলিত বাষ্পবারির দ্বারা বিক্তাঙ্গ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে[৩৮]। কোন স্থানে ইতর রমণীরা গৃহ লেপন করিতে করিতে গোময়পঙ্কলিপ্ত হস্তে ঝকড়া বাঁধাইয়া ক্রোধে অধীরা হইয়া এলোথেলো বেশে উচ্চ গলধ্বনি করিতেছে, এবং তাহাদিগকে দেখিয়া নগরবাসী সভ্য বালকেরা হাস্য করিতেছে[৩৯]। অপর এক স্থানে শান্ত স্বভাব মুনিরা প্রাণিগণের উদ্দেশে ভক্ষ্য বিকীরণ করিয়াছেন (ছড়াইয়া দিয়াছেন) ও কাকাদি পক্ষী অবিশঙ্কিত চিত্তে আগমন করতঃ সে সকল ভক্ষণ করিতেছে[৪০]। কোন কোন প্রদেশে গৃহপার্শ্বস্থ পুষ্পকাননে প্রাতঃসমীরণের আন্দোলনে রাশি রাশি পুষ্প নিপতিত হইতেছে। কোন স্থানে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ গিরিশিখর হইতে আপতিত যজ্ঞস্থানস্থিত বলিভোজী বায়সগণকে পুষ্পপত্রাদির দ্বারা ইতস্ততঃ উৎসারিত করিতেছেন। কোন কোন স্থানে গৃহদ্বার ও পন্থা সকল কণ্টকযুক্ত কুরণ্টক (গুল্মবিশেষ) দ্বারা সমাকীর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থানে জঙ্গলবিহারী তৃণভোজী মৃগ ও বিহঙ্গমগণ বিচরণ করিতেছে। কোন কোন স্থানে মৃগশিশু নিঃশঙ্কচিত্তে নিকুঞ্জজাত নবতৃণোপরি নিদ্রিত রহিয়াছে[৪১।৪২]। কোন কোন স্থানে গোবৎসগণ পুষ্প শয্যায় শয়ন করিয়া কর্ণস্পন্দন দ্বারা অঙ্গস্থ মক্ষিকাগণকে উৎসারিত করিতেছে। কোন কোন স্থানে মক্ষিকাপুঞ্জ গোপ দিগের ভক্ষণাবশিষ্ট দধির নিমিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইতেছে[৪৩]। কোন কোন স্থানে দেখিলেন, মধুমক্ষিকাগণ গৃহে গৃহে মধুচক্র রচনা করিতেছে। কোন কোন স্থানে অশোকপাদপোদ্যানে লাক্ষারঞ্জিত কাষ্ঠের ক্রীড়ামন্দির সংস্থাপিত রহিয়াছে[৪৪]। কোথাও বা জলকণবাহী মারুত কর্ত্তৃক প্রত্যহ আর্দ্র হওয়াতে কদম্বদ্রুম সকল নিত্য মুকুলিত, তৃণরাজি অঙ্কুরিত,

লতানিকর বিকসিত, শুভ্রবর্ণ কেতকী পুষ্প প্রস্ফুটিত ও সমুদয় বৃক্ষ প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রামের কোন কোন প্রদেশে পয়ঃপ্রণালী দিয়া পয়োরাশি গুব্ গুব্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে[৪৫।৪৬]।

অনন্তর সেই রমণীদ্বয় ঐ গিরিগ্রাম মধ্যে অত্যুচ্চ অট্টালিকা শ্রেণী ও প্রফুল্লকমলদলশোভিত পুষ্করিণীবিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্রপ্রভাবিকাসী শুভ্রবর্ণ মনোহর গিরিমন্দির অবলোকন করিলেন। এই গিরিমন্দিরসমূহ সৌন্দর্য্যগুণে পুরন্দরমন্দিরকেও পরাভব করিয়াছে। নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া, নির্ম্মল শাদ্বল ভূমি, তত্রস্থ প্রতিতৃণের অগ্রভাগে তারকাকার নীহার-বিন্দু পরম শোভা বিস্তার করিতেছে[৪৭।৪৮]। অনবরত নীহারপাতে ও পুষ্পনিপতনে তত্রস্থ মন্দির সকল কুন্দকুসুমসদৃশ শুভ্রবর্ণ দেখাইতেছে। স্থানে স্থানে মঞ্জরীপুষ্পের পাদপ, পত্রপাদপ ও ফলবৃক্ষ সকল শোভা বিস্তার করিতেছে। মেঘ সকল গৃহ কক্ষার অন্তরালে নিবিষ্ট থাকিয়া সেই সেই স্থানে তড়িতের দ্বারা আলোকিত হইতেছে[৪৯।৫০]। স্থানে স্থানে হারীত ও চকোর প্রভৃতি পক্ষিগণ অবিরত কাকলী শব্দে গান করিতেছে, এবং শুক, শারিকা ও দ্রোণকাক প্রভৃতি বিহঙ্গম নিচয় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ঐ সকল মন্দির কুসুমসুরভিবাহী সমীরণ দ্বারা সাতিশয় আমোদিত ও স্থানে স্থানে পথ সকল আলোলপল্লব লতাবলয় দ্বারা বেষ্টিত। কোন কোন স্থানে শাল তাল ও তমাল বৃক্ষ শ্রেণীকৃত, কোন কোন স্থানে লতাবিতানের শোভা, স্থানে স্থানে লতা-বলয়িত বৃক্ষশ্রেণী এবং তদ্দ্বারা যেন পথ সকল অবরুদ্ধ রহিয়াছে[৫১।৫৫]। কোন কোন স্থানে অন্তঃপ্রবাহশালিনী শব্দায়মানা নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত গোকুল ও গোপ সকল ব্যাকুল হইতেছে। এই সকল মন্দির উদ্যানজাত কুন্দ-মকরন্দ-সুগন্ধির দ্বারা সতত্ই আমোদিত রহিয়াছে; ষট্পদগণ মকরন্দ গন্ধে অন্ধ হইয়া কমলদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সকল মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই স্থানে যে সকল ফুল্ল পদ্ম বিরাজ করিতেছে, সেই সকল পদ্মের পরাগরাশি বায়ু প্রবহনে উড্ডীন হইয়া গগনমণ্ডল অরুণিত করিতেছে[৫৬।৫৭]। উহার স্থানে স্থানে বেগবতী গিরিনদী ঝর ঝর শব্দ করতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কোন কোন সৌধের (সৌধ=শ্বেত প্রাসাদ) অলিন্দ দেশে ফুল্লকুসুমশোভিত লতানিকুঞ্জ সংস্থাপিত রহিয়াছে। কোন স্থানে লীলাবিলাসী চঞ্চল

হঙ্গমগণ অবিরত কলকল ধ্বনি করতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে[৫৮]।
ান স্থানে যুবকগণ সোল্লাস চিত্তে কুসুমাস্তরণে উপবিষ্ট রহিয়াছে।
কান কোন স্থানে বিলাসিনীগণ পাদতল পর্য্যন্ত লম্বমান মাল্যে শোভিত
ইয়া অবস্থিতি করিতেছে। এবং সর্ব্বত্রই নবাঙ্কুরসম্পন্ন শরস্তম্ব সকল
তাবিজড়িত থাকায় অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে[৫৯]। কোন
কান স্থানে সুকোমল উৎপল-লতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং অপর কোন
নে তাহা কুসুমিত হইয়াছে। তত্রস্থ কোন কোন গৃহে পয়োদ (মেঘ)
লা সংলগ্ন রহিয়াছে। এবং কোন কোন স্থান হরিদ্বর্ণক্ষেত্রে নীহারবিন্দুসমূহ
নপতিত হইয়া হারাবলীর শোভা বিস্তার করিতেছে। আবার অন্য
ক স্থানে অঙ্গনাগণ সৌধস্থ মেঘতড়িত দ্বারা সমাকুলিত হইতেছে।
বং আর এক স্থানে জনগণ নীলোৎপল সৌরভ দ্বারা উল্লাসিত হই-
তছে। কোন কোন স্থানে গো সমুদয় তৃণপূরিতমুখে হুঙ্কার রব
রিতেছে এবং অন্য এক স্থানে অজির ভূমিতে মৃগ সকল বিশ্বস্ত-
াবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এই গিরিগ্রামের অন্য এক প্রদেশে
র্ঝর-শীকর নিপতন স্থলে শিখীকূল নৃত্য করিতেছে এবং সমুদায়
গরিমন্দির সুগন্ধবাহী সমীরণ দ্বারা বীজিত হওয়ায় জনগণের ইন্দ্রিয়-
বকুল্য তিরোহিত করিতেছে। বপ্রস্থিত ওষধি সকলের দীপ্তির দ্বারা
ত্রস্থ জনগণ দীপালোক বিস্মৃত হইয়াছেন। নীড়স্থিত পক্ষিকুলের
লরবে গিরিমন্দির সকল আকুলিত হইতেছে এবং গিরিনির্ঝরের কল-
ল ধ্বনিতে তত্রত্য মানবগণের সংলাপ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। এই
গরিমন্দিরের নিখিল দ্রুম, লতা, তৃণ, এবং পল্লব হইতে মুক্তাফলের
ায় পরম সুন্দর শিশিরবিন্দু সকল নিপতিত হইতেছে। এবং বিক-
াত কুসুমশোভা অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত থাকায় বোধ হইতেছে যে,
ন লক্ষ্মী এই গিরিগ্রামে নিত্য বিরাজমানা রহিয়াছেন[৬০।৬৩]।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষে ভোগ ও মোক্ষ উভয় শ্রী প্রবিষ্ট হয়, তেমনি, সেই শান্ত্যাদি সাধন সম্পন্না দেবীদ্বয় সেই অন্তঃশীতল সুরম্য গিরিগ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ঐ সকল দর্শন করিলেন। লীলা এ পর্য্যন্ত যে জ্ঞানাভ্যাস করিয়াছিলেন, সেই অভ্যাসের প্রভাবে এক্ষণে বিশুদ্ধজ্ঞানদেহিনী ও ত্রিকালদর্শিনী হইয়াছেন[১।২]। সেই নিমিত্ত এখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বসংসারের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। তাই এখন গিরিগ্রাম দৃষ্টে লীলার পূর্ব্বতন জন্ম মরণ প্রভৃতি সমুদায় ভাব সহজে স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল[৩]।

লীলা বলিতে লাগিলেন, দেবি! আপনার প্রসাদে এই দেশ দর্শন করিয়া আমার প্রাক্তন জন্মপরম্পরা ও সেই সেই জন্মের কার্য্যচেষ্টাদি সমুদয় স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে[৪]। পূর্ব্বে আমি শিরাব্যাপ্ত শরীরা কৃষ্ণবর্ণা ব্রাহ্মণীরূপে এই স্থানে বৃদ্ধা ও অতিশয় কৃশাঙ্গিণী হইয়াছিলাম। এই সকল শুষ্ক দর্ভাগ্র দ্বারা আমার পদতল ও করতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল[৫]। এই স্থানে আমি দোহন পাত্র ও মন্থনদণ্ড ধারিণী হইয়া ভর্ত্তার কুলকরী ভার্য্যা হইয়াছিলাম এবং পুত্রগণের ও অতিথিদিগের প্রিয়ানুষ্ঠানে অনুরক্তা ছিলাম[৬]। দেব, দ্বিজ ও সাধুগণের প্রতিও অনুরক্তা ছিলাম এবং সতত ঘৃতের ও দুগ্ধের দ্বারা সিক্তাঙ্গী থাকিতাম। এই স্থানে আমি ভর্জ্জনপাত্র ও চরুস্থালী প্রভৃতি মার্জ্জন করিতাম এবং একটীমাত্র কাচবলয় (কাচের বালা বা চুড়ি) প্রকোষ্ঠে ধারণ করত জামাতা, দুহিতা, পিতা, মাতা ও ভ্রাতাদিগের পরিচর্য্যা করিতাম। অপিচ, কার্য্যের ত্বরানিবন্ধন নিরন্তর তাঁহাদিগকে "সত্বর স্ব স্ব কার্য্য সাধন কর, বিলম্ব করিতেছ কেন?" এই বলিয়া ব্যাকুলা হইতাম। যত দিন না আমার দেহপাত হইয়াছিল, তত দিন আমি ঐ প্রকারে সংসারের দাসীত্ব করিয়াছিলাম[৭।৯]। হে দেবি! আমার ন্যায় আমার সেই শ্রোত্রিয় পতিও গৃহাসক্ত ছিলেন। আমি কে? সংসার কি!

ৎস্বরূপ? এ সকল এক দিনের জন্যও এবং স্বপ্নেও ভাবি নাই। ামার সেই শ্রোত্রিয় পতির ন্যায় আমিও অত্যন্ত মূঢ়বুদ্ধি ছিলাম[১০]। ামি কেবল সমিৎ, শাক, গোময় এবং ঈন্ধন সঞ্চয়ে সতত যত্নপরায়ণা াকিতাম। একমাত্র মলিন কম্বল আমার ব্যবহারোপযোগী ছিল এবং তত সাংসারিক কার্য্যে ব্যাসক্ত থাকায় আমার শরীর কঙ্কালমাত্রে র্য্যবসিত হইয়াছিল[১১]। আমি বৎসগণের কর্ণকীট নিষ্কাসনে তৎপরা াকিতাম। এই স্থানে আমি পরিচারিকার ন্যায় গৃহস্থিত শাকক্ষেত্রে লসেক ও তরঙ্গসঙ্কুল নদীতীরস্থিত তৃণ আহরণ পূর্ব্বক বালবৎস গণের প্তি সাধন ও প্রত্যহ বর্ণক দ্বারা গৃহ দ্বার রঞ্জিত করিতাম[১২।১৩]। যাহারা ামাকে জানিত না তাহারা আমাকে আক্ষেপ বাক্যে নিন্দা করিত। লিত, "এমন লোকের বাড়ী এমন অবিনীতা পরিচারিণী কি প্রকারে বস্থিতি করিতেছে?" সমুদ্র যেমন বেলা অর্থাৎ তীর ভূমি অতিক্রম রে না, সেইরূপ, আমিও তাঁহাদিগের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতাম [১৪]। ঐরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে আমি জরা কর্ত্তৃক আক্রান্তা ইয়াছিলাম। তখন আমার দেহ জীর্ণপর্ণের ন্যায় শিরাবিশিষ্ট হইয়াছিল শিরঃকম্পন দ্বারা আমার দক্ষিণ কর্ণ নিরন্তর দোলায়মান হইত। মে আমি বধির হইয়াছিলাম। কোন বলবান লোক দুর্ব্বলকায় াকের বধার্থ যষ্টি উদ্যম করিলে সে যেরূপ ভীত হয়, আমি জরার াগমনে সেইরূপ ভীতা হইয়াছিলাম[১৫]।

বশিষ্ঠমুনি বলিলেন, রাঘব! লীলা এই সকল কথা কহিতে লাগি- ান এবং গিরিগ্রাম কোটরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেন ানি আপনাকে ও দেবীকে বিস্মাপিত করতঃ বলিতে লাগিলেন[১৬]। দেবি! দেখুন এই আমার গুল্মপরম্পরামণ্ডিত পুষ্পবাটিকা। এই ামার পুষ্পোদ্যানস্থিত অশোকবাটিকা[১৭]। পুষ্করিণী তীরে দ্রুমতলে যে বৎসটী অল্প রজ্জু গ্রন্থির দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে, ওটী আমারই সেই র্ণিকা-নামক বৎস[১৮]। আহা! এই ধূলিধূসরিত শান্তপ্রকৃতি অবোধ ৎসটী আমার বিয়োগদুঃখ নিবন্ধন এক্ষণে সাতিশয় কৃশ ও বলহীন ইয়াছে এবং অদ্য আট দিন বাষ্পক্লিন্নাক্ষ হইয়া রোদন করিতেছে[১৯]। হে দেবি! আমি এই স্থানে ভোজন, এই স্থানে উপবেশন, এই ানে পান, এই স্থানে দান ও এই স্থানে ধান্যাদি আহরণ করি-

তাম[২০]। ঐ আমার জ্যেষ্ঠশর্ম্মানামক পুত্র গৃহমধ্যে রোদন করি তেছে। ঐ আমার দুগ্ধবতী ধেনু তৃণপূরিত ক্ষেত্রে বিচরণ করি তেছে[২১]। ঐ আমার প্রিয়জনেরা গৃহবহির্দ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক ধূলি বিধূসরাঙ্গ হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতেছে[২২]। ঐ আমার স্বহস্ত রোপিত তুম্বী লতা, যথোচিত পরিপালিতা না হইলেও পরিপুষ্টা হইয়া বহু প্রদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঐ আমার পাকশালা। ঐ পাক শালা আমার শরীর অপেক্ষা যত্নের ও আদরের ছিল[২৩]। ঐ আমার সংসারের সাক্ষাৎবন্ধনস্বরূপ বন্ধুগণ হস্তে রুদ্রাক্ষ বলয় অর্পণ করিয়া অনলেন্ধন (অগ্নি ও কাষ্ঠ) আহরণ করিতেছে। নিরন্তর রোদন দ্বারা উহাদিগের চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হইয়াছে[২৪]। ঐ আমার প্রফুল্ললতাপরিবেষ্টিত গুলুচ্ছদলসমাচ্ছন্ন গবাক্ষবিশিষ্ট সুন্দর গৃহমণ্ডপ লক্ষিত হইতেছে[২৫]। ঐ মণ্ডপ কুল্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শোভমানা। ঐ সমস্ত কুল্যার জলতরঙ্গ অনবরত শিলারাশিতে আঘাত করাতে তরঙ্গভঙ্গশীকর সমুত্থিত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের কিরণজাল ও তীরস্থিত বৃক্ষ সকলকে সমাচ্ছন্ন করিতেছে[২৬।২৭]। ঐ দেখুন, তরঙ্গান্দোলিত লতা সমুদয়ের আস্ফালনে উৎপল সকল ফেনিল ও কম্পিত হইতেছে। উহার তটস্থিত প্রফুল্লকুসুমপূর্ণ বৃক্ষে ভ্রমর সকল নিনাদ করিতেছে। ঐ কুল্যার তরঙ্গমালা ভীষণ শব্দে আবর্ত্তিত হইতেছে। উহার তরঙ্গাস্ফালনে তটসন্নিহিত উৎপল সকল ধৌত হইতেছে, এবং ঐ মণ্ডপ ঘনপত্রসম্পন্ন তরুরাজির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় উহার ছায়া সততই সুশীতল অনুভূত হইয়া থাকে[২৮।৩১] হে দেবি! এই স্থানে আমার ভর্ত্তা জীবাকাশ (জীব প্রকৃতপক্ষে আকাশের ন্যায় নির্লেপ ও নিষ্ক্রিয়) হেতু নিষ্ক্রিয় হইলেও আসমুদ্র মেদিনীর অধিপতি হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[৩২]। আমার স্মরণ হইতেছে, ইনি শীঘ্র রাজা হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে[৩৩]। ইনি আট দিনের মধ্যেই চিরাভিলষিত সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যলাভ করিয়াছেন। বায়ু যেমন আকাশে অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় আমার সেই ভর্ত্তৃজীব এই গৃহাকাশে অবস্থিতি করিতেছেন। এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই আমার সেই ভর্ত্তৃজীব যোজনকোটিবিস্তৃত মহারাজ্য অনুভব করিতেছেন[৩৪]। পরমেশ্বরি! আমার এই সকল সংসার, আমার ঐ ভর্ত্তা

র্তৃরাজ্য, সমস্তই চিদাকাশ। কিন্তু এমনি মায়ার কাণ্ড যে, আমার র্তৃরাজ্য তদ্রূপ হইলেও যেন উহা সহস্র সহস্র শৈলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে[৩৫।৩৭]। হে দেবি! প্রোক্ত কারণে আমি পুনর্ব্বার ভর্তৃনগরে গমন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, আপনি আগমন করুন, আমরা পুনর্ব্বার থায় গমন করিব। ব্যবসায়ী দিগের আবার দূর নিকট কি? ব্যবসায়ী=দৃঢ়সঙ্কল্পধারী)[৩৮]

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! লীলা ঐ প্রকার কহিলে পর দেবী রস্বতী ও লীলা উভয়ে সেই কুসুমপ্লাভ মণ্ডপাকাশে প্রবেশ পূর্ব্বক দন্তর্গত মহাকাশে পক্ষিণীর ন্যায় উড্ডীনা হইলেন[৩৯]। এই আকাশ রলায়িত কজ্জলতুল্য গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ অথচ মনোজ্ঞ। দেখিতে নিশ্চল ও ক্ষোভ্য একার্ণব সদৃশ। নারায়ণের অঙ্গপ্রভার ন্যায় প্রভাশালী ও ভৃঙ্গ-ষ্ঠের ন্যায় সুচিক্কণ[৪০]। তাঁহারা প্রোক্ত আকাশস্থ মেঘমার্গ অতিক্রম রিয়া বায়ুপূর্ণ প্রদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যালোক ও চন্দ্র-াক অতিক্রম করিলেন[৪১]। সূর্য্যালোকাদি অতিক্রম করিয়া ধ্রুবলোকে পনীত হইলেন। তথা হইতে সাধ্যলোকে, তথা হইতে সিদ্ধলোকে গমন রিলেন। ঐ সকল স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া পরে ব্রহ্মলোকে উপনীত লেন। তথা হইতে তুষিত (নিত্যতৃপ্ত) দিগের বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত লেন। অনন্তর গোলোক, শিবলোক, পিতৃলোক ও দূরস্থিত বিদেহ ও দহ দিগের লোক সকল সমুত্তীর্ণ হইলেন। লীলা একবার মাত্র রূপে দূর হইতে দূরে গমন করিয়া চকিতের ন্যায় আপনার অপরি-রতা বিস্মৃত হইলেন। যেমন বিস্মৃত হইলেন, তেমনি পশ্চাৎ ভাগ লোকন পূর্ব্বক দেখিলেন, অধোভাগ অন্ধকারময়। তথায় চন্দ্র, সূর্য্য তারাদি কিছুই লক্ষিত হয় না। দিক্ সকল একার্ণবোদরের ন্যায় পর্ব্বতগুহার ন্যায় তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে[৪২।৪৩]। তাহা দেখিয়া লীলা স্বতী দেবীকে বলিলেন, দেবি! চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র তারকাদির তেজ ালোক) কোথায় গেল? কোন্ অধস্তলে গেল? কেনই বা এখানে াভ্যরের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ ঘোর অন্ধকার? এত ঘন অন্ধকার থা হইতে আসিল তাহা আমাকে বলুন[৪৭]।

সরস্বতী বলিলেন, লীলে! তুমি আকাশপথের এত দূরে আগমন রিয়াছ যে, এখান হইতে অর্কাদি তেজঃপদার্থ কিছুই দৃশ্য হয় না।

যেমন অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপের অধোভাগস্থিত খদ্যোত দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ, এখান হইতে দূরোর্দ্ধগামী কর্ত্তৃক অধোভাগস্থিত সূর্য্যাদি দৃশ্য হয় না[৪৮,৪৯]।

লীলা বলিলেন, মাতঃ! ইহার উত্তরে কোন্ পথ? তাহা কি প্রকার? এবং এ পথে কোথায় ও কি প্রকারে গমন করা যায়? এই সকল আমাকে বলুন[৫০]। দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, ইহার উত্তরে ও অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড পুটের উর্দ্ধ কর্পর। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি ঐ ব্রহ্মাণ্ড কর্পরের কণিকামাত্র[৫১,৫২]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! সেই দুই ললনা ঐরূপ কথোপকথন করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড কর্পর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের এই কার্য্য ভ্রমরীদ্বয়ের নিশ্ছিদ্র পর্ব্বত গর্ত্তে ও কুড্যে প্রবেশ করার সহিত তুলিত হইতে পারে। গগন হইতে ব্রহ্মাণ্ড কর্পর প্রবেশ করিতে তাঁহাদের অল্পমাত্রও ক্লেশ হইল না। যাহা সত্য বলিয়া নিশ্চয় থাকে তাহাই বজ্রসদৃশ দুর্ভেদ্যে পর্য্যবসিত হয়। যাহা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত থাকে তাহা ভেদ করা জ্ঞানীর পক্ষে কঠিন নহে[৫৩,৫৪]। অনন্তর সেই অনাবৃতপ্রজ্ঞা ললনাদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপের পারে অবস্থিত বৃতির (বৃতি= বেষ্টন, প্রাচীর) স্বরূপ জলাদি আবরণ অবলোকন করিলেন। প্রথম আবরণ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের দশ গুণ ভাস্বর জলরাশি। দ্বিতীয় আবরণ তাহার দশ গুণ হুতাশন। তৃতীয় আবরণ সেই বহ্নির দশ গুণ মারুত। চতুর্থ আবরণ তদ্দশগুণ ব্যোম। এই ব্যোম অসীম অম্বরে (অবিদ্যা-সম্বলিত চিদাকাশে) পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। হে রাঘব! এই নির্ম্মল শান্তস্বরূপ অনন্ত চিদাকাশের আদি, অন্ত বা মধ্য, কিছুই নাই। যদি উহার কোন স্থান হইতে শিলাখণ্ড তীব্রবেগে আকল্প পর্য্যন্ত অধোভাগে নিপতিত হইতে থাকে, পতগরাজ গরুড় যদি প্রবলবেগে আকল্প পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উৎপতিত হইতে থাকেন, অথবা মারুত (বায়ু) যদি উহার অন্তরালে আকল্প পর্য্যন্ত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হন, তাহা হইলে, উঁহাদের কেহই অনাদি অনন্ত চিদাকাশের সীমা প্রাপ্ত হইবে না। এই আদি, অন্ত ও মধ্য বিরহিত শুদ্ধ বোধময় অনন্ত পরমাকাশ কেবল স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে[৫৫,৬০]।

উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাঁহারা নিমেষ মধ্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডকর্পরে পর পর দশ গুণ অধিক পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অতিক্রম করতঃ অসীম পরমাকাশ অবলোকন করিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন, প্রাগ্বর্ণিত ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণ জগৎ ও অন্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উক্ত পরমাকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে[১।২]। যেমন গবাক্ষরন্ধ্রে নিপতিত সূর্য্যকিরণে লক্ষ লক্ষ ত্রসরেণু ভাসিতে দেখা যায় তাহার ন্যায় জলাদি-আবরণ-বিশিষ্ট কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উক্ত পরমাকাশে ভাসমান রহিয়াছে[৩]। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশরূপ মহাসমুদ্রের মহাশূন্য অবিদ্যারূপ বারির ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্[৪]। আরও দেখিলেন, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের কতক অধোভাগে, কতক ঊর্দ্ধভাগে এবং কতক তির্য্যগ্‌ভাবে গমনাগমন করিতেছে এবং কতক নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছে[৫]। * বৎস রাম! ঐ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী জীবের সম্বিদনুসারেই প্রস্ফুরিত হইতেছে। (সম্বিৎ = ধ্যানাদিজনিত সংস্কারে সমুজ্জলিত জ্ঞান)। যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, ধ্যান বা উপাসনা করিয়াছিল, ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকট সেই-রূপেই অবস্থিত ও প্রতিভাত হইতেছে[৬]। যাঁহারা বস্তুদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডের অধঃ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ কিছুই নাই। তাঁহারা যাহা দৃষ্টিগোচর করেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে সে সমস্তই চিদাকাশ। সুতরাং ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছু বাস্তব আকার নাই। ঐ সকল শূন্যপদ ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে। সম্বিদের স্বভাব এই যে, সে, সঙ্কল্পের দ্বারা বালকের সঙ্কল্প জালের ন্যায় চিদাকাশে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের কাল্পনিক সৃষ্টি স্থিতি লয় নির্ব্বাহ করে[৭।৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যদি ব্রহ্মাণ্ডাধারে অধঃ ঊর্দ্ধ তির্য্যকত্ব না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে তৎপরিকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে অধঃ ঊর্দ্ধা-দির দর্শন সঙ্গত হইতে পারে?[৯] বশিষ্ঠ বলিলেন বৎস! যেমন নির্ম্মল

---

* জ্যোতির্ব্বিদেরাও বলিয়া থাকেন, পৃথিব্যাদি ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর পরস্পরকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে।

আকাশে দূষিতদৃষ্টি নরেরা কেশোণ্ডুক দর্শন করে, তেমনি, আদ্যন্তাদি-রহিত নির্ম্মল চিদাকাশে স্বাশ্রিত অবিদ্যাদোষে ঐ সকল সাবরণ ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে[১০]। ফলতঃ সমুদায় পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডাধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপে প্রধাবিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরকল্পিত সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডের পার্থিব ভাগই অধঃ এবং তদ্বিপরীত ভাগই ঊর্দ্ধ। কল্পিত ঊর্দ্ধাধঃ ব্যতীত বাস্তব ঊর্দ্ধাধঃ নাই। সেইজন্যই শাস্ত্রাদিতে উদাহৃত হইয়াছে যে, আকাশমধ্যগত বর্ত্তুলাকার লোষ্ট্রের পৃষ্ঠস্থিত পিপীলিকার পাদ-সংলগ্ন ভাগই অধঃ এবং তাহার বিপরীত ভাগই ঊর্দ্ধ[১১।১২]। বৎস! ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়প্রদেশে অর্থাৎ মধ্যভাগে ভূতল; তাহা কেবল বৃক্ষবল্মীকাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ তাহাতে মনুষ্যের বাস নাই। কিন্তু তাহার ব্যোম ভাগ সুর অসুর ও কিম্পুরুষ (কিম্পুরুষ=দেবযোনি বিশেষ) লোকে পরিব্যাপ্ত[১৩]। আবার ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীব-বর্গের সহিত, গ্রাম নগরাদির সহিত ও বৃক্ষপর্ব্বতাদির সহিত উৎপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে[১৪]। যেমন বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন কোন অরণ্য-বিভাগে হস্তী জন্মে, সর্ব্বত্র নহে, তেমনি, চিদাকাশের মায়া সমন্বিত প্রদেশেই ত্রসরেণু তুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, সর্ব্বাংশে নহে[১৫]। সমুদায় পদার্থ উৎপত্তিকালে উক্ত চিদাকাশেই উৎপন্ন হয়, স্থিতিকালেও তাহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে আবার তাহাতেই বিলীন হয়। সুতরাং তাহাই সর্ব্বময়[১৬]। সেই শুদ্ধবোধময় পরমালোক চিদাকাশ-বারিধি হইতে অজস্র ব্রহ্মাণ্ডনামক তরঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছে[১৭]। সেই চিদাকাশরূপ মহার্ণবের মধ্যে অনেক তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) অব্যাকৃত আছে, (এখনও উৎপন্ন হয় নাই) সে সকল তরঙ্গ পরে উঠিবে, এবং কোন কোন তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) সুষুপ্ত প্রায় রহিয়াছে। সে সকল তরঙ্গ তর্কণার (অনুমানের) দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে[১৮]। আবার এমন সকল তরঙ্গ (ব্রহ্মাণ্ড) আছে, যাহার কল্লোল প্রবৃত্ত ঘর্ঘর শব্দ অদ্যাপি কেহ জানে নাই ও শুনে নাই।* অপিচ, কোথাও বা কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাত্র সৃষ্ট্যারম্ভ হইয়াছে।

---

* অভিপ্রায় এই যে, প্রতিক্ষণেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ হইতেছে। অন্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও স্থিতি হইতেছে। অজ্ঞ জীব তাহা জানিতেছে না।

সে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি নিতান্ত পরিশুদ্ধ। যেমন সিক্ত বীজের কোষ হইতে প্রথমে শুভ্রবর্ণ অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তেমনি, তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভূভাগ হইতে শুদ্ধস্বভাব জীবই উৎপন্ন হইয়া থাকে[১৯।২০]। যেমন তাপসংযোগে ঘনীভূত হিম গলিতে থাকে; তেমনি, আমাদের এই কথোপকথন সময়ে কত শত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়াতে তত্রস্থ ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও অদ্রি প্রভৃতি গলিতে আরম্ভ হইয়াছে[২১]। কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড আধার প্রাপ্ত না হইয়া আকল্প পর্য্যন্ত অধোভাগে নিপতিত হইতেছে এবং কতকগুলি স্তব্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ফলতঃ এমন মনে করিও না যে, সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের পতনাদি অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে সমস্তই সুসম্ভব। যখন সমস্তই বাসনাময় সম্বিদ্, তখন, যে কোন কল্পনা, সমস্তই সুসম্ভব। যেমন বায়ুর স্পন্দন ও আকাশে কেশোণ্ড্রুক দর্শন, উক্তপ্রকার সম্বিদের উদয়ও সেইরূপ[২২।২৩]। যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বেদশাস্ত্রানুযায়ী জ্ঞান কর্ম্মাদির অর্জ্জন দ্বারা কল্পারম্ভ কালে এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিধাতা হন তাঁহার এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সহিত অন্য ব্রহ্মাণ্ডনাথের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বৈলক্ষণ্য আছে। সে বৈলক্ষণ্য শাস্ত্রসিদ্ধ। * সুতরাং সৃষ্টির ক্রম অনিয়ত[২৪]। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের বিষ্ণু, এবং কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা রুদ্র, ভৈরব, দুর্গা ও বিনায়ক প্রভৃতি। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড অনন্যপ্রজানাথ কর্ত্তৃক পরিপালিত এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডস্থ মৃগপক্ষ্যাদি জন্তুগণ নাথশূন্য। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বিচিত্র। (অর্থাৎ সে ব্রহ্মাণ্ডে দুই তিন ও ততোধিক পরস্পর মিলিত হইয়া ঈশ্বরত্ব নির্ব্বাহ করেন)। কোন ব্রহ্মাণ্ডে কেবল তির্য্যক্, কোন ব্রহ্মাণ্ড একার্ণব প্রায় এবং কোন ব্রহ্মাণ্ড মনুষ্যবর্জ্জিত[২৫।২৬]। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড শিলাবৎ নিবিড়, কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ড কৃমিদ্বারা, কতকগুলি দেবগণদ্বারা, কতকগুলি নরগণদ্বারা, এবং কতকগুলি নিত্য নিবিড় অন্ধকারে ও অন্ধকারে বস্তুদর্শী পেচকাদি জন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আবার কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড নিত্য প্রকাশে ও প্রকাশে বস্তুদর্শী জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে[২৭।২৮]। † কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড উড়ুম্বর ফলের

---

* অর্থাৎ এক ব্রহ্মার সৃষ্টি একরূপ ও অন্য ব্রহ্মার সৃষ্টি অন্যরূপ।

† প্রকাশে বস্তুদর্শী অর্থাৎ যাহারা আলোকের দ্বারা পদার্থ দর্শন করে।

ন্যায় মশক পূর্ণ এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড অন্তঃশূন্য নিস্পন্দ জন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে[২৯]। তাদৃশ ও অন্যাদৃশ সৃষ্টির দ্বারা পরিপূর্ণ অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড এত আছে যে সকল ব্রহ্মাণ্ড যোগীদিগের কল্পনা পথেও উদিত হয় না[৩০]। যতই বলিনা কেন, সমস্তই একমাত্র মহাকাশ। স্বয়ং মহাকাশই সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। যদি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ আজীবন উক্ত অসীম মহাকাশে পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলেও তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন না। তাদৃশ পরমাকাশস্থিত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডই পরস্পর স্বাভাবিক ভূতাকর্ষণ শক্তিতে বিধৃত রহিয়াছে, জানিবে[৩১।৩২]।

হে মহামতে! আমি তোমার নিকট জগতের মাত্র এইটুকু বৈভব ও বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। পরন্তু সম্পূর্ণরূপে জগদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে আমাদিগেরও শক্তি নাই। যেমন ভীমান্ধকারে গাঢ় অরণ্য মধ্যে যক্ষগণ পরস্পর অদৃশ্যভাবে নৃত্য করে, তেমনি, অনন্ত পরমাকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর অদৃশ্যভাবে প্রস্ফুরিত হইতেছে[৩৩।৩৪]।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, সরস্বতীর অভিপ্রায়—লীলা আপনার পূর্ব্বজন্ম-
ংক্রান্ত জগৎ হইতে নির্গত হউক। লীলা তদনুসারে সরস্বতীর সহিত
র্ণিতপ্রকারের অসঙ্খ্য জগদ্বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে তদন্তর্গত এক
্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলস্থিত বক্ষ্যমাণ লক্ষণসম্পন্ন অন্তঃপুরমণ্ডপ দর্শন করিলেন।
্াহা সেই পদ্মভূপতির অন্তঃপুরমণ্ডপ। এখানে তাঁহারা অধিক ক্ষণ থাকি-
লেন না, শীঘ্রই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন[১]। তাঁহারা দেখিলেন,
অন্তঃপুরমধ্যে নরপতি পদ্মের মহাশব পুষ্পদ্বারা সমাচ্ছাদিত ও সংস্থাপিত
রহিয়াছে। রাজমহিষী লীলা সেই প্রকার সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক সেই
ভর্তৃশবপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সেই সমস্ত শোকাকুল পরিজনবর্গ
রাত্র অধিক হওয়ায় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন এবং সেই অন্তঃপুর-
মণ্ডপ ধূপ, কর্পূর, চন্দন ও কুঙ্কুমাদির সৌরভ্যে আমোদিত রহিয়াছে[২।৩]।

অতঃপর লীলা তাঁহার অন্য ভর্ত্তার সংসার দেখিবার নিমিত্ত
উৎসুকা হইলেন। তদনন্তর সেই আতিবাহিকদেহা লীলা সেই অন্তঃপুর-
মণ্ডপের আকাশে উৎপতিতা হইলেন, হইয়া তাঁহার সেই অন্য ভর্ত্তার
সঙ্কল্পরচিত সংসারে প্রবেশ করিলেন। এ বারও তাঁহারা সংসারের
আবরণ ভেদ করিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডকর্পরও ভেদ করিলেন,
করিয়া বর্ণিত প্রকারের আবরণে বেষ্টিত অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ প্রাপ্ত
হইলেন। সবেগে অথবা শীঘ্র এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া লীলাপতি
বিদূরথের সঙ্কল্পরচিত জগৎ দেখিতে পাইলেন। যেমন সমবয়স্কা ও সমশীলা
দুইটী পিপীলিকা অক্লেশে কোমল বিল্বমধ্যে অথবা যেমন দুই সিংহী মেঘ
পরিপূর্ণ শৈলকুহরমধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে, সেইরূপ, সেই দুই
ব্যোমদেহা দেবী লীলানাথ বিদূরথের সঙ্কল্পরচিত জগতে অনায়াসে
প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা শত শত লোক, লোকান্তর, অদ্রি ও অন্তরীক্ষ
অতিক্রম করতঃ সুমেরুপর্ব্বতালঙ্কৃত নববর্ষবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপমধ্যস্থিত ভারত-
বর্ষে গমন করিয়া তন্মধ্যস্থিত বিদূরথের মণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন[৪।১০]। বিদূ-
রথের মণ্ডলে গমন করিয়া দেখিলেন, ভূপতি সিন্ধুরাজ স্বীয় সৈন্যসামন্তের

সহিত ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের সমুপস্থিত অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকনার্থ ত্রৈলোক্যস্থ সমুদয় প্রাণী তথায় সমবেত হইয়াছেন গগনবিহারিগণ তত্রত্য ব্যোমমণ্ডলে সমাগত হওয়াতে ব্যোমমণ্ডল নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে[১১।১২]।

অনন্তর সেই সঙ্কল্পদেহধারিণী কামিনী দ্বয় নিঃশঙ্কচিত্তে সেই দুর্ভেদ নভোমণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, অম্বুদমালা যেমন গগনতল সমাচ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায় তত্রত্য গগন নভশ্চরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে[১৩] তন্মধ্যে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধর গণ অবস্থান করিতেছেন কোন স্থানে স্বর্গলোকস্থিত অপ্সরোগণ শূরগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন[১৪]। কোন স্থানে রক্তমাংসভোজী রাক্ষস, ভূত ও পিশাচ গণ নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে বিদ্যাধরীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন[১৫]। কোন স্থানে সমরদর্শনাভিলাষী বেতাল, যক্ষ ও কুষ্মাণ্ড আয়ুধপাত আশঙ্কায় স্ব স্ব রক্ষণার্থ অদ্রিতটের আশ্রয় লইতেছে[১৬] কোন স্থানে ভূতমণ্ডল সকল অস্ত্রপাত যোগ্য আকাশ পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিতেছে। কোন কোন স্থানে পৌরুষাভিমানী অক্ষুব্ধচেতা বীরবৃন্দ যুদ্ধ দর্শনার্থ সমবেত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন[১৭] কোন স্থানে ভূতগণ পরস্পর উপস্থিত ঘোর সংগ্রামের বিষয় কথোপকথন করিতেছে। কোন স্থানে বিলাসপরায়ণা চামরধারিণী সুন্দরী সকল উৎকণ্ঠিতচিত্তে অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থানে অপ্সরোগণ লোকপাল দিগের স্তুতি করিতেছেন। কোন স্থানে মুনি ঋষি গণ স্বস্ত্যয়ন দেবার্চ্চনা করিতেছেন। কোন স্থানে ইন্দ্রসেনাগণ স্বর্গার্হ শূরগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া অত্যুচ্চ ঐরাবতাদি বাহন বৃন্দকে অলঙ্কৃত করিতেছেন[১৮।২০]। কোন স্থানে গন্ধর্ব্ব ও চারণ গণ যুদ্ধে মৃত্যুর পর স্বর্গাগমনকারী শূরগণের মান বর্দ্ধনের উপকরণ আয়োজন করিতেছেন। কোন স্থানে অমরস্ত্রীগণ অপাঙ্গ ভঙ্গ কটাক্ষে সম্ভ্রান্ত দিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন[২১]। কোন স্থানে বীরগণের বাহুলতা লিঙ্গন প্রার্থিনী নারীগণে সমাকীর্ণ এবং কোন স্থান শূরগণের শীত শুভ্র যশের দ্বারা দিবাকরও চন্দ্রীকৃত হইতেছেন[২২]।

এই অবসরে রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কীদৃশ যোদ্ধাকে শূর বলা যায়, কাহারাই বা স্বর্গার্হ এবং কাহারাই বা স্ব

লোকের অনুপযুক্ত, এই সকল বিষয় সংক্ষেপে আমার নিকট বর্ণন করুন[২৩]।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! যে সকল সন্তটগণ শাস্ত্রসম্মত আচারশীল প্রভুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধে মৃত, ক্ষীণ বা জয়ী হয়, তাহারাই শূর ও সুরপ্রাপ্য স্বর্গ লোকের উপযুক্ত[২৪]। যাহারা শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী প্রভুর রক্ষণার্থ স্বদেহ পণ করিয়া যুদ্ধ করে ও রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গের একান্ত অনুপযুক্ত ও অক্ষয় নিরয় গমনের উপযুক্ত[২৫,২৬]। যাঁহারা ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করেন তাঁহাদিগকে ভক্তশূর বলা যায়। যাঁহারা গো, ব্রাহ্মণ, মিত্র, সাধু ও শরণাগতগণের রক্ষণার্থ যত্নসহকারে যুদ্ধ করেন, করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বর্গের ভূষণ[২৭,২৮]। যাঁহারা স্বদেশ পরিপালনে রত থাকেন, এবং প্রভুর বা রাজার রক্ষণার্থ যুদ্ধ করেন, সেই সকল বীরেরাই বীরলোকের উপযুক্ত[২৯]। যাহারা প্রজার উপদ্রবকারী প্রভুর বা রাজার নিমিত্ত যুদ্ধ করে, তাহারা নরকগামী হয়[৩০]। ফলতঃ যোধগণ ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গে গমন করে, আর অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রাণত্যাগী হইলে তাদৃশ যোধগণের পরলোক অতীব ভয়াবহ হইয়া থাকে[৩১,৩২]। "যোধগণ সংগ্রাম স্থলে বিনষ্ট হইলেই স্বর্গ প্রাপ্ত হন," এ কথা প্রবাদমাত্র; বস্তুতঃ যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া মৃত হন, তাঁহারাই স্বর্গের ভূষণ ও শূর শব্দে অভিহত হন। ইহাই শাস্ত্র বাক্যের মর্ম্ম[৩৩]। বৎস! যাঁহারা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের রক্ষণার্থ খড়্গাধার সহ্য করেন, তাঁহারাই প্রকৃত শূর ও তাঁহারাই স্বর্গবাসের উপযুক্ত পাত্র। আর সব ডিম্বাহবহত অর্থাৎ বৃথা প্রাণ পরিত্যাগী। আমরা দেখিয়াছি, সমর সময়ে ধর্ম্মযুদ্ধকারী শূর দিগকে লক্ষ্য করিয়া সুরাঙ্গনাগণ "আমি এই মহাবল শূরপ্রধানের দয়িতা হইব" এই প্রকার আশয়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তে শূন্যে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত বিদ্যাধরীগণ মধুরস্বর সঙ্গীত অনুষ্ঠান করেন, এবং তাঁহাদিগেরই নিমিত্ত সুরকামিনীগণ সোৎসাহে ও ব্যগ্রতা সহকারে স্ব স্ব কবরীতে সুন্দর মন্দারমাল্য বেষ্টন করিয়া থাকেন। অপিচ, তাঁহাদিগের নিমিত্তই সুর ও সিদ্ধ গণের সুন্দর বিমানরাজি বিশ্রাণিত ও তাঁহাদিগের নিমিত্তই স্বর্গের উৎসবশোভা অধিকতর বিকসিত হইয়া থাকে[৩৪,৩৬]।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, জ্ঞপ্তিদেবীসমন্বিতা লীলা সেই শূরসমাগমোৎকণ্ঠিত নর্ত্তনশীল অপ্সরোগণে বিরাজিত নভোমণ্ডলে অবস্থান করতঃ অবনীতলস্থিত উভয় পক্ষীয় সৈন্যদল অবলোকন করিলেন[১]। দেখিলেন, এক দিকে স্বীয় ভর্ত্তা বিদূরথের পরিপালিত চতুরঙ্গ সৈন্য, অপর দিকে সমুদ্রসদৃশ অক্ষুব্ধ বহুসৈন্য সোৎসাহে অবস্থান করিতেছে। বিদূরথের সৈন্য পুরমণ্ডলভাগে এবং সমাগত দ্বিতীয় সৈন্য প্রান্তর বিভাগে অবস্থিত দেখিলেন। অনন্তর উভয় সৈন্য পরস্পর অভিমুখীন হইলে উভয় দলস্থ যুদ্ধোন্মত্ত রাজদ্বয় ও সুসজ্জিত সৈন্যগণ সমবকার্য্যোদ্যোগরূপ মহাড়ম্বর দ্বারা সাড়ম্বর জলধরের ন্যায় ও উজ্জ্বল কবচাবৃত হওয়াতে সুসমিদ্ধ হুতাশনের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। তাঁহারা যুদ্ধার্থ নির্ম্মল সলিলধারার ন্যায় দিব্য নিস্ত্রিংশ (তরবার) ধারণ পুর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের প্রহার সম্পাত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের পরশ্বধ, প্রাস, ভিন্দিপাল, ঋষ্টি এবং মুদ্গার প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রদীপ্ত ও ইতস্ততঃ বিচলিত হইতে লাগিল[২।৫]। তাঁহাদিগের কনকনির্ম্মিত উজ্জ্বল বর্ম্ম হইতে দিনকর কিরণের ন্যায় ছটা বিনির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে খগরাজ গরুড়ের পক্ষবিক্ষোভকম্পিত বনরাজির ন্যায় সেই ভীষণ সমর ক্ষেত্র বিকম্পিত হইতে লাগিল[৬]। অনন্তর সেই উভয়দলস্থ অনিবার্য্য অসঙ্খ্য সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে স্ব স্ব শরাসন উদ্যত করতঃ ভিত্তিন্যস্ত চিত্রের ন্যায় অনিমিষলোচনে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে প্রবৃত্ত হইল[৭]। তৎকালে তাহাদিগের ভীষণ হুঙ্কার ধ্বনিতে অন্যান্য সংলাপ সকল অশ্রুত হইয়া উঠিল[৮]।

হে রাঘব! প্রলয়কালের প্রচণ্ড বাত্যা যদি তৎকালের একার্ণবকে দ্বিধা বিভক্ত করে, তাহা হইলে যেরূপ ভীষণ দৃশ্য হয়, মধ্যে দ্বিধনু পরিমিত স্থান জনশূন্য (ফাঁক) থাকাতে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল সেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া স্তব্ধভাবে রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করিতে লাগিল[৯।১০]।

তখন সেই ভীষণ সংগ্রামরূপ কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া সেই দুই রাজা ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভয়ে ভীরুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল[১১]। লক্ষ লক্ষ সৈনিক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সংগ্রামার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধরগণ শরাসন কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করতঃ শরপরিত্যাগার্থ উন্মুখ হইয়া রহিল[১২]। অসঙ্খ্য যোধগণ প্রহার পাত লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত নিস্পন্দভাব অবলম্বন করিলেন। অন্যান্য যোধগণ ক্রোধভরে ভ্রূকুটী বিস্তার করতঃ জনগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন[১৩]। তাঁহাদিগের সেই ভ্রূকুটীকুটিল মুখবিনির্গত ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া ভীরু পুরুষেরা ম্লানমুখে পলায়ন করিতে সচেষ্ট হইল। রজোরাশি উত্থিত হইয়া দিগ্বিভাগ সমাচ্ছন্ন করায় যোধগণ, মাতঙ্গগণ ও অশ্বগণ ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর তন্মধ্যস্থ সৈন্যগণ স্থিরচিত্তে পরস্পর পরস্পরের প্রথম প্রহার নিরীক্ষণ (কে আগে প্রহার করে তাহা লক্ষ্য) করিতে লাগিল। ক্রমে নিদ্রাক্রান্ত পুরীর ন্যায় কলরব রহিত অর্থাৎ রণস্থল নিস্তব্ধ হইল। শঙ্খধ্বনি, তূর্য্যনিনাদ ও দুন্দুভিধ্বনি আর শুনা গেল না। কেবল মেদিনী হইতে ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করতঃ জলধরপটলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। কোন কোন ভীরুস্বভাব সেনা আপনার অধিপতি শূর যোদ্ধাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হইল।

ক্রমে উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল পরস্পর মৎস্য এবং মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ করতঃ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সংগ্রামস্থল তিমি মকর সঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[১৪।১৮]। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলের অসঙ্খ্য পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া নভোমণ্ডলস্থিত তারকানিকর সমাচ্ছাদিত করিল। গজারোহিগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অবস্থিতি করাতে বোধ হইল, যেন গগনান্তরাল কাননময় হইয়াছে[১৯]। পক্ষিপক্ষসুশোভিত উজ্জ্বল শরজাল হইতে প্রভাজাল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং অসঙ্খ্য দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত্রসমূহের "ধমদ্ধমৎ" শব্দে ও বহুতর শঙ্খাদির গম্ভীর নিনাদে গগনান্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিল[২০]।

ঐ অবসরে একপক্ষীয় সৈন্যগণ চক্রব্যূহে ব্যূহিত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় যোধ দিগকে আক্রমণ করিলে, সেই আক্রান্ত যোধগণ দুর্ব্বৃত্ত

দানবাক্রান্ত সুরগণের অনুরূপ দৃশ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়ে তাহারা গরুড়ব্যূহ নির্ম্মাণ করতঃ মাতঙ্গগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, তদ্‌বিপক্ষগণ শ্যেনব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই ব্যূহাগ্র ভেদ করিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। এই সময়ে অসংখ্য যোধগণের বাহ্বাস্ফোট দ্বারা ভূরি ভূরি সৈন্য সমরক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল[২১।২২]।

ঐরূপে উভয়পক্ষীয় যোধগণ পুনঃ পুনঃ ব্যূহিত হওয়াতে রণস্থলে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। সৈন্যগণের কৃষ্ণবর্ণ অস্ত্রশস্ত্রসমূহ হইতে সমুত্থিত কৃষ্ণবর্ণ কিরণজাল নীলমেঘের ন্যায় হইয়া দিবাকরপ্রকাশ সমাচ্ছাদিত করিল। বাতসমাহত তৃণ হইতে যেরূপ শন্ শন্ শব্দ সমুত্থিত হয়, সেইরূপ, এই সমর ভূমি হইতে শর সমূহের শন্ শন্ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল[২৩।২৪]। কল্পান্তকালের পুষ্কর ও আবর্ত্তক নামক জলধর দ্বয়ের ন্যায়, মহামেরুর সদ্যশ্ছিন্ন পক্ষদ্বয়ের ন্যায়, পাতালকুহরস্থিত অক্ষুব্ধ অন্ধকারের ন্যায়, সেই সৈন্যদলদ্বয় প্রলয়কালীন বাতবিক্ষুব্ধ মহার্ণবের ন্যায়, মারুত নিধূত (কম্পিত) ক্ষুদ্র কজ্জলশৈলের ন্যায় নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ও যোদ্ধৃগণের কুন্ত, মুষল, অসি ও পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সমুদয়ের কিরণরূপ সলিলরাশির দ্বারা সেই সমরক্ষেত্র একার্ণবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[২৫।২৮]।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রাম বলিলেন, ভগবন্! শ্রোতৃগণের শ্রুতিসুখাবহ এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত আমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুপতে! শ্রবণ কর। অনন্তর সেই লীলা ও সরস্বতী তথায় সাঙ্কল্পিক বিচিত্র বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ সেই অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন[২]। তাঁহারা দেখিলেন, উভয়-পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে লীলানাথের বিপক্ষপক্ষীয় একদল সেনা ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্য হইতে প্রলয়কালীন অর্ণবকল্লোলের ন্যায় প্রবলবেগে বিনির্গত হইয়া লীলাপতি বিদূরথের অভিমুখে আগমন করিল। পরন্তু তাহারা সম্মুখ-সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া দূর হইতে যোধগণের বক্ষঃস্থলে শিলা ও মুদ্গর বর্ষণ করিতে লাগিল[৩।৪]। তখন উভয় পক্ষীয় যোধগণ ক্রোধপ্রজ্জ্বলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কল্পান্তকালীন বারিধিতরঙ্গের ন্যায় আপতিত হইল ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রবলবেগে অস্ত্রাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের হুতাশন সদৃশ সমুজ্জ্বল অস্ত্র শস্ত্র হইতে বিদ্যুৎসদৃশ ছটা ও স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। অসংখ্য নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহের তরল ধারাগ্রভাগ দ্বারা নভোমণ্ডল যেন রেখাঙ্কিত হইল। এই সময়ে শরনিকরের কল কল ধ্বনির দ্বারা চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত ও যোধগণের ঘোর হুহুঙ্কার দ্বারা বর্ষাকালীন জলধর-মণ্ডলের ভীষণ গম্ভীর নিনাদ পরাজিত হইয়াছিল। তাহারা অসংখ্য শরবর্ষণ করতঃ দিবাকর-কিরণকেও সমাচ্ছাদিত করিয়াছিল[৫।৭]। খড়্গ প্রহারে যোধগণের বর্ম্ম হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল, সমুজ্জ্বল খড়্গ সকল নভোমণ্ডলে বিঘূর্ণিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন শত শত ব্যোমচর পক্ষী আকাশমার্গে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া ভ্রমণ করিতেছে[৮]। তাহাদিগের বাহু সমূহ সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন নভস্থলে বনরাজি সঞ্চালিত হইতেছে। ধনুর্যোদ্ধা ধনুক সকল চক্রাকারে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে খেচরপ্রাণী পলা-

য়ন আরম্ভ করিল[৯]। সৈন্যগণের এমন ভীষণ কোলাহল উঠিল যে, চতুর্দ্দিকে কেবল অবিচ্ছিন্ন ঘোর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। যেমন সমাধিকালে কোনপ্রকার বাহ্যিক শব্দ শুনা যায় না, সেইরূপ, এই সংগ্রামে মেঘগর্জ্জনানুরূপ নিবিড় কোলাহল ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শ্রবণ গোচর হইল না[১০]। নারাচের আঘাতে শত শত শূর ছিন্নমস্তক ও ছিন্নবাহু হইয়া নিপতিত হইল। অঙ্গে অঙ্গে সঙ্ঘট্টিত হওয়াতে তাহাদিগের বর্ম্মসম্ভূত রণ রণ ধ্বনি সেই সংগ্রামস্থল ভীষণ করিয়া তুলিল[১১]। মধ্যে মধ্যে ঘোর হুহুঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইয়া অস্ত্রটঙ্কার ধ্বনি অভিভূত কবিতে লাগিল। তরঙ্গশ্রেণীর সদৃশ অসঙ্খ্য শস্ত্রশ্রেণী নভোমণ্ডলে জলদমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত শস্ত্রের তরলধারাগ্রভাগ প্রদীপ্ত থাকায় বোধ হইতে লাগিল, দিক্ সকল যেন ভয়ানক দন্তুর (বিকটদন্ত) হইয়াছে[১২]। শত্রুদমনোদ্যত যোধগণের মুষ্টিগ্রাহ হইতে অসি সঙ্ঘট্টনের "ঝন্ ঝন্" শব্দ বাহ্বাস্ফোটনের চটচটা ধ্বনির সহিত মিলিয়া রণস্থল ভৈরবাকার করিয়া তুলিল[১৩]। কোশ হইতে খড়্গানিষ্কাশন সময়ে শীৎকার সহকৃত কন কন ধ্বনির সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনির্গত হইতে লাগিল এবং হননকারী যোধগণের শরনিকরের শস্ত্রের সন্ সন্ ধ্বনির সহিত অস্ত্রাঘাত হত প্রাণিগণের ছিন্নকণ্ঠ হইতে শোণিত বিনির্গমের ধকৎ ধকৎ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনবরত রণনিহত যোধগণের ছিন্ন শির ও ছিন্ন বাহু ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিরন্তর অসিখণ্ড সমূহ সঞ্চালিত হওয়াতে গগনমণ্ডল বিদ্যুৎসমাচ্ছন্নের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। তখন আয়ুধবর্ষণ দ্বারা সেই সমস্ত যোধগণের বর্ম্ম হইতে অগ্নিজ্বালা বিনির্গত হইয়া তাহাদিগের শিরোরুহ স্পর্শ করিতে লাগিল রণোৎসাহী প্রফুল্লদেহী অসিধারী শূরগণের খড়্গ সমূহ হইতে "ঝন্ ঝন্" শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল, কুন্তাহত মাতঙ্গ সমূহের শোণিত তরঙ্গ মালা সহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল, দন্তিগণ পরস্পর দন্ত বিনি ষ্পেষিত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল[১৪।১৭]। যোধগণ মহামুষ্ক প্রহারের দ্বারা বিনিষ্পিষ্ট হওয়াতে সেই সকল বীরের কাতর রব শ্রু হইতে লাগিল, শূরগণের শিরোরুহরূপ কমলসমূহ দ্বারা নভোমণ্ড আচ্ছাদিত হইল[১৮]। সৈন্যগণের ব্যোমন্যস্ত ভুজসমূহ অহীন্দ্রের ন্যা

খাইতে লাগিল, ঊর্দ্ধে ধূলিরাশি সমুত্থিত হওয়ায় তাহা মেঘমণ্ডলের ন্যায় তীয়মান হইতে লাগিল, অস্ত্র সকল ছিন্ন হওয়ায় উপায়ান্তর না খিয়া বৈরনির্যাতনার্থ পরস্পর পরস্পরের কেশাকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হল[১৯]। অসংখ্য যোদ্ধা পরস্পর পরস্পারের নখর প্রহারে ছিন্নাক্ষি, ন্নকর্ণ, ছিন্ননাসিক ও ছিন্নস্কন্ধ হইতে লাগিল, ছিন্নধনু যোদ্ধারা পরস্পর রস্পরকে তিরস্কার করতঃ ক্রীড়াসহকারে বাহুযুদ্ধ কবিতে লাগিল[২০]। নবহত মত্ত মাতঙ্গগণ সবেগে নিপতিত হওয়াতে পৃথ্বীতল বিকম্পিত ইতে লাগিল, রথবেগবিনষ্ট অসংখ্য সমরোন্মত্ত সৈন্যের শোণিত ক্ষরিত ইয়া নদীর ন্যায় প্রবাহে প্রবাহিত হইতে লাগিল[২১]। সেই ক্ষুভিত সৈন্য-মুদ্র প্রলয় জলধরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল[২২]। এই রণব্যাপার খিবা মাত্র বোধ হয়, মৃত্যু যেন সেই রণস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কট হাস্য করতঃ যোধগণকে আপন করাল কবলে নিক্ষেপ করিতেছেন। খন সুমেরুসদৃশ বৃহৎকায় গর্ব্বিত কীরন্দ্রগণের (উচ্চ হস্তীর) গর্জ্জনে ন্দগর্জ্জন খর্ব্বিত, শত্রুগণের যন্ত্রনিক্ষিপ্ত পাষাণ ও চক্র প্রভৃতি বিবিধ-স্ত্র দ্বারা পক্ষিগণ দূরে বিদ্রুত, মরণোন্মুখ যোধগণের ক্রন্দনের কাতর শব্দ মুত্থিত ও কুঠার সমুদায়ের আঘাতে সৈন্যগণেব মস্তক বিদলিত ইতে দেখা গেল[২৩।২৬]। অসংখ্য খড়্গ আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হওয়াতে াধ হইতে লাগিল, যেন গগনমণ্ডল তারকাময় হইয়াছে। আরও দেখা ল, যোধগণের নির্ম্মুক্ত শক্তিসমূহ পরস্পর আহত হইয়া ছিন্ন হওয়াতে র্গত প্রভা অবনীমণ্ডল আলোকময় করিতেছে[২৭]। শত্রুগণ কর্ত্তৃক নমণ্ডলে প্রেরিত বৃহতকায় তোমর শ্রেণী তোরণ মালার শোভা বিস্তাব বিল এবং গগনমার্গে ভুষণ্ডি সকল ও খড়্গ সমূহ দ্বিত্রিখণ্ডে খণ্ডিত তে লাগিল। এই সকল ভগ্ন ও খণ্ডিত ভুষণ্ডি ও খড়্গ ব্যোমকুন্তলেব ব্যোমকুন্তল=ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড) ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। কুন্ত-মূহ গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া বেণুবনলগ্ন দাবাগ্নির ন্যায় প্রতিভাত তে লাগিল[২৮।২৯]। প্রধান প্রধান সৈনিকগণ পরস্পর খড়্গ ও ঋষ্টি ভৃতি শস্ত্রের বর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইল, অপ্সরাগণ শক্তি উদ্যমনকারী স্বর্গার্হ গণকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতে লাগিল[৩০]। কেয়ূর ভায় দিঙ্মণ্ডল বিকাশকারী ভটগণেব বদনকমল সকল গদাঘাত দ্বারা াব বিগলিত (বিশীর্ণ) কমলের ন্যায় বিগলিত হইতে লাগিল, শত

শত যোদ্ধা প্রাসাস্ত্রের বেগে সংপিষ্ট হইল, চক্র ও ক্রকচ (করা
প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা অশ্ব, নর ও বারণ সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইল, ম
মাতঙ্গগণ পরশুর আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল৩১।৩
বহুসংখ্যক সৈন্য পরস্পর যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। য
বিনির্ম্মুক্ত পাষাণনিচয়ের বর্ষণে অসঙ্খ্য রথ ও ধ্বজ নিষ্পেষিত হই
করবাল প্রহারে বিচ্ছিন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণের শিরঃপঙ্কজ (মস্ত
রূপ পদ্ম) পাণ্ডুরবর্ণ হইল, পাশবিশারদ বীরগণ পরস্পর সন্নিহিত হই
পরিদেবনা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল, অনেক যোদ্ধা ক্ষুরিকাগ্রে
দ্বারা নির্ভিন্নকুক্ষি ও গলিতহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগি
ছিন্নমস্তক যোধগণ ত্রিশূল হস্তে নৃত্য করিতে করিতে শত্রু আক্র
করিতে প্রবৃত্ত হইল, এই সময়ে টঙ্কারকারী ধানুষ্কগণ (ধনুর্দ্ধারীবৃন্দ
ভিন্দিপালরূপ কেশর সমুচ্ছ্রিত ও সগর্ব্ব হুঙ্কাররূপ ভীষণ সিংহনিনাদ কর
নৃসিংহবেশধারী নটের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অসঙ্খ্য যোদ্ধা ম
গণের বজ্রমুষ্টি প্রহারে নিষ্পিষ্ট হইয়া সমরশায়ী হইলেন। অসঙ্খ্য তী
গামী সুতীক্ষ্ণ পট্টিশ সমূহ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নভোমার্গে উৎপতিত হই
লাগিল। অঙ্কুশাকৃষ্ট শূরগণ পরস্পর রথ, হস্তী, অশ্ব ও ধ্বজ বি
হইয়া হলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা পরস্পর হতাহত হইতে লাগি
তাহাদের বলবেগে কুলাচল সকল কম্পিত ও আকুলিত হইতে লাগি
উন্নত পুরুষগণ সুতীক্ষ্ণ কুদ্দালদ্বারা রণভূমি নিখাতিত করিতে লাগি
শরাসননির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রতিপক্ষীয় যোধগণনিক্ষিপ্ত শিলাসকল ি
ভিন্ন করিতে লাগিল এবং শাণিত ক্রকচ সমূহের উভয় পার্শ্ব দ
মত্ত মাতঙ্গগণ ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। সুদক্ষ যোধগণ এই সংগ্রাম
উলূখলে রাশি রাশি সৈন্যরূপ তণ্ডুল চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন৩৩।৪২। ধূর্ত্ত ব্যাধ
যেমন জাল দ্বারা শকুন্ত ধৃত করে, সেইরূপ, প্রধান প্রধান বী
বিপক্ষীয় দিগের সৈন্যরূপ বিহঙ্গম দিগকে নিস্ত্রিংশরূপ শৃঙ্খলজা
নিবদ্ধ করিয়া স্বশিবিরে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র যেমন
দিগকে খরতর নখরাঘাতে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ, তীব্র বেগশালী
বিঘাতী শূরেরা বিপক্ষীয় দিগের সৈন্যপশু দিগকে বিদীর্ণ করিলেন৪৩।
যোধগণের নিক্ষিপ্ত কুন্তাগ্নির প্রভাবে (পূর্ব্বকালের কুন্তাগ্নি এক্ষণে বা
নামে প্রসিদ্ধ) মৃত যোধগণের হস্ত হইতে অস্ত্র সকল স্খলিত হ

হাশব্দে নিপতিত হওয়াতে অন্যান্য শব্দ তিরোহিত হইল এবং তদা-
দ্ভূত তপ্তাঙ্গার দ্বারা চাপ সকল দগ্ধ ও আয়ুধ সকল স্খলিত ও
দ্ধগণের নেত্র সমুদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে জলদরূপ
দ্ধগণ বিষরূপ বারি বর্ষণ করতঃ যোধগণকে বিদলিত করিতে আরম্ভ
রিল এবং কবন্ধরূপ ময়ূরগণ সেই সমস্ত উন্মত্ত বীররূপ মত্ত মেঘ
র্শন করতঃ সমরাঙ্গনে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই ভীষণ সংগ্রাম,
ন কল্পান্তকালীন মহাবেগের ন্যায় বেগে ভ্রমণশীল মাতঙ্গরূপ শৈলগণ
রা পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল৪৬।৪৭।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

মুনিরাজ বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর সেই রণস্থলে যুযুৎসু রাজগণের বীরগণের, মন্ত্রিগণের ও নভোমণ্ডলস্থিত সমরদর্শক নভশ্চরগণের বক্ষ্যমা প্রকার বচনপরম্পরা (পরস্পর বলাবলি) সমুত্থিত হইতে লাগিল[১]।

দেবগন্ধর্ব্বাদিগণ বলিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, চঞ্চল বিহগের ন্যা অবিরত নিপতিত শূরমস্তকের দ্বারা গগনতল তারকীকৃত হইল। দেখ, ধরণীতল কমলসঙ্কুল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে ও দিকে দেখ, বীরগণের রুধিরকণবাহী মারুত সিন্দূরের ন্যায় অরুণ হইয়াছে। দেখ দেখ, এই মধ্যাহ্ন কালেও দিগ্বিভাগ আজ সায়ংকালী প্রভাকরপ্রভায় অরুণবর্ণ মেঘমণ্ডলাচিত (ব্যাপ্ত) বলিয়া ভ্রম জন্মিতেছে

কোন পুরুষ শূরগণের নিক্ষিপ্ত অসঙ্খ্য লোহিতবর্ণ শরনিকর দূর হই অবলোকন করিয়া ভ্রম বশতঃ কোন প্রধান পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল ভগবন্! গগনমণ্ডল কি পলালরাশির দ্বারা ভরিত হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন, অহে! উহা পলালরাশি নহে; উহা বীরগণের শর নিকরাচ্ছাদিত অম্বুদমণ্ডল[৪]।

নভশ্চরগণ বীরগণকে সম্বোধন করতঃ বলিতে লাগিলেন, অহে বীরগণ! তোমাদিগের ভয় নাই। তোমরা পরস্পর উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ কর। ভূতলে বীরগণের রুধিরধারার দ্বারা রণস্থলস্থিত যে পরিমা রেণু সিঞ্চিত হয়, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগকারী বীরেরা সেই পরি মিত অষ্ট সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থিতি করেন[৫]। অহে বীরগণ ঐ যে নীলোৎপলদলসঙ্কাশ নিস্ত্রিংশ, উহা নিস্ত্রিংশ নহে। উহা কেবল বীরাবলোকিনী স্বর্গলক্ষ্মীর নয়নবিভ্রম[৬]। অথবা কুসুমধন্বা ঐ সমস্তের দ্বারা বীরালিঙ্গনলোলা (যাহারা বীর দিগকে আলিঙ্গন দান করিবা জন্য চঞ্চলা, তাহারা) সুরযোষিৎগণের কটিতটস্থ মেখলা (চন্দ্রহার) শিথি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে[৭]। হে বীরগণ! তোমরা স্বর্গারোহণ করিবে সেই প্রত্যাশায় আনন্দিত হইয়া দেবতাগণ নন্দনকাননে ভুজলতা ও কর পল্লবসম্পন্ন উন্নত নয়নরূপসুরভিশালী মঞ্জরীর কটাক্ষবিক্ষেপাদি সহকৃত দৃ

বিলাস প্রদর্শন করতঃ তাল ও সঙ্গীত যোগে সানন্দ নৃত্য করিতেছেন[৮।৯]।

সৈন্যগণের মধ্যে বক্ষ্যমাণ প্রকার বচনপরম্পরা সমুত্থিত (বলাবলি আরব্ধ) হইতে লাগিল। ঐ দেখ, সেনাপতিরূপ বনিতাগণ কঠোর কুঠাররূপ কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা প্রতিযোধরূপ দয়িতগণের মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছেন[১০]। একি! হায় হায়! ভীষণ ভল্লাস্ত্রের দ্বারা আমার পিতার সমুজ্জ্বল কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছিন্ন হইল। উঃ! কালের কি দুঃস্বভাব! কালই গ্রহণকালে রাহুকে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী করে[১১]। হায় হায়! এই বীর যমের ন্যায় দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত হইয়া লম্বমান ও দৃঢ় শৃঙ্খলসংলগ্ন উপলখণ্ড চিত্রদণ্ডনামক চক্রযন্ত্রে বিঘূর্ণিত ও বিক্ষিপ্ত করতঃ সমস্ত সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আইস, আমরা যথাগত স্থানে পলায়ন করি[১২।১৩]। ঐ দেখ, রণচত্বরে অসংখ্য ছিন্নশির কবন্ধ তালে তালে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। ঐ শুন, ও দিকে দেবগণের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন হইতেছে। উহাঁরা বলাবলি করিতেছেন "কোন্ বীর কবে কিরূপে কোন্ লোকে গমন করিবেন"[১৪।১৫]। ঐ দেখ, এ দিকে আবার সৈন্যগণ মৎস্য বূ্যহে ও মকরব্যূহে ব্যূহিত হইয়া মৎস্যমকরসঙ্কুল সাগর প্রস্রবণের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে। হায় হায়! সাগর যদ্রূপ নদীসমূহকে গ্রাস করে, তদ্রূপ, সমাগত এই সকল সেনা অত্রস্থ সেনা সমূহকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই সমস্ত যোদ্ধা অতি বিষম[১৬]। ইহাদিগের নারাচ বর্ষণ করিকুম্ভ সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া বারিধারাসমাচ্ছন্ন শৈলশৃঙ্গের ন্যায় সুশোভিত করিতেছে[১৭]। ঐ দেখ, অসংখ্য যোধগণ বিপক্ষীয় কুন্তাস্ত্রে ছিন্নমস্তক হইয়া "হায়! কুন্তাস্ত্রে আমার মস্তক ছিন্ন হইয়াছে" এইরূপ কহিতে কহিতে আকাশপথে স্বর্গে গমন করতঃ তত্রস্থ উৎসব সন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া বলাবলি করিতেছে "আ!! আমি মস্তক দ্বারা জীবিত হইলাম, মৃত হই নাই[১৮]।" যদ্রূপ গগনে পক্ষিশিঞ্জিত শ্রুত হয়, তদ্রূপ, যুদ্ধমৃত যোধগণের স্বর্গগমনোৎসব কথা ঐরূপে শ্রুত হইতে লাগিল।

ঐ শুন, এ দিকে সৈন্যগণ কিরূপ আক্রোশ বাক্য বলিতেছে। বলিতেছে, যাহারা আমাদের উপর যন্ত্রপাষাণ বর্ষণ করিতেছে তাহাদিগকে ঘেরাও কর[১৯]।

যে সকল বীরপত্নী পূর্ব্বে মৃতা হইয়া অপ্সরা হইয়া জন্মিয়াছিলেন,

তাঁহারা আজ্ যুদ্ধমৃত স্বীয় ভর্ত্তাকে দেবতা জানিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতেছেন[২০]। ঐ দেখ, আজ্ যোধগণ কর্ত্তৃক কুন্তাস্ত্রের শ্রেণী কেমন অদ্ভুত রচনায় স্বর্গ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, উহা যেন বীরগণের স্বর্গারোহণের সোপান (সিঁড়ি)[২১]। যে সকল বীরনারী ইতিপূর্ব্বে কাঞ্চনবিভূষিত কমনীয় কান্তবক্ষে সমাশ্লিষ্টা ও রোরুদ্যমানা দৃষ্টা হইয়াছিলেন, সেই সকল বীরপত্নীরা এক্ষণে দেবপুরন্ধ্রী হইয়া ভর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছেন[২২]।

সেনাপতিগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, হায় হায়! যেমন মহাপ্রলয় কল্লোল সহকারে সুমেরু শৈল বিদীর্ণ করে, তেমনি, বিপক্ষগণ আজ্ উদ্ধত মুষ্টির দ্বারা অস্মৎপক্ষীয় যোধগণকে বিনষ্ট করিতেছে[২৩]। অরে মূঢ় সৈন্যগণ! তোমরা পুরোবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কর, পাদপ্রহারে অর্দ্ধমৃত দিগকে উৎসারিত কর, স্বপক্ষীয় দিগকে বিদীর্ণ করিও না[২৪]। ঐ দেখ, সমরমৃত বীরগণ দিব্যশরীরে কবরীরচনব্যগ্রা অপ্সরাগণের পার্শ্বপ্রাপ্ত হইতেছেন[২৫]।

স্বর্গীয় অপ্সরোগণ বলিতেছেন, ইহাকে এই প্রফুল্লহেমকমলসুশোভিত, দীর্ঘায়ত, শীতলসমীরণসম্পন্ন ও ছায়াবিশিষ্ট সুরধুনীর তটে বিশ্রাম করাও[২৬]। ঐ দেখ, নভোমণ্ডলে বীরগণের অস্থিসমূহ আয়ুধ দ্বারা বিখণ্ডিত হইয়া কণৎ কণৎ শব্দে তারকার ন্যায় ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে[২৭]। ঐ দেখ, আকাশে কেমন অদ্ভুত সায়কবারিসঙ্কুলা (সায়ক বাণ। তদ্রূপ বারি) জীববাহিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। স্তূপীভূত রণরেণু ঐ নদীর পঙ্ক এবং উহাতে বীর ও ভূভৃৎ (রাজা) গণের মস্তকনিকররূপ কমলরাজি কেমন অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছে। উহা বাতবিচলিত পদ্মরাজিবিরাজিত সরোবরের ন্যায় শোভা বিতরণ করতঃ গ্রহমার্গে প্রবাহিত হইতেছে। আয়ুধাংশু অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রের কিরণ বা ছটা ঐ পদ্মের মৃণাল, অসি উহার দল; শূল ও কুন্তাদি অস্ত্র উহার কণ্টক, কেতুপট্ট অর্থাৎ পতাকা সমূহ উহার পট্ট (মৃণালের আবরণত্বক্ উপরের ছাল), শিলীমুখ উহার ভ্রমর। আহা! নভোমণ্ডল যেন আজ্ অপূর্ব্ব পদ্মসরোবর[২৮,৩০]। এ দিকে দেখ, ভীরু মানবেরা রণাঙ্গনে মৃতমাতঙ্গের অন্তরালে পর্ব্বতান্তরালে পিপীলিকার ন্যায় ও পতিবক্ষে পত্নীর ন্যায় লুক্কায়িত হইতেছে[৩১]। ঐ দেখ, বিদ্যাধরীগণের

কান্তসমাগমসূচক অলকোল্লাসী মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে[৩২]। ঐ দেখ, বীরগণের ছত্রসমূহ চন্দ্রমার ন্যায় নভোমণ্ডলে অবস্থান করতঃ পৃথিবীর আতপত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে ও ভূমণ্ডলে কিরণরূপ শুভ্র যশশ্ছায়া বিস্তার করিতেছে[৩৩]। বীরগণ মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিয়া নিমেষমধ্যে স্বপ্নরচিত পুরীর ন্যায় স্বকর্ম্মরূপ শিল্পীর রচিত অমরবপু প্রাপ্ত হইতেছেন[৩৪]। ব্যোমরূপ সমুদ্রে শূল, শক্তি, ঋষ্টি এবং চক্র প্রভৃতি আয়ুধ সকল সচঞ্চল মৎস্য মকর প্রভৃতির অনুকার করিতেছে[৩৫]। বাণচ্ছিন্ন শুক্লবর্ণ রাজছত্র সকল হংসরাজির ন্যায় ও অসঙ্খ্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে[৩৬]। গগন মণ্ডলে সমুড্ডীন চামরনিকর বাতাহত চঞ্চল তরঙ্গের শোভা বিতরণ করিতেছে[৩৭]। বীরগণের ছত্র, চামর এবং কেতু সকল বিদলিত হইয়া আকাশমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া বীরগণের যশোবর্দ্ধন করিতেছে[৩৮]। ঐ দেখ, যেমন পতঙ্গপাল (পঙ্গপাল) ক্ষেত্রস্থ শস্য ভক্ষণ করে, তেমনি, আকাশমণ্ডলে উৎপতনশীল শরসমূহ শক্তি সকল ক্ষয় করিতেছে[৩৯]। ঐ শুন, প্রতাপান্বিত ভটগণের খড়্গ সমুদায় যোধগণের কঠিন বর্ম্মে আহত হওয়াতে তাহা হইতে উগ্র ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে[৪০]। ঐ দেখ, যদ্রূপ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে কল্পানিল দ্বারা নির্ঝরশালী পর্ব্বত সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ এই জনক্ষয়কর যুদ্ধে বীরগণের শরজালে দন্তবিশিষ্ট পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ বিনষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, রক্তমহাহ্রদে নিমগ্ন দুঃখাভিভূত মন্দগতি যোধগণ হাহাকার করতঃ চক্রী রথী ও সারথী দিগকে ও অশ্ববিশিষ্ট সজ্জিত রথ সকল অন্বেষণ করিতেছে[৪১।৪২]। ঐ দেখ, বীরগণ বীরগণের কবচে (বর্ম্মে) কালরাত্রিকম্প ভীষণ খড়্গসঙ্ঘট্ট (খড়্গপ্রহার) উদ্ভাবন করতঃ বীণাবাদ্যের অনুকার করতঃ যেন নৃত্য করিতেছেন[৪৩]। ঐ দেখ, ও দিকে নর, খর, ও অশ্বগণ হইতে বিনিঃসৃত রক্তনির্ঝরের শীকর বহনকারী সমীরণ দিঙ্মণ্ডল অরুণিত করিয়াছে। ঐ দেখ, যেমন মেঘে বিদ্যুৎ, তেমনি, চিকুরসম শ্যামবর্ণ ব্যোমতলে যোধগণের শস্ত্রকিরণ ক্রীড়া করিতেছে[৪৪।৪৫]। ঐ দেখ, ভুবনমণ্ডল রক্তসংসিক্ত আয়ুধ দ্বারা অগ্নিব্যাপ্ত মানবের ন্যায় আকুলিত হইয়াছে[৪৬]। ঐ দেখ, বীরগণ শত্রু কর্ত্তৃক ছিন্ন হওয়াতে তাহাদিগের হস্ত হইতে ভুষণ্ডী, শক্তি, শূল, অসি, মুষল এবং প্রাস

প্রভৃতি শস্ত্র সমূহ স্খলিত হইয়া পড়িতেছে[৪৭]। ঐ দেখ, অবিরত প্রহার নিবন্ধন অস্ত্র সমূহের ঝন্ ঝন্ শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, ঐ প্রহার সকল যেন ঐরূপ শব্দের দ্বারা ক্ষতজনিত ক্ষোভ প্রকাশক সঙ্গীত (রোদন) করিতেছে। হায়! হায়! যুদ্ধ ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিল[৪৮।৪৯]। ঐ দেখ, ও দিকে পরস্পরাঘাতবিচূর্ণিত ভীষণ খড়্গ সমূহ হইতে সমুত্থিত রেণু সমূহের দ্বারা ছত্ররূপ তরঙ্গে সঙ্কুল রণসাগর যেন বালুকাময় হইয়া যাইতেছে[৫০]। এই রণশৈল যেন প্রলয়কালে বাতেরিত অচলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতিকূলে ধাবমান হইতেছে[৫১]। এই যুদ্ধের বাদ্যনির্ঘোষে লোকালোক (পর্ব্বতবিশেষ) পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন বীর বলিতেছে, হায়! আমাদিগকে ধিক্। কোন বীর বলিতেছে, উঃ কি খেদ! খেদ এই যে, আমাদিগের প্রযুক্ত অর্থাৎ বিনিক্ষিপ্ত নারাচ সকল কার্য্য সাধন করিতেছে না, অধিকন্তু কঠিন উপলখণ্ডে আহত হওয়াতে তদ্বিনির্গত তড়িচ্ছটাসদৃশী অনলশিখা প্রতাপিত হইয়া সেই সকল উপলখণ্ড ভেদ করত' শব্দ সহকারে বৃথা বিনষ্ট হইতেছে। অহে ছিন্নেচ্ছ মিত্রগণ! সম্প্রতি বেলা অবসানপ্রায়। অতএব, আইস, আমরা যাবৎ এই প্রজ্বলিত অনলসদৃশ নারাচ দ্বারা ভস্মাঙ্গ না হই তাবৎ আমরা স্থানান্তর আশ্রয় করি[৫২।৫৩]।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! অনন্তর সেই রণসমুদ্র নিতান্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল[১]। গগনাক্রমকারী তুরঙ্গ সকল এই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, ছত্র সকল ফেন, ও শুভ্রবর্ণ শরনিকর অসংখ্য শফরী, অশ্বারোহী সৈন্য ইহার মহাকল্লোল[১।২]। চতুর্দ্দিক্ হইতে, বহুবিধ আয়ুধরূপ নদীস্রোত এই সমরার্ণবে আপতিত ও তদ্গর্ভে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ সৈন্যগণ অনবরত আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের বৃহৎ কুম্ভ এই অর্ণবের পর্ব্বতকূট; ঘূর্ণমান প্রদীপ্ত চক্রসমূহ আবর্ত্ত, (ঘূর্ণিজল), এবং যোধগণের ছিন্নমস্তক সকল তদাবর্ত্তস্থ তৃণ। এবম্বিধ রণসমুদ্রে মহা আড়ম্বরে ধূলিরূপ জলধরপটল সমুড্ডীন হইয়া খড়্গপ্রভারূপ সলিলরাশি পান করিতে লাগিল[৩।৪]। শত শত মকরব্যূহ এই মহাসমুদ্রের অসংখ্য মকর। এই সকল মকরের দ্বারা সৈন্যরূপ নৌকা সকল হতাহত হইতে লাগিল। ভীষণ সৈন্যাবর্ত্তের গুড় গুড় ধ্বনির দ্বারা মেঘকন্দর প্রতিধ্বনিত ও মীনব্যূহরূপ মৎস্যসমূহ হইতে শররূপ শুভ্র অণ্ড সকল অবিরত বিনিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল[৫]। খড়্গরূপ প্রবল তরঙ্গমালার দ্বারা পতাকারূপ লহরী সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। এই সমরমহার্ণবের শস্ত্ররূপ চঞ্চল সলিল ও মেঘের ন্যায় স্থায়ী আবর্ত্ত সমূহের ভীষণ সংবন্ত দ্বারা সেনারূপ তিমি ও তিমিঙ্গিলগণ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল[৬।৭]। লৌহকবচাবৃত সৈন্যরূপ সলিলরাশির মধ্য হইতে শত শত কবন্ধরূপ আবর্ত্ত সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত ও এই অর্ণবের নির্ঘোষ হইতে ঘুম্‌ঘুম্ শব্দ প্রসৃত হইতে লাগিল[৮।৯]। সৈন্যগণের উৎকর্ত্তিত মস্তক এই মহার্ণব হইতে শীকরনিকরাকারে উৎপতিত ও চক্রব্যূহরূপ আবর্ত্তের মধ্যে সৈন্যরূপ কাষ্ঠ সমূহ প্রবাহিত হইতে লাগিল[১০]। এই রণসাগর অনন্ত ছত্র বস্ত্র পতাকানিকর দ্বারা ফেনিল। ইহার অন্তরাগত বহমান রক্তনদীর স্রোতে রথরূপ দ্রুমরাজি ভাসমান এবং গজদেহ বিনির্গত মহারুধির তাহার বুদ্‌বুদ্। এই সমুদ্রের সৈন্যরূপপ্রবাহে হস্তিরূপ অসংখ্য জলচর বিচলিত[১১।১২]। বৎস! এবম্বিধ সংগ্রামার্ণব দর্শকগণের গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় চিত্তচমৎকারক

হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যদ্রূপ কল্পান্তকালে অনবরত ভূকম্প হয়, এই রণস্থলে তদ্রূপ অবিরত ভূকম্প হইতে লাগিল[১৪]। তখন অচলরাজি কম্পিত, বিহঙ্গমরূপ (এস্থলে বিহঙ্গম বাণ) তরঙ্গমালা অজস্র প্রবাহিত, করিকুম্ভরূপ অসংখ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ নিপতিত, ভীতসৈন্যরূপ ভীরু মৃগগণ বিত্রাসিত, যোধগর্জ্জনের গুর্ গুর্ ধ্বনি সমুত্থিত, চঞ্চল শরনিকররূপ অসংখ্য শর ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও শরধারী যোধমণ্ডল বনসঙ্কুল ভূমির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[১৫।১৬]। ধূলিপটলরূপ জলদজাল বিস্তৃত, সৈন্যরূপ পর্ব্বতসমূহ বিগলিত, মহারথগণের অঙ্গসমূহ নিপতিত, খড়্গিমৃগ সকল প্রপতিত, সৈন্যগণের পদরূপ কুসুমনিকর উৎপতিত, পতাকা ও ছত্ররূপ ধারিদমণ্ডল সমুত্থিত, রক্তনদী প্রবাহিত ও বারণগণ চীৎকার করত নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই সমরপ্রলয় জগৎ গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে।

অনন্তর সেই সমরপ্রলয়ে ধ্বজ, ছত্র ও পতাকার সহিত রথ সমূহ বিনষ্ট, নির্ম্মল খড়্গরূপ অসংখ্য প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডল নিপতিত ও যোধগণের প্রাণসন্তাপে তত্রস্থ প্রাণিগণের প্রাণ সন্তপ্ত হইতে লাগিল[১৭।২১]। কোদণ্ড সকল এই সমরপ্রলয়ের পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামধেয় মেঘ। এই মেঘ হইতে অনবরত শরধারা রূপ বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশ মণ্ডল সৈন্যগণের খড়্গসমূহের উজ্জ্বল ছটায় বিদ্যুৎ পরিবৃতের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। উচ্ছলিত শোণিতসমুদ্রে মাতঙ্গরূপ কুলাচল সমূহ নিপতিত, শোণিতবিন্দুরূপ তারকানিকর নভোমণ্ডল হইতে বিকীর্ণ হইয়া প্রপতিত, অস্ত্ররূপ কল্পাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যোধগণ বীরগতি প্রাপ্ত, হেতি ও বর্ষারূপ (শস্ত্রবিশেষ) অশনির দ্বারা অমল ভূধরসম্পন্ন ভূমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন, মহামাতঙ্গরূপ পর্ব্বতনিকর নিপতিত এবং তদ্দ্বারা জনগণ নিষ্পেষিত হইতে লাগিল[২২।২৫]। এই সময় মহাপ্রলয়ে শররূপ বারিধারাবর্ষী সৈন্যসামন্তরূপ নিবিড় জলধরপটল দ্বারা মহী ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ক্রমেই মহাসেনারূপ অর্ণবের সংক্ষোভ দ্বারা মহাড়ম্বর সমুত্থিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত শরবর্ষিগণের নিক্ষিপ্ত অসঙ্খ্য শরনিকরে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন কল্পান্তকালীন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা জলচর সর্পগণ সবেগে উদ্গত হইয়া সমুদ্রস্থিত পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বীরগণের নিক্ষিপ্ত শূল, অসি, চক্র,

ার, গদা ও ভুষুণ্ডী প্রভৃতি বাণসমূহ পরস্পর বিদলিত হইয়া শব্দ-
সহকারে দশ দিকে পরিভ্রমণ করতঃ যেন প্রলয়বাতবিচলিত শিলা
বৃক্ষাদি পদার্থ সমূহের বিলাসপরম্পরা প্রকাশ করিতে লাগিল২৭।২৮।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অতঃপর সেই সমরাঙ্গনে সৈন্যগণের শব-সমূহ রাশীকৃত হইয়া অদ্রিশিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সমস্ত ভীরুগণ সমরস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। বিনষ্ট মাতঙ্গ সমূহ শৈলাকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচগণ রুধিরার্ণবে ক্রীড়া করিতে লাগিল১।২। এই সময়ে ধর্ম্মনিষ্ঠ, অপরাঙ্মুখ, শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ও কুলোজ্জ্বলকারী বীরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিবার জন্য উৎসুক ও মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী৩।৪। উভয়পক্ষীয় বীরগণ এরূপ ভাবে মিলিত হইলেন যে, যেন দুই দিক্ হইতে দুই অরণ্যযুক্ত মহাশৈল একত্রিত হইতেছে। যেমন সমুদ্রতরঙ্গ গর্জ্জন করতঃ পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ, সেই রণক্ষেত্রে মাতঙ্গগণ মাতঙ্গসমূহের সহিত, অশ্বগণ অশ্বসমূহের সহিত ও পদাতিগণ পদাতি বৃন্দের সহিত সবেগে গর্জ্জন সহকারে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল৫।৬। এবং নরসৈন্যগণ পরস্পর শরাসন ধারণ করতঃ বাতবিচলিত বেণুর ন্যায় ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যেমন সমুড্ডীন আসুর নগর দৈব নগর দ্বারা বিদলিত হয়, তেমনি, এই যুদ্ধে বীরগণের রথরাজির দ্বারা রথনিকর নিষ্পেষিত হইতে লাগিল৭।৮। শূরগণের শরজাল গগনমণ্ডলে উত্থিত হইয়া অভি-নব জলদজালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং ধনুর্দ্ধরগণের পতাকাজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল৯। যাহারা ভীরুস্বভাব, তাহারা তাদৃশ নিদারুণ অস্ত্রযুদ্ধ প্রবৃত্ত দেখিয়া ইচ্ছানুসারে পলায়ন করিলে চক্রধারী চক্রধারীর সহিত, ধনুর্দ্ধর ধানুষ্কের সহিত, খড়্গবিদ্ খড়্গধারীর সহিত, ভুষুণ্ডী-ধারী ভুষুণ্ডীধরের সহিত, মুষলজ্ঞ মুষলযোদ্ধার সহ, কুন্তায়ুধ কুন্তধরের সহিত, ঋষ্ট্যায়ুধ ঋষ্টিধারীর সহিত, প্রাসধারী প্রাসজ্ঞের সহিত, সমুদ্গর মুদ্গরধারীর সহিত, গদাবিৎ গদাধারীর সহিত, শক্তিধারী শাক্তিকের সহিত, শূলবিশারদ শূলধারীর সহিত, বিখ্যাত পরশুবিশারদ পরশু-ধারীর সহিত, লকুটীগণ লকুটীর সহিত, (লকুট=লাঠি) উপলধর উপ-

ধরের সহিত, পাশী পাশজ্ঞের সহিত, শঙ্কুধর শঙ্কুধরের সহিত, ক্ষুরিকা-ধ ক্ষুরিকায়ুধের সহিত, ভিন্দিপালধারী ভিন্দিপালধরের সহিত, বজ্র-মুষ্টিগণ বজ্রমুষ্টিগণের সহিত, অঙ্কুশায়ুধ অঙ্কুশধরের সহিত, হলজ্ঞগণ লযোদ্ধার সহিত, ত্রিশূলী ত্রিশূলায়ুধের সহিত, কবচসম্পন্ন বীরগণ সক-চ যোধগণের সহিত সেই সমরার্ণবে মিলিত হইয়া প্রলয়বিক্ষুব্ধ অর্ণ-বর উর্ম্মিঘটার ন্যায় নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল[১০।১১]। এই সময়ে, াম্যমাণ চক্রব্রজ যাহার আবর্ত্ত, গতিশীল শর সকল যাহার শীকরবাহী ারুত, ভ্রমণশীল হেতি (হাতিয়ার) সকল যাহার মকর, উৎফুল্ল আয়ুধ কল যাহার কল্লোল, শিলাকুল যাহার জলচর জন্তু, সেই স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ভয়ের অন্তরালস্থ রণমহাসমুদ্র অমর (জীবিত) গণের নিতান্ত দুস্তর-ইয়াছিল[১৮।১৯]। এই সময়ে এক দিকে যক্ষ রাক্ষস পিশাচ ও অসুর, পর দিকে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও বিদ্যাধরগণ উভয় সৈন্যের ভাবী জয় রাজয় দর্শনার্থে সমবস্থান করিয়াছিলেন[২০]।

রাঘব! এই সমরাঙ্গণে লীলানাথ বিদূরথের সাহায্যার্থ যে সমস্ত াগণ সমাগত হইয়াছিলেন আমি তোমার নিকট তাঁহাদিগের জনপদ নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২১]।

পূর্ব্বদিক্ হইতে কোশল, কাশী, মগধ, মিথিলা, উৎকল, মেকল, কর্কর, গ্রামশৌণ্ড মুখ্যাহিম, রুদ্রমুখ্য, তাম্রলিপ্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বাজিমুখ, অম্বষ্ঠ, ষাদ[২২।২৩] বর্ণকোষ্ঠ এবং সবিশ্বোত্রদেশীয় আমমীনাশিগণ, (আমমীন= াচা মাচ) ব্যাঘ্রবক্ত্র, কিরাত, সৌবীর ও একপাদক, মাল্যবান্, শিবি, াঞ্জন, বৃষলধ্বজ, পদ্মাক্ষ এবং উদয়গিরিবাসী যোধগণ আগমন করিয়া-লেন[২৪।২৫]।

পূর্ব্বদক্ষিণদিক্ হইতে চেদী, মৎস্য, দশার্ণ, অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, কলিঙ্গ, ণ্ড্র, জঠর, বিদর্ভ, মেকল, শবরানন, শবরবর্ণ, কর্ণ, ত্রিপুর, পূরক, ণ্টকস্থল, পৃথগ্‌দ্বীপ, কোমল, কর্ণান্ধ্র, চৌলিক, চার্ম্মণ্বত, কাকক, হেম-ড্য, শ্মশ্রুধর, বলিগ্রীব, মহাগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা ও নালিকেরীবাসী বীরগণ াগত হইয়াছিলেন[২৬।২৯]।

লীলানাথের দক্ষিণ দিক্ হইতে সমাগত নৃপগণের উল্লেখ করি, শ্রবণ র। বিন্ধ্য, কুসুমাপীড়, মহেন্দ্র, দর্দ্দুর, মলয়, সূর্য্যবান্, সমৃদ্ধিশালী গণরাজ্য, বন্তী, শাম্ববতী, ঋষিক, দশপূরক, কচ্ছপ, বনবাসোপগিরি, ভদ্রগিরি,

নাগর, দণ্ডক, নূরাষ্ট্র, সাহা, শৈব, ঋষ্যমূক, কর্কট, বনবিম্বিল,[৩০।৩৩] পম্পানিবাসীগণ, কৈরকদেশীয় মহাবীরগণ, কর্কবীরগণ, স্বৈরিকগণ, নাসিকদেশীয় বীরগণ, ধর্ম্মপত্তন, পঞ্জিকগণ,[৩৪] কাশিক, তৃষ্ণখল্লুন, যাদ, তাম্রপর্ণ, গোনর্দ্দ, কানক, দীনপতন,[৩৫] তাম্রীক, দন্তর, কীর্ণক, সহকার, এনক, বৈতুণ্ডক, তুম্বনাল, জীনদ্বীপ, কর্ণিক,[৩৬] কণিকার সদৃশ প্রভাসম্পন্ন শিবি, কোঙ্কণ, চিত্রকূট, কর্ণাট, মণ্টবটক, মহাকটকিক, অন্ধ্র, কোলগিরি, অচলান্তক, বিবেষিক, দেবনক, ক্রৌঞ্চবাহ, শিলাক্ষারোদ, ভোনন্দ, মর্দ্দন, মলয়, চিত্রকুটশিখর ও লঙ্কাস্থিত রাক্ষসগণ[৩৭।৩৯]।

যে সকল রাজা পশ্চিমদক্ষিণ দিকে বাস করেন তাঁহাদেরও নামোল্লেখ করি, শ্রবণ কর। মহারাজ্য, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু, শূদ্র, সৌবীর, আভীর, দ্রবিড়, কীকট, সিদ্ধখণ্ডাখ্য, কালিরুহ, হেমগিরি, রৈবতক, জয়কচ্ছ, ময়বরদেশীয় যবনগণ, বাহ্লীক, মার্গণ, আবন্ত, ধূম্র, তুম্বক ও এতদ্দিক্স্থিত পর্ব্বতবাসী ও সমুদ্রতটস্থিত অসঙ্খ্য বীর লীলাপতির সাহায্যার্থ এই মহাযুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন[৪০।৪৩]।

রামভদ্র! এক্ষণে লীলানাথের প্রতিপক্ষীয় বীরগণের ও তাঁহাদিগের জনপদ সকলের নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। পশ্চিম দিকে যে সকল মহাগিরি বিদ্যমান আছে সে সকল এই—মণিমান্, অঙ্কুর, অর্পণ, শৈব্য, চক্রবান্ ও অস্তগিরি। এই সকল মহাগিরি নিবাসী যোধগণ ও অমরক, অছায়া, গুহুত্ব, হৈহয়, গুহ্যক ও গয়ানিবাসী এবং পঞ্চজন নামক প্রসিদ্ধ জনগণ, ভারক্ষ, পারক ও শান্তিকগণ,[৪৪।৪৬] জাতিক, হুণক, কর্ক ও গিরিপর্ণবাসী ধর্ম্মমর্য্যাদাবিহীন ম্লেচ্ছজাতি ও দ্বিশত যোজন পরিমিতস্থান বিস্তৃত মহেন্দ্রশিখরস্থিত মুক্তামণিময় ভূমি, রথাশ্ব নামক পর্ব্বত ও মহার্ণবতটস্থিত পারিপাত্র গিরি হইতে মহাবল বীরগণ সিন্ধুরাজের সাহায্যার্থ সেই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলেন[৪৭।৫০]।

পশ্চিমোত্তরদিক্স্থিত গিরিমতীদেশের রাজা মহারাজা, নিত্যোৎসবশালী নরপতি, বেণুপতি, ফাল্গুনক, মাণ্ডব্য, অনেত্রক, পুরুকন্দ, পার, ভানুমণ্ডলভাবননিবাসী যোধগণ, বল্মীক এবং ননিলদেশস্থ দীর্ঘকায়গণ, কেশ ও দীর্ঘবাহু বীরগণ, রঙ্গ, স্তনিক, গুরুহ, লুহদেশীয় জনগণ ও গোবৃষাপত্যভোজী স্ত্রীরাজ্যদেশীয় জনগণ এই সমরে সমাগত হইয়াছিল। এক্ষণে উত্তরদিক্ সমাগত যোধগণের কথা বলি, শ্রবণ কর[৫১।৫৪]।

উত্তরদিকস্থ হিমবান্, ক্রৌঞ্চ, মণিমান্, কৈলাস, বসুমান্ এবং এই উভয় পর্ব্বতের প্রত্যন্তপর্ব্বতস্থিত জনগণ, মদ্রবার, মালব ও শূরসেনীয় যোধগণ, ত্রিগর্ত্ত, একপাত্য, ক্ষুদ্র, মালব, এবং অন্তগিরিনিবাসিগণ, অবল, প্রস্থবল, কাশ, দশধান, ধানদ, সারক, বাটধানক, অন্তরদ্বীপ ও গান্ধারদেশীয় বীরগণ, তক্ষশিলা, বীলবর্গঘাতী, প্রসিদ্ধ পুষ্করাবর্ত্ত, যশোবতী মহী, নাভিমতী, তিক্ষাকালবর, কাহকনগর, সুরভূতিপুর, রতিকাদর্শ, অন্তরাদর্শ, পিঙ্গল এবং পাণ্ডব্য নিবাসী জনগণ ও যমুনা-তীরবর্ত্তী যাতুধানকগণ, হিমবান্, বসুমান্, ক্রৌঞ্চ ও কৈলাস এবং তদনন্তর অশীতিশতযোজনপরিমিত জনপদভূমি হইতে বীরোত্তমগণ সিন্ধু-রাজের সাহায্যার্থ সমাগত হইয়াছিল[৫৫।৬২]।

উত্তরপূর্ব্বদিক্‌স্থিত জনপদাদির নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। মালব, রন্ধ্ররাজ্য, বনরাষ্ট্র, সিংহপুত্র, সাবাক, আপলবহ, কাশ্মীর, দরদ, কালূত, ব্রহ্মপুত্র, কুনিদ, খদিন, মতিমান, পলোল, কুবিকৌতুক, কিরাত, যামুপাত, স্বর্ণমহী, দেবস্থল, উপবনভূমি, বিশ্বাবসুর উত্তম মন্দিরভূমি, কৈলাস ভূমি, তদনন্তর মঞ্জুবনশৈল এবং বিদ্যাধর ও অমরগণের বিমান সদৃশ ভূমি প্রদেশ হইতে যোধগণ সমাগত হইয়া লীলানাথের প্রতিপক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিল[৬৩।৬৭]।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রামচন্দ্র! শ্রবণকর। সেই নরবারণসঙ্কুল দারুণ সংগ্রামে ঐ সকল যোধগণ "আমি অগ্রে যাইব, আমি অগ্রে যাইব" এইরূপ পণ করতঃ শলভের পাবকপ্রবেশের ন্যায় সমরে প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। হে রাঘব! লীলানাথের পক্ষাবলম্বী মধ্যদেশীয় জনপদবাসী বীরগণের নামাদি পূর্ব্বে কথিত হয় নাই, সেজন্য সে সকল কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[১।৩]।

তদ্দেহিকা, শূরসেন, গুড়, আশ্বাদ্যনায়ক, উত্তমজ্যোতিভদ্র, মদমধ্যমিকাদি, শালূক, কেদ্যমাল, দৌর্জ্জেয়, পিপ্পলায়ন, মাণ্ডব্য, পাণ্ড্যনগর, সৌগ্রীব, গুরুগ্রহ,[৪।৫] পারিপাত্র, সুরাষ্ট্র, যামুন, উডুম্বর, রাজ্যনামা, উজ্জিহান, কালকোটী, মাথুর,[৬] পাঞ্চালদেশস্থ ধর্ম্মারণ্য ও তাহার উত্তর মধ্যস্থিত জনপদবাসিগণ ও পঞ্চালক, কুরুক্ষেত্র, সারস্বত জানপদগণ, অবন্তী, কুন্তী ও পাঞ্চনদের মধ্যস্থিত জনপদবাসী ও লীলাপতির স্বপক্ষ জনগণ ঐ সকল প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিকম্পিত হইয়া ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও গিরিপ্রপাতে নিপতিত হইতে লাগিল[৭।৮]। অন্তরবতীজনপদবাসিগণ দ্বারা কোশ ও ব্রহ্মাবসান এই দুই জনপদবাসিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত ও মত্তবারণগণ কর্তৃক বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল[৯]। দশপুর দেশীয় শূরগণ বানক্ষতিনিবাসী বীরগণ দ্বারা পরাজিত, ছিন্নোদর ও ছিন্নস্কন্ধ হইয়া পলায়নপর হওয়াতে তাহারা হ্রদমধ্যে নিমজ্জিত হইতে লাগিল[১০]। রাত্রিকালে পিশাচগণ সেই সমস্ত ছিন্নোদর যোধগণের উদরনিস্থত অন্ত্র সমূহ আকর্ষণ ও চর্ব্বণ করতঃ ভক্ষণ করিতে লাগিল[১১]। গভীরনিনাদকারী রণদীক্ষিত ভদ্রগিরিনিবাসী সেনাগণ মরগনিবাসী যোধগণকে বলপূর্ব্বক কচ্ছপাদির ন্যায় পল্ললাদিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল[১২]। মহাশত্রু সকল ক্ষরিত-রুধির-কলেবর, ইতস্ততঃ বিদ্রুত ও বিত্রাসিত হইতে লাগিল। মহাবল হৈহয়গণ দণ্ডিকাবাসী যোধগণকে অনলবিভাবিত হরিণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল[১৩]। এই যুদ্ধে দন্তিগণ পরস্পর দন্তে বিদারিত দেহ হইতে লাগিল। দরদবাসী শূরগণ অরাতি দিগকে বিদলি

রিতে লাগিল। তৎকালে সেই সমরভূমিতে ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত হইল[১৪]। চীনদেশীয় যোধগণ নারাচ প্রহারে ক্ষতবিক্ষত, জীর্ণ র্ণের ন্যায় জর্জ্জরিত ও বিকলাঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ বা জলধিজলে দেহ সমর্পণ করিল। নলদদেশীয় যোধগণ কর্ণাট রগণের বিনিক্ষিপ্ত কুন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া নিপতিত ও তারকা-কবের ন্যায় প্রভগ্ন ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল[১৫।১৬]। দাশক ও শকগণ য়ায়ুধ হইয়া পরস্পর কেশাকর্ষণ করতঃ সমরে প্রবৃত্ত হইল[১৭]। দশার্ণ-শীয় যোধগণ পাশদেশীয় বীরগণ-বিনির্ম্মুক্ত ভীষণ শৃঙ্খলের ভয়ে ত হইয়া বেতসমূলাশ্রয়ী অস্থিহীন মৎস্যের ন্যায় রক্তপঙ্কে নিলীন হইতে গিল[১৮]। তঙ্গনবাসিগণ শত শত অসি ও শঙ্কু প্রভৃতি শস্ত্রের দ্বারা র্জ্জরাধিপতির সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল[১৯]। অম্বুদপ্রভার ায় হেতিপ্রভাসম্পন্ন জলধররূপ নিগড়দেশীয় শূরগণ বারিধারার ন্যায় ব্রধারা বর্ষণ করতঃ বনরূপ গুহদেশীয় যোদ্ধা দিগকে অভিষিক্ত করিতে াগিল[২০]। বিপক্ষগণের মণ্ডলোদ্যত ভূষণ্ডী দিবাকর আচ্ছাদিত করতঃ াভীরদেশীয় ভীরু যোধগণকে বিনষ্ট করিল[২১]। তাম্রাখ্য যবন গণের হিনী গৌড়বাসী যোদ্ধৃগণের ভটরূপ বৃকের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর কশাকেশি ও নখানখি সংগ্রাম করিতে লাগিল[২২]। সেই গৃধ্রকঙ্ক-মাকুল রণক্ষেত্রে ভাসকনিবাসিগণ বৃক্ষশৈলচ্ছেদী চক্র সমূহ দ্বারা তঙ্গন না দিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ করিতে লাগিল[২৩]। গৌড়দেশীয় ভটগণের ঘূর্ণিত লগুড়ের ভীষণ গুড় গুড় ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গান্ধারদেশীয় াধগণ গোসমূহের ন্যায় বিদ্রুত হইতে লাগিল[২৪]। যেমন নিশার ন্ধকার শুভ্র জ্যোৎস্না গ্রাস করে, তেমনি, নীলপরিচ্ছদধারী সাগরসদৃশ কসেনা শুভ্র পরিচ্ছদ পারসিক দিগকে আক্রম করিল[২৫]। যোধগণের ায়ুধ সকল এই সময়ে ক্ষীরসাগরমধ্যস্থিত মন্দর ভূধরের ন্যায় শোভা াইতে লাগিল[২৬]। দর্শকগণ দেখিতে লাগিলেন, যেন হিমাচলশিরে নরাজি শোভা পাইতেছে। আকাশে বীরগণের প্রেরিত শস্ত্র সমূহের তি গগনবিহারী প্রাণীর নিকট সমুদ্রের চঞ্চলতরঙ্গমালার প্লুত গতি লিয়া বোধ হইতে লাগিল। শতচন্দ্রসমান শুভ্রবর্ণ ছত্র, কুন্তাস্ত্র ও ক্তি সকল গগনমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, ভোমণ্ডল শলভ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে[২৭।২৮]। সমুড্ডীন শক্তি সমূহের

দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় দৃষ্ট হইতে লাগিল, নভোমণ্ডল যেন রন্ধ্রবিহীন ও কাননীকৃত হইয়াছে। কেকয়গণ ভীষণ রবে কঙ্কাস্ত্র দ্বারা অরাতি গণের মস্তক ছেদন করিয়া আকাশমণ্ডল কঙ্ককুল (কঙ্ক=একপ্রকার পতঙ্গ) সমাচ্ছন্নের ন্যায় করিল[২৯]। ভীষণরবকারী অঙ্গদেশীয় বীরগণ কর্তৃক কিরাত সৈন্যরূপ কন্যাগণ অনঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইল (অনঙ্গ=দেহত্যাগ)[৩০]। কাশদেশীয় যোধগণ মায়াবলে পক্ষিরূপ ধারণ করতঃ পবনোড্ডীন পাংশুর ন্যায় স্বীয় সঞ্চালিত পক্ষ দ্বারা আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া অদৃশ্যভাবে তদ্দেহিক নিবাসী যোধগণকে বিনাশ করিতে লাগিল[৩১]। পরিহাসপটু যুদ্ধোন্মত্ত সচঞ্চল নার্ম্মদগণ শত্রু মধ্যে হেতিসমূহ নিক্ষেপ করতঃ হাস্য, নর্ত্তন ও গান করিতে লাগিল[৩২]। যোধগণের কণ্ কণ্ ধ্বনিকারী কিঙ্কিণীজাল শাল্বগণের বাণে খণ্ড বিখণ্ড হইতে লাগিল[৩৩]। শৈব্যগণ কুন্তীদেশ নিবাসী বীরগণের ভ্রাম্যমাণ কুন্তের দ্বারা বিঘট্টিত, বিখণ্ডিত, বিনষ্ট বিদ্যাধরের ন্যায় স্বর্গনীত হইল[৩৪]। আক্রমণকারী ধীরপ্রকৃতি অহীন দেশীয় সেনাগণ সোল্লাস গমন সহকারে পাণ্ডুনগরীয় বীরগণকে লুণ্ঠিত করিতে লাগিল[৩৫]। যেমন মাতঙ্গগণ বৃক্ষ সমূহ দলন করে, তেমনি পঞ্চনদনিবাসী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীরগণ কুন্ত, গজদন্ত ও দ্রুমযুদ্ধে কুশল তদ্দেহক নিবাসী বীর দিগকে বিদলিত করিতে লাগিল[৩৬]। নীপজন পদবাসী (নীপ একপ্রকার দেশ) বীরগণ ব্রহ্মবৎসানক জনপদবাসী দিগকে চক্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত ও হৈয়জনপদবাসী দিগকে ক্রকচ দ্বারা কর্ত্তিত করিতে লাগিল[৩৭।৩৮]। জঠরজনপদবাসিগণ কুঠার দ্বারা শ্বেতকাক নিবাসী জনগণের শিরঃছেদ ও পার্শ্বস্থ ভদ্রেশগণ শরানল প্রজ্বালন দ্বারা সেই সমস্ত জঠরসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মতঙ্গদেশীয় যোধরূপ মাতঙ্গগণ কাষ্ঠযুদ্ধকুশল বীররূপ মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া সমিদ্ধ হুতাশনস্থিত ইন্ধনের ন্যায় লয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল[৩৯]। মিত্রগর্ত্তনিবাসী বীরগণ ত্রিগর্ত্তদেশীয় জনগণ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া এরূপ ভাবে তৃণের ন্যায় উদ্ভ্রামিত হইতে লাগিল যে, যেন তাহারা পলায়ন মানসে অধঃশিরা হইয়া পাতালান্তে প্রবেশ করিতেছে[৪০]। বনিতদেশীয় যোধগণ মহাবল মাগধ দিগের মধ্যে আপতিত হইয়া পঙ্কনিমগ্ন গজের ন্যায় জীর্ণ হইতে লাগিল[৪১]। যেমন পথিমধ্যে আতপবিশীর্ণ কুসুম শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সেই রণক্ষেত্রে তঙ্গন সৈন্য কর্তৃক চিতিসৈন্যগণের জীবন বিনষ্ট হইতে লাগিল[৪২]

মস্তকসদৃশ কোশলগণ পৌরব গণের ভীষণ নিনাদ ও শর, গদা, প্রাস, হেতি প্রভৃতি শস্ত্র সমূহের অতিবর্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিক্ষতাঙ্গ হইতে লাগিল। পৌরব গণের ভীষণ পরাক্রম দর্শনে তাহারা সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত ও রুধিরার্দ্রকলেবর প্রযুক্ত তরুণাদিত্যের ন্যায় মূর্ত্তি বিধারণ করতঃ পর্ব্বতস্থিত বিদ্রুম দ্রুম সদৃশ শোভা ধারণ করিল। অনন্তর পলায়নপর হইল। অতঃপর তাহারা শত্রু কর্ত্তৃক নারাচ সমূহের ও মহাস্ত্র সমূহের দ্বারা বিকম্পিত হইতে লাগিল[৪৩,৪৪]। দূর হইতে দেখা গেল, যেন শরধারাবর্ষণকারী মেঘ অথবা শরলোমাঞ্চিত মেষ কিম্বা শরপত্রাবৃত বৃক্ষ নিচয় ভ্রমণ করিতেছে ও গজগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে[৪৬]। আরও দেখা গেল, কন্দাকস্থলনিবাসী হস্তী ও মনুষ্য প্রভৃতি জন্তুগণ বনরাজ্যনিবাসী বীররূপ জবার দ্বারা জীর্ণ হইয়া বলপ্রযুক্ত পেলব (সূক্ষ্ম) তন্তুর অনুরূপে ছিন্ন হইতেছে[৪৭]। গর্ত্তে নিরোধ প্রযুক্ত তাহাদের রথচক্র বিধ্বস্ত হওয়াতে, সেই সমস্ত রথের মস্তকরাজি, নানাদ্রি মধ্যে নিপতিত মেঘের ন্যায় সেই রণক্ষেত্রস্থিত প্রহারকারী শত্রুদল মধ্যে নিপতিত হইতে দেখা গেল[৪৮]। শাল ও তাল বৃক্ষের অনুরূপ প্রাংশুকায় যোধগণ মহাবনস্বরূপ সমরক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভুজ ও মস্তক ছেদন করিলে, সেই সমরক্ষেত্ররূপ মহাবন যেন উন্নত স্থাণুশ্রেণীর দ্বারা শোভমান হইতে লাগিল[৪৯]। যুদ্ধমৃত বীরগণের আশ্রিতা সুরসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক এই যুদ্ধের বিষয় মেরুসংস্থিত উপবনে আনন্দ সহকারে কল্পিত হইতে লাগিল[৫০]। এই সমরাঙ্গনে সৈন্যগণের উচ্চস্বরসম্পন্ন মুখমণ্ডল যাবৎ না পরপক্ষীয় কল্পান্তকালীন হুতাশনসদৃশ অনলশিখা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাবৎ উজ্জ্বলপ্রভাসম্পন্ন ও সুষুমান্বিত ছিল[৫১]। কামরূপদেশীয় পিশাচগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশার্ণদেশীয় ভূতগণ ছিন্নাঙ্গ ও অপহৃতায়ুধ হইয়া পলায়নের নিমিত্ত পথি কর্ণপাতন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল[৫২]। হতস্বামিক সৈন্যগণ বিজেতৃযোধগণের বলপ্রভাবে শুষ্কসরোবরস্থিত কমলের ন্যায় কান্তিবিহীন হইল[৫৩]। নরকজনপদবাসী কর্ত্তৃক শর, শক্তি, ঋষ্টি ও মুদ্গর দ্বারা বিদ্রুত হইয়া কণ্টকস্থলনিবাসী সৈন্যগণ পলায়ন আরম্ভ করিল[৫৪]। প্রস্থবানস্থ যোধগণ এক স্থলে অবস্থিতি করতঃ শর বর্ষণ দ্বারা কৌন্তক্ষেত্রগণকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল[৫৫]। দ্বিপিযোধগণ কমলবনচ্ছেদকারী পুরুষের ন্যায় ভল্লাস্ত্রের দ্বারা বাট-

ধান গণের হস্ত পদ মস্তক হরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল[৫৬]। পণ্ডিতগণ যেরূপ বাদ বিষয়ে পরাজিত বা উদ্বিগ্ন হন না, সেইরূপ, সরস্বতীতীরোদ্ভব বীরগণ দিবসের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াও উদ্বিগ্ন বা পরাজিত হইল না[৫৭]। ক্ষুদ্র সর্ব্বগগণ সমরে বিদ্রাবিত হইলেও লঙ্কাস্থ যাতুধানগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্ধনপ্রাপ্ত শান্ত অনলের ন্যায় পুনর্ব্বার পরম তেজঃ প্রাপ্ত হইল[৫৮]। রাঘব! আমি এই যুদ্ধের বিষয় সামান্যমাত্র বর্ণন করিলাম। ফলতঃ সহস্রফণা বাসুকি এই রণ বর্ণন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় সহস্র জিহ্বার দ্বারাও এই রণ যথাযথ বর্ণন করিতে সমর্থ হন না[৫৯]।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! বর্ণিত প্রকারে যখন সেই সকল বিজেতৃগণের বাহ্বাস্ফোট, পরাজিতগণের ত্রাস, ভয়সঙ্কুল ভীষণ সংগ্রামে বীরগণের শরনিকর অন্ধকারাচ্ছন্ন, বীরগণের বিদীর্ণ বক্ষ প্রদেশ হইতে শোণিতক্লেদরূপ নদী প্রবাহিত, অব্জপংক্তিসদৃশ শুভ্রবর্ণ অশ্ব সকল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উৎপ্লুত ও ঐ নদীর স্থানে স্থানে নিপতিত হইতেছিল; যখন যোধগণের নিক্ষিপ্ত শরফলাগ্র সমূহের পরস্পর সঙ্ঘট্টন দ্বারা বহ্নিকণা সমুত্থিত ও উক্ত শরনদীপ্রবাহ দূরে গমন করতঃ পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইতেছিল, যখন ব্যোমার্ণবস্থ যোধগণের ছিন্নমস্তকরূপ কমলরাজি সুশোভিত, চক্ররূপ আবর্ত্তের দ্বারা আবর্ত্তিত, আকাশ প্রসর আয়ুধরূপ নদীসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং যখন কপিকচ্ছবাসিগণের ব্যথাপ্রদ সমীরণসদৃশ কণ্‌কণ্‌ধ্বনিসম্পন্ন শস্ত্রসমূহ নিবিড় জলধরপটলের ন্যায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতেছিল, তখন সিদ্ধচারণগণ প্রলয়কাল সমুপস্থিত বিবেচনা করিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন দিবসের অষ্টম ভাগ শেষ হওয়াতে, দিবাকর দেবও যেন শস্ত্রাঘাত দ্বারা পীতকান্তি যোধগণের ন্যায় ক্ষীণপ্রভা প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে সেই উভয় দলস্থ সেনাধিনাথদ্বয় স্ব স্ব মন্ত্রীর সহিত বিচার করতঃ যুদ্ধবিরামার্থ পরস্পর পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন[১।৮]। উভয় পক্ষীয় বীরগণই যুদ্ধ পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের যন্ত্র, শস্ত্র ও পরাক্রম হতসামর্থ্য হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা সকলেই সেই প্রস্তাব স্বীকার করিলেন[৯]। যুদ্ধের উপসংহার স্থিরীকৃত হইলে উভয়পক্ষীয় উভয় মহারথের ধ্বজে রণবিরামের সঙ্কেত পতাকা উড্ডীন করা হইল এবং সঙ্কেত অনুসারে তৎপতাকা সৈন্যমধ্যে ভ্রামিত করিয়া যোধগণকে "তোমরা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও" এইরূপ বিজ্ঞাপিত করা হইল[১০।১১]।

তদনন্তর সেই উভয়দলস্থ সৈন্যগণ পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামক প্রলয় জলধর গর্জ্জনের অনুরূপ নিনাদে দুন্দুভি বাদন দ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল[১২]। যেরূপ মানস সরোবর হইতে নিষ্প্রতিবন্ধকে সরযূ প্রভৃতি

নিম্নগা নিম্নে আগমন করে, সেইরূপ, সেই সমরাঙ্গনাকাশ হইতে অতি বিস্তৃত অস্ত্রনদী সকল নিরাবাধে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন ভূমিকম্পের অন্তে বৃক্ষলতাদির স্পন্দন ও শরৎকাল আগতে অর্ণব স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, বীরগণের ভুজপরিচালন একে একে উপশান্ত হইল[১৩।১৪]। যেমন প্রলয়কালীন সমুদ্র হইতে জলোচ্ছ্বাস সবেগে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ, উভয় দিকে অবস্থিত উভয়পক্ষীয় সৈন্য সেই রণভূমি হইতে বিনির্গমনে প্রবৃত্ত হইল[১৫]। মন্দরভূধর নিষ্কাবিত হইলে ক্ষীরসমুদ্র যেরূপ প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল, সেইরূপ, যোধগণ সমরে বিরত হইলে সৈন্যাবর্ত্তও ক্রমে প্রশান্তভাব ধারণ করিল[১৬]। তখন দেখিতে দেখিতে সেই ভীষণ রণক্ষেত্র বিকটাকার রাক্ষসীর উদরের ন্যায় ও অগস্ত্যপীত অর্ণবের ন্যায় শূন্য হইয়া উঠিল[১৭]। রক্তনদী বহমানা হইল, তাহার কল কল শব্দে সেই শবপূর্ণ সমরাঙ্গন ঝিল্লিরব পরিব্যাপ্ত বন-ভূমির সাদৃশ্য ধারণ করিল[১৮]। তখন সরিৎস্রোতের ন্যায় বহমানা রক্ত-নদীর তরঙ্গসমূহের ঘোর শোঁ শোঁ ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। অর্দ্ধমৃত মানবগণ ক্রন্দন করতঃ প্রাণ-ব্যগ্র মানবগণকে আহ্বান করিতে লাগিল[১৯]। মৃত ও অর্দ্ধমৃত যোধগণের দেহ হইতে বিনির্গত শোণিতধারা কুটিল গতিতে প্রসৃত হইতে লাগিল। সজীব দেহের স্পন্দনে তৎপৃষ্ঠস্থিত মৃত দেহ সকল স্পন্দিত হওয়াতে সেই সেই মৃত দেহকে সজীব বলিয়া ভ্রান্তি হইতে লাগিল[২০]। অম্বুদমণ্ডল পর্ব্বতশিখর ভ্রমে করীন্দ্রগণের রাশীকৃত মৃত দেহের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিল। বিশীর্ণ রথসমূহ বাত-বিচ্ছিন্ন মহাবনের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[২১]। ভীষণ রক্তনদীর প্রবাহে শর, শক্তি, ঋষ্টি, মুষল, গদা, প্রাস, অসি, অসিকোষ, হয় ও হস্তিগণের মৃতশরীর ভাসিতে লাগিল[২২]। এই সময়ে পর্য্যাণ, সন্নাহ ও কবচাদির দ্বারা ভূতল এবং কেতু ও চামরপট্ট প্রভৃতির দ্বারা তত্রস্থ মৃত দেহ সকল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল[২৩]।

হে রাঘব! পবনদেব এই রণে ফণিফণাকারে সমুচ্ছ্রিত ও সচ্ছিদ্র তূণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেণুরন্ধ্রপ্রবিষ্ট বায়ু কুজনের অনুকার করিতে লাগিলেন এবং পিশাচগণ এই অবসরে শবরাশিরূপ পলালশয্যায় শয়ন করতঃ সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল[২৪]। চূড়ামণি, হার ও অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারের দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ চাপসমূহ চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত থাকায় বোধ

হইতে লাগিল, যেন সমর ভূমি এখন খদ্যোৎ-পরিবৃত নিবিড় অরণ্যের শোভা বিস্তার করিতেছে। অবসর পাইয়া কুক্কুর ও শৃগালগণ শব-সমূহের উদর হইতে দীর্ঘরজ্জুবৎ আর্দ্র অন্ত্র সমূহ আকর্ষণ করিতে লাগিল[২৫]। আসন্নমৃত্যু নরগণ বিকটদশন হইয়া ঘর্ঘরধ্বনি করিতে লাগিল। সজীব নরভেকগণ রক্তকর্দ্দমে নিমগ্ন হইতে লাগিল[২৬]। তত্রত্য অতি ভীষণ শত শত শোণিতনদীর গাত্রে যোধগণের উৎপাটিত রাশি রাশি চক্ষু ভাসমান হইয়া বিন্দুচিত্রিত কবচের অনুকার করিতে লাগিল এবং তাহাদিগের বাহু ও উরুরূপ বৃহৎ কাষ্ঠ সকল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বন্ধুগণ মৃত ও অর্দ্ধমৃত মানবগণকে বেষ্টন করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিল। হে কুলপাবন রাম! এই রণে রণক্ষেত্র শর, আয়ুধ, রথ, অশ্ব, হস্তী এবং পর্য্যাণ প্রভৃতির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। নর্ত্তনশীল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কবন্ধগণের দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঘ্রাণপীড়াদায়ক মদ, মেদ ও বসা প্রভৃতির গন্ধ দ্বারা জনগণের নাসারন্ধ্র আদ্র হইয়াছিল। অর্দ্ধমৃত হস্তী ও অশ্ব সকল মরণোন্মুখ ও উর্দ্ধতালু হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিল। রক্তনদীর প্রবাহপ্রহারের শব্দ (তরঙ্গা-ঘাতের শব্দ) দুন্দুভিবাদ্যের সাদৃশ্য বিস্তার করিয়াছিল[২৭।৩০]। ম্রিয়মাণ নরসৈন্যগণের ফুৎকারে তাহাদিগের মুখপ্রদেশ হইতে শোণিতপ্রণালী প্রসৃত হইয়াছিল[৩১]। শত শত শোণিত-নদীতে মৃত হস্তী ও অশ্ব রূপ মকর বাহিত হইতে হইয়াছিল। হে রামচন্দ্র! দর্শকেরা দেখিল, শরপূর্ণমুখ স্বল্পজীবনাবশিষ্ট সৈন্যগণের ক্রন্দনধ্বনি অবরুদ্ধ হইয়াছে। ক্ষণকাল এই স্থানে থাকিলে পিণ্ডভার্য্যার অর্থাৎ বামকুক্ষিস্থ মাংস খণ্ডের (প্লীহার) বসাগন্ধসম্পৃক্ত বায়ুর সঞ্চারে শরীরস্থ শোণিত ঘনীভূত হইয়া যায়[৩২]। আরও দেখা গেল, কবন্ধগণ অর্দ্ধমৃত করীন্দ্রগণের উদ্ধনাসার দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে। হস্তিপকহীন হস্তী ও আরোহি-বিহীন অশ্ব সমূহের ভ্রমণ বেগে উত্তাল কবন্ধগণ নিপতিত হইতে লাগিল[৩৩]। ক্রন্দনকারী, নিপতিত ও মৃত জীবগণ দ্বারা রণভূমিস্থ রুধিরপ্রবাহ উচ্ছলিত হইতে লাগিল। কুলাঙ্গনাগণ মৃত ভর্ত্তার গল-দেশে আলিঙ্গন করতঃ শস্ত্রাঘাত দ্বারা স্ব স্ব প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল[৩৪]। বিদেশী নরগণ স্ব স্ব স্বামীর আদেশক্রমে শিবির হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সংস্কার করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্র হইতে স্ব স্ব আত্মীয়জন-

গণের শব পরীক্ষা করিয়া আনয়নার্থ প্রবৃত্ত হইলে, শবাহরণ-ব্যাকুল সেই সকল মানবগণের প্রাণতুল্য অনুচরগণ তাঁহাদিগের সেই স্বাভিলষিত শবান্বেষণে ব্যাকুল হইয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল[৩৫]। সেই সমরক্ষেত্ররূপ উত্তুঙ্গতরঙ্গসমাকুল সমুদ্রে কেশরূপ শৈবাল, বদনরূপ কমল, ও চক্ররূপ আবর্ত্তযুক্ত শত শত রক্তনদী প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়াছিল[৩৬]। কেহ অর্দ্ধমৃত মানবর্গণের অঙ্গ-লগ্ন আয়ুধ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র, কেহ বা বিদেশে স্বজন-ব্যসন হওয়ায় শোকে নিতান্ত আকুল, কেহ বা মৃত যোধগণের পার-লৌকিক হিতকামনায় তাহাদিগের অঙ্গভূষণ ও গজ বাজী প্রভৃতি বিতরণ করিতে লাগিল[৩৭]। সৈন্যগণ প্রাণত্যাগকালে স্বীয় পুত্র, মাতা, ইষ্ট দেবতা ও পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই রণস্থলে কেবল মর্ম্মভেদী ব্যথাপ্রদ হা হা! হী হী! ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল[৩৮]। ম্রিয়মাণ ব্যক্তিরা উচ্চৈঃস্বরে স্ব স্ব প্রারব্ধ কর্ম্ম স্মরণ করিতে লাগিল। দন্তিযুদ্ধে অসমর্থ মৃতপ্রায় ব্যক্তিরা দন্তিগণের নিকট অবস্থিতি করতঃ তাহাদিগের দন্তনিষ্পেষণ ভয়ে স্ব স্ব ইষ্টদেবতা স্মরণ করিতে লাগিল। মহৎ পদাঘাতাদির দ্বারা মৃতকল্প হইয়া পলায়নকারী ভীরুগণ অসুরগণের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অশঙ্কিত-চিত্তে রুধিরাবর্ত্তসঙ্কুল ভীষণ স্থানে গমনোন্মুখ হইল[৩৯।৪০]। সৈন্যগণ মর্ম্মভেদী শরনিকরের আঘাত প্রাপ্তে পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কৃতি অনুভব করিতে লাগিল। বেতালগণ কবন্ধগণের বদনবিনিঃসৃত শোণিত পান করিবার নিমিত্ত মুখব্যাদানপূর্ব্বক সেই সমস্ত কবন্ধগণের ছিন্নশির আকর্ষণ করিতে লাগিল[৪১]। সেই সমরক্ষেত্র উচ্ছ্রীয়মান ধ্বজ, ছত্র ও চামররূপ পঙ্কজে পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত অরুণরাগরূপ সান্ধ্য (সন্ধ্যা কালের) কিরণে দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত, ভাসমান রক্তোষ্ণীষরূপ কোকনদে শোভিত, রথ, চক্র ও পর্ব্বতরূপ আবর্ত্তে সঙ্কুল, পতাকারূপ ফেনপুঞ্জে সমাকীর্ণ, চারুচামররূপ বুদ্‌বুদে পরিব্যাপ্ত, পঙ্কনিমগ্নপুরীসদৃশ বিপর্য্যস্ত রথনিকররূপ ভূমি (দ্বীপ) সম্পন্ন হইয়া যেন অষ্টম রক্তমহার্ণবের ন্যায় (প্রসিদ্ধ সমুদ্র ৭ এটী ৮) দৃষ্ট হইতে লাগিল। সৈন্যগণ উৎপাতবাতনির্দ্ধূত দ্রুম বনের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল[৪২।৪৩]। হে রঘুনাথ! প্রলয়দগ্ধ জগতের ন্যায়, অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায় ও অতিবৃষ্টিবিনষ্ট দেশের ন্যায় এই

জনশূন্য সমরভূমি সৈন্যগণের অঙ্গ বিভূষণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও ভুশুণ্ডীমণ্ডল দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল[৪৫]। সর্পাকার বাণ, কুন্তাস্ত্র, ভুশুণ্ডী, তোমর ও মুদ্গর সহ সামন্ত গণের অঙ্গভ্রষ্ট ভূষণে সেই সমর ভূমি সমাচিত হইয়াছিল[৪৬]। বীরগণের দেহ, শরীরে আবিদ্ধ কুন্তাস্ত্র সমূহের দ্বারা রক্ত-নদীতীরস্থ শৈলশিখরসঞ্জাত তালদ্রুমের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইয়াছিল[৪৭]। করীন্দ্র-গণের অঙ্গপ্রোথিত হেতিরূপ বৃক্ষ সকল স্বীয় উজ্জ্বল প্রভায় কুসুমনিকর-শোভিত বৃক্ষের অনুকার করিয়াছিল এবং কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষিগণসমাকৃষ্ট অন্ত্রের (নাড়ী বিশেষের) ও রসনাবৃন্দের দ্বারা গগনমণ্ডল জালকসদৃশ হইয়াছিল[৪৮]। কুন্ত সকল এই সমরভূমিস্থিত রুধির সরিতের তীরে উন্নত সরল দ্রুমের (সরল একপ্রকার বৃক্ষ) ন্যায় ও পতাকা সকল রক্ত সরোবরের মধ্যে রক্ত পদ্মের শোভা বিস্তার করিয়াছিল[৪৯]। মৃত হস্তীর পতন প্রহারে নিপতিত জনগণের কটিদেশ ভগ্ন হওয়াতে তাহারা কষ্টসৃষ্টে কিয়দ্দূর গমন করতঃ অবশেষে রণকর্দ্দমনিপতিত সেই সেই হস্তীর প্রতি কাতর দৃষ্টি নিপাতিত করিয়াছিল। এই সময়ে সুহৃদ্গণ মুমূর্ষু যোধগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আগমন করতঃ রণকর্দ্দমে নিপতিত হইয়া মৃতকল্প হইতে লাগিল[৫০]। হেতির দ্বারা ছিন্নমস্তক মানবগণ স্থাণু বলিয়া অর্দ্ধসন্দিগ্ধ হইতে লাগিল। সেই শোণিতনদীতে হস্তিগণের গণ্ড এবং পর্য্যাণ (যাহা হস্তীর পৃষ্ঠোপরি বসিবার জন্য থাকে তাহা পর্য্যাণ) ভাসিয়া যাওয়ায় সে সকল নৌকা শ্রেণীর সাদৃশ্য ধারণ করিল এবং রক্তস্রোতে ভাসমান শুভ্রবস্ত্র সকল ফেনপুঞ্জের শোভা বিতরণ করিতে লাগিল। আজ্ঞাপ্রাপ্ত ভৃত্যগণের দ্বারা দীপসঞ্চারে রণক্ষেত্রস্থ হতাহত মানবগণ বিবেচিত হইতে (কে জীবিত আছে এবং কে মৃত হইয়াছে তাহা অবধারিত হইতে) লাগিল[৫১।৫২]। রণস্থলের চতুর্দ্দিকে কবন্ধ ও দানব আপতিত হইতে দেখা গেল। উর্দ্ধ, স্থূল ও বৃহৎ ছিদ্র চক্রের দ্বারা সৈন্যগণ বিচ্ছিন্ন, চূর্ণীকৃত ও পলায়িত হইতে লাগিল[৫৩]। ভীষণ রণ নিস্বনের সহিত অর্দ্ধমৃত প্রাণি-গণের ভাঙ্কার ও ফেৎকার ধ্বনি (একপ্রকার ভয় জনক কাতর শব্দ) শ্রুত হইতে লাগিল। কঙ্কাদি পক্ষিগণ পক্ষনিক্ষেপ করতঃ উর্দ্ধে উৎ-পতিত হইয়া শিলীমুখবিনিঃসৃত শোণিতধারা নিরবলম্বে পান করিতে লাগিল[৫৪]। উত্তাল বেতালগণ উন্মত্ত হইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। জীবিত ভটগণ ভগ্নরথের দ্বারা নিষ্পীড়িত ও অর্দ্ধাচ্ছন্ন হইতে

লাগিল[৫৫]। অন্তর্জীবিত সৈন্যগণ ভীতিপ্রদ স্পন্দন (ছটফট করা) ও শোণিতাক্তমুখে কিঞ্চিজ্জীবিত জীবের কৃপা প্রাপ্তির নিমিত্ত সসম্ভ্রমে শবাক্রমণ করিতে লাগিল[৫৬]। সেই সমরস্থল তখন কুক্কুর, বায়স ও শ্বাপদগণের মহাকোলাহলে সমাকুল ও সম্যক নিকৃত্ত অসংখ্য অশ্ব, হস্তী, পুরুষ, অধীশ্বর এবং রথাদির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মাংসাশী প্রাণীরা সেই সেই ভক্ষ্যের নিমিত্ত যুদ্ধকলহ ও কোলাহল করিতে লাগিল। উষ্ট্র গ্রীবা হইতে রক্ত নিস্রুত হইয়া মনোহর নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই রক্তরূপ জলের অবসিঞ্চনে পল্লবিত আয়ুধরূপ লতা সকল চতুর্দ্দিকে বিততাঙ্গ হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, রণভূমি যেন মৃত্যুর উপবন বা প্রমোদ কানন হইয়াছে। যেমন কল্পান্তকালে সমুদায় জগৎ বিপর্য্যস্ত হয়, তেমনি আজ জগৎ যেন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে[৫৭।৫৮]।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর স্বচ্ছ নভোমণ্ডলে দিবাকর রণ-বিনষ্ট বীরগণের ন্যায় আরক্তবর্ণ হইয়া স্বীয় পরিম্লান প্রতাপ, সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিলেন[১]। দেখিতে দেখিতে আকাশ রক্তবর্ণতা ত্যাগ করিলেন ও সন্ধ্যালক্ষণগ্রাহী হইলেন। ক্রমে, রাত্রি আগমন করিলে রণস্থল যে কি ভীষণ হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তখন প্রলয়সমুদ্রের মহাকল্লোলের ন্যায় ভুবন, পাতাল, নভোমণ্ডল ও চতুর্দ্দিক হইতে করতালধ্বনিকারী বেতালগণ বলয়াকারে রণভূমিতে সমুপস্থিত হইতে লাগিল[২,৩]। নভোমণ্ডলে তারকা নিকর দেখা গেল। বোধ হইল, যেন দিনরূপ নাগেন্দ্রের মস্তক তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্ন হইয়াছে, তাই সন্ধ্যারাগরূপ তদীয় শোণিত দ্বারা অরুণবর্ণ গজমুক্তা সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছে[৪]। যোধ গণের হৃদয়পদ্ম আজ্ প্রাণরূপহংসবিহীন, মোহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ও সঙ্কুচিত হইয়াছে[৫]। আসন্নমৃত্যু যোধগণ নিমীলিতনেত্রে ও মরণদুঃখে উন্নতকন্ধর হইয়া কুলায়স্থিত পক্ষীর ন্যায় রণস্থলে শয়ন করিয়াছে। অথবা মৃতযোধগণের অঙ্গে অস্ত্র সকল এরূপ ভাবে বিদ্ধ হইয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন পক্ষী সকল কুলায়ে উন্নতগ্রীব হইয়া রহিয়াছে[৬]। যেমন চন্দ্রদেবের সৌন্দর্য্যময়ী জ্যোৎস্নায় কুমুদাদি কুসুম প্রফুল্ল হয়, তেমনি, বিশ্রান্ত বীরগণের হৃদয় প্রফুল্ল হইয়াছে[৭]। সেই প্রদোষকালে সেই রক্তবারিময়ী রণভূমি সঙ্কুচদ্গাত্র অভ্যন্তরপ্রবিষ্টভ্রমর ও পদ্মবনবিশিষ্ট মহাসরোবরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। (অর্থাৎ বীরগণের শরীরাভ্যন্তরে বাণ প্রবিষ্ট আছে, এবং তাহারাও সঙ্কুচদ্গাত্রে রণশয্যায় শায়িত আছে, সুতরাং সে দৃশ্য উক্তপ্রকার সরোবরের অনুরূপ)[৮]। ঊর্দ্ধভাগে ব্যোমরূপ সরোবর, তাহাতে তারারূপ কুমুদ, নিম্নভাগে ভূতলস্থ রুধির পরিপূর্ণ সরোবর, তাহাতে প্রস্ফুরিত বীররূপ কুমুদ, শোভা বিস্তার করিতে লাগিল[৯]। যেমন সেতু না থাকিলে সলিলরাশি দিক্ বিদিক্ গমন করে, সেইরূপ, আজ্ ভূতগণ অন্ধকারে ভূতগণের সহিত মিলিত হইয়া পরিচয় অভাবে ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হই-

য়াছে[১০]। সেই সমরাঙ্গনে বেতালগণ গান করিতে লাগিল এবং কণ্ কণ্ধ্বনিকারী নরকঙ্কাল সমূহের অঙ্কোপরি কঙ্ক ও কাকোল প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী নৃত্য করিতে লাগিল[১১]। বীরগণের চিতাগ্নি হইতে জ্বলন্ত শিখা সমূহ উত্থিত হইয়া তারানিকরসঙ্কুল নভোমণ্ডল ভাস্বর করিয়া তুলিল ও সেই প্রজ্বলিত চিতানলে মেদ ও মাংসের পচপচধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল[১২]। সেই সমরক্ষেত্র, কুক্কুর, কাক ও বেতাল গণের মহাকোলাহলে ও ভূতগণের ঘনসঞ্চারে সাগরের ন্যায় ভীষণ দৃশ্য হইয়া উঠিল[১৩]। কোলাহলকারী শৃগাল, কুক্কুর, যক্ষ, বেতালগণ ও ভূত গণের গমনাগমনে সেই অন্ধকারনিলীন রণস্থল সূর্য্যালোকবিহীন উড্ডীয়মান অরণ্যের উপমা প্রাপ্ত হইল[১৪]। ডাকিনীগণ ব্যগ্র হইয়া রক্ত, মাংস, বসা ও মেদাদি হরণ করিতে লাগিল। সৃক্কবিগলিতরুধির পিশাচগণ রুধির, বসা ও মাংসাদি ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মধ্যে মধ্যে তাহারা চিতালোক দ্বারা প্রকাশীভূত রুধির ও শবসমূহ অন্বেষণ করতঃ গ্রহণ করিতে লাগিল। বিরূপিকাগণ (পূতনাজাতিয়া পিশাচী) স্কন্ধোপরি মহাশব বিন্যস্ত করতঃ গমন করিতে লাগিল[১৫।১৬]। উগ্রমূর্ত্তি কুষ্মাণ্ড (একজাতীয় প্রেত) গণ দলে দলে মণ্ডলাকারে সঞ্চরণ করায় রণস্থল উত্তালীকৃত হইয়া উঠিল। চিতানলশিখা চিম্ চিম্ শব্দে শব-বস্ত্র দগ্ধ করিতে লাগিল। মেদ ও রক্ত সমুত্থিত বাষ্পের দ্বারা অদ্ভুতাকার মেঘ উৎপন্ন হইতে লাগিল[১৭]। খেচর ভূতপ্রেতগণের পদপ্রদেশ রক্তনদীর স্রোতে নিমগ্ন হওয়ায় তাহারা ভূচরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কাকোল পক্ষিগণ আনন্দে কল কল ধ্বনি করতঃ বেতালকুলাহৃত কঙ্কাল আকর্ষণ করিতে লাগিল[১৮]। বেতালবালকগণ মৃতমাতঙ্গোদররূপ মঞ্জুষা মধ্যে সানন্দে শয়ন করিতে লাগিল। গতজীবন জীবে পরিব্যাপ্ত ঈদৃশ সমরক্ষেত্রে রাক্ষসগণ আনন্দে যানারোহণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিল[১৯]। চিতানল শিখায় সমুজ্জ্বলিত সেই রণভূমিতে উন্মত্ত বেতালগণ পরস্পর কলহ করিতে লাগিল। রক্ত ও বসাদির উগ্রগন্ধের মিশ্রণে মারুত, ঘনীভূত হইল[২০]। পূতনাগণের (পূতনা রাক্ষসী বিশেষ) করণ্ডের (পেটরার) রট রট শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। যক্ষগণ অর্দ্ধপক্ক শব ভক্ষণে লুব্ধ হইয়া পরস্পর কলহ করিতে লাগিল[২১]। নিশাচর পক্ষিগণ তুঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অঙ্গ ও তঙ্গনাবাসী মৃত যোধগণের অঙ্গে

সংলগ্ন হইয়া রহিল। রূপিকাগণের হাস্যকালে তাহাদিগের বদন হইতে তাবা-পাতোপম প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদিগের সম্মুখে অগ্নিজ্বালা অবস্থিত রহিয়াছে[২২]। শোণিতাভিলাষী বিরূপিকাগণ উল্লাস সহকারে, আপতিত বেতালগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যোগিনীনায়কগণ, পিশাচগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সমাগত হইতে লাগিল[২৩]। তাহারা বীরপুরুষ গণের অন্ত্র সকল আকর্ষণ করায়, যে, শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল, সে শব্দ বীণা নিনাদের সহিত তুলিত হইতে পারে। পিশাচের ভয়ে মানবেরাও পিশাচ প্রায় হইতে লাগিল[২৪]। জীবিত সৈন্যগণ বিরূপিকা দিগের আকার প্রকার অবলোকন করিয়া ভয়ে মৃতকল্প হইতে লাগিল। কোন্ কোন স্থলে বেতাল ও যক্ষগণ আনন্দোৎসব করিতে লাগিল[২৫]। স্বরূপিকা (রাক্ষসী) গণের স্কন্ধ হইতে নিপতিত শবরাশির শব্দে নিশাচরগণ ত্রস্ত হইতে লাগিল। ব্যোমমার্গ, ভূত প্রেত ও পিশাচগণের পেটরায় সঙ্কট হইয়া উঠিল[২৬]। যক্ষপিশাচাদি নিশাচরগণ অতিযত্নে নরামিষ আহরণ করতঃ ভক্ষণার্থ অপেক্ষাকারী স্বপক্ষগণের নিকট নিক্ষেপ করিতে লাগিল[২৭]। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরাক্তকলেবর নরগণ মূর্চ্ছান্তে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জম্বুকগণের মুখবিনির্গত অগ্নিশিখোপম উজ্জ্বল আলোকে (আলেয়ার আলোকে) এরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল যে, যেন অশোকপুষ্পের গুচ্ছ সকল সজ্জিত রহিয়াছে[২৮]। বেতালবালকগণ কবন্ধগণের স্কন্ধে ছিন্নমস্তক যোজনা করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। আকাশে ভ্রমণকারী যক্ষ, রক্ষ ও পিশাচাদির উল্মুখ (অলাত) নভোমার্গ দীপ্তিমান্ করিল। এই অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ও ভূতগণের বেগবিকম্পিত রণক্ষেত্র আজ্ আকাশ, ভূধর, নিকুঞ্জ ও পর্ব্বতগুহামধ্যস্থিত পীঠবৎপ্রতিষ্ঠিত মেঘসমাচ্ছন্ন কল্পানিলবিকম্পিত করকাসঙ্কুল ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ভীষণ হইয়াছে[২৯।৩০]।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, জনগণ যদ্রূপ দিবসে নিঃশঙ্কে বিচরণ করে তদ্রূপ, সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রে রণাঙ্গনে নিশাচর রাক্ষস, পিশাচ ও যমদূত সকল সঙ্কুল হইয়া বিচরণ আরম্ভ করিল[১]। যেন হাত দিয় দূরীকৃত করিতে হয় এরূপ গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ সেই নিশারূপ গৃহে ভক্ষ্যসমৃদ্ধি লাভে আনন্দিত হইয়া ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ উদ্গতবস্ত্র (উলঙ্গ) হইয়া নাচিতে লাগিল[২]। নগরে নাগরিকগণ নিদ্রায় অচৈতন্য, দিক্ সকল নিঃশব্দ, রণাঙ্গনে কেবল নিশাচর জীবের ঘোর সঞ্চার এতদ্রূপ ভীষণ মধ্যরাত্র সময়ে উদারাত্মা লীলাপতি রাজা বিদূরথ কিঞ্চিৎ খিন্নমনা হইলেন[৩]। অনন্তর মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণের সহিত সত্বর প্রাতঃকাল কর্ত্তব্য যুদ্ধাদি কার্য্যের বিষয় বিচার করিয়া শশাঙ্কনিভ মনোহর শিরীষসম পেলব, অর্থাৎ সুকোমল ও শিলাসদৃশ সুশীতল শয়নে (শয্যায়) মুহূর্ত্তকাল নয়নপদ্ম মুদ্রিত করতঃ নিদ্রাগত হইলেন[৪।৫]। এই সময়ে লীলা ও সরস্বতী উভয়ে ব্যোমমণ্ডল পরিত্যাগ করতঃ বাতলেখা (সূক্ষ্ম বায়ু) যেমন পদ্মমুকুল মধ্যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করে, তেমনি, দ্বারসন্ধিগত সূক্ষ্মরেখার ন্যায় সূক্ষ্ম রন্ধ্র দিয়া লীলাপতির তাদৃশ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন[৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! বাগ্মিপ্রবর! উক্ত দেবীদ্বয়ের স্থূল দেহ কি প্রকারে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে শীঘ্র প্রবিষ্ট হইল? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনঘ! যাহার "আমি ভৌতিকদেহী ও স্থূল" এইরূপ নিরূঢ় বিভ্রম বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তিই সূক্ষ্মরন্ধ্র গমনে সমর্থ হয় না[৮]। যে পূর্ব্ব হইতে বার বার বহুবার অনুভব করিয়া আসিতেছে যে, আমি মানব—বৃহৎশরীরী—কি প্রকারে সূক্ষ্ম ছিদ্রে প্রবিষ্ট হইব? আমার শরীর সূক্ষ্ম আয়তনে পর্য্যাপ্ত হইবে কেন? (ধরিবে কেন?) সে ব্যক্তিই আপনার সেই প্রকার স্থূল দেহত্ব অনুভব করিয়া সূক্ষ্মায়তনে প্রবিষ্ট হইতে পারে না এবং সেই ব্যক্তিই সূক্ষ্মাদি গমনে নিরু

য়[৯]। কিন্তু যে ব্যক্তির নরদেহে অহংবুদ্ধি নাই এবং আপনার সূক্ষ্ম আতিবাহিকদেহতা নিশ্চয় আছে, সেই ব্যক্তি সেই নিশ্চয়ের দৃঢ় ংস্কার বলে সূক্ষ্মে গমনাগমন করিতে পারে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বহুবার এইরূপ অনুভব করিয়াছে যে, আমি অনবরুদ্ধস্বভাব, সেজন্য আমি ক্ষ্মতম ছিদ্রে গমন করিতে সমর্থ; সেই ব্যক্তির চেতনাংশে অর্থাৎ জীবচৈতন্যে তাদৃক্ স্বভাব আবির্ভূত হয়। তখন সে অনায়াসে সর্ব্বত্র অব্যাহতা গতি অবলম্বন করিতে পারে[১০]। যেমন অন্তরে, তেমনি বাহিরেও। যে বস্তু কঠিনস্বভাব, সে বস্তু সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু তির্য্যক্ গমন ব্যতীত কদাচ ঊর্দ্ধ গমন ও পাবক ঊর্দ্ধগমন ব্যতীত অধোগমন করে না। যে চৈতন্যে যে শক্তির আবির্ভাব হয় সে চৈতন্য সেই প্রকারেই অবস্থিতি করে[১১]। পরমাত্মা সম্যক্ প্রকারে বিদিত হইলে কোন প্রকার দুঃখ থাকে না। ছায়োপবিষ্ট ব্যক্তির কি তাপানুভব হয়? চিত্ত, সম্বিদের (চৈতন্যের বা জ্ঞানের) অনুগামী হইয়াই অবস্থিতি করে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে তাহা যেমন জ্ঞানবলে বিনষ্ট হইয়া যায় ও রজ্জুজ্ঞান প্রথিত হয়, সেইরূপ, প্রযত্ন বিশেষের বলে সম্বিৎ পদার্থে ভ্রান্তিবিদিত চিরনিরূঢ় স্থৌল্যের অন্যথা হইয়া থাকে[১২,১৪]। চিত্ত যেমন সম্বিদের অনুসারী, সেইরূপ, চেষ্টাও চিত্তের অনুসারিণী। তাহা বালক প্রভৃতি সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন[১৫]। অতএব, যাহার প্রকৃত আকার স্বপ্নের ও সঙ্কল্পপুরুষের অনুরূপ, অথবা আকাশের সদৃশ, কি প্রকারে তাহা অবরুদ্ধ হইতে পারে? তাহার অবরোধ অসম্ভব[১৬]। চিত্তমাত্রাকৃতি আতিবাহিক শরীর কোনও কিছুতে অবরুদ্ধ হয় না। হৃদ্গতজ্ঞানপ্রভাবে এই ভৌতিক শরীর আতিবাহিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং চিত্তবৃত্তির উদয়াস্তানুসারে এই ভৌতিক দেহেরও উদয় ও অস্ত অনুভূত হইয়া থাকে। জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে সমুৎপন্ন ভূত সকলের একীভাবই স্থূলদেহের কারণ[১৭,১৮]। ভাবনাপ্রভাবে চিত্তাকাশ, চিদাকাশ, মহাকাশ, এই আকাশত্রয় অভিন্ন অর্থাৎ এক হইয়া যায়[১৯]। হে রামচন্দ্র! চিত্তশরীরত্ব সকল বস্তুতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। চিত্তশরীর এত সূক্ষ্ম যে, তাহা ত্রসরেণু মধ্যে অবস্থিত, গগনোদরে অন্তর্হিত, অঙ্কুরমধ্যে বিলীন ও পল্লব মধ্যে রসরূপে অবস্থিতি করে[২০]। তাহাই জলে বীচিভাব প্রাপ্ত হইয়া উল্লাসিত হইতেছে, শিলোদরে নৃত্য

করিতেছে, অম্বুদরূপে বারিধারা বর্ষণ করিতেছে, শিলারূপেও অবস্থিতি করিতেছে[২১।২২]। এই চিত্তশরীর যথেচ্ছগামী। এমন কি, পর্ব্বত জঠরেও প্রবেশ করিতে সমর্থ। এই শরীর অনান্তাকাশব্যাপী, আবার তাহাই পরমাণুতুল্য[২৩]। সে শরীর গগনস্পর্শী অধোমূল ধরাধর রূপে অবস্থিতি করিতেছে, বাহিরে বনতনুরুহ (বৃক্ষাদি) প্রভৃতি ও অন্তরে প্রাণশক্তি প্রভৃতি বিধারণ করিতেছে[২৪]। যদ্রূপ জলনিধির আবর্ত্তরচনা জলনিধির অভিন্ন, তদ্রূপ, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরচনাও চিত্তস্বরূপের অভিন্ন। আত্মচিত্তই সমুদ্রের আবর্ত্ত ধারণের ন্যায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছে[২৫]। এই চিত্তদেহই সৃষ্টির পূর্ব্বে উদ্বেগরহিত অর্থাৎ নিরাকুল শুদ্ধবোধরূপে অবস্থিতি করে। পরে তাহাই আকাশাদি ক্রমে বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করতঃ প্রারব্ধানুরূপ প্রবৃত্তির অধীন হয়[২৬]। যেমন অসত্যবুদ্ধির দ্বারা মরু-মরীচিকায় মিথ্যা সলিলের উদয় হয়, এবং যেমন স্বপ্নে "এই বন্ধ্যাপুত্র রহিয়াছে" বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি, সেই আকাশাত্মা ও স্বনিষ্ঠ অসত্য বুদ্ধির দ্বারা মহান্ ব্রহ্মাণ্ড হইয়া বিস্তৃততা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমাদের সকলেরই চিত্ত কি ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন? অথবা কোন এক বিশেষ চিত্ত ঐরূপ শক্তিবিশিষ্ট? অপিচ, আপনি যে বলিলেন, চিত্তও সৎপদার্থ নহে। সে বিষয়েও আমার জিজ্ঞাসা জন্মিতেছে যে, কি নিমিত্ত চিত্ত সৎস্বরূপ নহে? আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের প্রত্যেকের চিত্ত কি ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অনুভব করে? কি এক অভিন্ন জগদ্দর্শন করে?[২৮]

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! প্রত্যেক চিত্তই ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন ও প্রত্যেক চিত্তই পৃথক্ পৃথক্ জগদ্‌ভ্রম ধারণ করে[২৯]। মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টি, এ প্রবাদ যেরূপে সঙ্গত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ক্রমে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য ও অনন্ত জগৎ সমুদিত ও বিগলিত হয়, তাহাও বলিতেছি, প্রণিধান কর[৩০]।

হে রাঘব! এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিই মরণমূর্চ্ছা অনুভব করিয়া থাকেন। হে সুমতে! সেই মুর্চ্ছাই তাহাদের প্রলয়যামিনী। * সেই প্রলয়-

* তাৎপর্য্য এই যে, ব্যষ্টি সৃষ্টি পক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ব্বমরণ মহাপ্রলয় এবং সমষ্টি সৃষ্টিতে সমষ্টিচিত্তশরীর হিরণ্যগর্ভের সুষুপ্তি ও মরণ মহাপ্রলয়।

রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি বিস্তার করে। যাহার যেমন জ্ঞান ও যেমন কর্ম্ম, সেই তদনুরূপ সৃষ্টি দর্শন ও অনুভব করে। অর্থাৎ যেমন, বিকারের রোগী চিত্তব্যামোহে অচলের (পর্ব্বতের) নৃত্য দেখে, তাহার ন্যায়, অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে সংসারের সৃষ্টি অনুভূত হয়[৩১।৩২]। যদ্রূপ মহাপ্রলয়ের অবসান হইলে সমষ্টিমনোবপু হিরণ্যগর্ভ সমষ্টিভোগ্যপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, তাহার ন্যায়, ব্যষ্টিমনোবপুঃ জীবও মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্ব স্ব ব্যষ্টিভোগ্যপ্রপঞ্চ বিস্তার (অনুভব) করিয়া থাকেন[৩৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যেমন ব্যষ্টিমনোবপুঃ জীব মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্বকৃত সৃষ্টি (আত্মকল্পিত বিশ্ব) অনুভব করেন, তেমনি, সমষ্টিমনোবপুঃ হিরণ্যগর্ভও প্রলয়ান্তে পূর্ব্বস্মরণের দ্বারা অতিবিস্তৃত সৃষ্টি অনুভব করেন। সুতরাং জগৎ অকারণ অর্থাৎ ইহার ব্রহ্মাতিরিক্ত কারণ নাই, নাই, দেখা যায় বটে; কিন্তু অসত্য, এ সকল কথা এক্ষণে অন্যথা হইতেছে। কেননা, সত্যসঙ্কল্প হিরণ্যগর্ভের সত্যসঙ্কল্পে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অসত্য হইবার কোন কারণ নাই[৩৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! মহাপ্রলয়ে হরিহরাদি সকলেই বিদেহমুক্ত হন। সেজন্য তৎকালে তাঁহাদের জগৎস্মৃতি অসম্ভব জানিবে[৩৫]। কল্পান্তকালে যখন বুদ্ধাত্মা আমরা মুক্ত হইব, তখন যে ব্রহ্মাদি দেবতারা বিমুক্ত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য[৩৬]। যে সকল জীব অপ্রবুদ্ধ থাকে, মোক্ষ না হওয়ায় তাহাদিগেরই জন্ম ও মরণ স্মৃতিমূলক। অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কারই তাহাদিগের জন্মমরণের কারণ[৩৭]। মরণমূর্চ্ছার অব্যবহিত পরেই জীবের অন্তরে যে অল্প অল্প অর্থাৎ অবিস্পষ্ট সৃষ্টির ভাব উদিত বা অঙ্কিত হয়, তাহাই পুরাণাদি শাস্ত্রের সৃষ্টির প্রকৃতি[৩৮]। সেই মূলপ্রকৃতি ব্যোম-প্রকৃতি নামেও উদাহৃত হয়। ঐ অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি জড়ও বটে, অজড়ও বটে। * সেই বিশ্ববীজ প্রকৃতিই এই বিস্পষ্ট বিশ্বের সংস্মৃতির ও অস্মৃতির, প্রলয়ের ও প্রলয়াবসানের অর্থাৎ সৃষ্টির ও সংহারের মূল কারণ[৩৯]। সেই ব্যোমাত্মিকা (আকাশের অনুরূপা) প্রকৃতি যখন প্রবুদ্ধা বা চিৎপ্রতি-ফলিতা হয়, অর্থাৎ যখন তাহাতে অহম্ভাবের উদয় হয়, তখন তাহাতে তন্মাত্রাপঞ্চক, দিক্ ও কাল প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভাব সকল প্রস্ফুরিত বা

* ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতি-নামক অব্যক্ত স্বয়ং জড়; পরন্তু তাহাতে চিন্ময় পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ায় তাহা অজড় অর্থাৎ চেতনের ন্যায় হয়।

প্রকটিত হইয়া থাকে। অনন্তর তাহাই অল্পপীবর (কিঞ্চিৎ স্থূল) হইয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় পঞ্চক বিস্তারিত করে। সেই যে সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় ইন্দ্রিয় পঞ্চক, তাহাই জীবের আতিবাহিক শরীর[৪০।৪১]। দীর্ঘকাল পরে সেই আতিবাহিক দেহ আমি স্থূল এইরূপ কল্পনার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আধিভৌতিকতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ভৌতিক স্থূলদেহ ও তাহাতে অহং-ভাব দৃঢ় হইয়া দাড়ায়[৪২]। তখন সেই চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকাদিবিশিষ্ট ভৌতিক দেহ, দিক্, কাল ও তদাশ্রিত পদার্থ নিচয় বায়ুতে স্পন্দক্রিয়ার ন্যায় তাহারই অধীনে তাহাতে (বুদ্ধিতে) মিথ্যাভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ সমস্তই বায়ুবিকার প্রস্পন্দের ন্যায় মনোমাত্রের বিকার। অতএব, এ সকল অনুভূত হইলেও স্বপ্নাঙ্গনাসঙ্গসদৃশ অসৎ। বুদ্ধিই স্বীয় কল্পনায় কথিত প্রকারে প্রকটিত হয় এবং মোহের প্রভাবে (আত্ম-জ্ঞানের অভাবে) ভুবনভ্রান্তি হইয়া থাকে[৪৩।৪৪]। জীব যে স্থানে মৃত হউক, সেই স্থানেই সে তৎক্ষণাৎ উক্তপ্রকার জ্ঞানে আরূঢ় হয় সুতরাং সেই স্থানেই তাহার ভুবন দর্শন সঙ্ঘটন হয়[৪৫]।

হে রামচন্দ্র! ঐ প্রকারে আকাশ সম সূক্ষ্ম জীব বাস্তব জন্মাদিবর্জ্জিত হইয়াও আগন্তুক দেহাদিভাবনার পরবশ হইয়া আমি, আমি জন্মিয়াছি, এবং আমি জগৎ দেখিতেছি, ইত্যাদিবিধ ভ্রম অনুভব করিতেছে। নভো-মণ্ডল সতঃ নির্ম্মল, অথচ অজ্ঞ লোক তাহাতে ইন্দ্রনীলকটাহাকার তল, মালিন্য কেশোণ্ড্রক ও সুরপত্তনাদি (গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি) দর্শন করে। জগদ্ভ্রম অসঙ্খ্যবিশেষণান্বিত। যথা—মর্ত্ত ও মর্ত্তবাসী, স্বর্গ ও স্বর্গবাসী ইন্দ্রাদিদেবতা, তাহাদের বাসস্থান অমরাবতী, সুমেরু প্রভৃতি শৈল, তৎপ্রদক্ষিণকারী সূর্য্য, চন্দ্র ও তারানিকর, ইহা মর্ত্তলোক, অত্রস্থ মানব, তাহাদের জরা, মরণ, বৈরূপ্য, ব্যাধি ও সঙ্কট, অনুকূল বিষয়ে উদ্যোগ ও প্রতিকূল বিষয়ে অনুদ্যোগ, ঐ সকলে সম্পন্ন স্থূল, সূক্ষ্ম, চর ও অচর প্রাণিসমূহ, অব্ধি, অদ্রি, উর্ব্বী, নদী, অধিপতি, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ ও কল্প এবং এই আমি এই স্থানে, এই আমি এই পিতা কর্তৃক জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এই আমার আধার; এই আমার সুকৃত, তাহা আমার দুষ্কৃত, আমি পূর্ব্বে বালক ছিলাম, সম্প্রতি যুবা হইয়াছি, এক্ষণে আমার হৃদয়ে বহু ভাব বিলাস করিতেছে, ইত্যাদি[৪৬।৫০]। জীব এইরূপে জগৎ নামক স্বকল্পিত বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া বৃথা জগদ্ভ্রম

অনুভব করিতেছে। এতদ্রূপ জীবসংসার (জীব পূর্ণ জগৎ) বহু অর্থাৎ অসঙ্খ্য। এবং এক এক জীবসংসার তুলনায় এক একটী অরণ্যের সমান। তারা সকল ঐ ঐ অরণ্যের ফুল ও নীলমেঘ ঐ বনের চঞ্চল পল্লব[৫১]। এ সকল অরণ্যে নররূপ মৃগগণ ও সুরাসুররূপ বিহঙ্গমগণ নিয়ত বিচরণ করিতেছে। আলোকপ্রধান দিন ইহার কুসুমরাজির রজঃ ও দুষ্প্রবেশ্যা শ্যামবর্ণা বিভাবরী ইহার নিকুঞ্জ[৫২]। সমুদ্র ইহার পুষ্করিণী, মেরুপ্রভৃতি কুলপর্ব্বত সকল ইহার লোষ্ট্র, এবং চিত্ত ইহাতে পুষ্করবীজ। ঐ বীজের অন্তরে যে অনুভূতি সমূহের সংস্কার নিলীন হইতেছে সেই সকল সংস্কার অপর সংসারারণ্যের অঙ্কুর[৫৩]। জন্তুগণ যে স্থানে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়, সেই স্থানেই তাহারা তৎক্ষণাৎ এই সংসাররূপ বনখণ্ড দর্শন করে। কোটি কোটি ব্রহ্মা, রুদ্র, মরুৎ, বিষ্ণু, বিবস্বান্, গিরি, অব্ধিমণ্ডল ও দ্বীপ গত হইয়াছে[৫৪।৫৫]। আকারবর্জ্জিত পরব্রহ্মে যে কত অসৎ জগদ্বিজ্ঞান আবির্ভূতা হইয়াছে ও হইবে, তাহা কে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে?[৫৬] এই স্থূল বিশ্ব মনন ব্যতীত অর্থাৎ স্বকীয় সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যদি বল, মন চঞ্চলস্বভাব; পরন্তু দেখা যাইতেছে, স্থূল বিশ্ব স্থিরস্বভাব, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, যেরূপে ইহাও চঞ্চল (এই বিশ্বও ক্ষণভঙ্গুর) তাহা বিচার করিয়া দেখ[৫৭]। যাহাকে পূর্ব্বোক্ত চিদাকাশ বলা হইয়াছে তাহাই মনন অর্থাৎ তাহা মনের অব্যতিরিক্ত আশ্রয়। অপিচ, যাহা চিদাকাশ, পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহাই পরম পদ[৫৮]। যেমন, যাহা জল তাহাই আবর্ত্ত, তেমনি, যাহা দৃশ্য তাহাই দ্রষ্টা। জলের ও আবর্ত্তের অভিন্নতার দৃষ্টান্তে দৃশ্যও দ্রষ্টা হইতে ভিন্ন নহে[৫৯]। যেমন ঐন্দ্রজালিক মণি আকাশমণ্ডলে বিবিধ ছিদ্র ও তন্মধ্যে নানাবিধ বিচিত্র বস্তু প্রতীয়মান করায়, তেমনি, মিথ্যারূপী অনাদিমায়াও চিদাকাশে অথবা সূক্ষ্মভূত বিরচিত চিত্তাকাশে নাম রূপাদি সম্পন্ন বিবিধবস্তুদর্শনকারী জীবভাবের স্ফুরণ করাইয়া থাকে। চিত্তের সেই সেই স্ফুরণই এক্ষণে জগৎ। একমাত্র "আমি" এই জ্ঞান থাকিলেই জগৎশব্দ পরমার্থস্বরূপে অনুভূত হয়; কিন্তু "তুমি" এইরূপ জ্ঞান দ্বারা জগৎশব্দ আরোপিত বলিয়া বোধ হয়[৬০।৬১]। *

হে রামচন্দ্র! চিদাকাশরূপিণী পরমাত্মস্থিতা অপ্রতিহতগামিনী সেই

* ভাবার্থ এই যে, অহমাত্মাই সব; তাহাতে "তুমি" এই জ্ঞান কল্পিত।

সরস্বতী ও লীলা উক্ত কারণে ও কথিত প্রকারে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে বিদূরথগৃহে আবির্ভূত হইতে সমর্থা হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রতিবন্ধক ঘটনা হয় নাই। চিদ্‌বস্তু সর্ব্বগামী এবং তাহাতেই যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়। অপিচ, তাহা আতিবাহিক ও সূক্ষ্ম। অতএব, এমন কি আছে, যাহা তাদৃশ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বতঃ প্রসারী আতিবাহিক দেহকে অর্থাৎ চিত্তশরীরকে অবরোধ করিতে পারে? তাহা কোনও কিছুতে অবরুদ্ধ হইবার নহে[৬২।৬৪]।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর সেই দেবীদ্বয় ভূপতি সদনে প্রবেশ করিলে সদ্মমধ্য সমুদিত চন্দ্রদ্বয়ে ধবলীকৃতের ন্যায় সুসুন্দর হইয়া উঠিল[১]। তখন ঐ গৃহে মন্দার-কুসুমবাহী মৃদুসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই দেবীদ্বয়ের প্রভাবে অন্যান্য নরনারীগণ নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিল, কেবল রাজা বিদূরথ ঐ সময়ে সচেতন থাকিলেন। এই সময়ে সেই গৃহ যেন সৌভাগ্যের নন্দনোদ্যান, সর্ব্ব-প্রকার ভয়নিবারণ ও সবসন্ত বন ও প্রাতঃকালীন প্রফুল্ল অম্বুজ সদৃশ মনঃপ্রসন্নকর হইয়াছিল। রাজা সেই দেবীদ্বয়ের নিস্পন্দ শশাঙ্কশীতল দেহপ্রভায় আহ্লাদিত হইয়া যেন আপনাকে অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন[২।৪]।

অনন্তর রাজা দেখিলেন, সেই দিব্য সীমন্তিনীদ্বয় মেরুশৃঙ্গদ্বয়ে সমুদিত চন্দ্রবিম্বদ্বয়ের ন্যায় আসনোপরি উপবিষ্টা হইয়াছেন। অতঃপর লম্বমান দিব্যমাল্যধারী রাজা বিস্মিতমনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শেষ-শয্যা হইতে সমুত্থিত ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় পর্য্যঙ্ক শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া উপধান প্রদেশে অবস্থিত পুষ্পকরণ্ড হইতে কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "হে দেবীযুগল! আপনারা জন্মদুঃখরূপ দাহের শশিপ্রভা এবং বাহ্য ও অন্তর্গত অন্ধকার বিদ্রাবণকারিণী রবিপ্রভা। আপনাদিগের জয় হইক।" এই বলিয়া নদীতীরস্থিত বিকসিত কুসুম দ্রুম যেমন পদ্মিনীর প্রতি কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করে, (জলে পদ্মপুষ্প ফুটিয়া আছে, তদুপরিতীরস্থ বৃক্ষের ফুল পড়িতেছে। সেই দৃশ্য যেরূপ দেবীদ্বয়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ তদ্রূপ) সেই প্রকার, দেবীদ্বয়ের পদদ্বয়ে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিলেন[৫।১০]। অনন্তর ঈশ্বরী সরস্বতী লীলাকে ভূপতি পদ্মের জন্ম-বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী মন্ত্রীকে প্রবোধিত করিলেন[১১]। মন্ত্রী প্রবুদ্ধ হইয়া সেই দিব্যনারীদ্বয়কে সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রণাম ও তাঁহাদিগের পদদ্বয়ে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করতঃ পুরোভাগে উপবিষ্ট হইলেন[১২]। অনন্তর দেবী সরস্বতী রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক

বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, রাজন্! তুমি কাহার পুত্র? কিপ্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এই স্থানে কতকাল অবস্থিতি করিতেছ? এই সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর।

মন্ত্রী দেবীর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া রাজার পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেবীদ্বয়! আমি আপনাদিগের সম্মুখে যে আমার প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব, তাহা আপনাদিগেরই প্রসন্নতার মহিমা। যাহাই হউক, আপনারা আমার প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন[১৩।১৪]।

হে দেবীদ্বয়! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত রাজীবলোচন শ্রীমান্ কুন্দরথ নামক এক নরপতি ছিলেন। তিনি ভুজচ্ছায়ার দ্বারা দরিদ্র প্রভৃতি জনগণের সন্তাপ তিরোহিত করিয়া অবনী পালন করিতেন[১৫]। সেই মহারাজ কুন্দরথের পুত্র ভদ্ররথ, ভদ্ররথের পুত্র বিশ্বরথ, বিশ্বরথের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র সিন্ধুরথ, সিন্ধুরথের পুত্র শৈলরথ, শৈলরথের পুত্র কামরথ, কামরথের পুত্র মহারথ, মহারথের পুত্র বিষ্ণুরথ, এবং বিষ্ণুরথের পুত্র নভোরথ। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শরীর আমাদিগের এই প্রভু উক্ত মহারাজ নভোরথের পুত্র[১৬।১৮]। ইনি ক্ষীরোদসমুদ্রীয় চন্দ্রমার ন্যায় জনগণকে অমৃতের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। আমাদিগের এই মহারাজ মহৎপুণ্যসম্ভার সহ উৎকৃষ্ট পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে উপরিউক্ত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বলিয়া ইঁহার নাম বিদূরথ[১৯] যেমন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় গৌরীমাতার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি, আমাদিগের এই মহারাজা সুমিত্রা মাতার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার পিতা ইঁহার দশবর্ষবয়ঃক্রম কালে ইঁহার প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ বনগমন করিলে তদবধি ইনি ধর্ম্মানুসারে মহীমণ্ডল পালন করিতেছেন। শত শত ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল পরম ক্লেশের সহিত তপস্যা করিয়াও যাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না, অদ্য আমাদিগের সুকৃতদ্রুম ফলিত হওয়াতে আমরা সেই দুষ্প্রাপ্য দেবীদ্বয়কে প্রাপ্ত হইলাম। হে দেবীযুগল! আমরা আজ আপনাদের প্রসন্নতায় পরমপুণ্যলাভ করিলাম, সন্দেহ নাই।

হে রামচন্দ্র! মন্ত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং রাজা কিয়ৎক্ষণ কৃতাঞ্জলিপুটে ও অবনতবদনে তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেন অনন্তর সরস্বতী স্বীয় হস্ত দ্বারা রাজার মস্তক স্পর্শ করতঃ কহিলেন

াজন্! তুমি বিবেক দ্বারা তোমার প্রাক্তন জন্মপরম্পরা স্মরণ কর[২০।২৪]।

সরস্বতীর স্পর্শে ভূপতির হৃদয়ান্ধকার (জীবের আবরণ মায়া নামক মঃ) বিনষ্ট হইল। মায়ার বা তমের অপসারণে হৃদয়পদ্ম (বুদ্ধিরূপ পদ্ম) কসিত হইল ও সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল[২৫।২৬]। জ্ঞানের প্রকাশে) বিকশিতহৃদয় নরপতি জ্ঞপ্তিদেবীর অনুগ্রহবলে ব্ববৃত্তান্ত সকল পরিজ্ঞাত হইতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি একে একে সমুদয় র্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার লানাম্নী মহিষী ছিল, লীলা ব্রতপরায়ণা ও জ্ঞপ্তিদেবীর সেবিকা ল, পরে তাঁহার দেহের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ (মরণ) হয়, রণের পর পদ্মনৃপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এ সমস্তই তাহার অন্তরে ত্যক্ষের ন্যায় প্রস্ফুরিত হইল। যেমন সমুদ্রবক্ষে শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গ-ালা উত্থিত হয়, সেইরূপ, বিদূরথের অন্তরাকাশে সমুদায় প্রাক্তন বৃত্তান্ত থানুপূর্ব্বী উদিত হইতে লাগিল। তিনি বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া মনে নে ভাবিতে লাগিলেন, একি! এ কাহার মায়া! এক্ষণে আমি এই দবীদ্বয় কর্ত্তৃক কি পরিজ্ঞাত হইলাম? পরে বলিলেন, হে দেবিদ্বয়! । কি আশ্চর্য্য! আমি বিস্পষ্ট দেখিতেছি, আমার এক দিন মাত্র ত্যু হইয়াছে, অথচ তাহারই মধ্যে আমার সপ্ততিবর্ষ বয়স অতীত ইয়াছে ও পূর্ব্বজন্মের অনেক কার্য্যকলাপ স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। পিতা, াতামহ, প্রপিতামহ, বাল্য, যৌবন, মিত্র, বন্ধু ও পরিবার, সমস্তই রণ হইতেছে। হে দেবীদ্বয়! এ কি কাণ্ড তাহা বলুন[২৭।৩০]।

জ্ঞানদেবী বলিলেন, রাজন্! তুমিই বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলে। যে মুহূর্ত্তে ামার মরণমূর্চ্ছা হয়, সেই মুহূর্ত্তে ও সেই স্থানেই তুমি ঐ সকল াক অনুভব করিয়াছ। তোমারই মায়াবরণবর্জ্জিত চিদাত্মায় ঐ কল মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত ছিল। সেই গিরিগ্রামীয় ব্রাহ্মণের হাদি, পদ্মভূপতির রাজ্য ও রাজপুরী, তন্মধ্যস্থ প্রধান গৃহ ও গৃহা-াশ, সমস্তই তোমার অন্তরাকাশে অর্থাৎ চিত্তাকাশে প্রতিরঞ্জিত ইয়াছিল। তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ, অর্থাৎ যাহা অনুভব করিয়াছ, স্তই উক্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডপে অর্থাৎ অন্তঃস্থ কল্পনাময় চিত্তে, অন্য াথাও নহে। কেবল যে সেই ব্রাহ্মণের জগৎ-ই ঐরূপ, তাহা হ। প্রত্যেক জগৎ-ই ঐরূপ। অর্থাৎ সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন বা পৃথক্

পৃথক্ প্রতিভাত হইয়া থাকে। তোমারই জীব সেই গৃহাকাশে আমার উপাসক হইয়া অবস্থিত ও সেই প্রকারে প্রথিত হইয়াছিল। যে স্থানে তোমার জীব ছিল, সেই স্থানেই পদ্মভূপালের পৃথিবী এবং সেই পৃথিবীতেই তাঁহার রাজ্যগৃহাদি এবং সেই স্থানেই তোমার এই আরম্ভ-মন্থর (মহাসমৃদ্ধিশালী) গৃহ রহিয়াছে৩১।৩৫। নির্ম্মল আকাশ অপেক্ষাও সুনির্ম্মল ত্বদীয় চিদাকাশস্থ চিত্তাকাশে ঐ সকল ভ্রান্তিব্যাবহার পরম্পরার বিস্তার প্রতিভাত হইয়াছে। * আমার নাম অমুক, ইক্ষ্বাকুকুলে আমার জন্ম হইয়াছে, পূর্ব্বে আমার অমুকনামধারী পিতা ছিলেন, ও পিতামহ ছিলেন, এই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি বালক ছিলাম, দশবর্ষ বয়সের সময় পিতা আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করত বনে গমন করিয়াছিলেন, অনন্তর আমি দিগ্বিজয় করিয়া এই সমস্ত মন্ত্রী ও পৌরগণের সহিত বসুন্ধরা পালন করতঃ অকণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতেছি, এবং যজ্ঞ ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করতঃ ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেছি, আমার বয়স এক্ষণে সপ্ততি বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে,৩৬।৪০ সম্প্রতি পরবল কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হওয়ায় আমার সহিত তাহাদের দারুণ বিগ্রহ সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি যুদ্ধ করিয়া গৃহে সমাগত হইবা মাত্র অপূর্ব্ব দৃষ্ট দেবীদ্বয় এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিলাম, তাঁহাদিগের মধ্যে এক দেবী আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া জাতিস্মরত্বপ্রদ ও প্রফুল্লকমলসপ্রভ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন, এই সমস্ত ভাব তোমার মনে সম্প্রতি উদিত হইতেছে। আবার ইহা ভাবিয়াও পরিতুষ্ট হইতেছ যে, দেবতারা পূজায় পরিতুষ্ট হইলে, বাঞ্ছিত প্রদানে পরাঙ্মুখ হন না। আরও ভাবিতেছ যে, আমি এখন গতসংশয়, কৃতকৃত্য, শান্ত, বিগতসর্ব্বদুঃখ ও পরম সুখী হইলাম। মহারাজ! তোমার এবম্প্রকার বহ্বাচারসম্পন্ন লোকান্তর সঞ্চারিণী ভ্রান্তিই বিস্তৃত হইয়াছে, অন্য কিছু হয় নাই।† তুমি যে মুহূর্ত্তে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমার হৃদয়ে অভিবর্ণিত ভ্রান্তির বিলাস আরব্ধ হইয়াছিল। যেমন নদীপ্রবাহ

* কথাগুলির স্থূল মর্ম্ম বা নিষ্কর্ষ—বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের, পদ্মভূপতির ও বিদুরথ রাজার, এই তিন্ সংসার বিস্তারের মূল কারণ চিত্তবিকার।

† অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তর ও লোক লোকান্তর প্রভৃতি সমস্তই অনাদি ভ্রান্তির মহিমা।

ক আবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া অন্য আবর্ত্ত অবলম্বন করে, সেইরূপ, ৎপ্রবাহও এক দৃশ্য ত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্য প্রতিভাসিত করে[৪৭।৪৮]। পিচ, আবর্ত্ত যেমন আবর্ত্তান্তরের সহিত মিলিত হইয়া অন্য আবর্ত্তের ৎপত্তি করে, সেইরূপ, সৃষ্টিশ্রীও মিশ্র ও অমিশ্র রূপে প্রতিভাত ইয়া থাকে[৪৯]।

হে ভূপতে! তুমি যে কিছু অনুভব করিয়াছ ও স্মরণ করিতেছ, মস্তই অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাকল্প ও চৈতন্যরূপ সূর্য্য হইতে সমুত্থিত। মন স্বপ্নে মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্বৎসরশত ভ্রম উপস্থিত হয়, যেমন সঙ্কল্প চনায় পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ কল্পিত হইয়া থাকে, যেমন গন্ধর্ব্ব- ার কুড্য ও বেদ্যাদির দ্বারা বিভূষিত দৃষ্ট হয়, যদ্রূপ নৌকাদির নে তীরস্থিত পর্ব্বতাদির গমন অনুভূত হয়, যেমন বাতপিত্তাদির ক্ষোভে বৃক্ষ পর্ব্বতাদির অপূর্ব্ব নর্ত্তন দৃষ্ট হয়, যেমন স্বপ্নে স্বশির- ছদ দৃষ্ট হয়, এই বিস্তৃতরূপধারিণী ভ্রান্তিকে তুমি সেইরূপ জানিবে[৫০।৫৩]। স্তুতঃ উক্ত সমস্তই মিথ্যা। তুমি জাত বা মৃত হও নাই। তুমি চির- ালই কেবল, শুদ্ধ ও শান্ত বিজ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থিতি করি- চছ[৫৪]। তুমি অখিল জগৎ দর্শন করিতেছ, অথচ কিছুই দেখিতেছ । সর্ব্বাত্মকত্বপ্রযুক্ত তুমি আপনি আপন আত্মায় প্রকাশিত হই- ছ[৫৫]। এই যে মহামণির ন্যায় উজ্জ্বল ও সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর ভূপীঠ, ইহা স্তব ভূপীঠ নহে এবং তুমিও বাস্তব ঐরূপ নহ[৫৬।৬২]। এই গিরিগ্রাম, এই গণ, এই আমরা, এ সকল কিছুই নহে ও নাই। সেই যে, গিরিগ্রামীয় প্রের মণ্ডপাকাশ, সেই যে মণ্ডপাকাশেই সেই সভর্ত্তৃক লীলার সহিত স্বর জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, সেই যে, গৃহাকাশস্থিত ব্যোমমণ্ডল লীলা- জধানীতে সুশোভিত রহিয়াছে, আমরা যে এই জগতে অবস্থিতি করি- ছি, এ সমস্তই সেই গৃহাকাশে অবস্থিত। সে মণ্ডপাকাশ কি? সে গুপাকাশ নির্ম্মলব্রহ্ম। সে মণ্ডপে মহী, পত্তন, বন, শৈল, সরিৎ, র্ণব, মানবগণ, পার্থিব ও ভূধর প্রভৃতি কিছুই নাই। জনগণের ণ ও পরস্পর দর্শনাদি, সমস্তই মিথ্যা এবং সমস্তই চিন্মাত্রে পরিপূর্ণ।

বিদূরথ বলিলেন, হে দেবি! যদি এ সমস্ত কিছুই নহে, তাহা লে, আমার এই সমস্ত অনুচরগণ কি আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া াত্মাতেই অবস্থিত আছে? অথবা অন্য কিছুতে অবস্থিত আছে? স্বাপ্ন

পদার্থের ন্যায় যদি এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে; যদি এই সমস্ত নরনারী স্বপ্নস্বরূপে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইলে আমার এই সমস্ত অনুচর-বর্গেরাও স্বপ্নস্বরূপ। অতএব হে দেবি! ইহারা কি প্রকারে আত্মাতে সত্যস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে? কি প্রকারেই বা এ সমস্ত অসৎ? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৬৩।৬৬]।

সরস্বতী প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! বিদিতবেদ্য, শুদ্ধবোধৈকরূপী, চিদ্ব্যোমাত্মা দিগের সম্বন্ধে সমুদায়ই অসদ্রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কারণ, শুদ্ধবোধাত্মা দিগের জগদভ্রম নাই। সর্পজ্ঞান তিরোহিত হইলে যেমন রজ্জুতে আর কখন সর্পভ্রম হয় না, তেমনি, জগতের অসদ্ভাব পরিজ্ঞাত হইলে জগদ্ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়, কদাচ আর তাহার উদয় হয় না। মৃগতৃষ্ণিকাভ্রান্তি উপশান্ত হইলে তখন আর জলভ্রম উপ-স্থিত হইবে কেন? "ইহা স্বপ্ন" এরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট স্বমরণ কি প্রকারে সত্য হইবে?[৬৭] সর্ব্বদা অমর জীব স্বপ্নে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় আপনাকে মৃত ও জাত মনে করিতেছে। হে অঙ্গ! শরৎকালের নির্ম্মল নভোমণ্ডলের অপেক্ষাও নির্ম্মল চিত্ত ও শুদ্ধবোধ ব্যক্তিরা "এই আমি, এই জগৎ" এরূপ কুৎসিত শব্দ বাগাড়ম্বর ব্যতীত অন্য কিছু মনে করেন না[৬৮]।

মহর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন সভ্যগণ পরস্পর অভিবাদন পূর্ব্বক স্নান ও সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর তমোময়ী যামিনী আগতা হইলেন। যামিনী অবসান হইলে পুনর্ব্বার দিবাকর সমুদিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহারা সভায় সমাগত হইয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন[৬৯]।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হয় নাই, যে পরম পদে আরোহণ করে নাই, এই অসৎ জগৎ তাহারই নিকট বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও সদ্রূপে প্রতিভাত হয়[১]। যেমন বাল্য সংস্কারে আবদ্ধ বেতাল (ভূতের ভয়) মরণ পর্য্যন্ত দুঃখপ্রদ হয়, তেমনি, এই অসদাকার জগৎ আকারসম্পন্ন হইয়া অবোধ দিগকে দুঃখপ্রদান করিয়া থাকে[২।৩]। যেমন মরুভূমিস্থ সূর্য্যকিরণ বারি না হইলেও অজ্ঞ মৃগ দিগের বারি-ভ্রম জন্মায়, সেইরূপ, এই জগৎ সত্য না হইলেও অতত্ত্বজ্ঞ দিগকে সত্য বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়। যেমন জীব দিগের স্বপ্নদৃষ্ট স্বীয় মরণ অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয় ও অর্থক্রিয়াকারী (অর্থক্রিয়া= শোক রোদনাদি। সে মরে নাই অথচ মরণ স্থির করিয়া শোক ও রোদন করে) হয়, সেইরূপ, এই অসৎ জগৎ অপ্রবুদ্ধ জনগণের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত ও বৃথা অর্থক্রিয়াকর হইয়া থাকে[৪]। যেমন সুবর্ণ-তত্ত্বে অব্যুৎপন্ন জনগণের সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কার বুদ্ধিই হয়, সুবর্ণবুদ্ধি হয় না, তেমনি, এই জগতে ও জগদন্তর্গত পুর, গ্রাম, অগার, নগ ও নাগেন্দ্র প্রভৃতিতে অতত্ত্বজ্ঞ জনগণের দৃশ্যতা ব্যতীত পরমার্থ দৃষ্টি জন্মে না[৫।৬]। যেমন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অসত্য মৌক্তিকমালা, কেশোণ্ড্রক ও বর্হ (ময়ূরের পিচ্ছ) প্রভৃতি সত্যরূপে অনুভূত হয়, সেইরূপ, এই অসৎ জগৎ তত্ত্বজ্ঞান বর্জ্জিত দিগের নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে[৭]। রাম! অহংভাবাদিবিশিষ্ট এই বিশ্বমণ্ডল একটী সুদীর্ঘ স্বপ্ন। তন্মধ্যে যে স্বাতিরিক্ত পুরুষ, তাহাও স্বপ্নকল্প। স্বপ্নকল্প হইলেও তাহা সত্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যেমন তুমি আমি তিনি ইনি সমস্তই সত্য। যেরূপে ঐ সকল সত্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর[৮]। সমুদায় দৃশ্যের আধার একমাত্র শান্ত, সত্য, পবিত্র, অচেত্য ও চিন্মাত্রবপু পরমাকাশ বিস্তৃত রহিয়াছেন[৯]। এই চিদাকাশ স্বয়ং, সর্ব্বগ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বাত্মক। ইনি স্বীয় সর্ব্বাধারত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্বপ্রভাবে যে যে স্থানে যে যে অর্থ-ক্রিয়োপযোগী হইয়া সমুদিত হন, সেই সেই স্থলে তদনুরূপ ক্রিয়াদি

প্রথিত হইয়া থাকে[১০]। এই বিশ্বরূপ স্বপ্নপুরে যে দ্রষ্টা, অজ্ঞগণ তাহাকে যে-ই নর বলিয়া জানে, সেই অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তাহা তাহার নিকট নরাকারে অনুভূত হয়[১১]। দ্রষ্টার স্বরূপ চৈতন্য, যাহা স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নাকাশের অন্তরে (স্বপ্নাকাশ পুরিততী নাম্নী নাড়ীর ছিদ্র প্রদেশ) অবস্থিত, তাহা স্বপ্নদ্রষ্টার বাসনানুসারে (বাসনা=পূর্ব্বসংস্কার) বাসনার আধার চিত্তের সহিত এক হইয়া প্রকাশ পায় এবং সেই ঐক্যের প্রভাবে সে আপনাকে নর (মনুষ্য) বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বুঝা গেল যে, সত্য চৈতন্যের প্রভাবেই সমুদায় চিত্তবিকার প্রকাশের সত্যতা প্রথিত হয়[১২।১৩]। অভিপ্রায় এই যে, আত্মচৈতন্যই সত্য; চিত্তবৃত্তি সকল মিথ্যা। তুমি, আমি, তিনি, এ সকল বোধ চিত্তেরই বিকার বা বৃত্তি; সুতরাং মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা হইলেও ঐ সকল সত্যচৈতন্যের সংশ্রবে সত্যবৎ জানিবে।

এই স্থানে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে মহামুনে! যদি মায়ামাত্র-শরীর স্বাপ্নপুরুষ আত্যন্তিক অসত্য হইলে অর্থাৎ সত্য সংশ্রব শূন্য হইলে দোষ কি?[১৪] * বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! স্বপ্নকালেও পুর ও বাস্তব্য প্রভৃতি সত্যচৈতন্যের সংশ্রবে সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। স্বপ্নকালেও যে স্বাপ্ন পদার্থে সত্যের সংশ্রব থাকে, সে বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি, প্রণিধান কর। † সে প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অন্য কিছু নহে[১৫]। সৃষ্টির আদিতে স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি স্বপ্নের ন্যায় আভাসসম্পন্ন ছিলেন। তিনি অনুভবরূপী ও হিরণ্যগর্ভ। অর্থাৎ সংস্কারীভূত জ্ঞানসমষ্টিরূপী। সেইজন্য তাঁহার সঙ্কল্পসম্ভূত এই বিশ্ব স্বপ্নসদৃশ[১৬]। হে রাঘব! স্বপ্ন যেরূপ, এই বিশ্বও সেইরূপ। ইহাতে আমার সম্বন্ধে তুমি যেরূপ সত্য, স্বপ্নে অন্য নরগণ অন্য নরগণের সম্বন্ধে সেইরূপ সত্য[১৭]। অন্যের কথা এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট নগর ও নগর

---

* রামপ্রশ্নের অভিপ্রায়—জাগ্রৎ পুরুষ সম্পূর্ণরূপে অসত্য হইলে ব্যবহার কার্য্যের বিরোধ ও কর্ম্মশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য দোষ হয়। স্বাপ্নপুরুষের সত্যতার সে দোষ হয় না। কেননা, স্বাপ্নপুরুষের কোন কিছু কর্ত্তব্য নাই। সুতরাং ব্যবহারের ও শাস্ত্রের অপ্রমাণ্যের আশঙ্কা নাই। যখন তাহা নাই, তখন স্বাপ্নপুরুষে সত্যচৈতন্যের সম্বলন স্বীকারের প্রয়োজন কি?

† বশিষ্ঠের অভিপ্রায়—সত্যচৈতন্যের বিনা সংশ্রবে কোনও কিছু প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং স্বাপ্ন প্রত্যক্ষেও সত্যচৈতন্যের সংশ্রব আছে। স্বাপ্নদৃষ্ট বস্তু ব্রহ্মের ন্যায় সত্য নহে, পরন্তু ব্রহ্মে ভাসমান হওয়ায় ব্রহ্মের সত্যতা স্বপ্নকল্পিত মিথ্যায় মিশিয়া সেই সকল মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলে।

বাসীরা যদি কোনও অংশে সত্য না হয়, তাহা হইলে, তদাকার সম্পন্ন তুমিও আমার সম্বন্ধে কোন অংশে সত্য নহ। তোমার সম্বন্ধে আমি যেরূপ সত্যাত্মা, সেইরূপ, আমার সম্বন্ধে সকলই সত্যাত্মা। এই নিদর্শনই স্বপ্নবৎ অনুভূত এই সংসারের পরস্পর সিদ্ধির প্রমাণ ও ক্রম[১৮।২০]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার মনে হইতেছে যে, স্বপ্নদ্রষ্টা নির্নিদ্র হইলেও তদ্দৃষ্ট (স্বপ্নদৃষ্ট) গ্রামনগরাদি বিদ্যমান থাকে। কেননা, সমস্তই সৎ, সৎ ব্যতীত অসৎ কিছুই নাই। (কিন্তু কৈ? তাহা ত থাকে না? জাগ্রৎ হইলে স্বপ্নদৃষ্ট কোনও কিছু প্রমাগোচর হয় না। হইতে দেখাও যায় না এবং কস্মিন্‌কালে ঐরূপ শুনাও যায় নাই)[২১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহাই ঠিক্। অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি জাগ্রৎ কালেও থাকে; পরন্তু তাহার যাহা সত্য, তাহাই তদাকারে থাকে। আকাশের ন্যায় নির্ম্মল নির্লিপ্ত দর্শনাধার আত্মচৈতন্যই পরমসৎ এবং সে সকল তন্মাত্রে বিদ্যমান থাকে; মিথ্যাংশের অপলাপ হয়[২২]। হে রাঘব! তুমি যাহা জাগ্রদবস্থায় অনুভব করিতেছ, তাহাই স্বপ্নাবস্থায় অনুভব করিয়াছ ও করিবে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রদ্দৃষ্টের ন্যায় স্বপ্নান্তরে দৃষ্ট না হইবার কারণ, কালের ও স্থানের প্রভেদ বা পরিবর্ত্তন। (রামের অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও যদি সৎ হয় তবে তাহা জাগ্রৎ কালে না থাকে বা না দেখা যায় কেন? বশিষ্ঠের অভিপ্রায় জাগ্রৎদৃষ্ট ও স্বপ্নদৃষ্ট উভয়ই সমান। জাগ্রদ্দৃষ্ট যেমন স্বপ্নকালে থাকে না, তেমনি, স্বপ্নদৃষ্টও জাগ্রৎকালে থাকে না। সুতরাং যাহা দেখা যায় তাহা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া মিথ্যা; পরন্তু তন্মধ্যে যে অপরিবর্ত্তনস্বভাব আত্মচৈতন্য তাহাই ত্রিকালব্যাপী ও সত্য)[২৩]। অতএব, যে কিছু দৃশ্য প্রতিভাত হইতেছে সমস্তই সেই সতে (আত্মব্রহ্মে) অবস্থিত। যাহাতে অবস্থিত, তাহাই সত্য এবং সেই সত্যের সত্যতায় এ সকলও সত্য-বৎ। অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সত্য। যেমন স্বপ্নাবস্থার স্ত্রীসঙ্গম মিথ্যা হইলেও সত্য, সেইরূপ[২৪]। উক্তপ্রকারে সমস্তই সর্ব্বত্র সমান বিদ্যমান এবং যিনি সর্ব্ববেত্তা তিনিই স্বকীয় মায়া শক্তির সামর্থ্যে সর্ব্বপ্রকারে প্রস্ফুরিত হন[২৫]। ধনাগারে ধন থাকে, যে তাহা দেখিতে পায়, সে তাহা লাভ করে। সেইরূপ, সমস্তই চিদাকাশে ভাসমান আছে, কিন্তু সেই চিদাকাশ যাহা দৃষ্ট করায়, দ্রষ্টা তাহাই দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয়[২৬]।

অনন্তর জ্ঞানদেবী সরস্বতী এতাদৃশ বোধরূপ অমৃতে পরিষেক করতঃ মহারাজ বিদূরথের বিবেকরূপ অঙ্কুর সমুৎপাদন করতঃ কহিলেন, রাজন্! আমি লীলার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তোমার নিকট এই সমস্ত কথা বলিলাম। এক্ষণে তোমার অভিলষিত সিদ্ধ হউক; আমরা যথাগত স্থানে গমন করি। লীলা মণ্ডপান্তর্গত কল্পিত জগৎ দর্শন করিলেন, আর আমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই[২৭।২৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ভগবতী সরস্বতী মধুর বাক্যে ঐ সকল কথা কহিলে ধীমান্ ভূপাল বিদূরথ বলিলেন,[২৯] দেবি! আপনি মহাফলপ্রদা। সেই কারণে বলিতেছি, যখন প্রার্থনাকারী ব্যক্তি দিগের প্রতি তাদৃশ মনুষ্যের দর্শন বিফল হয় না, তখন আমাদের সম্বন্ধে আপনার দর্শন কি নিমিত্ত বিফল হইবে?[৩০] হে দেবি! স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর প্রাপ্তির ন্যায় আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া কত দিনে স্বীয় প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইব? তাহা আমাকে বলুন। হে বরদে! হে মাতঃ! আমি আপনার শরণাগত। আপনি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা আমাকে এই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন। হে দেবি! আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন। আমার অপর প্রার্থনা এই যে, আমি যে প্রদেশে গমন করিব, আমার এই মন্ত্রী ও এই কুমারী যেন তথায় গমন করিতে পারে[৩১।৩৩]।

সরস্বতী বলিলেন, আমাদিগের দ্বারা অর্থিজনের কামনা বিফলীকৃত হয়, ইহা কেহ কখন দৃষ্টিগোচর করেন নাই। অতএব, হে মহারাজ! তুমি অশঙ্কিত চিত্তে আগমন পূর্ব্বক অর্থবিলাস সম্পন্ন সেই মনোহর রাজ্য উপভোগ কর[৩৪]।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।
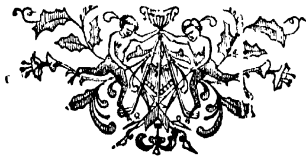
ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

সরস্বতী বলিলেন, মহারাজ! এই মহাসংগ্রামে তোমার মৃত্যু হইবে। অনন্তর তুমি মৃত্যুর পর, সর্ব্বসমক্ষে তোমার সেই প্রাক্তন রাজ্য ও শবীভূত প্রাক্তন দেহ প্রাপ্ত হইবে। এই কুমারীও এই সমস্ত মন্ত্রিগণের সহিত সেই প্রাক্তন পুর প্রাপ্ত হইবে[১।২]। বায়ু যেমন আগমন ও গমন করে, আমরা উভয়ে সেই প্রকারে যথাগত স্থানে গমন করি, তুমি ও এই কুমারী মন্ত্রিগণের সহিত সেই প্রাক্তন দেশে আগমন কর[৩]। অশ্বের গমন এক প্রকার, খরের ও উষ্ট্রের গতি অন্য প্রকার, মদমত্ত হস্তীর গতি অন্য প্রকার। (ভাব এই যে, আতিবাহিক দেহের গত্যাগতি মানোরথিক গত্যাগতির ন্যায় দূরে ও অদূরে ও অন্যের অদৃশ্য। অশ্বাদির গতি সেরূপ নহে। কেননা, অশ্বাদি নিতান্ত স্থূল ও পরিচ্ছিন্ন বস্তু)[৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবতী সরস্বতী ও বিদূরথ উভয়ে ঐরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন দূত তথায় সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! পট্টিশ, চক্র, অসি, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র বর্ষণকারী প্রলয়ার্ণবসদৃশ উদ্ধত ও দুঃসহ শত্রুবল আগমন করিতেছে[৫।৭]। তাহারা নগরমধ্যবর্ত্তী প্রাসাদশিখরে কাষ্ঠ রাশি স্থাপন করতঃ পর্ব্বতাকার করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। তাহাতে সেই সমস্ত প্রাসাদশিখরলগ্ন অগ্নি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া চট্ চট্ ধ্বনি সহকারে উত্তম উত্তম পুরী সকল দগ্ধ করতঃ ভূমিসাৎ ও ভস্মসাৎ করিতেছে[৮]। যেমন কল্পান্তকালে সম্বর্ত্তনামক মেঘ উদিত হয়, তাহার ন্যায় ভীমদর্শন ধূমরাশি উত্থিত হইয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত করাতে বোধ হইতেছে যে, যেন মহাদ্রি সকল গরুড়ের ন্যায় সবেগে আকাশে উড্ডীন হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে[৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! সেই দূত সসম্ভ্রমে ঐরূপ কহিতেছে, সেই অবসরে শত্রুভীষণ শব্দ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল ও পুরবহির্ভাগে মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল[১০]। শরবর্ষিগণের বলাকৃষ্ট ধনুর টঙ্কার, মদমত্ত কুঞ্জরগণের বৃংহিত, পুরস্থিত দহনশীল অগ্নির চট চট শব্দ,

পুরবাসিগণের ও দগ্ধনারীগণের হল হলা শব্দ, স্পন্দমান অগ্নিজিহ্বা-সমূহের ও প্রজ্বলিত শিখা স্পন্দনের ধগ ধগ শব্দ বিমিশ্রিত হইয়া ভীষণ কর্ণকঠোর নিনাদে পরিণত হইয়াছে[১১।১৩]।

সেই মহারজনীতে সরস্বতী, লীলা, মন্ত্রী ও রাজা বিদূরথ বাতায়ন ছিদ্র দিয়া সেই কোলাহলপূর্ণা বিভীষিকাময়ী পুরী দর্শন করিতে লাগিলেন[১৪]। তাঁহারা দেখিলেন, পুরী প্রলয়বাতবিক্ষুব্ধ সপ্তসমুদ্রমিশ্রিত একার্ণবসদৃশ বেগসম্পন্ন উগ্রহেতিরূপ (হেতি=হাতিয়ার) মেঘকুল দ্বারা তরঙ্গায়মান শত্রুসৈন্যগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তাহা গগনস্পর্শী অনলশিখার দ্বারা দহ্যমান হইয়া কল্পান্তানলবিগলিত মহামেরুর অনুকার করিতেছে। অপিচ, মহামেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জনকারী বিপক্ষগণের লুণ্ঠন শব্দ, দস্যুগণের জল্পনা ও ঘোর কল কল শব্দ, দিক্ বিদিক্ ধ্বনিত করিতেছে[১৫।১৭]। দহ্যমান পুরীর ধূমরাশি নভোমণ্ডলে অভ্রমণ্ডলের ন্যায় সমুড্ডীন হইয়া পুষ্কর ও আবর্ত্ত নামক জলধর যুগলের উপমা সম্পাদন করিতেছে। হেমপত্রসন্নিভ অগ্নিশিখা নিরন্তর প্রোড্ডীন হইতেছে। ভীষণ উল্মূক খণ্ড সমূহের অগ্রভাগ স্পন্দিত হওয়াতে পুরস্থ আকাশ যেন তারকামালায় বিভূষিত হইয়াছে। প্রজ্বলিত গৃহ সমুদায় হইতে সমুত্থিত অগ্নিশিখা পরস্পর মিলিত হইয়া প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পর্ব্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইতেছে। লোক সকল শত্রুগণকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। অগ্নিকণা ও নারাচ সমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। দগ্ধপুরস্থিত জনগণ শত্রুগণের নিক্ষিপ্ত বহুল হেতি ও শিলাজাল প্রহারে ভূমিলুণ্ঠিত হইতেছে। কেহবা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে[১৮।২১]। মহাবল সৈন্যগণ সমরকরিগণের সঙ্ঘট্টনে চূর্ণীকৃত হইতেছে। দ্রুতবেগে পলায়মান তস্করগণের শিরশ্ছেদনে তাহাদিগের অপহৃত মহাধন পথে বিকীর্ণ ও সমাকীর্ণ হইতেছে[২২]। শত্রুগণনিক্ষিপ্ত অঙ্গাররাশির দ্বারা নরনারীগণ দগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড চট চটা শব্দ সহকারে চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে[২৩]। বিপুল জ্বলন্ত উল্মূখ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় তত্রত্য নভস্থল যেন শতসূর্য্যে সমাকীর্ণ হইয়াছে। প্রজ্বলিত অঙ্গারখণ্ড-সমূহ দ্বারা বসুধাতল সমাকীর্ণ হইতেছে[২৪]। দগ্ধ কাষ্ঠ সমুদায়ের কেঙ্কারধ্বনি মিশ্রিত প্রজ্বলিত বেণুসমূহের রণ রণ শব্দ সমুত্থিত হইতেছে।

সৈন্য ও অন্যান্য প্রাণিগণ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে[২৫]। সর্ব্বভোজী হুতাশন উক্তপ্রকারে যেন সমুদয় নগর গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়া অবশেষে সেই রাজশ্রী ভস্মাবশেষ করতঃ পরিতৃপ্ত হইলেন[২৬]। জনগণ এই অবসরে অসংখ্য মনুষ্যের ও অশ্বাদির ভোজনার্হ ধান্যরাশি ও তণ্ডুল প্রভৃতি সর্ব্বভোজী হুতাশন কর্তৃক ভুক্ত হইলে অবশিষ্ট গ্রহণের নিমিত্ত লোলুপ হইতে লাগিল[২৭]।

অনন্তর রাজা বিদূরথ স্বসন্নিধানে বেগে আগম্যমান দগ্ধভার্য্য যোধগণের এই বাক্য শুনিতে পাইলেন। "হায়! হায়! বিপদরূপ প্রচণ্ড বায়ু সমাগত হইয়া আমাদিগের শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় গৃহরূপ উচ্চতর আশ্রয় পাদপ সমূলে উন্মূলিত করিল। হায়! হায়! আমাদিগের এই সমস্ত মহৎ স্নিগ্ধ ব্যক্তি গণের মনের ন্যায় প্রশান্ত স্বভাব দারাগণের মূর্ত্তি দাবানলে দগ্ধ হরিণীর ন্যায় হইয়া দন্তিগণের দেহে লীন হইতেছে। হা পিতঃ! হেতিরূপ হুতাশন বীরগণরূপ অনিলপ্রেরিত হইয়া এই সমস্ত স্ত্রীগণের কবরীরূপ তৃণগুচ্ছে সংলগ্ন হওয়ায় সে সকল যেন শুষ্ক পর্ণের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে[২৮।৩১]। ঐ দেখ, আবর্ত্তসম্পন্না ঊর্দ্ধগামিনী দগ্ধকাষ্ঠবাহিনী ধূমরূপিনী যমুনা যেন ব্যোমগঙ্গার প্রতি প্রধাবিত হইয়া বৈমানিক গণকে গ্রাস করতঃ প্রবাহিত হইতেছে। রাশি রাশি অগ্নিকণা সকল ঐ নদীর বুদ্ বুদ্[৩২]।"

কেহ স্বীয় কন্যাকে সম্বোধন করতঃ অন্য অনাথা নারী দেখাইয়া কহিতেছে। "পুত্রি! এই অবলার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, যামাতা এবং তনয়গণ এই গৃহে দগ্ধ হওয়াতে এই অবলা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ না হইলেও শোকে দগ্ধ হইয়াছে[৩৩]।" কেহ কহিতেছে, হা, তোমারা শীঘ্র আগমন কর। তোমাদের এই মন্দির এই স্থান হইতে বিচলিত হইয়াছে। যেমন প্রলয় কালে সুমেরুশৈল নিপতিত হয়, তদ্রূপ ইহাও শীঘ্র নিপতিত হইবে[৩৪।৩৫]। কেহ কহিতেছে, ঐ দেখ, যেমন সন্ধ্যাকালে শলভকুল মেঘমণ্ডলে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় অজস্র শর, শিলা, শক্তি, কুন্ত, প্রাস ও হেতি প্রভৃতি অস্ত্র বাতায়ন দ্বারা গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে[৩৬]। কোন ব্যক্তি কহিতেছে, হায়! হায়! ঐ দেখ, যেমন বড়বানলশিখার দ্বারা উচ্ছলিত অর্ণবের তরঙ্গ তটাভিমুখে প্রধাবিত হয়, তেমনি, এই সমস্ত অস্ত্রশিখার দ্বারা উৎক্লিষ্ট জনগণ পলায়নার্থ নভোমার্গে উৎপতিত হইতেছে[৩৭]। যেমন রাগ্নি-

দিগের হৃদয় ক্রোধ দ্বারা শুষ্ক হয়, তেমনি, প্রাসাদশিখর সমুত্থিত অভ্র-মণ্ডলসদৃশ ধূমরাশির দ্বারা উদ্যান ও সরোবর প্রভৃতি শুষ্ক হইতেছে[৩৮]। কেহ কহিতেছে, ঐ দেখ, দন্তিগণ ক্রোধভরে চীৎকার করতঃ আলান ভঙ্গ করিয়া বৃক্ষ সমূহ কট কট শব্দে নিপাতিত করিতেছে[৩৯]। সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইলে গৃহস্থগণ যেরূপ দীনতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, পুষ্পফলপরিপূর্ণ গৃহসন্নিহিত দ্রুম সকল শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে[৪০]। যে সকল মৃতকল্প বালক পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিমুক্ত হইয়া রথ্যায় নীত হইয়াছিল, হায়! তাহারা এক্ষণে ভিত্তি পতন দ্বারা মৃত হইল[৪১]। ঐ দেখ, বাতবিদ্রাবিত প্রজ্ব-লিত হস্তিশালা সকল নিপতিত হওয়াতে তত্রত্য হস্তিগণ ভীত হইয়া কুৎসিত শব্দ করিতেছে[৪২]। অপরে কহিতেছে, হায়! কি কষ্ট! একে ত বক্ষঃস্থল, তদুপরি আবার তাহা বীরপুরুষগণের অসির দ্বারা নির্ভিন্ন, তাহাতে আবার প্রজ্বলিতকাষ্ঠসংলগ্ন যন্ত্রপাষাণ বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতেছে[৪৩]। ঐ দেখ—গো, অশ্ব, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র, শৃগাল ও মেষ সকল গমনশীল ব্যক্তি-দিগের গমনমার্গ অবরোধ করতঃ পরস্পর ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই-য়াছে[৪৪]। ঐ দেখ, নারীগণ অনলভয়ে ভীতা হইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গমন করাতে ভূমণ্ডল যেন স্থলপদ্মসমাচিত বোধ হইতেছে। উহাদিগের ঐ আর্দ্র বস্ত্রের পট পটা শব্দে পথ সকল সমাকুল হইতেছে[৪৫]। ঐ দেখ, অগ্নিকণা সকল অশোক কুসুমের ন্যায় শোভা বিস্তার করতঃ স্ত্রীগণের অলকপঁক্তি সংলগ্ন হইয়া যেন বিশ্রাম লাভ করিতেছে[৪৬]। উঃ—নরগণের স্নেহবাগুরা কি দুশ্ছেদ্য! ইহারা স্বয়ং দগ্ধ হইলেও ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া গমনে সমর্থ হইতেছে না[৪৭।৪৮]। ঐ দেখ, করিগণ বেগে প্রজ্ব-লিত আলানপাদপ (হস্তী বাঁধিবার গাছ) ভগ্ন করতঃ দগ্ধশুণ্ড হইয়া ক্রোধভরে পদ্মসরোবরে গিয়া নিমগ্ন হইতেছে[৪৯]। অনলশিখারূপ চঞ্চল বিদ্যুৎযুক্ত ধূমরূপ মেঘ নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া অঙ্গার ও নারাচ-নিকর বর্ষণ করিতেছে[৫০]। কেহ রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, দেব! ধূমমণ্ডল নভোমণ্ডলে বহ্নিকণারূপ আবর্ত্ত ও শিখারূপ তরঙ্গ উৎপাদন করতঃ রত্নপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে[৫১]। কেহ বলিতেছে, তোমরা এ দিকে দেখ, বহ্নিশিখার দ্বারা আকাশমণ্ডল গৌর-বর্ণে প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন, মৃত্যুদেব প্রাণিবিনাশ উৎসবে দিগ্বধূ দিগকে সুবর্ণবর্ণ নভোরূপ কুঙ্কমাক্ত সম্পুটক (পেটরা)

প্রদান করিয়াছেন[৫২]। উঃ! কি বিষম অসচ্চরিত্রতা উপস্থিত! ঐ দেখ, বৈরিবীরগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া রাজনারীগণকেও গ্রহণ করিতেছে[৫৩]। ঐ দেখ, সুপ্রভান্বিত চঞ্চল কুসুমমালা, অর্দ্ধদগ্ধ কবরী ও সুস্তনসম্পন্না রমণীগণ রাজপথ সমাকীর্ণ করিয়াছে। উহাদিগের অঙ্গ হইতে বিগলিত মাণিক্যখচিত বলয় সমূহ অবনীমণ্ডল মণ্ডিত করিতেছে[৫৪।৫৫]। উহাদিগের ছিন্নভিন্নহারলতা, নির্ম্মল মুক্তাফল সকল রাজপথে বিকীর্ণ করিতেছে। আহা! উহাদিগের স্তনমণ্ডলের পার্শ্ব হইতে কনকপ্রভা নির্গত হইতেছে[৫৬]। উহাদিগের কুররীর ন্যায় করুণ ক্রন্দনধ্বনির দ্বারা রণধ্বনি অভিভূত হইয়াছে। উহারা অবিরল ধারায় অশ্রুবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। হায়! উহাদিগের কাহার পার্শ্বদেশ এবং কাহার বা কুক্ষি বিদীর্ণ হইয়াছে, সেই কারণে উহারা বেদনানুভবে বিচেতনপ্রায়[৫৭]। উহারা পলায়নেচ্ছু; পরন্তু সৈন্যগণ উহাদিগকে রক্তকর্দ্দমলিপ্ত ও বাষ্পবারির দ্বারা ক্লিন্ন অঙ্গবস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করতঃ ভুজমূলে স্ব স্ব ভুজ বিন্যস্ত করিয়া লইয়া যাইতেছে[৫৮]। যখন উহারা "কে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তখনই বোধ হইতেছে, যেন সেই সেই দিকে উৎপল বর্ষণ হইতেছে। তদ্দর্শনে সহৃদয় সৈন্যগণ দুঃখিত হইয়া রোদন আরম্ভ করিয়াছে[৫৯]। ঐ সকল মৃণালসদৃশ সুন্দর ও কোমলোরু রমণীগণের সুনির্ম্মল চরণরাজি ও স্বচ্ছ বসনান্তপ্রদেশ আকাশস্থ নলিনীর ন্যায় শোভমান। ঐ সকল আলোলমাল্যবসনা অলঙ্কারপরিশোভিনী অঙ্গরাগসম্পন্না বাষ্পাকুললোচনা চঞ্চলালকবল্লরীযুক্তা (চঞ্চল=দোদুল্যমান। অলক=চুলের গোছা ও বেণী। বল্লরী=লতা। মিলিতার্থ, লতার ন্যায় বক্রানুবক্র কেশগুচ্ছ) রমণী বিষয়সুখস্বরূপ মন্দর ভূধর দ্বারা নিরন্তর মথ্যমান হইয়া কামরূপ সমুদ্র হইতে লক্ষীর ন্যায় সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই[৬০।৬১]।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ঐ অবসরে পূর্ণযৌবনা, আলোলমাল্য-বসানা ছিন্নহারলতাকুলা, চন্দ্রবদনা, তারকাকারদশনা শ্বাসোৎকম্পিত-পয়োধরা পরমরূপবতী রাজমহিষী লীলা (বিদূরথের মহিষী। এ লীলা সরস্বতী সহচারিণী লীলার প্রতিচ্ছায়া মাত্র) ভয়বিহ্বলচিত্তে বয়স্যা ও দাসী গণের সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রাজগৃহরূপ পঙ্কজকোটরে প্রবেশ করিলেন[১।৩]। তাহার সেই সমস্ত বয়স্যার মধ্যে অপ্সরার ন্যায় সৌন্দর্য্য-শালিনী এক বয়স্যা রাজাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, "হে দেব! ভূত-গণের মহাসংগ্রাম আবদ্ধ হইয়াছে। এই নিমিত্ত বাতপীড়িত লতা যেরূপ মহাদ্রুম আশ্রয় করে, সেইরূপ, আমাদের এই দেবী (প্রধানা রাজ-মহিষী) আমাদিগের সহিত অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণার্থ আপনার নিকটে সমাগতা হইয়াছেন[১।৫]। হে মহারাজ! যেমন মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মিজাল তীরস্থিত দ্রুমলতা হরণ করে, তেমনি, মহাবল উদ্যতায়ুধ ভূতগণ অন্যান্য ভূতভার্য্যাগণকে হরণ করিতেছে[৬]। অন্তঃ-পুররক্ষকগণ অশঙ্কচিত্ত উদ্ধত শত্রুগণ কর্ত্তৃক বাতনিষ্পিষ্ট দ্রুমের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে[৭]। যেমন বর্ষাকালের রাত্রে বারিবর্ষণে কমলিনীগণ আহত হয়, তেমনি, দূর হইতে সমাগত অশঙ্কচিত্ত শত্রুগণ আমা-দিগের অন্তঃপুর আহত করিতেছে[৮]। ভীষণ নিনাদ সহকারে ধূম বর্ষণকারী ও চঞ্চল তীক্ষ্ণধার হেতিবহ্নিবর্ষণকারী যোধগণ আমাদিগের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছে[৯]। যেমন ব্যাধগণ কুররীগণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তেমনি আজ, বলবন্ত শত্রুগণ ক্রন্দনশীলা বিলাসপরায়ণা দেবীদিগের কেশাকর্ষণ করতঃ বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে[১০]। অতএব হে দেব! আমাদিগের এই যে নানাপ্রকার বিষম (ছোট বড়) বিপত্তি উপস্থিত, এ বিপত্তিতে একমাত্র আপনিই আমাদের শান্তিবিধান করিতে সক্ষম[১১]।"

অনন্তর রাজা বিদূরথ দাসীর নিকট তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া সেই দেবীদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ কহিলেন, হে দেবীদ্বয়

আমি যুদ্ধার্থ গমন করি। আপনাদিগের পাদপদ্মের ভ্রমরীস্বরূপা আমার এই ভার্য্যা আপনাদিগের রক্ষণীয়া। সেইজন্য প্রার্থনা—আপনারা ইহাকে রক্ষা করুন। আপনাদিগকে রাখিয়া যাওয়ায় আমার যে গমনাপরাধ হইবে, তাহা আপনারা দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন[১২]। রাজা বিদূরথ দেবীদ্বয়কে এইরূপ কহিয়া, অঙ্কুশাঘাত প্রাপ্ত মদমত্ত হস্তীর ন্যায় কোপারুণনেত্রে সবেগে শৈলগুহা হইতে কেশরীর বিনির্গমনের ন্যায় তথা হইতে বিনির্গত হইলেন[১৩]।

অনন্তর প্রবুদ্ধলীলা (সরস্বতীসহায়া লীলা), চারুদর্শনা বিদূরথ ভার্য্যা লীলাকে স্বসমীপে আগমন করিতে দেখিলেন। আরও দেখিলেন, সমীপাগতা লীলা অবিকল আত্মসদৃশী। যেমন নির্ম্মল আদর্শে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহাকে তিনি ঠিক্ সেইরূপ দেখিলেন। দেখিয়া দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! একি দেখিতেছি! কি প্রকারে ইনি আমার ন্যায় আকারসম্পন্না হইলেন? আমি আমার প্রথম বয়োবস্থায় যেরূপ আকারসম্পন্না ছিলাম, এই মহিষীকেও ঠিক্ তদ্রূপ দেখিতেছি। আমিই কি ইনি? অথবা ইনিই আমি? এই মন্ত্রী ও এই সকল বলবাহনসম্পন্ন পৌর যোধ, এ সমস্তই যেন আমার সেই পূর্ব্ব-রাজ্যস্থিত জনগণ। আমার বোধ হইতেছে, যেন তাহারাই। ইহারা যদি সেই সমস্তই হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে ইহারা এখানে অবস্থিতি করিবে? হে মাতঃ! ইহারা কি দর্পণপ্রতিবিম্ববৎ আমার বাহ্যে ও অন্তরে চেতনসম্পন্নের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে? যদি প্রতিবিম্বই হইবে, তাহা হইলে সচেতন হইবে কেন? বৃত্তান্ত কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন[১৪।১৭]।

দেবী বলিলেন, সুন্দরি! যাহার জ্ঞানসংস্কার যেরূপ থাকে, তাহা উদ্বুদ্ধ হইলে ঠিক্ সেইরূপ অনুভূতি জন্মায়। চিৎশক্তির মহিমা অপ্রতর্ক্য। তাহা চিত্তের সহিত একীভূত হইয়া চিত্তেরই অনুরূপে প্রথিত হইয়া থাকে। যেমন চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্বপ্নকালে জাগ্রদনুভূত পদার্থের আকার ধারণ করে, তেমনি, চিৎশক্তিও চিত্তের আকারে প্রথিত হয়[১৮]। চিত্তে ও তৎপ্রতিফলিত চৈতন্যে যে আকারের সংস্কার থাকে, উদ্বোধ হইলে সে সংস্কার সেই আকারে সমুদিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। তাহাতে দেশের কি কালের দীর্ঘতা অথবা পদার্থের বিচিত্রতা প্রতিবন্ধক

হয় না[১৯]। জগৎ উক্তক্রমে অন্তঃস্থ আত্মচৈতন্যে অধ্যস্ত ও অধিষ্ঠিত থাকিলেও প্রোক্ত কারণে বাহিরে আছে বলিয়া বোধ হয়। যেমন স্বপ্ন, তেমনি জগৎ। যেমন স্বপ্ননির্ম্মিত ও সঙ্কল্পরচিত পুরী অন্তরে কল্পিত ও অবস্থিত হইলেও বহির্ব্বিদ্যমানের ন্যায় দেখা যায়, তেমনি, অন্তঃপরিকল্পিত জগৎও চৈতন্যের সর্ব্বব্যাপিতা কারণে বহির্ব্বিদ্যমানের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে[২০]। অতএব, অন্তরে উদীয়মান মিথ্যা জগৎ চিরাভ্যাস বশতঃ অবাধে বাহিরে সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। তোমার ভর্ত্তা তোমার পুরে যে ভাবে অর্থাৎ যেরূপ বাসনাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইয়া ছিলেন, সেই মৃত্যুমুহূর্ত্তেই ও সেই স্থানেই তাঁহার সেই সেই ভাব অন্তঃপ্রস্ফুরিত বা বহিঃপ্রব্যক্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পর হইতেই তিনি সেই সেই সৃষ্টি অনুভব করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রী প্রভৃতি এই সমস্ত ব্যক্তিগণ আকারগত সাদৃশ্যে তোমার পূর্ব্বমন্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় হইলেও তাহাদিগের সহিত ইহারা অভিন্ন নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন[২১।২২]। অপিচ, রাজা যাহা অনুভব করিতেছেন তাহাও রাজার চিৎসত্তার সত্যতায় সত্য। চিৎসত্তার সত্যতা ব্যতীত আর কাহার সত্যতা নাই। সমস্তই অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা। মিথ্যা কেন? না সে সকল স্বচৈতন্যে স্বকীয় অজ্ঞানে কল্পিত। তবে জাগ্রতের ও স্বপ্নের প্রভেদ এই যে, জাগ্রদনুভূত বস্তু বাস্তবপক্ষে অর্থাৎ পরমার্থ দর্শনে অতত্ত্ব হইলেও ব্যবহারে তত্ত্বের ন্যায় অবিসম্বাদী[২৩]। ব্যবহারে অবিসম্বাদী হইলেই যে সত্য হয় তাহা হয় না। ইন্দ্রজালপ্রদর্শিত পদার্থকেও সকলে একরূপ দেখে, সুতরাং অবিসম্বাদী। আরও দেখ, যেমন উত্তরকালে না থাকায় স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ অলীক অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তেমনি, জগৎও তত্ত্বজ্ঞানে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হওয়ায় অলীক বলিয়া অবধৃত হয়[২৪]। ভাবিয়া দেখ, জাগ্রৎকালে স্বপ্নের যেরূপ নাস্তিতা, স্বপ্নকালেও জাগ্রতের সেইরূপ নাস্তিতা। অল্পমাত্রও নাস্তিতার ভিন্নতা বা প্রভেদ নাই। সেইজন্য বলা যায়, স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রৎও মিথ্যা[২৫]। যেমন জন্মকালে মৃত্যু অসদ্রূপ, তেমনি মৃত্যুকালেও জন্ম অসদ্রূপ। বস্তু সকল নাশকালে অবয়ব ধ্বংস পূর্ব্বক অভাবগ্রস্ত হয় এবং বাধকালে তদ্বিষয়ক অনুভবের বিপর্য্যয় হয়[২৬]। জগৎ যে ভাবে সত্য তাহা বলিলাম, এবং যে ভাবে অসত্য তাহাও বলিলাম। বস্তুতঃ

জগৎ অন্যথা হইয়া যায় বলিয়া সৎ নহে এবং ব্রহ্মময়ত্ব প্রযুক্ত অসৎও নহে। ব্রহ্মময়ত্বের বৈপরীত্যে যে পৃথক্ জগৎজ্ঞান হয়, তাহা ভ্রান্তি-রই মহিমা, অন্য কিছু নহে। মহাকল্প প্রারম্ভাবধি অতীত অনাগত বহুযুগ পর্য্যন্ত জগৎভ্রান্তি ভাসমান হইয়া আসিতেছে[২৭]। এই সৃষ্টিনামিকা ভ্রান্তি ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্না, সেজন্য ইহা ব্রহ্মের অনতিরিক্ত[২৮]। যেমন আকাশে কেশোণ্ড্রক প্রভৃতি বাস্তব পদার্থ নহে, অথচ দৃষ্ট হয়, তেমনি, জগৎও বাস্তব নহে, অথচ অজ্ঞানীর দর্শনে দৃষ্ট হয়। যেমন জলধিতে তরঙ্গসমূহ বিস্তৃত হয়, তেমনি, পরব্রহ্মে এই সৃষ্টি বিস্তৃত হইয়াছে[২৯]। যেমন ধুলিজাল প্রবল বায়ুতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তেমনি, তুমি, আমি ও জগৎ, এই সকল ভ্রান্তিময় ভাবও আভাসাত্মা (জীবচৈতন্য) হইতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইয়া থাকে[৩০]। মৃগতৃষ্ণিকাজলের ন্যায় ও দগ্ধপটের ন্যায় সৃষ্টির প্রতি আস্থা কি? কিসের আস্থা? ইহা ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ব্রহ্ম ও জগৎ, ইত্যাকার ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইলে ইহা সেই পরম পদেই পর্য্যবসিত হইবে[৩১]। গাঢ় অন্ধকারে বালকগণের যে যক্ষভ্রান্তি, তাহা সেই অন্ধকার বৈ যক্ষ নহে। অতএব, এই জগৎ জন্মমৃত্যুরূপ মোহের ও ব্যামোহের অর্থাৎ অজ্ঞানের বিস্তার ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩২]। মহাকল্পের সহিত দৃশ্য-সমূহের শান্তি হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম। অতএব, জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অর্থাৎ অতিরিক্ত সত্য নহে, এবং ব্রহ্মময়ত্ব প্রযুক্ত ইহা নিতান্ত অসত্যও নহে[৩৩]। অথবা এক পদার্থের সত্যতা ও অসত্যতা উভয়রূপিত্ব অসম্ভব। সেই কারণে অবধারিত হয়, পরিদৃশ্যমান জগৎ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপের প্রচ্ছাদন মাত্র অর্থাৎ আবরণ মাত্র। আকাশে, পরমাণুর অন্তরে ও দ্রব্যাদির অণুমধ্যে, যে যে স্থানে জীবাণু অব-স্থিতি করে, সেই সেই স্থানেই জগৎ বা পরমাত্মার শরীর বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন অগ্নি আপন ভাবনার বলে আপনাকে উষ্ণ বলিয়া জানেন, তেমনি, বিশুদ্ধ চিদাত্মাও ভাবনার বলে এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূত অবলোকন করেন। * যেমন সূর্য্য সমুদিত হইলে গৃহমধ্যস্থ তদীয় আলোকে ত্রসরেণু সকলকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়, সেইরূপ,

* এতৎ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, এই সমস্তই পূর্ব্বকল্পীয় জীব। এক্ষণে ইঁহারা দেবতা। পূর্ব্বকল্পীয় উপাসনার প্রভাবে এতৎকল্পে দেবভাব প্রাপ্ত। পূর্ব্বকল্পে

সেই পরমাকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপ অসংখ্য ত্রসরেণু নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, অভিজ্ঞগণ দেখিয়া থাকেন। যেমন বায়ুতে স্পন্দন ও আমোদ থাকে, এবং আকাশে শূন্যতা আছে, সেইরূপ, আবির্ভাব, তিরোভাব, উৎসর্গ ও ত্যাগ, এতচ্চতুষ্টয়াত্মক স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ সেই পরমাত্মাতেই অবস্থিত রহিয়াছে[৩৪।৩৮]। হে রাঘব! এই বিশ্ব সেই অবয়ববর্জ্জিত (নিরাকার) ব্রহ্মের ভাবান্তর মাত্র। সেই কারণে তুমি এই সাকার বিশ্বকেও নিরাকার বলিয়া বিবেচনা করিবে[৩৯]। ফলতঃ ইহা পরমাত্মারই নৈজ মায়িকভাব অনুসারে সমুদিত, সুতরাং পূর্ণব্রহ্মে অবস্থিতি প্রযুক্ত বিশ্বশব্দ অর্থশূন্য নহে। অর্থাৎ বিশ্বশব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম পদার্থের নামান্তর মাত্র। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবে, ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু অনির্ব্বাচ্য। যেমন রজ্জুসর্প। যাহা ভ্রান্তিদৃষ্ট, তাহা সত্য নহে। যাহা পরীক্ষাদৃষ্ট, তাহা অসত্য নহে। এই দুই বা দ্বিবিধ যুক্তির সাহায্যে জানা যায়, জগৎ অনির্ব্বাচ্য। অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় সত্য নহে এবং রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যাও নহে। পরিদৃষ্ট রজ্জুসর্পও অনির্ব্বাচ্য অর্থাৎ সত্যও নহে ও মিথ্যাও নহে। সত্য হইলে বাধ হইত না, এবং মিথ্যা হইলে দৃষ্ট হইত না। চৈতন্য, অনির্ব্বাচ্য মায়াপিহিত হওয়াতেই জীবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই কারণে জীবত্বও অনির্ব্বাচ্য[৪০।৪২]।

হে রামচন্দ্র! চিরকাল আপনার জীবভাব অনুভব করায় ক্রমে তাহার সংস্কার দৃঢ় হইয়া যায়, সেই কারণে জগতে আপনার সত্যতা অধ্যস্ত হইয়া যাওয়ায়, জগৎ সত্য, এতদ্রূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ফলতঃ জগৎ সত্য হউক, আর অসত্য হউক, চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কোথাও নাই ও অন্য কিছুও নহে। চিদাকাশেই জগদ্দর্শন হইয়া থাকে[৪৩]। জীবের যে ভোগেচ্ছা, তাহাই সংসারের উৎপাদক কারণ, সে অংশে সত্য মিথ্যার উপযোগিতা নাই। বিষয় সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক, তাহার অনুরঞ্জনাই সংসারের উৎপত্তির ও স্থিতির মূল কারণ। জীব অগ্রে স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ানুভবে অনুরঞ্জিত হয়, পরে, সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয় সকল পুনরনুভব করে[৪৪]। অনুভবের মহিমা এরূপ বিচিত্র যে, তাহা কদাচিৎ পূর্ব্বানুভবের অবিকল মূর্ত্তি প্রদর্শন করায় এবং কখন

অগ্নি অনগ্নি জীব ছিলেন, এবং আপনাকে অগ্নিভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন। সে কল্পের সেই দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে এ কল্পে তিনি অগ্নি হইয়াছেন। অন্য দেবতা পক্ষেও এইরূপ সিদ্ধান্ত।

বা অসমান ও অর্দ্ধসমান অনুভবনীয় উপস্থাপিত করিয়া সে সকলকে পুনঃ পুনঃ অনুভবগম্য করায়। অর্থাৎ বাসনার যেমন যেমন উদ্বোধ, তেমনি তেমনি বাস্ত-বস্তুর দর্শন হয়। পরন্তু বিচার চক্ষে দেখিবা মাত্র বুঝা যায় যে, সেই সেই অনুভব সমস্তই অসত্য অথচ একমাত্র জীবাকাশে (জীবরূপ আকাশে। জীব আকাশতুল্য নিরবয়ব, সেজন্য তাহা আকাশ) বিকসিত (দৃষ্ট)। বৎসে! তোমার পূর্ব্ববাসনা (পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানসংস্কার) সর্ব্বাংশে সমান হইয়া উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সম্প্রতি তুমি দেখিতেছ, অনুভব করিতেছ, সেই কুল, সেই আচার, সেই আকার প্রকার ও সেই চেষ্টা প্রভৃতি সমন্বিত মন্ত্রী ও পুরবাসী প্রভৃতি এই স্থানে আমার দর্শন পথে রহিয়াছে। ফলতঃ এ সমস্তই তোমার আত্মায় অবস্থিত, অন্যত্র (অর্থাৎ বাহিরে) নহে[৪৫।৪৭]। সর্ব্বব্যাপী আত্মার রূপ প্রতিভা। তাহার স্থিতিও সেইরূপ অর্থাৎ যে প্রকার বলিলাম সেই প্রকার। অপিচ, যেমন রাজার আত্মাকাশে সত্যবৎ প্রতিভা (জ্ঞান) উদিত হইতেছে, তেমনি, তোমারও আত্মাকাশে সত্যবৎ প্রতিভা (জ্ঞান বা অনুভব) প্রকাশ পাইতেছে। সেই কারণে তুমি দেখিতেছ, সমাগতা নারী (বিদূরথপত্নী দ্বিতীয়া লীলা) অবিকল তোমারই অনুরূপা[৪৮।৪৯]। বৎসে! প্রতিভা সর্ব্বব্যাপী সম্বিদ্রূপ নির্ম্মল আদর্শে কথিত প্রকারেই প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরের প্রতিভা অন্তরে প্রতিভাসিত অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত হইয়া পশ্চাৎ তাহা বাহিরের ন্যায় প্রকটিত হয়। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার প্রতিভার প্রতিবিম্ব, জীবরূপ আকাশ ব্যতীত অন্য কোথাও সমুদিত হয় না। অর্থাৎ জীবই স্বকীয় প্রতিভায় স্বসংস্কারানুরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পায় অর্থাৎ অনুভব করে[৫০।৫১]। বৎসে! এই মহান্ আকাশ, এতদন্তর্গত ভুবন, ভুবনান্তর্গত ভূমণ্ডল, তদন্তর্গত তুমি, আমি ও রাজা, এ সমস্তই প্রতিভাময় অর্থাৎ চিন্মাত্রস্বভাব। যেহেতু চিন্মাত্রস্বভাব, সেইহেতু সমস্তই অহং অর্থাৎ আপন আত্মার স্ফুরণ বিশেষ। এ রহস্য তত্ত্বজ্ঞানীরাই বিদিত হইতে পারেন, অন্যে নহে। তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন, এ সমস্তই চৈতন্যাকাশরূপ বিল্বের উদরস্থ। লীলে! আশা করি, তুমিও এ সমুদায়কে চিদাকাশ বলিয়া জানিবে। জানিলে তুমিও তত্ত্বজ্ঞ দিগের ন্যায় পরিপূর্ণ নির্ব্বিক্ষেপ কেবল ও শান্ত নির্ব্বাণ রূপে অবস্থিত হইবে[৫২]।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অতঃপর জ্ঞপ্তিদেবী সরস্বতী, সমাগতা লীলাকে বলিলেন, লীলে! তোমার এই ভর্ত্তা রাজা বিদূরথ উপস্থিত যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করিয়া সেই অন্তঃপুর মণ্ডপে গিয়া তদাকার প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ এতদীয় জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা সেই মৃত পদ্মভূপতির শবীভূত দেহ পুনর্জ্জীবিত হইবেক[১]।

মহামুনি বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! সেই দ্বিতীয়া লীলা সরস্বতী দেবীর ঐ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়নম্রা হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন[২]। বলিলেন যে, হে দেবি! আমি প্রত্যহ জ্ঞানদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন[৩]। হে অম্বিকে! আমি স্বপ্নে তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আপনাকে ঠিক্ সেইরূপ ও সেই আকার সম্পন্না দেখিতেছি। এক্ষণে আপনাকে দেখিয়া আমার অভিলাষ হইতেছে, আপনি দয়া করিয়া আমাকে বর প্রদান করুন[৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সমাগতা লীলা ঐরূপ বলিলে, জ্ঞানদেবী সরস্বতী তদ্দেশলীলার তাদৃশ ভক্তিভাব স্মরণ করিয়া প্রসন্না হইলেন ও অগ্রি-মোক্ত কথা বলিলেন[৫]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত পরিতুষ্টা হইয়াছি, এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া কৃতার্থা হও[৬]।

সমাগতা লীলা বলিলেন, আমার এই পতি যুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে যে শরীরে অবস্থান করিবেন, আমি যেন এই শরীরে তাঁহার সেই অবস্থিতি স্থানে যাইতে ও থাকিতে পারি[৭]। দেবী প্রসন্না হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে। পুত্রি! তুমি আমাকে বহুকাল একচিত্তে পুষ্প ধূপ ও বিবিধ পরিচর্য্যাদির দ্বারা পূজা করিয়াছ, তাহাতে আমি পরিতুষ্টা হইয়াছি[৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর তদ্দেশীয় লীলা উক্ত বর প্রাপ্তে প্রফুল্লা হইলে পূর্ব্বলীলা কিঞ্চিৎ সন্দিহানা ও বিস্মিতা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ

পরে দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৯]। বলিলেন, দেবি! যাহারা আপনার ন্যায় সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, সেই ব্রহ্মরূপী দিগের ইচ্ছা অচিরাৎ পূর্ণ হইয়া থাকে[১০]। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি, হে ঈশ্বরি! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে আমার সেই স্থূল শরীর ত্যাগ করাইয়া এতল্লোকে ও সেই গিরিগ্রামে আনীতা করিয়াছেন? এবং কোন্ কারণে এই লীলাকে স্বশরীরে ভর্ত্তৃলোক গমনের আদেশ করিলেন। জানিবার জন্য আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, ব্যক্ত করিয়া আমার চপল চিত্তকে সুস্থির করুন[১১]।

দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন। বলিলেন, বরবর্ণিনি! আমি কাহার কিছু করি না। জীবেরা নিজেই নিজের অভীপ্সিত সিদ্ধ করিয়া থাকে[১২]। প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ শুভ আমি বর প্রদান দ্বারা মাত্র প্রকট করিয়া থাকি, অন্য কিছু করি না। প্রত্যেক জীবে পূর্ব্বকৃত কাম, কর্ম্ম (কর্ম্ম সংস্কার) ও জ্ঞান প্রভৃতি পবিব্যাপ্ত চিদাত্মরূপিণী জীবশক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই বিদ্যমানশক্তিই তাহাদিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকে। আমি কেবল তাহাদের সেই সম্বিদের (চিচ্ছক্তির) প্রকাশকারিণী অধিষ্ঠাত্রী মাত্র[১৩]। জীবের যখন যে চিচ্ছক্তি উদয়োন্মুখা হয়, তদনুসারে আমি তাহাদিগের বরপ্রদা হই[১৪]। তুমি যখন আমার আরাধনায় তৎপরা ছিলে, তৎকালে তোমার জীবশক্তি "আমি দেহাভিমানশূন্যা হইব" এইরূপে উদ্বোধিত হইয়াছিল। যেহেতু তুমি আমাকে উক্ত প্রকারে উদ্বুদ্ধা করিয়াছিলে, সেই কারণে তুমি আমা কর্ত্তৃক অলংভাবে অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ বর্জ্জিত নির্ম্মল স্থিতিপ্রবাহে নীতা হইয়াছ[১৫।১৬]। এ লীলা আমাকে যে ভাবে বোধিত করিয়াছে, আমিও সেই ভাবে ইহাকে ফল প্রদান করিতেছি। ইহার চিৎশক্তি পূর্ব্বেই অভিহিত প্রকারে সমুদিত হইয়াছিল সুতরাং আমিও তদনুগামিনী হইয়া ইহাকে স্থূল শরীরে ভর্ত্তৃলোক গমনের বর দিয়াছি[১৭]। অধিক কি বলিব, যাহার যেরূপ চৈতন্যপ্রধান প্রযত্ন, যোগ্যকালে তাহার সেইরূপ ফলই স্বচৈতন্যে সমুপস্থিত হয়[১৮]। তপস্যা বল, আর দেবতা বল, কেহ কিছুই নহে। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, আপনার প্রযত্নপ্রদীপ্ত চিৎশক্তিই সেই সেই তপস্যা ও দেবতা হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। নিজ সম্বিদের প্রযত্ন ব্যতীত অন্য কেহ ফলদাতা নাই, ইহা জানিয়া যাহা ইচ্ছা

তাহা করিতে পার। অর্থাৎ যে ফল ইচ্ছা করিবে, পূর্ব্ব হইতে তদনুরূপ কার্য্য করিবে। করিলে অবশ্যই সেই ফল অনুভব করিবে[১৯।২০]। এই যে অপরিমিত-মহিমা ও দেহপরিচ্ছিন্না চিতিশক্তি, এই শক্তিকে পূর্ব্বকালে রম্য ও অরম্য (রম্য=বিহিত। অরম্য=নিষিদ্ধ) যে বিষয়ে ব্যাপারিত করিবে এবং যেরূপ ও প্রযত্নে উত্থাপিত করিবে, উত্তর কালে তাহা তাহারই অনুরূপা ও ফল স্থানিয়া হইয়া উদিত হইবে। এক্ষণে আমার অপর বক্তব্য এই যে, তুমি মদীয় উক্তি সকল বিচার কর, করিয়া যাহা পবিত্র, তাহাই বুদ্ধিস্থ করিয়া তদন্তরে অব-স্থান কর[২১]।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! রাজা বিদূরথ কুপিত হইয়া গৃহ মধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং লীলাদ্বয় ও জ্ঞানদেবী ঐরূপ কথোপকথন করিলেন। কিন্তু আমার চিত্ত, বিদূরথ গৃহবহির্গত হইয়া কি কার্য্য করিলেন তাহা জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত সমুৎসুক হইতেছে। অতএব, বলুন, বিদূরথ কোপভরে গৃহবহির্গত হইয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিদূরথ কোপভরে আপন কক্ষা (গৃহ) হইতে নির্গত হইয়া চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্রবৃন্দে পরিবৃত হন, সেইরূপ, অসংখ্য পরিবারে পরিবৃত হইলেন[২]। অনন্তর বর্ম্মে ও অস্ত্রশস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ সন্নদ্ধ করিলেন; এবং অঙ্গে হার প্রভৃতি দিব্যাভরণ ধারণ করিলেন। সুররাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণ কর্ত্তৃক জয় শব্দে বন্দিত হইয়া অসুর বধার্থ যুদ্ধ যাত্রা করেন, সেইরূপ, মহারাজ বিদূরথও অমাত্য ও সামন্তগণ কর্ত্তৃক জয় শব্দে বন্দিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন[৩]। পরে যোদ্ধা দিগকে যথাযথ আদেশ করিলেন। মন্ত্রিগণের নিকট ব্যূহ-রচনার ও রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা শ্রবণ করিলেন এবং বীরদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রথারোহণ করিলেন[৪]। মহারাজ বিদূরথের যুদ্ধরথ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, মুক্তা ও মণিমাণিক্যে খচিত এবং পতাকা পঙ্ক্তে পরিশোভিত। দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বর্গের বিমান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছে। ইহার চক্রে ও ভিত্তিপ্রদেশে সুবর্ণকীলক প্রোথিত এবং ইহার অগ্রভাগ (সম্মুখভাগ) মুক্তামালায় বিজড়িত[৫।৬]। অত্যন্ত বেগশীল, কৃশকায়, সুগ্রীব ও সুলক্ষণ সম্পন্ন সদশ্ব সকল এই রথ বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হইল, যেন উড্ডয়নশীল পক্ষীন্দ্রেরা অন্তরীক্ষে কোন দেবতাকে বহন করিতেছে[৭]। বায়ু অগ্রগামী হইবে, ইহা যেন তাহাদের অসহ্য। অসহ্য বোধ করিয়াই যেন তাহারা বায়ুর অগ্রে আকাশ চুম্বন করতঃ ধাবমান হইল[৮]। তাদৃশ বেগগামী, চন্দ্রচন্দ্রিকাতুল্য শুভ্রবর্ণ আট অশ্ব উক্ত রথ উক্ত প্রকারে বহন করিতে প্রবৃত্ত হইল[৯]। অনন্তর, যেমন গিরিগহ্বরে মেঘগর্জ্জন হইলে তাহার প্রতিধ্বনি ভীষণ হইয়া উঠে, তদনুরূপ ধ্বনিতে

দুন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগিল[১০]। তাদৃশ দুন্দুভিধ্বনি উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের কলকলারবে, আয়ুধসঙ্ঘাতের সঙ্ঘট্টশব্দে, ধনুকের চটচটাশব্দে, শরের সীৎকার বা শন্ শন্ শব্দে, অঙ্গসঙ্ঘট্টজনিত অঙ্গস্থ কবচের ঝন্ ঝন্ শব্দে, অলাতাগ্নির টনৎ টনৎ শব্দে, যুদ্ধাহতগণের কাতর শব্দে, বীরগণের পরস্পরাহ্বানজনিত বজ্রবৎ কঠোর বা কর্কশ শব্দে ও বন্দিগণের রোদন শব্দে নিবিড়িত হইয়া উঠিল[১১।১৩]। বোধ হইল, এই নিবিড় যুদ্ধগর্জ্জন যেন সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডছিদ্র (আকাশ) প্রপূরিত করিয়াছে[১৪]। এই অবসরে আকাশে এরূপ ধূলি উড্ডীন হইল যে, তত্রস্থ দর্শকগণ তদ্দর্শনে মনে করিলেন, সমুদায় ভূপীঠ যেন উর্দ্ধে উৎপতিত হইয়া আদিত্য পথ রুদ্ধ করিয়াছে[১৫]। তৎকারণে এরূপ অন্ধকার উপস্থিত হইল যে, রাজপুরী যেন গর্ব্ভবাসে নিমগ্ন হইয়াছে[১৬]। যেমন দিবসাগমে তারকা-রাজি অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ, সমুদায় লোক অন্ধকারে লীন হইয়া গেল এবং রাত্রিঞ্চর ভূত প্রেতাদি জীবের বল বৃদ্ধি পাইল[১৭]। সে অন্ধকারে সকলেই অন্ধ, কেবল দেবীর প্রসাদে লব্ধদিব্যদৃষ্টি লীলাদ্বয় ও বিদূরথকন্যা দৃক্‌শক্তিসম্পন্ন রহিলেন। সুতরাং তাঁহারা সেই যুদ্ধ দেখিতে অবসর পাইলেন[১৮]।

অনন্তর, যেমন প্রলয়কালে জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে বাড়বানল উপশান্ত হয়, তেমনি, রাজার আগমনে নগর লুণ্ঠক দিগের, রথের, সৈন্যের ও অস্ত্রশস্ত্রের কটকটা রব প্রশমিত হইল[১৯]। যদ্রূপ সুমেরু পর্ব্বত প্রলয়মহার্ণবে প্রবিষ্ট অর্থাৎ নিমগ্ন হয়, সেইরূপ, রাজা বিদূরথ স্বপক্ষ বিপক্ষ সৈন্যসমুদ্রের তারতম্য অনুধাবন না করিয়াই শত্রুসেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন[২০]। অতঃপর কেবল জ্যা-সিঞ্জিত শুনা যাইতে লাগিল এবং স্বপক্ষ বিপক্ষ হইতে অস্ত্রাংশুময় মেঘ সকল সৃষ্ট হইতে লাগিল[২১]। অসঙ্খ্য অস্ত্ররূপ বিহঙ্গম গগনমার্গে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং অস্ত্র সকল পরপ্রাণ হরণ করিয়া পাপীর ন্যায় মলিনদীপ্তি হইতে লাগিল[২২]। প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রের পরস্পর সংঘর্ষে যে অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল, সে সকল অগ্নি উল্মুকের বা অলাতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। বীররূপ মেঘেরা শরবর্ষণ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল[২৩]। বীর দিগের অঙ্গে আয়ুধ সকল প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং উভয়দলের খড়্গ প্রহারের শব্দ আকাশে সঞ্চরণ করিতে লাগিল[২৪]। শস্ত্ররূপ দীপের আলোকে রণসঙ্ঘট্ট

জনিত অন্ধকার দূরে পলায়ন করিল। বীর দিগের অঙ্গে নারাচ প্রোথিত হওয়ায় তাহারা রোমশ পুরুষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৫]। সেই যমযাত্রায় (যমসম্বন্ধীয় উৎসবে) অনেক শত কবন্ধ (নির্ম্মস্তক যোদ্ধৃদেহ) নটের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল এবং পিশাচকন্যাগণ আসিয়া তৎসঙ্গে নটকন্যার অনুকার করিতে লাগিল[২৬]। পৃথিবীতে দন্তের কট-কটাধ্বনি এবং আকাশে যন্ত্রক্ষিপ্ত প্রস্তরের সঙ্ঘট্টজনিত ঠন্ ঠন্ শব্দ অন-ববত শ্রুত হইতে লাগিল[২৭]। যেমন বায়ুর প্রচলনে শুষ্কপত্র সকল নিপতিত হয়, সেইরূপ, শবীভূত প্রাণিনিকর ভূতলে নিপতিত হইয়া স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধরূপ অদ্রি হইতে সর্ব্বদিকেই প্রাণিমরণরূপ অসঙ্খ্য নদী বিনিঃসৃত হইল[২৮]। অজস্র রক্ত নিপতনে রণাঙ্গনের পাংশু কর্দ্দমিত হইল। অস্ত্রাগ্নির প্রতাপে অন্ধকার বিনষ্ট হইল। যুদ্ধে তন্মনা হওয়ায় বীরগণের সংলাপশব্দ বিনিবৃত্ত হইল এবং অনেক প্রাণী ভয়ে ব্যাকুলিতচিত্ত হইতে লাগিল[২৯]। অভিহিত প্রকারে ও নিঃশব্দে যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং বাত বিরহিত বর্ষণের ন্যায় অজস্র শরবর্ষণ হইতে লাগিল। এই বর্ষণের বিদ্যুৎ ও বজ্র খড়্গের ক্রীড়া ও শব্দ[৩০]। শরের খদ খদ ধ্বনি, ভুশুণ্ডির টক্কটক নিস্বন, মহাস্ত্রসমূহের ঝন্ঝনা শব্দ, মিলিত হওয়ায় এই যুদ্ধ নিতান্ত ভীষণ ও দুস্তর হইয়া উঠিল[৩১]।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! উপস্থিত ঘোর সংগ্রামে উক্ত উভয় লীলা পুনর্ব্বার জ্ঞাপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন[১]। "দেবি! আপনি আমাদের প্রতি পরিতুষ্টা হউন এবং বলুন যে, আমাদের ভর্ত্তা কিজন্য জয় লাভে সমর্থ হইতেছেন না। আমাদের চিত্ত সোৎসুক হইতেছে, এ অবস্থায় উহা ব্যক্ত করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন[২]। "সরস্বতী বলিলেন, পুত্রিযুগল! বিদূরথের শত্রু এই সিন্ধুরাজ জয় লাভের নিমিত্ত দীর্ঘকাল আমার আরাধনা করিয়াছেন। কিন্তু রাজা বিদূরথ সেরূপ কামনায় আমার আরাধনা করেন নাই[৩]। সেই কারণে সিন্ধুরাজের জয় ও বিদূরথের পরাজয় হইতেছে।" আমিই সর্ব্বভূতের অন্তর্গতা সম্বিৎ। আমাকে যে যে প্রকারে ও যে কার্য্যে প্রেরণ করে, আমি তাহার সেই কার্য্য সেই প্রকারে সম্পন্ন করিতে বাধ্য। আমার স্বভাব এই যে, আমাকে যে, যে কার্য্যে নিয়োগ করে, আমি তাহার সেই কার্য্যের ফলরূপিণী হই। যাহা যাহার স্বভাব, তাহা তাহার কদাচ অন্যথা হয় না। উষ্ণ-স্বভাব বহ্নি কি কখন উষ্ণতা পরিত্যাগ করে? বিদূরথ আমাকে মুক্তি কামনায় বিভাবিত করিয়াছেন, তাই আমি বিদূরথের প্রতিভায় মুক্তিদাত্রী হইয়াছি। সেই কারণে বিদূরথ শীঘ্রই মুক্ত হইবেন। বিদূরথের শত্রু সিন্ধুমহীপতি যুদ্ধজয় কামনায় আমার আরাধনা করায় আমিও তাহার জয়দাত্রী হইয়া উদিত হইয়াছি। দেখিবে, শীঘ্রই বিদূরথ দেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার ও ইহার সহিত মুক্ত হইবেন, এবং এতদীয় শত্রু সিন্ধুরাজ ইহাকে বিনাশ করিয়া জয়ী ও এতদ্রাজ্যাধিপতি হইবেন। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাম! দেবী সরস্বতী এইরূপ বলিতেছেন, এবং উভয়পক্ষীয় সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে, এমন সময়ে ভগবান্ রবি যেন যুদ্ধ দেখিবার জন্য উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। তখন তিমির সঙ্ঘাত পাতালে পলায়ন করিল। জীব সকল সচেতন হইল, অল্পে অল্পে আকাশ ও পর্ব্বতকন্দর প্রকাশ প্রাপ্ত হইল, এবং জগৎ যেন কজ্জল সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল, রবি যেন তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধৃত করিলেন।

রবিরশ্মি এখন যে ভাবে পৃথিবীতে পতিত হইতেছে, সে ভাব দেখিলে মনে হয়, যেন স্বর্গ হইতে কনক রাশি গলিয়া পড়িতেছে[১২।১৩]। কনকদ্রব-সন্নিভ সুন্দর রবিরশ্মি শৈলোপরি ও বীরশরীরে নিপতিত হওয়ায় তাহা রক্তছটার শোভা বিতরণ করিতে লাগিল। অপিচ, রণস্থল বীরগণের ভুজগ-সদৃশ ভুজ সমূহে পরিব্যাপ্ত দেখা গেল। আরও দেখা গেল, রণস্থল যেন বীরগণের রত্নকুণ্ডল দ্বারা রত্নৌঘসমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে[১৪।১৫]। কোন ভূভাগ খড়্গী সমূহে (খড়্গী=গণ্ডার পশু) পরিব্যাপ্ত হইলে যেরূপ দৃশ্য হয়, আয়ুধ সম্পাতে রণভূমি আজ্ সেইরূপ দৃশ্য হইয়াছে। শলভ পতনে (শলভ=পঙ্গপাল) শস্য ক্ষেত্র যেরূপ অদৃশ্য হয়, উভয়পক্ষীয় শরবর্ষণে সমরভূমি আজ্ সেইরূপ অদৃশ্য হইয়াছে। রক্তের লোহিত প্রভায় চতুর্দ্দিক্ সন্ধ্যারাগের ন্যায় অরুণিত হইয়াছে এবং সমর নিপতিত শবের (মৃত দেহের) দ্বারা সমরভূমি যেন সমাধিসাধক সিদ্ধ পুরুষের অভিনয় করিতেছে[১৬]। নিপতিত হার সকল সর্পনির্ম্মোক, পতাকা সকল লতার বিলাস, এবং ছিন্ন উরু সকল তোরণ[১৭]। এই আকারের রণভূমি যেন আজ্ নিকৃত্ত হস্তপদাদির দ্বারা পল্লবিত, শর সমুদায় দ্বারা শরবনোপম এবং শস্ত্রাংশুর দ্বারা শ্যামলবর্ণ হইয়াছে। সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রাশি রাশি আয়ুধমালার দ্বারা, উন্মত্ত ভৈরবের অস্ত্রসঙ্ঘর্ট্টন সম্ভূত অনলশিখার দ্বারা, প্রফুল্ল অশোক-বনের ও আয়ুধ সমুদায়ের বালসূর্য্যোপম কান্তির দ্বারা রণস্থল এখন সৌবর্ণ নগরের আকার ধারণ করিয়াছে[১৮।১৯]। প্রাস, অসি, শক্তি, চক্র, ঋষ্টি ও মুষল সম্পাতের মহাশব্দে রণস্থলস্থ আকাশ প্রতিধ্বনিময় হইয়াছে। মহাবেগে রক্তনদী প্রবাহিত, তাহাতে রাশি রাশি শব ভাসিয়া যাইতে লাগিল[২০।২১]। ভুষণ্ডী, শক্তি, কুন্ত, অসি, শূল ও পাষাণ এবং শস্ত্র, ছত্র, কবন্ধ, এই সকলের পতনে ও উৎপতনে রণভূমি সমাকুল হইয়াছে। এই অবসরে করালরূপ বেতালকুল নর্ত্তন সহকারে হলহলা ধ্বনি করিতে লাগিল এবং এই অবসরে পদ্মভূপতির ও সিন্ধুরাজের দীপ্তিশীল দিব্য রথদ্বয় অচলের ন্যায় দর্শকগণের দৃষ্টিগোচর হইল[২২।২৩]। অর্থাৎ উভয়ের দ্বৈরথ যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

যদ্রূপ অন্তরীক্ষে নভোমণ্ডলের কেতুস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ে পরিভ্রমণ করেন, রাজদ্বয়ের রথদ্বয় সেইরূপ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। চক্র, শূল, ভুষণ্ডী, ঋষ্টি, প্রাস, গদা ও আয়ুধ দ্বারা সমাকুল ও বীরগণে

পরিবৃত ঐ রথদ্বয় মহাশব্দে ও স্বেচ্ছানুসারে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল[২৪।২৫]। তখন ঐ উভয় রথের কুবর হইতে মণি মুক্তার ঝন ঝন শব্দ ও বাতাহত পতাকার অগ্রভাগ হইতে পট পটা শব্দ সমুত্থিত হইল[২৬।২৮]। রথদ্বয় যেন রণলীলায় মত্ত হইয়া শব্দায়মান মহাচক্রের দ্বারা মৃতামৃত অসঙ্খ্য ব্যক্তিকে পরিপেষণ করতঃ সেই কেশশৈবলাদিসম্পন্ন, (কেশ সকল এই নদীর শেয়ালা। চক্র=রথচক্র ও অস্ত্র ৭ চক্রবাক্= জলচরপক্ষী)। চক্ররূপ চক্রবাকসমূহে সমাকুল ও বহমান বারণসঙ্কুল শোণিত-নদী সন্তরণ করিতে লাগিল। যে সকল সৈনিকগণ ভীত হইয়াছিল, এতক্ষণ পরে তাহাদিগের অগ্রনায়ক বীরেরা শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শরধারা বর্ষণ ও কুন্ত, শক্তি, প্রাস ও চক্র প্রভৃতি আয়ুধ সমুদয় নিক্ষেপ করতঃ রথ-দ্বয়ের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই রথদ্বয় মণ্ডলা-কার গতিক্রমে পরস্পর সম্মুখীন হইলে তত্রস্থ নরপতিদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-লেন। তখন পরস্পর প্রহারকারী রাজদ্বয় নারাচধারা নিক্ষেপের ধ্বনি উত্থাপন করতঃ মেঘোদয়ে গর্জ্জনকারী মত্তমহাসমুদ্রের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই দুই নরসিংহ প্রহারপ্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ধনুক হইতে নানাপ্রকার প্রহরণ বিনিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষ হইতে যে সকল বাণ প্রেরিত হইতে লাগিল, সে সকলের কেহ পাষা-ণের ও মুষলের ন্যায় আকারসম্পন্ন, কেহ করবাল মুখ, কেহ মুদ্গরানন, কেহ শুভ্রবর্ণ ও চক্রমুখ, কেহ পরশুর ও মহাচক্রের আকার, কেহ শক্তি-মুখ, কেহ স্থূল শিলীমুখ, কেহ ত্রিশূলবদন, কেহ বা মহাশিলার ন্যায় স্থূলদেহ। এই সকল বাণ আকাশমণ্ডলে এরূপ ভাবে উৎপতিত ও বিস্তৃত হইতে লাগিল যে, যেন সমরস্থলে প্রলয়বায়ুবেগে উৎপতিত প্রস্তর সকল উড্ডীন হইয়া দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিতেছে[২৯।৩০]।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে কুলপাবন রাম! অনন্তর রাজা বিদূরথ দীপ্তবল সিন্ধুরাজকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া কোপে মধ্যাহ্নকালীন তপন সদৃশ প্রজ্বলিত হইলেন। যেমন কল্পান্তপবন সুমেরু পর্ব্বতের প্রতি আস্ফালন করে, সেইরূপ, রাজা বিদূরথ ধনুরাস্ফালন ও তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিতে লাগিলেন[১,২]। যেরূপ প্রলয়মার্ত্তণ্ড রশ্মিজাল বিস্তার করেন, তদ্রূপ, তিনি তূণীর হইতে শিলীমুখপরম্পরা বিস্তার করিতে লাগিলেন[৩]। তাঁহার নিক্ষিপ্ত এক এক শর নভোমণ্ডলে শতধা ও সহস্রধা হইতে লাগিল এবং পতন কালে সে সকল লক্ষাধিক হইতে দেখা গেল[৪]। সিন্ধুরাজেরও সেই প্রকার শক্তি, শিক্ষা ও ক্ষিপ্রহস্ততা ছিল। তাঁহারা উভয়েই বিষ্ণুর বরে সমান ধনুর্যুদ্ধকুশলতা লাভ করিয়াছিলেন[৫]। তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত মুষলাকার বাণ সকল অশনির ন্যায় ভীষণ ধ্বনি করতঃ চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল[৬]। কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে তারকানিকর যেমন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা আলোড়িত হইয়া গভীর নিনাদ সহকারে নিপতিত ও নিহত হয়, উক্ত রাজদ্বয়ের কনকনির্ম্মিত নারাচ সকল তদ্রূপ মহাশব্দ করতঃ নভোমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল[৭]। বিদূরথ হইতে ভীষণ শর সমূহ অব্ধিস্রোতের ন্যায়, সূর্য্যকিরণের ন্যায়, প্রচণ্ডপবননির্দ্ধূত পুষ্পরাজির ন্যায়, সন্তাড়িত তপ্তলোহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গসমূহের ন্যায়, ধারাবর্ষী জলধর হইতে ধারাবর্ষণের ন্যায় ও নির্ঝর হইতে উৎপতিত শীকরনিকরের ন্যায় অনবরত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল[৮,১০]। সেই ধনুর্যুদ্ধকুশল উক্ত রাজদ্বয়ের ধনুরাস্ফোটের চটচটা শব্দ শ্রবণ করিয়া উভয় দলস্থ সৈন্যগণ প্রশান্ত অর্ণবের ন্যায় স্থির ভাব অবলম্বন করিল[১১]। বিদূরথনির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রলয়বায়ুর ন্যায় মহাশব্দে ও গঙ্গার স্রোতের ন্যায় অতিবেগে নভোমার্গে প্রধাবিত হইয়া পশ্চাৎ সিন্ধুরাজরূপ মহাসমুদ্রাভিমুখে নিপতিত হইতে লাগিল[১২]। তাঁহার কোদণ্ডরূপ মেঘ হইতে অবিশ্রান্ত কনকনির্ম্মিত বিচিত্রপ্রভ নারাচ ও শররূপ জল নির্গত হইতে দেখা গেল[১৩]।

এই সময়ে কমলবদনা রাজমহিষী লীলা বিদূরথের শরনিকর বর্ষণ অবলোকন করতঃ ভর্ত্তার জয়লাভ আশা করিয়া নিরতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং জ্ঞপ্তিদেবীকে বলিলেন। "দেবি! তোমার জয় হউক। মাতঃ! ঐ দেখুন, আমার ভর্ত্তা জয়ী হইতেছেন। সিন্ধুরাজ কি, ইহার শর সমূহে সুমেরু পর্য্যন্তও চূর্ণীকৃত হয়"[১৩।১৬]। মানুষহৃদয়া লীলা এইরূপ বলিতেছেন এবং তত্রস্থ দেবীদ্বয় (প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী) তদবলোকনার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন ও হাস্যবিস্তার করিতেছেন, এমন সময়ে সিন্ধুরাজরূপ বাড়বাগ্নি, অগস্ত্যের সমুদ্রপানের ন্যায় ও জহ্নুর মন্দাকিনী পানের ন্যায় বিদূরথনিক্ষিপ্ত সেই শরার্ণব সহসা পান করিল এবং অজস্র শরবারি বর্ষণ দ্বারা সেই সায়কজালরূপ বিস্তৃত মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতঃ ধূলিকণার ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া আকাশার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিল[১৭।১৯]। যদ্রূপ দীপ নির্ব্বাপিত হইলে তাহার গতি পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, সেইরূপ, বিদূরথনিক্ষিপ্ত সায়ক সমূহের গতি আর দৃষ্টিগোচর হইল না[২০]। ইত্যবসরে সিন্ধুসেনাগণ বিদূরথের শরজাল ছেদন পূর্ব্বক গগনতলে শররাশি নিক্ষেপ করতঃ চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিল। তদ্দর্শনে রাজা বিদূরথও কল্পান্তপবন যেমন সামান্য মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ, উৎকৃষ্ট শর সমূহ বর্ষণ করতঃ সেই শররাশিরূপ মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। মহীপতি বিদূরথ অনবরত বাণবর্ষণ দ্বারা সিন্ধুপক্ষীয় সমস্ত শর ব্যর্থ করিলেন[২১।২৩]।

অনন্তর সিন্ধুরাজ, বান্ধবতাবশতঃ গন্ধর্ব্ব হইতে যে মোহনাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা বিদূরথ ব্যতীত তৎপক্ষীয় আর আর সমুদায় যোদ্ধৃবর্গ মোহপ্রাপ্ত হইল[২৪]। মোহপ্রাপ্ত যোধগণ ন্যস্তশস্ত্রাস্ত্র ও বিষণ্ণবদনেক্ষণ হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলে, মহারাজ বিদূরথ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সেই মোহ অপনীত করিলেন[২৫]। যন্মুহূর্ত্তে বিদূরথ ব্যতীত আর আর সৈন্য মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মুহূর্ত্তেই রাজা বিদূরথ প্রবোধাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন এবং প্রবোধাস্ত্রের প্রভাবে সূর্য্যোদয়ে পদ্মপ্রবোধের ন্যায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। শত্রুসেনাগণ গতমোহ হইল, দেখিয়া, দিবাকর যেমন পূর্ব্বকালে রাক্ষসের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন, আজ্ সিন্ধুরাজ বিদূরথের প্রতি সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে উষাসমুদিত

অরুণদেবের ন্যায় রক্তবর্ণ হইলেন২৬।২৭। অনন্তর, ক্রোধে লোহিতাক্ষ হইয়া সমুদায় সৈন্য লক্ষ্য করিয়া নাগাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। যদ্রূপ পর্ব্বত সর্পপরিব্যাপ্ত ও সরোবর মৃণালে প্রপূরিত হয়, সিন্ধুরাজের নাগাস্ত্র সমুদ্ভূত নাগসকল তদনুরূপে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। এই সকল নাগ পর্ব্বতাকার ও বন্ধনদুঃখপ্রদ২৮।২৯। এই সময়ে সমুদায় পদার্থ সেই সর্পগণের উষ্ণবিষ প্রভাবে ম্লান ও সপর্ব্বতবনা (পর্ব্বতের ও বনের সহিত) মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল৩০।

অনন্তর মহাস্ত্রবিৎ রাজা বিদূরথ গারুড়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, পর্ব্বত প্রমাণ লক্ষ লক্ষ মহাগরুড় উৎপতিত ও সমুড্ডীন হইল। তাহাদিগের সুরঞ্জিত পক্ষপ্রভায় দিক্ সকল কাঞ্চনীকৃত হইল। তাহাদিগের পক্ষ সঞ্চালনের বায়ু প্রলয়মারুতের ন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল৩১।৩২। গারুড়াস্ত্রসম্ভূত সেই সমস্ত গরুড়ের নিশ্বাস-বায়ুর দ্বারা নাগাস্ত্রসম্ভূত ভুজগগণ সমাকৃষ্ট হইয়া ভয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। বলিতে কি, দেখিতে দেখিতে, মহর্ষি অগস্ত্য যেমন সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তেমনি, এই সকল গরুড় পৃথিবীব্যাপ্ত সর্পপ্রবাহ পান করিয়া ফেলিল৩৩।৩৫। মেদিনী এখন সর্পাবরণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। দীপ যেমন বায়ুসংযোগে অদৃশ্য হয়, মেঘ যেমন শরৎকালে পলায়ন করে, বজ্রভয়ে যেমন মৈনাক প্রভৃতি ভূধরের পক্ষ লুক্কায়িত হইয়াছিল, এবং স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ ও পুরপত্তনাদি যেমন জাগ্রতে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ, সেই সকল গরুড়, সর্প ভক্ষণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল৩৬।৩৮। অতঃপর সিন্ধুরাজ বিদূরথ সৈন্যের প্রতি গাঢ় অন্ধকারপ্রদ তমঃ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের অন্তরালে মহাসমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইল। ভূমিস্থিত সৈন্যগণ এই তমঃসমুদ্রের মৎস্য ও নভঃস্থিত তারকাগণ তাহার রত্নস্থানীয় হইল। তাদৃশ গাঢ় অন্ধকার প্রবৃত্ত হইলে, জনগণের বোধ হইল, দিক্ সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কে প্রলিপ্ত হইয়াছে অথবা প্রলয় সমীরণ যেন অঞ্জনগিরির উপাদান রেণু চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে৩৯।৪১। প্রজাগণ যেন অন্ধকূপে নিপতিত হইয়াছে এবং ব্যবহারপরম্পরা যেন কল্পান্ত কালে প্রলীন হইয়া গিয়াছে৪২।

অনন্তর মন্ত্রবিদ্শ্রেষ্ঠ বিদূরথ মার্ত্তণ্ডাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মন্ত্রপূত মার্ত্তণ্ডাস্ত্র প্রযোজিত হইলে তদ্বিনিঃসৃত কিরণজাল অগস্ত্যের ন্যায় সেই

তমোরূপ মহাসাগর পান করিয়া ফেলিল। যেমন শরদাগমনে কৃষ্ণমেঘ সকল আকাশোদরে লুকায়িত হয়, অন্ধকার সকল সেইরূপ অবস্থাম্বিত হইল। পয়োধর-যুগল-শালিনী কান্তা যেমন ভূপতির পুরোভাগে শোভা প্রাপ্তা হয়, এই সময়ে দিক্ সকল অন্ধকারমুক্ত হইয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। লোভরূপ কজ্জল হইতে মুক্তি লাভ করিলে সাধুগণের বুদ্ধি যেরূপ সুপ্রকাশিত হয়, নিখিল বনরাজি এখন সেইরূপ প্রকাশিত হইল[৪৩।৪৬]। এতদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ অধিক কুপিত হইলেন। কোপাকুলিত হইয়া ভীষণ রাক্ষসাস্ত্র মন্ত্রপূত করতঃ বিকীর্ণ করিলেন[৪৭]। দেখিতে দেখিতে রণস্থল বৃহৎকায় রাক্ষসগণে পরিপূরিত হইল। এই সকল রাক্ষস কর্কশ ও ক্রোধন স্বভাব। পাতালস্থ দিগ্‌গজ ক্রুদ্ধ হইলে তাহার ফুৎকারে মহাসমুদ্র যেমন ঘোর গর্জ্জন করিতে থাকে, এই সকল রাক্ষস তদ্রূপ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাদের কেহ কপিল বর্ণ, কেহ ধূম্রবর্ণ, কেহ অগ্নিবর্ণ, কেহ বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কেহ কপিলবর্ণজটাধারী, কাহার বা বিদ্যুৎবর্ণ জটা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, কেহ গর্জ্জন করিতেছে, কেহ তর্জ্জন করিতেছে, কাহার জিহ্বা বাড়বাগ্নির ন্যায় লক্ লক্ করিতেছে, কেহ আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, কেহ ঘোর চিৎকার করিতেছে ও উজ্জ্বল উল্মুকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ দন্তুর, কেহ কর্দ্দমাক্ত, কাহার গাত্রলোম শৈবালের অনুরূপ। এই সকল ঘোর দর্শন রাক্ষস তর্জ্জন ও গর্জ্জন সহকারে জনগণকে বিত্রাসিত ও বিতাড়িত করিতে লাগিল এবং কোন কোন রাক্ষস যোধগণকে অস্ত্রসহ গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইল[৪৮।৫২]।

অনন্তর লীলানাথ বিদূরথ দুষ্টভূত নিবারক নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। যেমন দিবাকর উদিত হইলে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনি, সেই অস্ত্ররাজ উদীর্য্যমাণ হইয়া সেই সমস্ত রাক্ষস বিনাশ করিয়া ফেলিল[৫৩।৫৪]। অস্ত্রপ্রভাবে রাক্ষসগণ প্রমর্দ্দিত হইলে, যেমন চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার বিনাশে দিক্ সকল নির্ম্মলাকার ধারণ করে, সেইরূপ, ত্রিভুবন ও ব্যোম (আকাশ) এখন নির্ম্মলাকার ধারণ করিল[৫৫]। অনন্তর মহারাজ সিন্ধু আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই অস্ত্রের প্রভাবে আকাশ ও দিক্ সমস্তই যেন জ্বলিয়া উঠিল। যেমন কল্পকাল উপস্থিত হইলে তন্নিবন্ধন প্রলয়মহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, মন্ত্রপূত আগ্নেয়াস্ত্র সেইরূপ প্রজ্বলনে

অতিভীষণাকার হইয়া উঠিল। এই অস্ত্রের অগ্নি হইতে যে সকল মহাধূম জন্মিল ও নির্গত হইল, তদ্দ্বারা দিক্ সকল মেঘায়মান হইল। বোধ হইতে লাগিল, রণস্থল যেন পাতালতিমিরে সমাকুলিত হইয়াছে৫৬।৫৭। পর্ব্বত সকল জ্বলিতে লাগিল। প্রজ্বলিত পর্ব্বত সকল কাঞ্চনের ন্যায় ও প্রফুল্লচম্পকারণ্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। উৎসব সময়ে কুম্ কুম্ পরিষিক্ত কুসুমমালা যেরূপ শোভা বিস্তার করে, তৎকালে ব্যোম, অদ্রি ও দিক্ সমুদায় সেইরূপ শোভা প্রকাশ করিয়াছিল৫৮।৫৯। তদ্দর্শনে জনগণ মনে করিয়াছিল, সমুদ্রস্থ বাড়বানল বুঝি সহস্র সহস্র জলযানের বেগে সমুদ্ধৃত ও এক হইয়া ভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই ব্যাপার দর্শনে রাজা বিদূরথ উক্ত আগ্নেয়াস্ত্রের নিব্বাকরণ ও সিন্ধুরাজের পরাজয় এই দুই অভিলাষে বারুণাস্ত্রের অর্চ্চনা করিলেন এবং তাহা পরিত্যাগ করিলেন। অমনি সেই মুহূর্ত্তে অধঃ উর্দ্ধ দিক্ বিদিক্ হইতে কৃষ্ণবর্ণ জলপ্রবাহ আসিয়া রণস্থল পরিপূর্ণ করিল। বোধ হইল, যেন কজ্জলপর্ব্বত গলিয়া আসিতেছে। লক্ষ লক্ষ মেঘ যেন দৌড়িয়া আসিতেছে। মহাসমুদ্র যেন উর্দ্ধে উঠিয়াছে। কুলপর্ব্বত যেন উচ্চ হইয়াছে। তমালবন যেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। রাত্রি যেন দিবস হীন হইয়াছে৬০।৬৪। পাতালের গুহা যেন ব্যোম দর্শনে আসিতেছে। ইহার শব্দও ইহার আকৃতির অনুরূপ ভীষণ৬৫। কৃষ্ণপক্ষীয় যামিনী যেমন শীঘ্র শীঘ্র সন্ধ্যা আক্রমণ করে, তদ্রূপ, এই সলিলরাশি সিন্ধুরাজ নিক্ষিপ্ত হুতাশনকে অতিশীঘ্র গ্রাস করিল৬৬। নিদ্রা যেমন জীব দেহ আক্রমণ ও অভিভূত করে, তদ্রূপ, সেই সলিলরাশি আগ্নেয়াস্ত্র গ্রাস করিয়া ভূতল কবলিত করিল৬৭। তখন মহারাজ সিন্ধুর সৈন্য ও সৈন্যরক্ষক সেই সলিলে তৃণের ন্যায় উহ্যমান ও তাঁহার রথ বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজ এই সলিলাক্রম হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে শোষণাস্ত্র যোজনা করতঃ পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ দিবাকর কর্ত্তৃক ত্রিযামা অপসারিত হয়, সেইরূপ, সেই শোষণাস্ত্রকর্ত্তৃক পৃথিবী পরিশোষিত হইলে অম্বুময়ী মায়ার শান্তি হইল। পরে মূর্খদিগের ক্রোধের ন্যায় সেই অস্ত্রতাপ প্রজাগণকে সন্তাপিত করিয়া রণস্থলীতে শুষ্কপত্রসমাকীর্ণ করতঃ বিরাজ করিতে লাগিল। তখন সেই কনকদ্রবপ্রভ অস্ত্রতাপ রাজভার্য্যার অঙ্গরাগের ন্যায় দিক্ সমুদায়কে রঞ্জিত করিয়া তৎসদৃশ

আকারে বিরাজ করিতে লাগিল। সিন্ধুরাজের বিপক্ষগণ গ্রীষ্মকালীন দাবানলোত্তপ্ত কোমল পল্লবের ন্যায় সেই ঘর্ম্মময়ী মায়ার দ্বারা সমাক্রান্ত হইয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল৭৮।৭৪। অনন্তর বিদুরথ স্বপক্ষীয় দিগের তৎক্লেশ নিবারণার্থ কোদণ্ড কুণ্ডলীকৃত করিয়া পর্জ্জন্যাস্ত্র সন্ধান করতঃ পরিত্যাগ করিলেন৭৫। পর্জ্জন্যাস্ত্রের সামর্থ্যে তমাল বনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘপংক্তি উদিত হইতে লাগিল। সেই সকল মেঘ হইতে নিরন্তর বৃষ্টিধারা নিপতিত ও শীকর সম্পৃক্ত সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদ্গাত্রে বিদ্যুৎপুঞ্জ, সুবর্ণবর্ণ সর্পের ন্যায় ও সুন্দরী যুবতীর কটাক্ষের ন্যায় ক্রীড়া করিতে দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে তাদৃশ মেঘমণ্ডলের সঞ্চরণে দিক্ বিদিক্ প্রপূরিত হইল৭৬।৮০। অনন্তর মুষলধারে ও মহাশব্দে কৃতান্তদৃষ্টিসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল৮১। এই মেঘাস্ত্রের যুদ্ধে পাতাল তল হইতে অনলের ন্যায় উষ্ণ বাস্প সমুত্থিত হইয়াছিল। আত্মবোধ সমুপস্থিত হইলে যেমন নিরতিশয় আনন্দরসের আবির্ভাব হয়, সংসার বাসনা তিরোহিত হয়, সেইরূপ, সে বাস্প, ক্ষণকাল মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় প্রশমিত হইয়া গেল৮২।৮৩। তৎকালে পৃথিবী পঙ্কপরিপূর্ণ হওয়াতে লোক সকলের চলাচল রহিত হইয়াছিল। এবং মহারাজ সিন্ধু যেন সিন্ধুসলিলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন৮৪। অনন্তর সিন্ধুরাজ বায়ু অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা আকাশকোটর পরিপূর্ণ হইল ও সেই বায়ুব্যূহ যেন প্রমত্ত হইয়া কল্পান্তকালীন বায়ুর ন্যায় ভীষণ নিনাদে নৃত্য করিতে লাগিল৮৫। জনগণ সেই প্রবল মারুতে আহত হইয়া যেন অশনিনিপাতে নিপীড়িতাঙ্গ হইতে লাগিল ও যোধগণ প্রতিযোধগণের প্রতি শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যেরূপ শব্দ সমুত্থিত হয়, সেই প্রলয়সমীরণসদৃশ মহাসমীরণ সেই প্রকার শব্দ করতঃ রণস্থলে প্রবাহিত হইতে লাগিল৮৬।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তখন নীহার ও ধূলি পরিপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইলে বনস্থলী কম্পিত, বৃক্ষশাখা ছিন্ন ভিন্ন, ক্ষুদ্র বৃক্ষ উদ্ধৃত ও আকাশে পক্ষিবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভটগণ উৎপতিত ও নিপতিত, সৌধ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ ও অভ্র,সকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল[১।২]। নদী যেমন সবেগে জীর্ণ পল্লব বহন করে, তাহার ন্যায় বিদূরথের রথ সেই ভীম-বায়ুবেগে বাহিত হইতে (উড়িতে) লাগিল[৩]। মহাস্ত্রবিদ্ বিদূরথ তন্মুহূর্তে পর্ব্বতাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন বোধ হইল, তাঁহার এই মহাস্ত্র যেন বিদূরথের প্রেরিত জলধরের বারিবর্ষণের সহিত নভোমণ্ডল গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে[৪]। ক্ষণমধ্যে সেই অতি বিস্তৃত প্রচণ্ড বায়ু শৈলাস্ত্র দ্বারা সমাহত হইয়া শমতা প্রাপ্ত হইল[৫]। তখন বায়ুসমুড্ডীন অন্তরীক্ষগত বৃক্ষ সমূহ কাকসমূহের ন্যায় ভূতলস্থ শব-ব্যূহোপরি নিপতিত হইতে দেখা গেল, এবং চতুর্দ্দিক্স্থ পুর, গ্রাম, বন, লতা মনুষ্য প্রভৃতির সূৎকার (নিশ্বাস শব্দ) ডাৎকার (লুণ্ঠন রব) ঝাঙ্কার (অন্যান্য ভীষণ শব্দ) ও চিৎকার (উদ্ভট সামরিক গণের শব্দ) শব্দ সকল শমতা প্রাপ্ত হইল[৬।৭]।

অনন্তর সিন্ধুরূপ সিন্ধুরাজ স্বসৃষ্ট পর্ব্বতাস্ত্রপ্রভব মৈনাকাদি পর্ব্বত সকল পর্ণবৎ নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইতেছে (উড়িতেছে) দেখিয়া সুদীপ্ত বজ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই বজ্রাস্ত্র হইতে বজ্র সমূহ বিনির্গত হইয়া অনলের ইন্ধন ভক্ষণের ন্যায় সেই সকল গিরীন্দ্রতিমির পান করিয়া ফেলিল[৮।৯]। এই অস্ত্রের চঞ্চুসদৃশ অগ্রভাগ দ্বারা সেই সমস্ত গিরিশিখর সমূহ খণ্ডিত হইয়া বাতছিন্ন ফল সমূহের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল[১০]।

অনন্তর বিদূরথ বজ্রাস্ত্র শান্তির নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত হইল[১১]। সিন্ধুরাজ বজ্রাস্ত্র প্রশমিত দেখিয়া শ্যামবর্ণ পিশাচাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন দিগ্-দিগন্ত হইতে অতি ভয়প্রদ পিশাচপংক্তি রণস্থলে আগমন করিতে

লাগিল। দিবাকর তদ্দ্বারা যেন নিতান্ত ভীত হইয়া সন্ধ্যাকালের ন্যায় শ্যামতা প্রাপ্ত হইলেন। অন্ধকার সদৃশ ভীষণ পিশাচগণ যেন মূর্তিমান্ ভয়ের ন্যায় ভূতলে আগমন করিল[১২।১৩]। সেই সমস্ত পিশাচগণ দগ্ধস্তম্ভাকার, তালসহকারে নর্তনশীল ও ভীষণাকার সম্পন্ন। ইহারা কাহারও মুষ্টিগ্রাহ্য নহে (কেহ ইহাদিগকে ধরিতে পারে না)। ইহারা দীর্ঘকেশসম্পন্ন ও কৃশাঙ্গ। এই নভশ্চর পিশাচগণের মধ্যে কেহ কেহ গ্রাম্যগণের ন্যায় শ্মশ্রুধারী, কৃষ্ণবর্ণ ও মলিনাঙ্গ। মূঢ়ব্যক্তিরা সভয় অন্তঃকরণে সেই সমস্ত অস্থি, কপাল, বজ্র ও অসিধারী সচঞ্চল পিশাচ দিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই সমস্ত পিশাচ গ্রাম্যজনগণের ন্যায় ক্রূর ও দীন স্বভাব। ইহারা তরু, কর্দ্দম, রথ্যা, শূন্য পুরি ও শূন্য গৃহাভ্যন্তরে গমনানুরক্ত, সৃক্কণীলেহনশীল, প্রেতরূপী ও বিদ্যুতের ন্যায় দৃশ্য ও অদৃশ্য স্বভাব[১৪।১৭]। এই সমস্ত পিশাচ উন্মত্ত হইয়া হতাবশিষ্ট শত্রু বল গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে, বিদূরথসৈন্যগণ হতচেতন, ভিন্নাস্ত্র, আয়ুধহীন, বর্ম্মবিহীন ভীতচিত্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতাবিষ্টচেতার ন্যায় কথন হস্ত, পদ, অঙ্গ ও মুখাদি কর্ষণ, কথন কৌপীন ও উত্তরীয় বসন পরিত্যাগ, কখন বিষ্ঠা মূত্রাদি বর্জ্জন, কথন উন্মত্তের ন্যায় নর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল[১৮।২০]। অতঃপর যখন এই সকল পিশাচেরা বিদূরথকে আক্রমণ করিল, তখন বিদূরথ পরপ্রমুক্ত পিশাচসংগ্রামকারিণী মায়া অবগত হইয়া ক্রোধভরে রূপিকাস্ত্র সন্ধান করতঃ পরিত্যাগ করিলেন[২১।২২]। তখন ভূতল হইতে বিবিধাকারের রূপিকা সমুত্থিত হইয়া ব্যোমমণ্ডল আক্রম করিল। তাহারা ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজ, ভীমলোচন, কোঠরলোচন ও চঞ্চলশ্রোণিপয়োধর[২৩।২৪]। তাহাদের মধ্যে কতক উদ্ভিন্ন যৌবনা, কতক বৃদ্ধা, কতক পীবরাঙ্গী, কতক জরাজীর্ণদেহা, কতক সুন্দরজঘনা, কতক বিরূপজঘনা, কতক বিবৃত্ত ও বিকৃতনাভি, কতক বিস্তৃত ও কূপসদৃশ জননেন্দ্রিয় যুক্ত[২৫]। কাহার কাহার হস্তে শোণিতপূর্ণ নরকপাল ও নরশির। তাহাদের গাত্র সায়ংকালীন অভ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তাহারা অস্থি ও মাংস চর্ব্বণ করিতেছে। তাহাদিগের স্কন্ধদ্বয় হইতে নিরন্তর রুধিরধারা ক্ষরিত হইতেছে[২৬]। তাহারা নানাপ্রকারে শরীর সঞ্চালন করিতেছে। তাহাদের ঊরুদেশ শীলার ন্যায় কঠিন ও ভুজগের ন্যায় বক্র, তাহাদের পার্শ্ব ও কর অত্যন্ত দৃঢ়[২৭]। তাহারা মৃত বালকগণকে মালা স্বরূপে ধারণ ও

অন্ত্ররজ্জু হস্তে করিয়া আকর্ষণ করিতেছে। সেই সকল রূপিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ কুক্কুরবদনা, কেহ কেহ কাকাস্যা, কেহ কেহ উলূক-মুখী, কেহ কেহ নিম্নবক্ত্রা এবং কেহ কেহ নিম্নহনু ও নিম্নোদরী[২৮]। এই সকল রূপিকা দুষ্কৃতকারী দুর্ব্বল বালকের ন্যায় সেই সকল পিশাচ গণকে পতিত্বে গ্রহণ করিল। তখন পিশাচ ও রূপিকা এই উভয় সৈন্য একতা প্রাপ্ত হইল এবং ক্রীড়ারসে নিমগ্ন হইয়া শবাহরণ পূর্ব্বক নর্ত্তন করিতে করিতে পরস্পর হস্ত ধারণ করতঃ দিক্‌দিগন্তে প্রধা-বিত হইতে লাগিল। অপিচ, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল[২৯।৩০]। তাহারা মহাজিহ্বা নিষ্কাশিত করিয়া নানা প্রকার মুখবিকার দেখাইতে আরম্ভ করিল। এই সকল লম্বোদর, লম্বভুজ, লম্বকর্ণ, লম্বৌষ্ঠ ও লম্বনাসিকা রূপিকা ও পিশাচ গণ কখন রুধিরসলিলে নিমগ্ন ও তাহা হইতে পুনঃ উন্মজ্জিত হইতে লাগিল এবং রক্ত মাংসরূপ মহা-পঙ্কে নিপতিত হইয়া পরস্পর সানন্দে আলিঙ্গন অভ্যাস করিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন মন্দর ভূধর দ্বারা ক্ষীরসমুদ্র সমালোড়িত হইতেছে ও তন্মুখনির্গত কল কল ধ্বনি চতুর্দ্দিক্ সমাকুল করিতেছে[৩১।৩৩]। বিদূরথ সিন্ধুরাজের সম্বন্ধে এইরূপ মায়া বিস্তার করিলে সিন্ধুরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন। পারিয়া তদ্বিনাশার্থ বেতালাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহা হইতে তখন সমস্তক অমস্তক নানা প্রকার বেতাল অর্থাৎ শব আবি-র্ভূত হইয়া পরবলমর্দ্দন বেশে সঞ্চরণ করিতে লাগিল[৩৪।৩৫]। সেইরূপে পিশাচ, বেতাল ও রূপিকাগণ সমবেত হইলে বোধ হইল, যেন এই সকল উগ্রবল সৈন্য উর্ব্বীভক্ষণে সমর্থ ও উদ্যত হইয়াছে[৩৬]। অনন্তর বিদূরথ সিন্ধুরাজের সে মায়া সংহার পূর্ব্বক সিন্ধুরাজসৈন্যের প্রতি পর্ব্বতপ্রমাণ ত্রৈলোক্য প্রহননক্ষম রাক্ষসাস্ত্র সৃজন করিলেন। তখন বৃহৎকায় রাক্ষসগণ সর্ব্বদিক্ হইতে বিনিক্রান্ত ও আগত হইতে লাগিল। তখন বোধ হইল, যেন পাতাল হইতে মূর্ত্তিমান্ নরক সমূহ আগমন করিতেছে। সুরাসুর-ভীতিপ্রদ, গভীরগর্জ্জন ও ভীষণ নিনাদ সম্পন্ন, কবন্ধনৃত্যসঙ্কুল, মেদ-মাংসোপদংশাঢ্য, (মাংসচর্ব্বণকারী) রুধিরাসবসুন্দর ও নর্ত্তনশীল কুষ্মাণ্ড, বেতাল ও যক্ষ সঙ্কুল এই রাক্ষসবল অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল[৩৭।৪২]।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তখন ধৈর্য্যশালী সিন্ধুরাজ ঘোর সংগ্রামবিভ্রাট উপস্থিত দেখিয়া স্বসৈন্য রক্ষা ও পরসৈন্য বিনাশ উদ্দেশে বৈষ্ণবাস্ত্র স্মরণ করিলেন[১]। সেই অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিলে তাহা হইতে রাশি রাশি চক্রাস্ত্র ও অন্যান্য অসঙ্খ্য অস্ত্র নির্গত হইতে লাগিল[২।৩]। সেই সকল অস্ত্রপঙ্ক্তি শত সূর্য্য সমুদ্ভাষিত দিক্তটের ন্যায় সমুজ্জ্বলিত হইল। তাহা হইতে গদা, শিতধার বজ্র, পট্টিশ, শিতধার শরনিকর ও শ্যামবর্ণ খড়্গ সমূহ আবির্ভূত হইয়া রণাকাশ আচ্ছাদিত করিল[৪।৬]।

অনন্তর বিদূরথ সেই বৈষ্ণবাস্ত্র শান্তির নিমিত্ত তদনুরূপ বৈষ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাহা হইতেও শক্তি, গদা, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র মেঘ হইতে নির্গমের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। আকাশ মণ্ডলে সেই সকল অস্ত্রের শৈলবিদ্রাবণকারী তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল[৭।৯]। সেই যুদ্ধে আপতিত শরনিকর দ্বারা শূল, অসি, খড়্গ ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র চূর্ণ, মুষল নিপাতনে প্রাস ও শক্তি সমুদয় খণ্ডিত হইতে লাগিল[১০]। মুদ্গররূপ মন্দরভূধর দ্বারা শররূপ অম্বুনিধি মথিত ও গদাবদন হইতে দুর্ব্বার প্রতিযোদ্ধার ন্যায় অসি সকল বিনির্গত হওয়ায় তদ্দ্বারা বিপক্ষ দল আলোড়িত হইতে লাগিল[১১]। তৎপ্রসূত প্রাসাস্ত্র সকল জনবিনাশোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় সেই যুদ্ধে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যাহার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া যায়, যাহার আঘাতে কুলাচলও ভগ্ন হয়, সেই সর্ব্বায়ুধক্ষয়কর চক্রাস্ত্র অকুণ্ঠিত আকারে ঊর্দ্ধে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অতঃপর শঙ্কু অস্ত্রের দ্বারা শূল ও শিলাশাণিত অসি তিরোহিত এবং ভূষণ্ডীর দ্বারা দণ্ড ও ভীষণ ভিন্দিপাল নির্জ্জিত হইতে দেখা গেল[১২।১৫]। সর্ব্বসংহারসমর্থ উৎকৃষ্ট শূলধারী রুদ্রের ন্যায় এক একটি আয়ুধশ্রেষ্ঠ শূল সমুদায়কে কুণ্ঠিত ও সমুৎসাদিত করিল এবং শত্রুবিদ্রাবণকারী কুটিল গমনে সংচ্ছিন্ন আয়ুধ সকল কুটিলগতি অবলম্বনে আকাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। হেতি ও অস্ত্র

সকল চূর্ণ হওয়াতে তাহার চট চটা শব্দে ও তাহা হইতে সমুত্থিত ধুমরাশির দ্বারা গগন মণ্ডল ধ্বনিত ও পরিপূরিত হইল[১৬।১৭]। এই রূপে উভয়পক্ষীয় অস্ত্র আকাশ পথে যুদ্ধ করতঃ পরস্পর দ্বারা পরস্পর সঙ্ঘটিত হওয়াতে মেঘ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নি জ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। তদুত্থ ভয়ঙ্কর শব্দে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ মনে করিতে লাগিলেন, বিদূরথ কেবল আমার অস্ত্র নিবারণ মাত্র করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন। ইহার পরাক্রম ফুরাইয়া গিয়াছে। যে যৎকিঞ্চিৎ আছে তাহা আমার নিকট তুচ্ছ। সিন্ধুরাজ এইরূপ মনে করিয়া যুদ্ধে অবহেলা করতঃ অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে বিদূরথ অশনি শব্দের ন্যায় মহাশব্দ উত্থাপন করতঃ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন[১৮।২০]। তখন সেই অস্ত্রের প্রভাবে সিন্ধুরাজের রথ শুষ্ক তৃণের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল। অনন্তর হেতিপরিপূর্ণ নভোমণ্ডলে সেই রাজদ্বয়ের একতর সন্নদ্ধকলেবর ও প্রাবৃট্ পয়োধরের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। নারায়ণাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষণকাল এইরূপ ঘোর সংগ্রাম হইল[২১।২২]। উভয়েই তুল্যবলশালী, সুতরাং কাহার ন্যূনাধিক্য দেখা গেল না। এই অবসরে সিংহ যেমন বন দগ্ধ হইলে বনকন্দর হইতে নির্গত হয়, তেমনি, সেই হুতাশন সিন্ধুরাজের রথ ভস্মসাৎ করিয়া সিন্ধুরাজকেও আক্রমণ করিল। তখন সিন্ধুরাজ বারুণাস্ত্র দ্বারা সেই প্রবল আগ্নেয়াস্ত্রের শমতা করতঃ রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং খড়্গ পরিচালন আরম্ভ করিলেন। অনন্তর নিমেষ মাত্রে করবাল দ্বারা মৃণালের ন্যায় বিপক্ষ রাজার রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বিদূরথও বিরথ ও অসিধারী হইলেন[২৩।২৬]। এখন উভয়েই সমায়ুধ। এই সমায়ুধ, সমোৎসাহ ও সমযোদ্ধা বীরদ্বয় মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইহাদের খড়্গ, ক্রকচের ন্যায় কঠিন বর্ম্ম বিদারণে সমর্থ[২৭]। ইত্যবসরে বিদূরথ খড়্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শক্তি গ্রহণ করতঃ তাহা সিন্ধুরাজের উচ্ছেদার্থে পরিত্যাগ করিলেন[২৮]। অশনিপাতের ন্যায় ও সিন্ধুসলিলের উচ্ছ্বাসের ন্যায় মহোৎপাত সূচক সেই শক্তি অবিচ্ছিন্ন বেগে ভীষণরবে সমাগত হইয়া সিন্ধুরাজের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল[২৯]। যেমন স্বীয় কামিনী ভর্ত্তার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করে না, সেইরূপ, সেই শক্তি

সমাগতা হইয়াও সিন্ধুরাজের মৃত্যুসাধন করিল না। কিন্তু তদ্দ্বারা তিনি সমাহত হওয়ায়, হস্তিগণ্ড হইতে যেরূপ মদক্ষরণ হয়, তাঁহার দেহ হইতে সেইরূপ শোণিত ক্ষরণ হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া তদ্দেশবাসিনী লীলা সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া পূর্ব্বলীলাকে বলিতে লাগিলেন, দেবি! দেখুন, নরসিংহসদৃশ আমাদের ভর্ত্তা সিন্ধুরাজকে নিহত করিলেন৩০।৩২। ঐ দেখুন, উন্নতস্কন্ধ সিন্ধুরাজ শক্তির দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে, সরোবরমধ্যস্থিত গজেন্দ্রের কর হইতে যেরূপ ফুৎকার শব্দে সলিল নির্গত হয়, সেইরূপ, উহাঁর বক্ষঃ হইতে চুলু চুলু শব্দে শোণিত নির্গত হইতেছে৩৩।

হায় হায়! পুনর্ব্বার সিন্ধুর আরোহণার্থ সুবর্ণময় রথ সমানীত হইয়াছে। এই রথ সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় ও ইহার অশ্ব পুষ্করাবর্ত্ত মেঘের ন্যায়। হে দেবি! ঐ দেখুন, ঐ রথও মুদ্গরাঘাতে চূর্ণিত হইল৩৪।৩৫। যেমন পার্থশরনিপাতে নিবাতকবচগণের সুবর্ণ নগর বিঘূর্ণিত হইয়াছিল, * আমার পতি সেইরূপ বিঘূর্ণিত ও হরিদ্বর্ণ ক্রমের ন্যায় সমুচ্ছ্রিত সমানীত রথে সিন্ধুরাজকে বঞ্চনা করিয়া আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন৩৬।

কি কষ্ট! সিন্ধুরাজ আবার শরবর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিল। আর্য্যপুত্র বিদূরথ এবার ছিন্নধ্বজ, ছিন্নরথ, ছিন্নাশ্ব, ছিন্নসারথি, ছিন্নকার্ম্মুক, ছিন্নচর্ম্ম এবং ছিন্নগাত্র হওয়াতে সাতিশয় সমাকুল হইলেন। হা ধিক্! হায় হায়! কি কষ্ট! সিন্ধু এবার আর্য্যপুত্রের হৃদয় ও মস্তক বজ্রসদৃশ বাণ দ্বারা আঘাতিত করিল। হায় হায়! আর্য্যপুত্রকে এবার ভূতলে নিপাতিত করিল৩৭।৪১। ঐ যে, তিনি চেতনা লাভ করতঃ সমানীত অন্যরথে কষ্টে আরোহণ করিতেছেন। এ কি! দুর্ব্বৃত্ত সিন্ধুরাজ খড়্গ দ্বারা রথারোহণেচ্ছু মহারাজার শির-

---

* অর্জ্জুনের নামোল্লেখ থাকাতে রামচন্দ্রের সময়ের পূর্ব্বে পার্থের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয়। কিন্তু তাহা নহে। অর্জ্জুন দ্বাপর যুগের শেষে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাপরযুগ এক নহে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বহু শত দ্বাপর অতীত হইয়াছে। অতএব, রামচন্দ্রের সময়ে, যে অর্জ্জুনের কথা লিখিত হইয়াছে সে অর্জ্জুন অন্য দ্বাপর যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন লোক সকল সেই অর্জ্জুনের নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ঋষি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিবাত কবচগণের সুবর্ণ নগর পরিচালনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

চ্ছেদন করিল। হায় হায়! কি খেদ! দেবি! আমার ভর্ত্তার স্কন্ধদেশ অবলোকন করুন। দেখুন, আমার ভর্ত্তার ছিন্নশির হইতে পদ্মরাগ সন্নিভ শোণিত নিঃসৃত হইতেছে। হা ধিক্! হায়! কি কষ্ট! পাদপ যেমন ক্রকচ দ্বারা ছিন্ন হয়, আমার ভর্ত্তার মৃণাল সদৃশ কোমল জানুদ্বয় তাহার ন্যায় সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক শিতধার খড়্গ দ্বারা ছিন্ন হইল। হায়! আমি হত হইলাম, মৃত হইলাম, দগ্ধ হইলাম ও উপহত হইলাম!৪২।৪৪

ভর্ত্তৃভাবদর্শনকাতরা সেই লীলা ঐরূপ বিলাপ করিয়া পরশুছিন্ন লতার ন্যায় ভূতলে নিপতিতা মূর্চ্ছিতা ও অবসন্না হইলেন। এ দিকে বিদূরথ শত্রু কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় পতনোন্মুখ হইলে সারথি তাঁহাকে গৃহে আনয়নার্থ রথ দ্বারা বহন করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব সিন্ধুরাজ তাঁহার অনুগামী হইয়া তদীয় কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিল। বিদূরথ অর্দ্ধছিন্নস্কন্ধ অবস্থায় সরস্বতীর প্রভাবপূর্ণ গৃহে সারথি কর্ত্তৃক প্রবেশিত হইলেন। যেমন মশক জ্বালোদর মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, সিন্ধুরাজ পদ্মগৃহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না৪৫।৪৯। অনন্তর সারথি সেই খড়্গানিকৃত্তগলনালী হইতে নির্গত শোণিতধারার দ্বারা পরিষিক্তগাত্র-বস্ত্র-তনুত্র-সহ বিদূরথকে গৃহে প্রবেশিত করাইয়া তন্মধ্যবর্ত্তী ভগবতী সরস্বতীর সম্মুখস্থিত কোমলাস্তরণসমন্বিত সুখমরণযোগ্য কোমল শয্যায় স্থাপিত করিলেন৫০।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অনন্তর যুদ্ধে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক মহারাজা বিদূরথ হত হইলেন, হত হইলেন, এই শব্দ সমুত্থিত হইলে সেই রাজ্য মহাভয়ে ব্যাকুলিত হইল[১]। নগরবাসীরা গৃহসামগ্রীসহ শকটারোহণে কলত্রাদির সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পলায়ন আরম্ভ করিল। দুর্দ্দম্য শত্রুগণ পথিমধ্যে তাহাদের কলত্রাদি কাড়িয়া লইতে লাগিল। লোক সকল পরদ্রব্য লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে নগর অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিল[২।৩]। বিপক্ষীয় জনগণের নৃত্য, জয়লাভজনিত আনন্দ নিনাদ, আরোহিবিহীন হস্ত্যশ্বের শব্দ ও কবাটোৎপাটনের শব্দ মিলিত হইয়া ভয়প্রদ হইতে লাগিল। লুব্ধ যোধবৃন্দ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। এই অবসরে চোরেরা চুরি আরম্ভ করিল, দুরাত্মারা নরনারী বধ করিয়া অলঙ্কার অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট লোক রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া সুখানুভব করিতে লাগিল, পামরগণ রাজভোগ্য অন্নাদি অপহরণ করতঃ ভক্ষণে উন্মুখ হইল, হেম-হার-ধারী শিশুগণ বীরগণ কর্ত্তৃক পদদলিত ও আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল,[৪।৭] দুরাশয় যুবক কর্ত্তৃক অনেক যুবতীর কেশাকর্ষণ হইতে লাগিল, চৌরগণের হস্তচ্যুত মহামূল্য রত্নরাজি পথে নিপতিত হওয়ায় তলব্ধ পথিকের বদন হাস্যপ্রফুল্ল হইতে দেখা গেল এবং হয়, হস্তী ও রথাদির মহা আড়ম্বর দৃষ্ট হইল। সিন্ধুপক্ষীয় সমস্ত রাজারা ব্যগ্র হইয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, অদ্য সিন্ধুরাজ এই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। কেহ অভিষেক দ্রব্য আনয়নের আদেশ করিতেছে, কেহ গৃহোপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, কোন মন্ত্রী শিল্পীদিগকে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণের জন্য আদেশ দান করিতেছেন। সিন্ধুরাজের প্রিয় পাত্রেরা অট্টালিকোপরি আরোহণ করতঃ গবাক্ষের অন্তরাল দিয়া নগরের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন[৮।১০]। সিন্ধুরাজের পুত্র অভিষিক্ত হইলে তৎপ্রতি জয়শব্দ সমুদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। ভটগণ (শান্তিরক্ষক বীরগণ) চোর দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত

হইল। সিন্ধুপক্ষীয় রাজন্যবর্গ সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত রাষ্ট্রমর্য্যাদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। বিদূরথের প্রিয় ব্যক্তি সকল প্রচ্ছন্নভাবে গ্রামান্তরে অবস্থিতি করিলেও বিপক্ষরাজ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হওয়ায় তথা হইতে বিদ্রুত হইতে লাগিল। সিন্ধুরাজের সৈন্যগণ তদ্রাজ্যস্থিত গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। চৌরগণ অপহরণাভিলাষে রাজপথ অবরোধ করাতে মনুষ্যগণের গমনাগমন রহিত হইতে লাগিল। বিদূরথের বিয়োগদুঃখে আজ্ জনগণের দিবসেও সনীহার আতপ (সূর্য্যকিরণ) অনুভূত হইতে লাগিল[১১।১৩]। মৃত বন্ধুগণের রোদনধ্বনিতে, জিতশত্রু দিগের তূর্য্য রবে এবং হয় হস্তী ও রথ প্রভৃতির শব্দে ঐ নগর যেন পরিপূর্ণ হইয়াছে। জনগণ "একচ্ছত্র ভূমণ্ডলাধিপতি সিন্ধুরাজের জয়" এইরূপ ঘোষণা করতঃ নগরে নগরে ভেরী বাদন করিতে লাগিল[১৪।১৫]।

যেমন যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে অপর মনু জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত সমাগত হন, সেইরূপ, উন্নতস্কন্ধ মহারাজ সিন্ধু আজ্ অভিষিক্ত হইয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন[১৬]। রত্নরাজি যেমন সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, সেইরূপ, আজ্ দশ দিক্ হইতে বহুবিধ রাজস্ব সমাগত হইয়া সিন্ধুরাজপুরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল[১৭]। চতুর্দ্দিকে সিন্ধুনামাঙ্কিত চিহ্ন সংস্থাপিত হইল। প্রত্যেক দেশের ও পুরের নিয়ম বিভিন্ন হইয়া উঠিল। পবন প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলে যেমন তৃণ, পর্ণ ও ধূলি প্রভৃতির আবর্ত্তন প্রশান্ত হয়, সেইরূপ, রাজবিপ্লবজনিত উৎপাত পরম্পরা শীঘ্র তিরোহিত হইয়া গেল এবং যেন নিমেষ মধ্যে দেশের সমুদায় বিপ্লব ও উপপ্লব নিরাকৃত ও দিক্ সকল প্রশান্ত হইয়া গেল। সমীরণ এখন সিন্ধুরমণীগণের মুখকমলস্থিত অলকারূপ ভ্রমরপংক্তি সঞ্চালিত করতঃ বদনকমলস্থ স্বেদবিন্দুরূপ মধুপানে প্রমত্ত হইয়াই যেন সকল প্রদেশের সন্তাপ ও দৌর্গন্ধ্য প্রভৃতি ক্লেশকর পদার্থ দূরীকৃত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল[১৮।২২]।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এ দিকে জ্ঞপ্তিসমভিব্যাহারিণী লীলা সম্মুখবর্ত্তী ভর্ত্তাকে শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট ও মূর্চ্ছিত অবলোকন দেখিয়া দেবী সরস্বতীকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, অম্বিকে! আমার ভর্ত্তা দেহ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সরস্বতী বলিলেন, পুত্রি! রাষ্ট্রবিপ্লব ও মহাড়ম্বরসম্পন্ন সংগ্রাম উপস্থিত হইলেও রাষ্ট্র ও মহীতল দুএর কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। কেননা, এই স্বপ্নাত্মক জগৎ ভাসমান হইলেও ইহার স্থিতি নাই[১।৩]। অনঘে! তোমার ভর্ত্তা বিদূরথের এই পার্থিব রাজ্য ভূপতি পদ্মের অন্তঃপুরস্থ গৃহাকাশে ও ভূপতি পদ্মের তথাবিধ ব্রহ্মাণ্ডও সেই বশিষ্ঠব্রাহ্মণের গৃহাকাশে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই বশিষ্ঠব্রাহ্মণগৃহের মধ্যস্থিত শবগৃহে এই জগৎ ও এই জগন্মধ্যে এই বিদূরথব্রহ্মাণ্ড উভয়ই অবস্থিত রহিয়াছে। তুমি, আমি, এই লীলা, এই বিদূরথ ও এই সসাগরা মেদিনী প্রভৃতি মিথ্যা জগত্রয় সেই গিরিগ্রামীয় বিপ্রের গৃহাভ্যন্তরস্থ গগনকোষে অবস্থিত রহিয়াছে[৪।৮]। স্বীয় আত্মাই উক্ত আকারে কখন বৃথা প্রকাশিত, কখন বা অপ্রকাশিত হইয়া থাকেন। যে আত্মা ঐ প্রকার হন, সেই আত্মাই উৎপত্তি বিনাশবিবর্জ্জিত পরম পদ[৯]। সেই অনাময় শান্ত পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, তিনিই মণ্ডপগেহান্তে স্বীয় চিন্মাত্র স্বভাব দ্বারা আপনিই আপনাতে সমুদিত আছেন[১০]। লীলে! পূর্ব্বোক্ত মণ্ডপদ্বয়ের মধ্যে যে ভূতাকাশ, বস্তুতঃ তাহাতেও শূন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। অর্থাৎ তাহাতেও জগৎ নাই। যখন তাহা ভূতাকাশেও নাই, তখন চিদাকাশে থাকিবার সম্ভাবনা কি? ভাবিয়া দেখ, ভ্রমদ্রষ্টা না থাকিলে ভ্রান্তি কোথায় ও কাহার হইবে? অতএব, ভ্রমেরও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। যাহা আছে তাহা সেই নিত্য পরমপদ[১১।১২]। দৃশ্য কি? দৃশ্য দ্রষ্টার ব্যাপারের আধার সুতরাং কোনও দ্রষ্টা আপনাতে আপনার ব্যাপার আহিত করিতে সমর্থ নহে। কর্ত্তা আপনিই আপনার কর্ম্ম, ইহা অসম্ভব। অতএব, দ্রষ্টৃ দৃশ্যের দৃষ্ট ক্রম অদ্বৈতবাদের ভূষণ। বৎসে! দৃশ্যভ্রান্তির অভাব হইলে

দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়েব অভাব হয়। দ্রষ্টার ও দৃশ্যের অভাব হইলে অদ্বয় পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। বস্তুতঃ উক্ত পদ (প্রাপ্য আত্মা) পরম ও উৎপত্তি বিনাশ বর্জ্জিত। চিদাত্মপদই স্বতঃ উক্তপ্রকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৩।১৪]। সেইজন্যই বলিতেছি, সেই মণ্ডপগৃহে জনগণ স্ব স্ব ভাবে সমুদিত হইয়া স্ব স্ব ব্যবস্থাতেই বিহার করিতেছেন। অথচ তাহাতে জগৎ বা সৃষ্টি কিছুই নাই। নাই বলিয়াই বলা যায়, জগৎ অজ ও আকাশস্বরূপ[১৫।১৬]। অজ্ঞদৃষ্টির দ্বারাই উক্তবিধ অহন্তাবের সাক্ষী-ভূত চিদাকাশ জগৎস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। এই মরু ও ভূধর প্রভৃতি দৃশ্য সেই শূন্যরূপী চিদাত্মাব স্বরূপ। ঐ সকলের দৃশ্যতা স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরীর ন্যায় অলীক[১৭]। জনগণ স্বপ্নে কণ্ঠ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত প্রাদেশ পরিমিত স্থানে তৎপ্রদেশাবচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্যে লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতাদি ভাসমান (অবস্থিত) দর্শন করে[১৮]। এক পরমাণুতে (পরমাণুতুল্য মনে) লক্ষ্য লক্ষ্য জগৎ দেখা যায়, সে সকল বিবিধ বেশে কদলীত্বকের ন্যায় স্তরে স্তরে অবস্থিত রহিয়াছে[১৯]। স্বপ্ন নির্ম্মিত পুর ও নগরাদির অব-স্থিতির ন্যায় চিদণুর (জীবভাবের) মধ্যে ত্রিজগৎ অবস্থিতি করিতেছে স্তুতরাং ত্রিজগতের মধ্যে চিদণু ও চিদণুর মধ্যে আরও এক একটী জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে[২০]। লীলে! সেই সকল জগতের মধ্যে যে জগতে ভূপতি পদ্মের শব অবস্থিত আছে, তোমার সপত্নী লীলা পূর্ব্বেই তোমার অজ্ঞাতসারে তথায় গমন করিয়াছেন। তুমি দেখিলে, তোমার সম্মুখে লীলা মূর্চ্ছিতা হইলেন। যেই মূর্চ্ছা হইল সেই তিনি ভর্ত্তা পদ্মের নিকটে গিয়া স্থিতা হইয়াছেন[২১।২২]।

লীলা বলিলেন, দেবি! তিনি তথায় কি প্রকারে দেহধারিণী হইয়া আমার সপত্নী ভাব অবলম্বন করতঃ অবস্থিতি করিতেছেন? এবং মহা-রাজ পদ্মের গৃহবাসী সেই সমস্ত জনগণ তাঁহার কি প্রকার রূপ দর্শন করিতেছেন? আর তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা কিইবা বলিতেছেন? এই সমস্ত আমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করুন[২৩।২৪]।

দেবী বলিলেন, লীলে! আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলে সম্যক্ জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবে। সেই বিদূরথরূপ তোমার স্বামী ভূপতি পদ্ম সেই শবাশ্রয়ীভূত সদ্মে সেই নগরাদিভাবে

পরিদৃশ্যমান জগন্ময়ী ভ্রান্তি দর্শন করিতেছেন[২৫]। বৎসে! এই যুদ্ধ ভ্রান্তি-যুদ্ধ। এই সমস্ত জনও জন নহে; সমস্তই ভ্রান্তি। বস্তুতঃ জন্মাদি-বিক্রিয়ারহিত আত্মাই সংসার[২৬।২৭]। লীলা যে ভূপতি পদ্মের দয়িতা হইয়াছিলেন তাহাও ভ্রান্তির ক্রম ও ভ্রান্তির বিলাস। হে বরারোহে! তুমি ও এই লীলা তোমরা উভয়েই স্বপ্নসদৃশ[২৮]। তোমরা যেমন মহারাজ পদ্মের স্বপ্ন, তেমনি, মহারাজ পদ্মও তোমাদের স্বপ্ন। তোমাদের এই ভর্ত্তা ও আমি, ইহাও তোমাদের অন্যবিধ স্বপ্ন[২৯]। ঈদৃশী জগৎশোভা-কেই দৃশ্য কহে। বস্তুতঃ "ইহা দৃশ্য নহে" ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে দৃশ্যশব্দার্থ পরিত্যক্ত হইয়া যায়[৩০]। কেবল আত্মাই পরিপূর্ণ। তদাশ্রয়ে তুমি, লীলা, আমি ও এই নৃপতি প্রভৃতি জনসমাকীর্ণ সংসার তদীয় ভ্রান্তিরই বিজৃম্ভণ। এই নৃপতি প্রভৃতি, আমরা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, যে প্রকারে সেই মহাচিতের মিথ্যা কল্পনা হইতে সমুদিত হইয়াছে ও হইয়াছিল, মনোহারিণী, হাস্যবিলাসশালিনী, নবযৌবনসম্পন্না চঞ্চলবদনা, সাধুশীলা, মধুরোদারভাষিণী, কোকিলস্বরসম্পন্না, মদমন্মথ-মন্থরা, অসিতোৎপলপত্রাক্ষী, পীনপয়োধরা, কাঞ্চনগৌরাঙ্গী, পক্কবিম্বফলা-ধরা রাজমহিষী লীলাও সেইরূপে সমুৎপন্না হইয়াছেন[৩১।৩৫]। তোমার ভর্ত্তা তোমারই মনঃকল্পিত এবং এই সপত্নী লীলাও তোমার মনঃকল্পিত ভর্ত্তার মনোবৃত্তিময়ী। যে দিন তোমার ভর্ত্তার চিত্ত লীলামূর্ত্তির বাসনায় বাসিত হইয়াছিল, সেই দিন চমৎকার স্বভাব চৈতন্যাকাশে তোমার ন্যায় আকারবিশিষ্টা এই লীলা দৃশ্যত্বে পরিণতা হইয়াছিল[৩৬]। যে দিন তোমার ভর্ত্তার মরণ হয়, সেই দিনই তোমার ভর্ত্তা এই বাসনাময়ী ও ত্বৎপ্রতিবিম্বময়ী লীলাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন[৩৭]। চিত্ত যখন আধি-ভৌতিক ভাব অনুভব করে, তখন, আধিভৌতিক ভাবকে সৎস্বরূপ ও আতিবাহিক ভাবকে কল্পিত জ্ঞান করে। আর যখন চিত্ত আধি-ভৌতিক ভাবকে অসৎ বিবেচনা করে, তখন, আতিবাহিক সঙ্কল্পই সংরূপে অনুভূত হয়। এই লীলা বাসনাময়ী হইলেও তোমার ভর্ত্তা ইহাকে উক্ত কারণে বাসনাময়ী বলিয়া জানিতেন না, সত্য বলিয়াই জানিতেন[৩৮।৩৯]। হেতু এই যে, তোমার ভর্ত্তা মরণমূর্চ্ছান্তে পুনর্জ্জন্মময় ভ্রমে নিপতিত হইয়া এই বাসনাময় লীলার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সে লীলাও তুমি অর্থাৎ সে তোমারই প্রতিবিম্ব। চিদাত্মার সর্ব্ব-

গামিত্ব হেতু তুমিও আপনার বাসনাময় শরীরান্তর দেখিয়াছ এবং বাসনাময়ী লীলাও তোমাকে দেখিয়াছে। বলিতে কি, এ সমস্তই ত্বদীয় বুদ্ধিস্থ বাসনার বিলাস[৪০।৪১]। যখন যে স্থানে যে বাসনা উদ্রিক্ত হয়, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তখনই সেই স্থানে তদনুরূপ দৃশ্য, স্বপ্ন দেখার ন্যায় দেখেন[৪২]। আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্। অত্যন্ত অভিনিবেশের প্রভাবে যখন যে শক্তির উদ্রেক হয়, সর্ব্বব্যাপী আত্মা তখন তাহারই অনুরূপে অবস্থিতি করেন ও প্রকাশিত হন[৪৩]। এই দম্পতি (পদ্ম ও লীলা) পূর্ব্বে মরণমূর্চ্ছার অব্যবহিত পরক্ষণেই আপন আপন হৃদয়ে পূর্ব্ববাসনার উদয়ে বক্ষ্যমাণ প্রকার অনুভব করিয়াছিলেন। যথা—এই আমাদিগের পিতা, এই আমাদের মাতা, এই আমাদের দেশ, এই আমাদের ধন, এই আমাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, আমরা বিবাহিত হইয়া অভিন্ন হৃদয় হইয়াছি, এবং এই আমাদের পরিজনবর্গ, ইত্যাদি[৪৪।৪৫]। লীলে! এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ নিদর্শন স্বপ্ন। যেমন নিদ্রানুভূতির উদ্ভবমাত্রেই জাগ্রৎ বাসনা দেশদেশান্তর দেখায়, তেমনি, মরণমূর্চ্ছার পরেও পূর্ব্ববাসনার উদয়ে জীব বাসনানুরূপ সৃষ্টি অনুভব করে। তোমার পূর্ব্ববাসনা ঐরূপই ছিল, তাই তুমি তদনুরূপ দৃশ্য, স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দর্শন করিতেছ। ইনি আমার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এবং প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "আমি যেন বিধবা না হই[৪৭]।" আমিও ইঁহাকে বাসনানুরূপ বর দিয়াছিলাম। সেই কারণে লীলা ভর্ত্তার অগ্রে মৃতা হইয়াছেন। এখনও তিনি বালিকা। হে বরাঙ্গনে! তোমরা চৈতন্যেরই অংশরূপিণী এবং আমিও তোমাদের চেতনারূপা কুলদেবী ও পূজ্যা। আমি স্বভাবতঃই এইরূপ করিয়া থাকি[৪৮।৪৯]। এক্ষণে শ্রবণ কর, কিরূপে তিনি সদেহা হইয়া এখানে আসিয়াছেন।

অনন্তর সেই লীলার জীব প্রাণবায়ুসহকারে তদীয় মুখ হইতে বিনির্গত হইল। অনন্তর লীলা মরণমূর্চ্ছান্তে স্বীয়সঙ্কল্পে রচিত বুদ্ধিরূপ আকাশে সেই সেই ভাব অনুভব করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। বাসনার উৎকর্ষে তিনি পূর্ব্ব দেহ স্মরণ করিয়া রবিকরবিকসিতা পদ্মিনীর ন্যায় বাসনানুরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মনোহর কান্তকে উপভোগ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বস্মৃতির দ্বারা ভূপতি পদ্মের মণ্ডপে গমন করতঃ স্বীয় ভর্ত্তার সহিত মিলিতা হইলেন[৫০।৫২]।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর লব্ধবরা লীলা সেই বাসনাময় দেহে মহী-পতি পতির সকাশে নভোমার্গে গমনোদ্যতা হইলেন[১]। তিনি চিন্তার দ্বারা শরীরধারীণীর ন্যায় হইলেন এবং পতি পাইবেন, সেই উৎসাহে আনন্দিত হইয়া সেই লঘু দেহে নভস্তল বিহঙ্গিনীর ন্যায় অতিক্রম করিতে লাগিলেন[২]। এ দিকে তাঁহার সেই কন্যা জ্ঞপ্তিদেবী কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া তাঁহার অগ্রগামিনী হইয়াছেন। যেন তিনি লীলার সংকল্প রূপ আদর্শ (আয়না) হইতে অগ্রেই নির্গতা হইয়াছেন[৩]। লীলা সমীপবর্ত্তিনী হইলে কুমারী তাঁহাকে বলিলেন, মাতঃ! আপনি ত সুখে আগমন করিতেছেন? আমি আপনার দুহিতা। আপনার প্রতী-ক্ষায় আমি এই আকাশপথে অবস্থিতি করিতেছি[৪]।

লীলা কুমারীকে দেবী জ্ঞান করতঃ বলিলেন, দেবি! নীরজলোচনে! মহতের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না। আপনি আমাকে শীঘ্র আমার ভর্ত্তৃসমীপে লইয়া যাউন। মহতের দর্শন নিষ্ফল হইবার নহে[৫]। তৎ-শ্রবণে কুমারী অন্য কিছু না বলিয়া বলিলেন, আসুন, আমরা উভয়ে তথায় গমন করিব। এই বলিয়া লীলার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগি-লেন এবং লীলাও আকাশপথ দেখিতে দেখিতে তাহার অনুগামিনী হই-লেন[৬]। ভাবি শুভাশুভ লক্ষণ সূচক বিধাতৃবিহিত হস্তরেখা যেমন প্রাণিগণের করতল প্রাপ্ত হয়, তেমনি, লীলা ও কন্যা অম্বরকোটর (ব্রহ্মাণ্ড কর্পরের মধ্যস্থল অর্থাৎ আকাশ মধ্য) প্রাপ্ত হইলেন[৭]। তাঁহারা প্রথমে মেঘ সঞ্চার স্থান অতিক্রম করিয়া বায়ুরাশির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে সূর্য্যমার্গ ও নক্ষত্রমার্গ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্বরিত গমনে বায়ু, ইন্দ্র, সুর ও সিদ্ধ দিগের লোক সকল উল্লঙ্ঘন করিলেন। পরে বিষ্ণুর ও মহেশ্বরের লোক প্রাপ্ত হইলেন[৮।৯]। যেমন কুম্ভ ভগ্ন না হইলেও তন্মধ্যগত হিমানীর (বরফের) শীতলতা বহিরাগত হয়, তাহার ন্যায়, সেই সিদ্ধসঙ্কল্পা লীলা ব্রহ্মাণ্ডকর্পর হইতে নির্গতা হইলেন[১০]। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, সেই চিত্তদেহা লীলা সঙ্কল্পসম্ভূত ঐ সকল

বিভ্রম স্বীয় অন্তরেই অনুভব করিতে লাগিলেন[১১]। লীলা উক্তপ্রকারে ব্রহ্মলোকাদি অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মাণ্ডকপাল ভেদ করিয়া জলাদি সপ্ত পদার্থের সপ্ত আবরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে অসীম অপার মহাচিদাকাশ। গরুড় যদি মহাবেগে শতকোটি কল্প উড্ডয়ন করেন, তাহা হইলেও এই চিদাকাশের অন্ত প্রাপ্ত হইবার নহে[১২।১৩]। এবম্বিধ মহাচিদ্গগনের অন্তরালে দেখিতে পাইলেন, যেমন মহাবনে অসংখ্য ফল থাকে, তাহার ন্যায় মহাচিদ্গগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে[১৪]। ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর পরস্পরের দৃষ্ট নহে। অর্থাৎ এক ব্রহ্মাণ্ড অন্য ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞাত নহে। (কেহ কাহার খবর রাখে না ও জানে না)। পরে কীট যেমন অলক্ষ্যে বদর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি, সেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পুরোবর্ত্তী বিস্তৃত আবরণ যুক্ত এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। সে ব্রহ্মাণ্ডেও ব্রহ্মা ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতির ভাস্বর পুরমণ্ডল আছে, সে সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া তত্রস্থ নভোমণ্ডলের অধোভাগে শ্রীমান্ ভূপতি পদ্মের মহীমণ্ডলস্থিত রাজধানীস্থ লীলান্তঃপুরমণ্ডপ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই মণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক পদ্মনরপতির পুষ্পগুপ্ত শবের নিকট গিয়া অবস্থিতা হইলেন[১৫।১৭]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অতঃপর সেই বরাননা লীলা সেই কুমারীকে আর দেখিতে পাইলেন না। যেন তিনি মায়ার ন্যায় কোথায় লুকাইয়া গিয়াছেন[১৮]। পরে লীলা সেই শবরূপী ভর্ত্তার মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভা বশতঃ এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন যে, আমার এই ভর্ত্তা সম্প্রতি সংগ্রামে সিন্ধুরাজকর্ত্তৃক নিহত হইয়া এই বীরলোকে আগমন পূর্ব্বক এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন[১৯।২০]। পরে মনে করিলেন, যাহাই হউক, আমি যে দেবীর প্রসাদে সশরীরে এই স্থানে উপনীতা হইয়া এই ভর্ত্তৃশব প্রাপ্ত হইলাম; ইহা আমার সমধিক সৌভাগ্যের ফল। আমিই ধন্যা। আমার সদৃশী রমণী ইহ জগতে আর কে আছে?[২১]। তিনি কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিলেন, অনন্তর মনোহর চামর লইয়া সেই ভর্ত্তৃশব বীজন করিতে লাগিলেন[২২]।

ঐ সময়ে প্রবুদ্ধ লীলা জ্ঞপ্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! ইহারা পদ্মভূপতির সেই সমস্ত ভৃত্য, সেই সকল দাসী এবং সেই রাজাও এই অবস্থিত রহিয়াছেন। তাই জানিতে ইচ্ছা করি, এক্ষণে ইহারা

এই সমাগতা লীলাকে কে কিরূপ বুঝিবে, কে কি প্রকার বলিবে, কে কি প্রকার ব্যবহার করিবে, তাহা আমাকে বলুন[২৩]। দেবী বলিলেন, এই সেই রাজা, এই সেই লীলা ও এই সেই সমস্ত ভৃত্য, ইহারা কেহই চিদাকাশের একতা, অর্থাৎ পরমাত্মার পরিপূর্ণতা বা সর্ব্বব্যাপিতা ও আমাদিগের উভয়ের প্রভাব, মহাচিতের প্রতিভাস ও মহানিয়তির প্রেরণা প্রযুক্ত পরস্পর পরস্পরকে অপরিচিত বলিয়া জানিতেছে না। সকলেই সকলে প্রতিবিম্বিত হইয়া সকলকে আপন আপন সম্বন্ধ সহ দর্শন করিতেছে। সুতরাং রাজা এই আমার ভার্য্যা, এই আমার সখী, এই আমার মহিষী ও এই আমার ভৃত্য, এইরূপ অনুভব করিতেছেন। কিন্তু হে লীলে! এই রহস্য বা তথ্য তুমি, আমি ও বিদূরথপত্নী লীলা এই তিন্ ব্যতিরেকে অপর কেহ বুঝিতে পারিতেছে না[২৪।২৭]। না বুঝিবার কারণ, ঐ সকল ব্যক্তির অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গ হয় নাই।

প্রবুদ্ধ লীলা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! আপনি বর দিলেও ললিতবাদিনী লীলা কি নিমিত্ত স্থূল শরীরে পতিসমীপে আগমন করিতে পারিল না তাহা আমাকে বলুন[২৮]। দেবী বলিলেন, যদ্রূপ অন্ধকার আলোকে সংগত হয় না, তদ্রূপ, অপ্রবুদ্ধধী ব্যক্তিরা (যাহারা আপনাকে অস্থূল বলিয়া না জানে তাহারা) কদাচ স্থূল দেহে পবিত্র লোকে সমাগত হইতে পারে না[২৯]। সৃষ্টির আদিতে সত্যসঙ্কল্প হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক এই নিয়তি (অবশ্যম্ভাবী নিয়ম) স্থাপিত হইয়াছে যে, সত্য কদাচ অলীকের সহিত মিলিত হইবে না[৩০]। যাবৎকাল বালকগণের বেতালসঙ্কল্প থাকে, তাবৎ তাহাদিগের নির্ব্বেতাল বুদ্ধি কি প্রকারে উদিত হইবে?[৩১] যাবৎকাল আপনাতে অবিবেকরূপ জ্বরের উষ্ণতা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ তাহাতে বিবেকরূপ শীতাংশুর শৈত্য উদিত হইবে না[৩২]। "আমি পৃথ্ব্যাদিময় স্থূলদেহী, আকাশে আমার উত্তমা গতির সম্ভাবনা নাই" এইরূপ কৃতনিশ্চয় ব্যক্তির কিরূপে স্থূল শরীরে আকাশে উত্তমা গতি হইবে?[৩৩] যদি কেহ জ্ঞান, বিবেক, পুণ্যবিশেষ ও বর দ্বারা তোমার এই দেহের ন্যায় দেহ ধারণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই ঈদৃশ পরলোকে আগমন করিতে পারে, অন্যে নহে[৩৪]। যেমন শুষ্কপর্ণ প্রজ্বলিত অঙ্গারে শীঘ্র দগ্ধ হয়, তেমনি, সুবাসনার দৃঢ়তায় আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইলে স্থূলদেহ

তখন বিশীর্ণ হইয়া যায়[৩৫]। বরের ও অভিশাপের দ্বারা পূর্ব্বকৃত জ্ঞান কর্ম্মের উদ্বোধনমাত্র * হয়, অন্য কিছু হয় না[৩৬]। রজ্জুতে "ইহা রজ্জু" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তখন কি আর ভ্রান্তিদৃষ্ট সর্প তাহাকে বিষমূর্চ্ছা প্রদান করিতে পারে? তাহা পারে না। সেইরূপ, যাহা আত্মাতে বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ যাহা অসত্য; কিরূপে তাহা সত্য কার্য্য প্রসব করিবে?[৩৭] "এ মরিয়াছে" এ জ্ঞান মিথ্যা-অনুভব মাত্র। পরিপুষ্ট পূর্ব্ব অভ্যাস দ্বারাই ঐরূপ অনুভব হইয়া থাকে। হে সুবুদ্ধিশালিনি! সৃষ্টির ঈদৃশ নিয়তি হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে, রচিত হয় নাই। অবিদিতবেদ্য অজ্ঞানচক্ষু ব্যক্তির অন্তরে এই সংসার অনুভূত হইলেও, বস্তুতঃ ইহা জলে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় বাহে প্রতিভাত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে[৩৮।৪০]।

* বর বল, আর অভিশাপ বল, সমস্তই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে লাভ ও সফল হয়। বর ও অভিশাপ সেই সেই ফলোন্মুখ কর্ম্মের সূচক মাত্র। যখন কর্ম্মফল ফলিবার সময় আইসে, তখন বর পাওয়া ও অভিশাপ ঘটনা হইয়া থাকে।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।
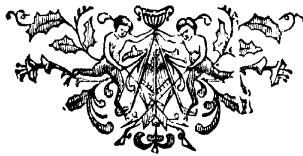
চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

দেবী বলিলেন, বৎসে! উক্তকারণে পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ এবং যাঁহারা যোগাভ্যাসজনিত পরম ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই আতিবাহিক লোক প্রাপ্ত হন; অন্যে আতিবাহিক লোক প্রাপ্ত হন না[১]। আধিভৌতিক দেহ মিথ্যা। যাহা মিথ্যা, কি প্রকারে তাহা সত্যে (আতিবাহিকে) অবস্থিতি করিবে? ছায়া কি কখন আতপে থাকিতে পারে?[২]। কেবল উৎকৃষ্ট যোগজ ধর্ম্ম প্রাপ্তা তত্ত্বজ্ঞানশালিনী লীলাই আতিবাহিক দেহ পাইয়াছেন এবং আতিবাহিক দেহে এতল্লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; অপর কেহ এরূপ হইতে পারে নাই[৩]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন। যাহা বলিলেন, লীলা সেই প্রকারেই আগমন করুক, তাহা আমি অযুক্ত মনে করিতেছি না। কিন্তু, ঐ দেখুন, সম্প্রতি আমার স্বামী প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ বিষয়ের কি উপপত্তি করিবেন, তাহা বলুন। অর্থাৎ আপনি যে নিয়তির কথা বলিলেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ভগবতি! আপনিই ভাবিয়া দেখুন, নিয়তিই দেহিগণের সুখ দুঃখের ভাব ও অভাব উভয় বিষয়ে সমাগত হয়। আবার অনিয়তি (অনিয়ম) তাহাদিগের মৃত্যুর ও জন্মাদির সূচক হইয়া উপস্থিত হয়। এ সকল ঘটনা কেন হয়? কি প্রকারে হয়? তাহা বর্ণন করুন। জলের শীততা ও অগ্নির উষ্ণতা প্রভৃতি স্বভাব, কি প্রকারে সংসিদ্ধ হয়? কি প্রকারে সত্তা, পদার্থগামিনী হয়? (সত্তা=ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা। যাহা থাকাতে ঘটপটাদি আছে, ইত্যাকার প্রতীতি হইয়া থাকে) অগ্ন্যাদিতে উষ্ণত্বাদি, পৃথ্ব্যাদিতে স্থিরতাদি, হিমাদিতে শীততাদি, কালের ও আকাশের বিদ্যমানতা প্রভৃতি কিরূপে অনুভূত হয়? ভাবাভাবের গ্রহণ ও উৎসর্গ, পদার্থের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা প্রভৃতির নিয়মই বা কি কারণে দৃষ্ট হয়! (ভাব সত্যরজতাদি, তাহার গ্রহণ, অভাব শুক্তিরজতাদি, তাহার উৎসর্গ অর্থাৎ বর্জ্জন। ভূম্যাদির স্থূলতা এবং ইন্দ্রিয়াদির সূক্ষ্মতা)। তৃণ গুল্ম ও লতাদির উচ্চ নীচ ধর্ম্ম কি প্রকারে সংসিদ্ধ হয়? কূপ সকল

শাল তালাদির ন্যায় উচ্চ না হয় কেন? কেন এত সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খল দৃষ্ট হয়? এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৪।৮]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যখন সমুদায় পদার্থ অস্তগত হইবে, তখন অনন্ত আকাশস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্ম থাকিবেন[৯]। তুমি যেমন আকাশ গমনাদি অনুভব কর, সেইরূপ, ব্রহ্ম চিৎস্বরূপতা প্রযুক্ত "আমি তেজঃকণ" এইরূপ অনুভব করেন। তেজঃকণ অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত ভাস্বর সূক্ষ্ম ভূত। অনন্তর সেই তেজঃকণ চৈতন্যের ব্যাপ্তিতে আপনিই আপনাতে স্থৌল্য অনুভব করেন। তাঁহার সেই স্থূলভাব ব্রহ্মাণ্ড। ইহা অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে[১০।১১]। ব্রহ্ম স্বকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে অবস্থিতি করতঃ "আমি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা" এইরূপ অভিমান ধারণ (সঙ্কল্প) করতঃ এই মনোরাজ্য বিস্তৃত করিয়াছেন। তাঁহার সেই সত্যসঙ্কল্পস্বরূপ মনোরাজ্যই এই জগৎ[১২]। সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁহার সঙ্কল্পবৃত্তি অনুসারে যে প্রকারে ও যে নিয়মে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই প্রকার ও সেই নিয়ম নিশ্চল ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে[১৩]। চিত্ত যে যে প্রকারে প্রস্ফুরিত হয়, চৈতন্যও সেই সেই প্রকারে প্রস্ফুরিত হন। সেইজন্য এই জগতের কোনও কার্য্য অনিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় না[১৪]। সুবর্ণ যেমন কটক ও কুণ্ডলাদিরূপে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় সমুদয় বস্তু পরমাত্মায় অবস্থিতি করিতেছে[১৫]। জগতের কোনও বস্তু সেই বিশ্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। সৃষ্ট্যারম্ভ কালে যাহা যে স্বভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা সেই স্বভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে[১৬]। তিনি কদাচ স্বীয় স্বাভাবিক সত্তা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। সেইজন্য নিয়তির বিনাশ নাই[১৭]। এই ব্যোমরূপী পৃথিব্যাদি সৃষ্টির আদিতে যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, উক্তবিধ নিয়তির দ্বারা সে সকল সেই রূপেই অবস্থিত রহিয়াছে, কিছুমাত্র ব্যতিক্রান্ত হইতেছে না। জীবননিয়তি ও মরণনিয়তি এ উভয়ও উক্তকারণে বিপর্য্যস্ত হয় না। প্রাণী সকল উক্তবিধ স্বভাব দ্বারা জীবন ও মরণ এবং স্থিতি প্রভৃতি অনুভব করে, তাহার অন্যথা হয় না[১৮।১৯]। কিন্তু ইহার পারমার্থিক পক্ষ দেখিতে গেলে দৃষ্ট হইবে যে, জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা স্বপ্নাঙ্গনা সঙ্গমের অনুরূপ মিথ্যা অথচ আত্মচৈতন্যের বিকাশ। বাস্তবপক্ষে অসত্য হইলেও বিশ্ব যে বর্ণিত

প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে ও অনুভূত হইতেছে, ঐ অবস্থান ও অনুভব স্বকীয় স্বভাবেরই সম্পত্তি[২০।২১]। প্রস্ফুরণশীল সম্বিদ্ সৃষ্টির আদিতে যে যে প্রকারে আবির্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সেই প্রকারে অদ্যাপিও অবিপর্য্যস্ত ভাবে অবস্থিত আছে, এবং এই অবিপর্য্যস্ত ভাব শাস্ত্রীয় ভাষায় নিয়তি[২২]। সেই চিদাকাশই সৃষ্টির আদিতে ব্যোমসম্বিদ্ গ্রহণ করায় ব্যোমত্ব প্রাপ্ত, কালসম্বিদ্ স্বীকার করায় কালত্বপ্রাপ্ত ও জলসম্বিদ্ গ্রহণ করায় জলভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরুষ যেমন স্বপ্নে আপনাতেই জল দর্শন করে, সেইরূপ, সেই চিৎশক্তিও আপনাতে আকাশাদিভাব দর্শন করেন। মায়ার এতই কুশলতা ও এতই চমৎকারিতা যে, যাহা নাই তাহাই উহ্য করিয়া লয় ও দেখায়[২৩।২৫]। আকাশত্ব, জলত্ব, পৃথিবীত্ব, অগ্নিত্ব ও বায়ুত্ব, এ সমস্তই অসৎ। অসৎ হইলেও চিৎসঙ্কল্প স্বপ্ন দেখার ন্যায় ও ধ্যানাদির ন্যায় স্বীয় অন্তরে ঐ সকলের অবস্থান অনুভব করে[২৬]। আমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তোমার নিকট জীবগণের মরণানন্তর স্বকর্ম্মানুসারী ফলানুভবের বৃত্তান্ত বা প্রকার বর্ণন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[২৭]।

সৃষ্ট্যারম্ভকালে এইরূপ নিয়তি অর্থাৎ নিয়ম সঞ্জাত হইয়াছিল যে, মানবগণের পরমায়ু কৃতযুগে চারি শত, ত্রেতায় ত্রিশত, দ্বাপরে দুই শত এবং কলিযুগে এক শত বৎসর ভোগ হইবে। (ইহা মনুর অভিমত বৎসর। বৎসর অনেক প্রকার, তন্মধ্যে জ্যোতিষোক্ত বর্ষ গণনা করিলে অধিক হইয়া থাকে)। এই নিয়তির আবার অবান্তর নিয়তি (নিয়ম) আছে। অর্থাৎ উক্ত পরমায়ুর ন্যূনাতিরেক হওয়াও অন্য নিয়তি। ন্যূনাতিরেক হওয়ার কারণ বলি, শ্রবণ কর[২৮]।

কর্ম্ম, দেশ, কাল, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা মনুষ্যগণের পরমায়ুর ন্যূনাতিরেকের কারণ[২৯]। স্ব স্ব আচর্ত্তব্য কর্ম্মের ও ধর্ম্মের হ্রাস হইলে আয়ুর হ্রাস হয়, বৃদ্ধি হইলে আয়ুর বৃদ্ধি হয় ও সমভাবে থাকিলে আয়ুও সমভাবে থাকে। অর্থাৎ যে যুগের যে আয়ু, সেই আয়ুঃ ভোগ হয়[৩০]। অপিচ, বাল্যমৃত্যুপ্রদ কর্ম্মকলাপের (যে কর্ম্ম করিলে বালককালেই মৃত্যু হয়, সেই কর্ম্মের) দ্বারা বালকগণ, যৌবনমৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম দ্বারা যুবকগণ ও বার্দ্ধক্যমৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধগণ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়[৩১]। যে ব্যক্তি শাস্ত্র শাসনের বশবর্ত্তী

হইয়া স্বকর্ম্মে অবস্থিতি করে, সেই শ্রীমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত পরমায়ু লাভ করিতে সমর্থ হয়[৩২]। আয়ুঃ পরিসমাপ্ত হইলে যখন অন্তিম দশা উপস্থিত হয়, তখন তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে মর্ম্মচ্ছেদিনী বেদনা অনুভব করে[৩৩]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, হে চন্দ্রসমাননে! আপনি সংক্ষেপে আমার নিকট মরণ বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। মরণদুঃখ কিরূপ? তৎকালে সুখ কিছু আছে কি নাই? মরণের পর কি হয়? এই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে আমার মনে বড়ই কৌতুক হইতেছে[৩৪]।

দেবী বলিলেন, পুরুষ (মনুষ্য) তিন্ প্রকার। মূর্খ, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিমান্। * এই তিন্ প্রকার মুমূর্ষু নরের মধ্যে ধারণাভ্যাসী ও যুক্তিযুক্ত, দেহ পরিত্যাগ কালে সুখানুভব ব্যতীত দুঃখানুভব করেন না। কিন্তু যাহারা ধারণাভ্যাসী নহে বা যাহারা যুক্তিযুক্ত নহে, সেই সকল বিষয়নিষ্ঠ মূর্খ ব্যক্তিরাই মৃত্যুকালে আত্মবশ্যতা হারা হইয়া দুঃখ ভোগ করে[৩৫।৩৭]। বাসনার বশীভূত অস্বাধীনচিত্ত ব্যক্তিরা মরণ সময়ে ছিন্ন কুসুমের ন্যায় ম্লানি ও পরম দীনতা প্রাপ্ত হয়[৩৮]। যাহাদিগের বুদ্ধি অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে কলুষিত হইয়াছে, যাহারা অসজ্জন সঙ্গে কালযাপন করিয়াছে, তাহারা মৃত্যুকালে অনলদগ্ধের ন্যায় অন্তর্দ্দাহ অনুভব করে[৩৯]। যখন গলায় ঘড়ঘড়ি চাপে ও দৃষ্টি বিকৃত হইয়া যায়, তখন সেই অবিবেকী ও অযতাত্মা (মূঢ়বুদ্ধি) পুরুষেরা বিলক্ষণ দীনচেতা হয়[৪০]। তৎকালে তাহারা দিক্ সকলকে আলোকপরিহীন অন্ধকারময় দর্শন করে, দিবসেও তারকার উদয় দেখে, দিঙ্মণ্ডল মেঘাবৃত দেখে, নভোমণ্ডল শ্যামীভূত (কাল) দেখে, মর্ম্মবেদনায় কাতর হয়, এবং তাহাদের দৃষ্টি তখন উদ্ভ্রান্ত হয়। তাহাতে তাহারা পৃথিবীকে আকাশের ন্যায় ও আকাশকে পৃথিবীর ন্যায় দর্শন করে[৪১।৪২]। দিঙ্মণ্ডল সমুদ্রের আবর্ত্তের

---

* পুরাণে কথিত আছে, প্রাণ বহির্গমন কালে জীব সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করে। প্রাণ ও মন এই উভয়কে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই সকল স্থানে ধারণ করা যাহার অভ্যস্ত হইয়া যায়, তিনি ধারণাভ্যাসী। যিনি ইচ্ছামৃত্যুর ও পরশরীর প্রবেশের কৌশল জানেন এবং যিনি অভিমত লোক গমনের সোপানস্বরূপ নাড়ী পথ জ্ঞাত থাকেন, তিনি যুক্তিযুক্ত বা যুক্তিমান্ নামে খ্যাত। যোগশাস্ত্রের দ্বারা ধারণা শিক্ষার কৌশল ও পরশরীর প্রবেশের নাড়ী জ্ঞাত হওয়া যায়।

ন্যায় ঘূর্ণিত, এবং আপনাকে কখন আকাশে নীয়মান, কখন অন্ধ কূপে নিপতিত, কখন নিদ্রায় অভিভূক্ত, এবং কখন বা প্রান্তর মধ্যে প্রবেশিত বলিয়া অনুভব করে[৪৩]। আপনার ক্লেশ ও অন্তর্দ্দাহ ব্যক্ত করিতে পারে না, বলিতে পারে না, জড়ীভূত (বর্ণোচ্চারণে অসমর্থ) হইয়া ছিন্ন হৃদয়ের ন্যায় হয়[৪৪]। কখন বাত্যাগৃহীত তৃণের ন্যায় আকাশে উৎপতিত, কখন বা আকাশ হইতে নিপতিত, কখন দ্রুতগতি রথে সমারূঢ়, কখন বা আপনাকে তুষারবৎ গলনোন্মুখ বলিয়া অনুভব করে[৪৫]। তখন তাহারা সংসারকে দুঃখসমাকুল মনে করে, কিন্তু অন্যকে বলিতে পারে না। এই সময়ে তাহারা বান্ধবগণের অস্পৃশ্য হইয়া আপনাকে কখন উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত, কখন প্রক্ষিপ্ত, কখন ক্ষেপণযন্ত্রে ভ্রামিত, কখন বাতযন্ত্রে অবস্থিতের ন্যায় অবস্থিত, কখন ভ্রমিযন্ত্রে রজ্জুর দ্বারা ভ্রামিত, কখন জলাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত, কখন শস্ত্রযন্ত্রে সমর্পিত, কখন প্রচণ্ড মারুত দ্বারা উহ্যমান তৃণের ন্যায় ইতস্ততো বাহিত, কখন জলরাশি দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অর্ণবে নিপতিত, কখন বা অনন্ত আকাশে, কখন শ্বভ্রে (গর্ত্তে) ও কখন চক্রাবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত, কখন বা অব্ধির ও উর্ব্বীর বৈপরীত্য অনুভব করে[৪৬।৪৯]। অর্থাৎ পৃথিবীকে সমুদ্র ও সমুদ্রকে পৃথিবী দেখিয়া ভীত হয়। কখন মনে করে, যেন সে অনবরত উর্দ্ধ হইতে নিম্নে নিপতিত হইতেছে এবং তৎপরক্ষণে জ্ঞান হয়, যেন সে অনবরত উর্দ্ধে উৎপতিত হইতেছে। অপিচ, আপনার নিঃশ্বাসের গর্জ্জন শুনিতে পায়, পাইয়া ব্যাকুল ও ইন্দ্রিয়গণে ব্রণবেদনা (ফোড়ার মত ব্যথা) অনুভব করে[৫০]।

দিবাকর অস্তমিত হইলে দিঙ্মণ্ডল যেরূপ শ্যামলবর্ণ হয়, সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির দৃষ্টি সেইরূপ শ্যামলীকৃত হইয়া যায়। যেমন পশ্চিম সন্ধ্যাস্তে অষ্টদিক্ দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি, স্মৃতিবিলোপ হওয়ায় সে কিছুই অবগত হইতে পারে না। এই সময়ে সে মনের কল্পনাসামর্থ্য রহিত ও বিবেকহীন হইয়া মহামোহে অর্থাৎ উৎকটতর মূর্চ্ছায় অভিভূত হয়[৫১।৫৩]। যে পর্য্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্তব্ধীভূত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহারা ঈষন্মূর্চ্ছাবস্থায় অবস্থিতি করে, কিন্তু প্রাণবায়ুর সঞ্চালন রহিত হইলেই প্রগাঢ় মোহে অবিভূত (জ্ঞানশূন্য) হইয়া পড়ে[৫৪]। মোহ, পূর্ব্বসংস্কার ও অন্যথাপ্রতিভাস অর্থাৎ ভ্রান্তি, অত্যন্ত পুষ্ট হওয়ায় জীবগণ

ই সময়ে অল্পকালের নিমিত্ত পাষাণের ন্যায় জড় অর্থাৎ বিচেতন হইয়া পড়ে[৫৫]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, দেবি! এই দেহ অষ্টাঙ্গ (শিরঃ, পাণি, পাদ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, চক্ষু ও কর্ণ) শালী হইয়াও কি নিমিত্ত ব্যথা, মোহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ব্যাধি ও চেতনহীনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়?[৫৬]

দেবী বলিলেন, স্পন্দসংবিৎ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃজনকালে এইরূপ ক্রিয়ার সঙ্কল্প (সৃজন) করিয়াছিলেন যে, মদভিন্ন জীবের অমুক সময়ে, অমুক প্রকার দুঃখ হউক। অর্থাৎ মৃত্যুকালে অমুকপ্রকার, বাল্যকালে অমুকপ্রকার, যৌবনে অমুকপ্রকার, বার্দ্ধক্যে অন্যপ্রকার সুখ দুঃখাদি হইবেক। সত্যসঙ্কল্প ভগবানের ঐ সঙ্কল্প স্বভাব। নিয়তি নামে উক্ত হয়। যেমন স্বকল্পিত তরুগুল্মাদি স্বকীয় দুঃখাদি অনুভবের হেতু হয়, তেমনি, সেই হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পজাত উপাধিতে (দেহে) অনুপ্রবিষ্ট হিরণ্যগর্ভ জীবভাবে বিরাজিত থাকাতেই উপাধি ঘটিত দুঃখাদি তদীয় দুঃখাদির ন্যায় প্রথিত হইয়া থাকে। অতএব, এ বিষয়ে চিতের (চৈতন্যের) বিজৃম্ভণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই[৫৭।৫৮]।

এক্ষণে প্রস্তাবিত কথা শ্রবণ কর। যে সময়ে দুর্নিবার্য্য যন্ত্রণা হয় তখন মৃত্যুযন্ত্রণার প্রতাপে পিত্তাদিরসপ্রপূরিত নাড়ী সকল সঙ্কোচ বিকাশ দ্বারা ভুক্তান্ন পানাদির রস অসমান রূপে গ্রহণ করে। সমান বায়ু তখন আপনার সমীকরণ কার্য্য পরিত্যাগ করেন[৫৯]। যখন বায়ু নাড়ী পথে দেহপ্রবিষ্ট হইয়া আর নির্গত না হয় এবং নির্গত হইয়া আর দেহপ্রবিষ্ট না হয়, অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্থগিত হয়, তখন নাড়ীর কার্য্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বিনাড়ী ও চক্ষুরাদি নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া যায় সুতরাং এই সময়ে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান থাকে না। কেবল পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের অস্ফুট সংস্কার মাত্র অন্তরে বিরাজিত থাকে[৬০]। যখন আর অপান বায়ু দেহে প্রবেশ করে না, প্রাণবায়ুও মুখ নাসিকার দ্বারা নির্গত হয় না, এবং নাড়ীস্পন্দন রহিত হয়, তখন তাহাকে "মরিয়াছে", বলে[৬১]। পৌর্ব্বকালিক চিৎসঙ্কল্পরূপ নিয়তিই উক্তপ্রকার মরণের কারণ। মৃত্যু-নিয়তির সংক্ষেপ বিবরণ এই যে, "আমি জন্মিব ও এত কালের পর মরিব" ইত্যাদি[৬২]। ও "আমি অমুক স্থানে অমুক প্রকারে অমুক হইব"

ইত্যাদি প্রকার চিৎসংকল্প। যাহা আদি সৃষ্টিকালে প্রকটিত হইয়াছিল, সেই সংকল্প মায়াশক্তির অবিনাশী স্বভাব। তাহার নাশও হয় না, বিশ্লেষও হয় না। অর্থাৎ নিয়তির নিয়ম ভঙ্গ হইবার নহে। আদিসর্গসমুদ্ভূত সম্বিদ্‌নামক জ্ঞান স্বভাব হইতে ভিন্ন নহে এবং স্বভাবরূপ সম্বিদ্‌ হইতে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ে ভিন্ন নহে[৬৩।৬৪]। অতএব, যাবৎ না মুক্তি হয়, তাবৎ জন্মের ও মরণের নিবৃত্তি নাই। যেমন প্রবাহশালী নদীজল কখন কলুষিত (মলিন), কখন নির্ম্মল, কখন অস্থির ও কখন সুস্থির, তেমনি, জীবচৈতন্যও (জীবচৈতন্য=জীবাত্মা) কখন সাধনাদির দ্বারা নির্ম্মল ও কখন জীবধর্ম্ম রাগদ্বেষাদির দ্বারা কলুষিত হইতেছে[৬৫]। যেমন লতাদি উদ্ভিদের মধ্যে মধ্যে গ্রন্থি দেখা যায়, তেমনি, চেতনসত্তারও অর্থাৎ জীবচৈতন্যেরও জন্ম ও মৃত্যুরূপ গ্রন্থি (গাঁইট) উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা যাহা বলিলাম সমস্তই অজ্ঞানীর নিয়তি। পরন্তু মুক্ত পুরুষ দিগের দর্শনে ঐ সকল মিথ্যা ও অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাঁহারা জানেন যে, চিদাত্মা কোনও কালে জন্মেন না ও মরেন না। জন্ম মৃত্যু এই দুই কাল্পনিক ভাব তিনি মধ্যে মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় অনুভব করেন মাত্র[৬৬।৬৭]। পুরুষ কি? (পুরুষ এস্থলে আত্মা) চেতনা পদার্থ-ই পুরুষ। তাহার বিনাশ হয় না। কোনও কালে বিনাশ হয় না। চেতনা ছাড়া আর কাহাকে তুমি পুরুষ (আত্মা) সংজ্ঞা দিতে পার? অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ইহারা পুরুষ নহে। কারণ, উহারা জড়। জড়, দৃশ্যপ্রকাশে বা দৃশ্য অনুভবে অসমর্থ[৬৮]। অতএব, সাক্ষীর (যে জানে সে সাক্ষী) অভাবে চেতনের মরণ অসিদ্ধ। বল দেখি, এই অনাদি সংসারে এ পর্য্যন্ত কোন্‌ ব্যক্তি চৈতন্যের মৃত্যু দর্শন করিয়াছে? লক্ষ লক্ষ দেহই মৃত হইতেছে, কিন্তু চৈতন্য অক্ষয়রূপে অবস্থিতি করিতেছে[৬৯]। মরা বাঁচা কি? মরা বাঁচা বাসনার বৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং কোনও জীবের বাস্তব মৃত্যু ও বাস্তব জন্ম হয় না। তাহারা কেবল স্ব স্ব বাসনার অনুরূপ স্বকল্পিত গর্ত্তে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হয় মাত্র[৭০।৭২]। * দৃঢ় বিচার দ্বারা দৃশ্য বস্তুর অত্যন্ত

---

* ভাবার্থ এই যে, শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এ সকলের কোনওটি পুরুষ নহে। কেন না ঐ সকল গুলিই জড়। উহারা বস্তু প্রকাশ করে না ও স্বয়ং জ্ঞাত বা অনুভব করে না। কাযেই মানিতে হয়, চেতনাই পুরুষ (আত্মা)। কেননা, চৈতন্যই সর্ব্ব

অসম্ভব বোধ সমুদিত হইলে বাসনা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বাসনার বিনাশ হইলে তখন আর দৃশ্যসত্যতা দৃশ্যদর্শন থাকে না। জীব গুরূপদেশ শ্রবণাদি ও অভ্যাস বৈরাগ্যাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই মিথ্যা সমুদিত জগৎপ্রবন্ধকে অনুদিত মনে করিয়া দ্বৈতবাসনা-বিহীন হন, অনন্তর ভবভয় হইতে মুক্ত হন[১৩।১৪]।

সাক্ষী। সুতরাং "চেতন মরে" এ সিদ্ধান্ত অসাক্ষীক। অর্থাৎ প্রমাণাভাব। চেতনা শরীর-মরণেরই সাক্ষ্যদাত্রী, চেতনা মরণের সাক্ষ্যদাত্রী নহে। কবে কে কোথায় চেতনা মরিতে দেখিয়াছে? মরণ কি? বিনাশের নাম মরণ? কি দেহান্তর প্রাপ্তির নাম মরণ? বিনাশ পক্ষে চেতনার স্বতঃ বিনাশ ও পরতঃ বিনাশ উভয়ই অসঙ্গত। দেহান্তর প্রাপ্তি পক্ষও চেতনার অমরত্ব ব্যতীত অসম্ভব হইবে। প্রতি দেহে চেতনা বিভিন্ন, এ পক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকায় একচৈতন্য পক্ষে শ্রৌত প্রমাণ থাকায়, চৈতন্যের মরণ পক্ষে, একের মরণে সকলের মরণ না হয় কেন? ইত্যাদি আপত্তি হয়। যেহেতু একের মরণে সর্ব্ব মরণ নিষ্পন্ন হয় না সেইহেতু, পুরুষের মরণ নহে, দেহাদিরই মরণ, পুরুষের কল্পনামাত্র।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, হে দেবেশি! জন্তু যে প্রকারে মরে ও যে প্রকারে জন্মে, এই দুইটী বিষয় আমার বোধবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলুন[১]।

দেবী বলিলেন, বৎসে! শ্রবণ কর। নাড়ীপ্রবাহ (নাড়ীর গতি) রুদ্ধ হইলে জন্তুগণ যখন প্রাণবায়ুর প্রশান্তি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন প্রাণবায়ু আর স্বকীয় চলনস্বভাবে থাকে না, তখন তদনুগত চেতনাও উপশান্তপ্রায় পরিদৃষ্ট হয়। চেতনার অভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণাদি তখন বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই কারণে প্রতীত হয়, যেন চেতনাও বিনষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ যাহা চেতনা তাহা শুদ্ধস্বভাব ও নিত্য। তাহা উৎপন্ন ও বিনষ্ট, উদিত বা দৃশ্য হয় না। তাহা স্থাবর, জঙ্গম, আকাশ, শৈল ও অগ্নি প্রভৃতি সকল পদার্থে অবস্থিতি করিতেছে[২।৩]। শরীরস্থ শারীর বায়ুর অবরোধ হইলেই শরীরের স্পন্দনাদি প্রশান্ত হয়। সেই প্রশান্তির নাম মরণ[৪]। শরীর তখন যে জড় সেই জড় হয় এবং শব নামে অভিহিত হয়। প্রাণবায়ু ঐরূপে মহাবায়ুতে বিলীন হইলে এবং দেহ শবীভূত হইয়া পৃথক্ নিপতিত হইলে, জীবচেতনা তখন পূর্ব্বোপার্জ্জিত বাসনাসংশ্লিষ্ট পরমাত্মায় অবস্থান করে[৫]। জীবচেতনা পৃথক্ পদার্থ না হইলেও জন্মবীজ বাসনা যুক্ত হওয়ায় পৃথকের ন্যায় ব্যবহারগোচর হয়। সেইজন্য তদবচ্ছিন্ন (বাসনাবিশিষ্ট) চেতনাকে জীব বলা যায়। এই জীব স্বস্থানে থাকিয়াই বাসনার দ্বারা পরলোক গমনাগমন অনুভব করে, বাস্তব গমনাগমন করে না। তাহার দৃষ্টান্ত—যেমন সেই শবগৃহের আকাশে তোমার সেই ভর্ত্তৃজীব সেই বাসগৃহে অবস্থিত থাকিয়াও বাসনা অনুসারে পরলোক গমনাদি অনুভব করিতেছে।

অনন্তর সেই তৎশরীরাভিমানত্যাগী জীব ব্যবহারিগণ কর্ত্তৃক প্রেত ও মৃত শব্দে অভিহিত হয়। যে প্রকার বায়ুতে সুগন্ধ থাকে, সেই প্রকার, চেতনে জীববাসনা বিদ্যমান থাকে[৬।৭]। * জীব যে সময়ে

* পুষ্পাদির সহিত বায়ুসংযুক্ত হওয়ায় পুষ্পাদির গন্ধ বায়ুতে মিলিত হয়। চেতনাও

এতদ্দৃশ্যের দর্শন (পূর্ব্বদেহাদির অভিমান) পরিত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্য দর্শনে (অন্য দেহাদি অনুভবে) প্রবৃত্ত হয়, সেই সময়েই সে আপনিই আপনাতে আপনার বাসনানুরূপ কল্পিত পরলোক ও সে লোকের ভোগ্যাদি দেখিতে পায়[৮]। অপিচ, সেই জীব আবার সেই লোকান্তরে তজ্জন্মের সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার মৃতিমূর্চ্ছা অনুভব করতঃ অন্য শরীর অনুভব করিয়া থাকে[৯]। এই অসীম আকাশ, অথবা এই আকাশ ও পৃথিবী, কিংবা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সমস্তই যাহার প্রভাবে আত্মায় সংঘটিত অর্থাৎ চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে বটে; পরন্তু আকাশ ও পৃথিবী অথবা সমুদায় বিশ্ব মৃত পুরুষের আত্মায় আকাশে মেঘঘটার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্য লোক তাহা দেখিতে পায় না। অন্য লোক কেবল গৃহাকাশই দেখে[১০]।

লীলে! প্রেত ছয় প্রকার। আমি সেই ষড়্‌বিধ প্রেতের ভেদ বর্ণন করি, শ্রবণ কর। সামান্য পাপী, মধ্যপাপী, স্থূলপাপী, সামান্যধার্ম্মিক, মধ্যধার্ম্মিক ও উত্তমধর্ম্মবান্। এই ষড়বিধ প্রেতের মধ্যে কোন কোন প্রেত আরও দুই তিন বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে[১১।১২]। পাপাত্মাদের মধ্যে কোন কোন মহাপাতকী এক বৎসর পর্য্যন্ত মরণমূর্চ্ছায় পাষাণের ন্যায় জড়ীভূত হইয়া থাকে। অনন্তর যথাকালে জাগরিত হয়, হইয়া বাসনার জঠরে অবস্থান করতঃ অসংখ্য নরকদুঃখ অনুভব ও শত শত যোনিতে জন্মগ্রহণ ও নানাপ্রকার দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব ও সহ্য করিতে থাকে। পরে কাল কালান্তরে ভোগাবসানে কদাচিৎ কাহার সংসাররূপ স্বপ্ন বা বিভ্রম শমতা প্রাপ্ত হয়[১৩।১৫]। কোন কোন পাতকী মরণমূর্চ্ছার পরক্ষণেই হৃদয়ে জড়দুঃখসমাবিষ্ট বৃক্ষাদিভাব অনুভব করে। অনন্তর বাসনানুরূপ দুঃখপরম্পরা অনুভব করতঃ নরক ভোগান্তে দীর্ঘকালের পর পুনর্ব্বার ভূতলে জন্মগ্রহণ করে[১৬।১৭]।

ষড়্‌বিধ প্রেতের মধ্যে যাহারা মধ্যপাপী, তাহারা মরণমোহের পর কিঞ্চিৎকাল শিলাজঠরের ন্যায় জাড্য (মূর্চ্ছা) অনুভব করতঃ পরে পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করে। করিয়া তির্য্যগাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ সংসার ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে[১৮।১৯]। যাহারা সামান্য পাতকী, তাহারা মৃত হইয়াই স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের ন্যায় মনুষ্যদেহ অনুভব

অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে অধ্যস্তরূপে মিলিত থাকায় অন্তঃকরণস্থ বাসনাবিশিষ্টের ন্যায় হন।

করতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জন্ম, মরণ ও ভোগ্যাদি স্মরণ করিতে থাকে[২০।২১]। যাহারা মহাপুণ্যশীল, তাহারা মৃতিমোহের পর স্মৃতির দ্বারা স্বর্গস্থিত বিদ্যাধরীগণের অন্তঃপুর অনুভব করিতে থাকে[২২]। অনন্তর সেই সেই স্বর্গ শরীর লাভ করতঃ কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করতঃ পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে সজ্জনাস্পদে শ্রীসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে[২৩]। যাঁহারা মধ্যমধার্ম্মিক, তাঁহারা মরণানন্তর ওষধিপ্রধান স্থানে অর্থাৎ সুন্দর নন্দন কাননাদিতে কিন্নরাদি জন্ম লাভ করেন এবং তত্রস্থ ফলভোগ অবসানে তথা হইতে প্রচ্যুত হইয়া খাদ্যের সংশ্লেষে রেতঃশালী ব্রাহ্মণাদি নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক কিছুকাল অবস্থান করতঃ যথাকালে তাহাদিগের স্ত্রীগণের ক্রমোপচিত গর্ভে জন্মগ্রহণ করে[২৪।২৫]। মৃতব্যক্তিগণ সকলেই উক্তপ্রকারে স্ব স্ব জ্ঞানকর্ম্ম সংস্কারের অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, ইহা অবগত হও। ষড়্‌বিধ প্রেতের মধ্যে চতুর্থ প্রেতের গতিও ঐ ব্যবস্থার অনুরূপ। অর্থাৎ সকলেই মরণ মূর্চ্ছার অব্যবহিত পরে চেতনা লাভের পর অন্তঃকরণ মধ্যে ক্রমে ও অক্রমে ভবিষ্যৎ দেহ ও ভোগ্যাদি স্বপ্নের ও সঙ্কল্পের ন্যায় অনুভব করিতে থাকে, পরে তদনুরূপ স্থান ও দেহাদি লাভ করিয়া পরিপুষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হয়[২৬]। তাহারা মরণের পর, পর পর যে প্রকার অনুভব করে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহারা মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর প্রথমে মনে করে, আমরা মরিয়াছি। পরে দাহ কার্য্যের পর পুত্রাদি কর্ত্তৃক পিণ্ড প্রদানাদি কার্য্য সমাপিত হইলে অনুভব করে, আমার শরীর হইয়াছে। তৎপরে যমালয় গমন অনুভব করিতে থাকে। যেন কালপাশ সমন্বিত যমদূতেরা তাহাকে যমরাজ সকাশে লইয়া যাইতেছে। ক্রমে তাহারা পাথেয় শ্রাদ্ধের (পথে সম্বল স্বরূপ মাসিক শ্রাদ্ধের) দ্বারা তর্পিত হইয়া এক বৎসরে যমালয় প্রাপ্ত হয়[২৭।২৮]। উত্তম পুণ্যবান্ প্রেতগণ স্বীয় উত্তম কর্ম্মের প্রভাবে পথিমধ্যে সুন্দর উদ্যান সকল ও সুশোভন বিমানরাজি অনুভব করে এবং মহাপাতকিগণ স্বীয় দুষ্কৃত কর্ম্মের প্রভাবে হিম, তপ্তবালুকা, কণ্টক, শ্বভ্র (গর্ত্তাদি) ও শস্ত্রসঙ্কুল অরণ্যাদি দর্শন করে এবং মধ্যমপুণ্যশীলেরা "এই আমার সুশীতল নব নব তৃণসুমাচ্ছাদিত পদগমন যোগ্য ও সুখপ্রদ পন্থা ও স্নিগ্ধচ্ছায়াসম্পন্ন বাপিকা সম্মুখে সংস্থাপিত রহিয়াছে; আমি এই যমপুরে আগমন করিয়াছি; এই আমার সম্মুখবর্ত্তী লোকপ্রসিদ্ধ যম, এই সভায় চিত্রগুপ্তাদির দ্বারা

আমার প্রাক্তন কর্ম্মের বিচার হইতেছে।" ইত্যাদি প্রকার অনুভব করে[২৯।৩২]। মরণের পর যে পারলৌকিক অনুভব হয়, তাহা সকলের সমান নহে। প্রতি পুরুষে বিভিন্ন। কর্ম্মানুসারে যাহার যেরূপ প্রতীতি উৎপন্ন হয় সে তদনুরূপ সংসারগতি অনুভব করে ও পরে জন্মাদি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু সকলেই এই অশেষপদার্থাচারসম্পন্ন বিশাল সংসার খণ্ডকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। তাহাদের যদি স্বরূপ দৃষ্টি (আত্মজ্ঞান) থাকিত, তাহা হইলে ভাহারা বুঝিতে পারিত—এক মাত্র আকাশসদৃশ অমূর্ত্ত অদ্বয় আত্মাই প্রবুদ্ধ রহিয়াছেন এবং দেশ, কাল, ক্রিয়া ও হ্রস্বদীর্ঘাদি আকার বিশিষ্ট দৃশ্য সমূহ অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চ সত্য নহে[৩৩।৩৪]।

অনন্তর তাহারা "আমি যমরাজ কর্তৃক স্বকর্ম্মফলভোগার্থ আদিষ্ট হইয়াছি" "আমি এখন এই যমসভা হইতে স্বর্গে অথবা নরকে চলিলাম।" "আমি যমরাজনির্দ্দিষ্ট সুখজনক স্বর্গ বা দুঃখজনক নরক ভোগ করিতেছি।" "আমি যমরাজের আজ্ঞায় স্বর্গ অথবা নরক ভোগের উপযুক্ত যোনিজন্ম প্রাপ্ত হইলাম।" "পুনর্ব্বার আমি মানবীয় সংসারে প্রাদুর্ভূত হইতেছি।" এই পর্য্যন্ত অনুভবের পর মেঘনির্ম্মুক্ত জলাদির সহিত পৃথিবীতে আইসে ও শস্যাদিমধ্যে প্রবেশ করে। তখন, "আমি ব্রীহ্যাদিগত হইয়াছি" "অঙ্কুরস্থ হইলাম।" "ক্রমে ফলমধ্যগত হইলাম।" "এখন আমি ফলে অবস্থিতি করিতেছি।" এ সকল ঘটনা স্মরণ করিতে পারে না। কারণ, বোধ শক্তি তখন লুপ্তকল্প হইয়া যায়। তৎকালে ঐ সকল ঘটনার বিস্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও উত্তরকালীন মনুষ্য শরীরে শ্রুতি পুরাণাদি শ্রবণ জন্য বোধ প্রাপ্ত হইলে তখন ঐ সকল ক্রম স্মরণ করিতে পারে। যখন ব্রীহ্যাদিতে অবস্থিতি করে তখন ঐ সকল বোধ লুপ্ত থাকে। কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়গণ লুপ্ত বা মূর্চ্ছিত থাকায় সে (জীব) তখন আপনার শস্যাদিভাব প্রাপ্তি বুঝিতে পারে না। তৎপরে ভুক্তান্নপানের দ্বারা পিতৃশরীরে প্রবেশ করে, ক্রমে তৎশরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। সেই রেতঃ যোনি পথে মাতৃশরীরে গিয়া গর্ভভাব ধারণ করে[৩৫।৩৮]। অনন্তর সেই গর্ভ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে সুখসৌভাগ্যাদিসম্পন্ন সাধুচরিত্র অথবা তদ্বিপরীত বালকরূপে প্রসূত হয়[৩৯]। তদনন্তর তাহার চন্দ্রপ্রভার ন্যায় উপচয় অপচয় হইতে থাকে ও শীঘ্র শীঘ্রই ক্ষয়শীল ও চঞ্চল যৌবন কাল সমাগত হয়। অনন্তর পদ্মমুখে

হিম নিপাতের ন্যায় সেই দেহ আবার জরাকর্তৃক আক্রান্ত হয়। তৎপরে বিবিধ ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আবার মরণমূর্চ্ছা অনুভব করতঃ আবার বন্ধুদত্ত ঔর্দ্ধদেহিক পিণ্ডাদির দ্বারা ভোগ দেহ ধারণ করতঃ পুনর্ব্বার যমলোকে গমন করে। মরণের পর পিণ্ডদানাদির দ্বারা যে দেহ হয়, সে দেহ অস্থিচর্ম্মাদি নির্ম্মিত স্থূল দেহ নহে; তাহা বাসনাময় বা ভাবময় আতিবাহিক অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ।

জীব ঐ প্রকারে নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া ভূয়োভূয় ঐরূপ অসংখ্য ভ্রমপরম্পরা অনুভব করিয়া থাকে। ব্যোমরূপী জীব যাবৎ মুক্ত না হয় তাবৎ চিদ্ব্যোমে সে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ঐরূপ পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে থাকে[৪০।৪৩]।

প্রবুদ্ধ লীলা বলিলেন, হে দেবি! সৃষ্টির আদিতে যে প্রকারে আদি (প্রথম) ভ্রম প্রবর্ত্তিত হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা আমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত কীর্ত্তন করুন[৪৪]। দেবী বলিলেন, শৈল, দ্রুম, পৃথিবী, আকাশ, এ সমস্তই পরমার্থঘন অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্য। বিশুদ্ধ চৈতন্যেই এই সকল মায়িক প্রতিভাস মায়ার প্রভাবে উদিত হয়। চেতনাপ্রচুর ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি যখন যে স্থানে যে আকারে উদিত হন তখন সেই আকারেই প্রথিত হন। তিনি স্বপ্ন অথবা সঙ্কল্পবান্ পুরুষের ন্যায় জীবসমষ্টিরূপ প্রজাপতি হইয়া সৃজ্যসঙ্কল্পবান্ হন, হইয়া সপ্তলোকাকারে বিবর্ত্তিত হন। * তাঁহার সৃষ্টিকালের সেই সংকল্প অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঈশ্বরের (মায়াসমন্বিত ব্রহ্মের) প্রথম সাঙ্কল্পিক রূপ প্রজাপতি। ইনি ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্বস্বরূপ। তাদৃশ প্রজাপতি হইতে যাহা কিছু বিবর্ত্তিত হইয়াছে সে সমস্তই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে[৪৫।৪৮]। স্থাবর জঙ্গম আর কিছুই নহে; যাহারা দেহস্থিত বাতযন্ত্রগত অনিল কর্তৃক পরিস্পন্দিত হয়, তাহাদিগকে জঙ্গম বলা যায় এবং যাহারা নিষ্পন্দ, তাহা দিগকে স্থাবর নাম দেওয়া যায়। বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরেরা চেতনাবান্ হইলেও স্পন্দরহিত বলিয়া প্রথমাবধিই স্থাবর ও অচেতন নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে[৪৯।৫০]। সেই পরাৎপর পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্টির আদিতে কথিত প্রকারের চেতনাচেতন বিভাগ নির্দিষ্ট

---

* বিবর্ত্তন=যাহা ভ্রান্তি জ্ঞানে দেখা যায়। রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, তাহা বিবর্ত্তন। যেমন রজ্জু সর্পাকারে বিবর্ত্তিত হয়, তেমনি, প্রজাপতি ও সৃষ্টির আকারে বিবর্ত্তিত হন।

হইয়াছিল। যে চিদাকাশ ঐরূপ জীব ও অজীব এই দুই বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন এবং তিনি আপনার যে অংশে জীবনামক বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সেই চিদাকাশই এতৎশাস্ত্রের সম্বিদ্। সম্বিদ্ কোনও কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।[৫১] সেই বুদ্ধ্যনুপ্রবিষ্ট চিদাকাশ ঔপাধিক নরশরীররূপ পুর প্রাপ্তির অনন্তর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরাদিজনিত বৃত্তির দ্বারা বাহ্যজ্ঞান প্রকাশিত করিতেছেন। সেইজন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বয়ং চেতন নহে[৫২]। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ববস্তু ব্যবস্থাপক চিৎসঙ্কল্পই এই বিশ্বশৃঙ্খলার কারণ। শূন্যাকার চিৎসঙ্কল্পই আকাশ, ভূম্যাকার চিৎসঙ্কল্পই ভূমি, এবং জলশক্তিসম্পন্ন চিৎকল্পই জল। তিনিই জঙ্গমসঙ্কল্প দ্বারা জঙ্গম ও স্থাবর সঙ্কল্প দ্বারা স্থাবর। চিৎশক্তি এবম্প্রকারে বৃক্ষ ও শিলা প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। চিৎশক্তি যখন যেরূপ সঙ্কল্প করেন, তখন সেইরূপেই অবস্থিতি করেন[৫৩।৫৪]। অতএব, পৃথক্ জড় অথবা পৃথক্ চেতন নাই এবং আদিসৃষ্টি হইতেই জড়ের সহিত চেতনের সত্তাসামান্যের (অস্তিভাব) অভেদ রহিয়াছে[৫৫।৫৭]। এই বৃক্ষ, এই শৈল, এ সকল অন্তঃসম্বিদ্ বুদ্ধ্যাদির দ্বারাই বিহিত অর্থাৎ পরিকল্পিত এবং উহাদের নাম ও রূপাদি, সমস্তই তৎকৃত অর্থাৎ তাহারই কল্পনা প্রসূত। সম্বিদন্তর্গত তথাবিধ স্থাবরাদির বৃক্ষ, শৈল, ইত্যাদি নাম, সঙ্কেত ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৮।৫৯]। স্ব স্ব অন্তঃসম্বিদ্-ই বুদ্ধি এবং তাদৃশী বুদ্ধিই বিকার ভেদে কীট, পতঙ্গ, ইত্যাদি নামোল্লেখিনী হইয়া বিরাজ করিতেছে[৬০]। বস্তুতঃ ঐ সমুদয় পদার্থান্তর নহে। যেমন কেহ না জানাইয়া দিলে উত্তরসমুদ্রতীরবাসীরা দক্ষিণসমুদ্রতীরবাসী দিগের স্থিতি জানিতে পারে না, তেমনি, এই সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম সম্বিৎ ব্যতীত সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। সকলেই আপন আপন চৈতন্যসাক্ষিক জ্ঞান লইয়াই অবস্থিত সুতরাং অন্যবুদ্ধির কল্পনা অবগত নহে। এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সমুদায় ব্যবহারই পরস্পর পরস্পারের বুদ্ধিসঙ্কেত সাপেক্ষ[৬১।৬২]। আরও বুঝিতে হইবে যে, সচ্চিদ্রূপ পরব্রহ্মে বায়ু প্রভৃতি জড়পদার্থের বাস্তব সত্তা না থাকিলেও ঐ সকল কাল্পনিক সত্তায় অনুস্যূত এবং তাহা প্রোক্ত কারণে অসম্ভব নহে। যেমন প্রস্তরমধ্যবর্ত্তী ভেক * ও তদ্বহিস্থ ভেক পরস্পর পরস্পারের কল্পনায় অন্তঃসম্বেদনশূন্য ও

* পাথরের মধ্যে ও বৃক্ষের গুঁড়ির মধ্যে ভেক থাকিতে দেখা যায়। সে সকল ভেক

জড়, স্থিতিশীল সমুদায় পদার্থ সম্বন্ধে সেইরূপ জানিবে৬৩। মহাপ্রলয়ে মায়ার অন্তরে বিলীন সর্ব্বাত্মক সর্ব্বগত সমষ্টি চিত্ত, যাহা এই জগতের সূক্ষ্মাবস্থা, পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহা প্রত্যক্‌চৈতন্যনামক চিদাকাশ দ্বারা যেরূপে ও যে যে ভাবে চেতিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি সেইরূপে ও সেই ভাবে চেতিত (অনুভূত) হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টারম্ভে যাহা স্পন্দনাত্মা বায়ুরূপে চেতিত বা বিস্তৃত হইয়াছিল, এখনও তাহা বায়ুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা সুষির ভাবে (সুষির=ফাঁক) চেতিত (বিস্তৃত) হইয়াছিল, তাহা এখনও আকাশ নামে ব্যবহৃত হইতেছে। এই আকাশে স্পন্দাত্মা মারুত অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছে। যেমন সর্ব্বব্যাপী সদাগতি (চলনশীল বায়ু) সর্ব্বত্র থাকিলেও তদ্দ্বারা শুষ্ক তৃণাদি লঘু পদার্থ ব্যতীত অলঘু পদার্থ সকল স্পন্দিত হয় না, অর্থাৎ প্রস্তররাশি স্পন্দিত হয় না, তেমনি, চিত্তও সর্ব্বগামী বা সর্ব্বত্রাবস্থিত থাকিলেও শারীর বায়ুর প্রচলন ও অপ্রচলন হেতু স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছে। * বায়ুর স্পন্দন স্থাবরে নাই৬৪।৬৬। † এইরূপে সেই সম্বিৎ চৈতন্যে ভ্রমময় বিশ্বের যে যে পদার্থ কিরণের ন্যায় আদিসৃষ্টি কালে যে যে রূপে স্ফুরিত হইয়াছিল, সেই সেই প্রস্ফুরণ অদ্যাপি চলিতেছে৬৭। লীলে! দৃশ্য বিশ্ব স্বভাবের বিলাস ও মিথ্যা হইলেও যে প্রকারে সত্যের ন্যায় অনুভূত হয় তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এখন দেখ, রাজা বিদূরথ মরণোন্মুখ হইয়াছেন। ঐ দেখ, তিনি মৃত হইয়া সেই পুষ্পমালাসমাচ্ছাদিত শবীভূত তোমার সেই ভর্ত্তা পদ্মনৃপতির হৃদ্‌পদ্মে যাইবার উপক্রম করিতেছেন৬৮।৬৯।

কূপস্থিত ভেক দিগকে জানে না এবং কূপের ভেকেরাও প্রস্তরমধ্যবাসী ভেক দিগকে জানে না। সুতরাং তাহারা ঐ বিষয়ে সম্বেদনশূন্য অর্থাৎ জড়। এ উদাহরণের তাৎপর্য্য—বুদ্ধি যাহা কল্পনা করে তাহাই তাহার নিকট আছে এবং যাহা কল্পনা করে না, তাহা তাহার বোধে নাই বলিয়া স্থির থাকে। এ অনুসারে সমুদায় দৃশ্যই বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধির কল্পনা সুতরাং অসৎ।

* বৃক্ষাদি স্থাবর জীবে জীবত্ব আছে অর্থাৎ চৈতন্য আছে। কেবল প্রাণ নাই। অর্থাৎ স্থাবর দেহে প্রাণ ও অন্তঃকরণ প্রভৃতির কার্য্য করিবার যন্ত্র নাই। সেইজন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, প্রস্তরাদিতেও চৈতন্য আছে, পরন্তু সে চৈতন্য উপযুক্ত আধারের অভাবে অব্যক্ত।

† বায়ু শব্দের অর্থ অধ্যাত্মবায়ু অর্থাৎ শরীরস্থ প্রাণবায়ু। স্থাবরে প্রাণযন্ত্রের অভাব বশতঃ বায়ুর স্পন্দন সামর্থ্য অবরুদ্ধ আছে।

প্রবুদ্ধ লীলা কহিলেন, দেবেশ্বরি! আসুন, ইনি কোন্ পথ দিয়া শবগৃহে গমন করেন, তাহা আমরা উভয়ে শীঘ্র গিয়া দর্শন করি[১০]। দেবী বলিলেন, ঐ চিন্ময় জীব অন্তরস্থ বাসনাময় দেহ ও পথ অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন। ভাবিতেছেন, "আমি দূরস্থ অপর লোকে গমন করিতেছি।" আইস, আমরাও ঐ পথ দিয়া গমন করি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ইচ্ছাবিচ্ছেদ হইলে পরস্পরের সৌহার্দ্দ বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে[১১।১২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। সরস্বতীর ঐরূপ বাক্যপরম্পরার দ্বারা লীলার নির্ম্মল অন্তঃস্থ সকল সন্তাপ তিরোহিত ও বিরোধরূপ সূর্য্য (বিরোধ অর্থাৎ আশঙ্কা) অস্তমিত হইল। ঐ অবসরে নৃপতি বিদূরথ বিগলিতচিত্ত, মূর্চ্ছিত ও বিচেতন হইয়া পড়িলেন[১৩]।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।
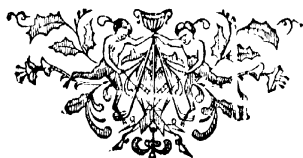
ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর রাজা বিদূরথ ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন এবং তাঁহার চক্ষুঃ স্পন্দরহিত হইল। অধর রাগহীন, শরীর শুষ্ক, জীর্ণ ও শুষ্ক পত্রের ন্যায় আভাবিশিষ্ট ও মুখ পাণ্ডুরবর্ণ হইল। কেবল প্রাণমাত্র অবশিষ্ট আছে, আর কিছু নাই। প্রাণবায়ু এখনও ভৃঙ্গ-কূজনের ন্যায় ধ্বনি সহকারে প্রবাহিত হইতেছে[১।২]। (ভৃঙ্গকূজন= ভ্রমরের শব্দ) কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মরণমূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া আপনাকে অন্ধকূপে নিমগ্নের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, রাজার সমুদায় ইন্দ্রিয় বৃত্তিবিরহিত ও অন্তর্ব্বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি অচেতন ও চিত্রন্যস্ত আকৃতির ন্যায় অথবা প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ও নিষ্পন্দ[৩।৪]। অধিক কি বলিব, প্রাণবায়ু এখন অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে সেই রাজশরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়াছে। পক্ষী যেমন নিজ বাসবৃক্ষে যাইবার ইচ্ছায় আকাশে উৎপতিত হয়, উড্ডয়ন করে, রাজার প্রাণবায়ুস্খলিত জীব সেইরূপে নভোগত হইল[৫]। সেই দুই ললনা সেই নভোগত প্রাণময়ী জীবসম্বিদ্‌কে স্ব স্ব দিব্য দৃষ্টির দ্বারা অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, যেমন বায়ুতে সূক্ষ্ম পরিমল (সুগন্ধ) অবস্থিতি করে, সেইরূপে সেই জীব সংবিৎ নিতান্ত সূক্ষ্ম ও আকাশে অবস্থিত হইয়াছে[৬]। অনন্তর সেই জীবসম্বিদ্ আকাশে বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বাসনাময় রূপ দূরতর আকাশপথে গমন করিতে আরম্ভ করিল[৭]। যেমন ভ্রমরীযুগল বাতসংলগ্ন গন্ধলেশের অনুসরণ করে, তাহার ন্যায় সেই রমণীদ্বয় সেই জীবসম্বিদের অনুসারিণী হইলেন[৮]। অনন্তর বায়ুবাহিত গন্ধলেখার ন্যায় বায়ুবাহিত সেই জীবসম্বিদ্ মুহূর্ত্তমধ্যে মরণমূর্চ্ছা অবসান হওয়ায় স্বপ্নের তুল্য বোধ (জ্ঞান) প্রাপ্ত হইলেন। (যেমন স্বপ্ন দেখা যায়, ঠিক সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন)। তিনি দেখিলেন, কতকগুলি যমদূত কর্ত্তৃক তিনি নীত হইতেছেন, এবং বন্ধুদত্ত পিণ্ডাদির দ্বারা যেন তাঁহার শরীর উৎপন্ন হইয়াছে[৯।১০]। অনন্তর সেই জীবসম্বিদ্ দক্ষিণ মার্গের

অতিদূরে অবস্থিত প্রাণিগণের কৃত কর্ম্মের বিচার স্থান ও বিচার্য্য জীবে পরিপূর্ণ যমপুরী প্রাপ্ত হইলেন[১১]। বৈবস্বত পুরী প্রাপ্ত হইলে যমরাজ দূত দিগকে আদেশ প্রদান করিলেন, ইহার কর্ম্ম অনুসন্ধান কর। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, এবং বলিল, ইহার কিছুমাত্র পাপ নাই। কেননা, ইনি প্রতিদিন লোভাদি দোষ রহিত হইয়া অকলুষিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন এবং ভগবতী সরস্বতীর বরে সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন[১২।১৩]। ইহার শবীভূত প্রাক্তন দেহ তদ্গৃহাকাশে কুসুমসমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। অনন্তর যমরাজ আজ্ঞা প্রদান করিলেন, আমার এই দূতেরা এই বিদূরথ জীবকে পরিত্যাগ করুক[১৪]। (এ দিকে লীলা ও সরস্বতী যমরাজের অলক্ষ্যে অথবা যমভবনের বাহিরে থাকিয়া বিদূরথ জীবের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন)।

অনন্তর যেমন ক্ষেপণী যন্ত্র হইতে উপলখণ্ড পরিত্যক্ত হয়, তেমনি, যমদূতগণ কর্ত্তৃক সেই জীবকলা (অর্থাৎ নিতান্ত সূক্ষ্ম জীব) নভোমার্গে পরিত্যক্ত হইল। অনন্তর সেই বিদূরথ জীব নভঃপথে গমন করিতে লাগিল, সরস্বতী ও প্রবুদ্ধ লীলা তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রূপসম্পন্না দুইটী রমণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, বিদূরথ জীব তাহা দেখিতে পাইল না। উক্ত রমণীদ্বয় বিদূরথ জীবের অনুসরণ করতঃ নভস্থল উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লোকান্তর অতিক্রম করিয়া সে জগৎ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে অন্য এক জগৎ প্রাপ্ত হইলেন। বিদূরথজীব এই জগতে আসিয়া ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন[১৫।১৭]। তখন সেই সঙ্কল্পরূপিণী দুইটী রমণী সেই বিদূরথজীবের সহিত পদ্মরাজ পুর প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যস্থ লীলার অন্তঃপুর মণ্ডপে বাতলেখার অম্বুজ প্রবেশের ন্যায়, রবিকরের অম্ভোজ প্রবেশের ন্যায়, ও সুরভির পবন প্রবেশের ন্যায় প্রবেশ করিলেন[১৮।১৯]।

এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, বিদূরথপত্নী লীলাকে তদীয় কুমারী (কন্যা) পথ দেখাইয়া আনিয়া ছিলেন, কিন্তু বিদূরথজীবের পথ পরিজ্ঞানের কথা বলেন নাই। সেইজন্য জানিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, বিদূরথ-জীব কি প্রকারে সেই পদ্মভূপতির শবগৃহের নিকটবর্ত্তী হইল? কি প্রকারে সে পথ চিনিয়া আসিল? এবং কি প্রকারেই বা সেই মৃতশরীর সজীব

হইল?[২০] বশিষ্টদেব বলিলেন রাঘব! সেই জীবের অন্তঃস্থ বাসনায় পঞ্চ-শরীরের অভিমান বিদ্যমান ছিল এবং তাহাতেই তাহার বুদ্ধিতে পথ প্রভৃতি সমস্তই প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। তাই সে পরিচিত প্রদেশে গমনের ন্যায় সেই শবগৃহে যাইতে সমর্থ হইয়াছিল[২১]। কে না দেখিয়াছে যে, সজীব বটবীজ সকল অঙ্কুরের কারণ (মৃত্তিকাদি) প্রাপ্ত হইলে আপনাকে অঙ্কুরিত বটবৃক্ষভাবে অবলোকন করে? অথবা অনুভব করে। যেমন বটবীজ আপনার অন্তঃস্থ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত বটবৃক্ষকে যথাকালে ও কারণসংযোগে পরিপুষ্ট দর্শন করে, তেমনি, জীবের উপাধি সূক্ষ্মতম অন্তঃকরণে বাসনাময় অসংখ্য ভ্রান্তিনির্ম্মিত সূক্ষ্ম জগৎ অবস্থিত থাকে, তন্মধ্যে উদ্বোধক দ্বারা যাহা যখন পরিপুষ্ট হয় তাহাই তখন সে বিদিত হয় বা অনুভব করে[২২]। যেমন সজীব বীজ স্বীয় অন্তরে অঙ্কুর অনুভব করে, তেমনি, চিৎকণা জীবও স্বীয় হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) সংস্কারীভূত ত্রৈলোক্য অনুভব করে[২৩]। যেমন কোন এক প্রদেশস্থিত নর আপনার দূরদেশস্থ বাসস্থান মনোমধ্যে দর্শন করে, সেইরূপ, জীবও শত শত জন্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেও স্বকীয় বাসনায় অবস্থিত ইষ্টানিষ্ট সকল সত্যবৎ অবলোকন করিয়া থাকে[২৪।২৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যে সমস্ত জীব পিণ্ড প্রাপ্ত না হয়, তাহারা কিরূপে শরীর প্রাপ্ত হয় তাহা বলুন[২৬]। বশিষ্ঠ বলিলেন, বন্ধু ব্যক্তিরা (পুত্রাদি) পিণ্ড প্রদান করুক বা না করুক, প্রেতের বুদ্ধিতে যদি "আমি পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি" এতদ্রূপ বাসনা উদিত হয়, তাহা হইলে সেই বাসনাই তাহার শরীর সম্পাদন করে। পিণ্ডপ্রদানের শাস্ত্র, "বন্ধুজনের পিণ্ডপ্রদান কর্ত্তব্য" এতাবন্মাত্রের বোধক। * ফলকল্পে ঐ কার্য্যের দ্বারা পুত্রাদি, পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হয়, এবং প্রেতবাসনারও অল্প কিছু উপকার ঘটনা হয়[২৭]। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অনুভব এই যে, চিত্ত যেরূপ, জীবও তদাকৃতি অর্থাৎ তন্ময়। কি জীবিত ও কি মৃত, কোনও সময়ে ঐ নিয়মের অন্যথা হয় না[২৮]। পিণ্ডবিহীন ব্যক্তিরাও "আমি সপিণ্ড হইয়াছি" এই প্রকার সম্বিদ্ দ্বারা সপিণ্ড অর্থাৎ ভোগদেহসম্পন্ন হইয়া থাকে। আবার "আমি নিষ্পিণ্ড"

* এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় এই যে, বন্ধুগণ যথাসময়ে যথাশাস্ত্র পিণ্ডপ্রদান করিলে মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান বাসনা উদিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

এইরূপ সম্বিদ্ দ্বারা সপিণ্ড ব্যক্তিও নিষ্পিণ্ড হইয়া থাকে[২৯]। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, পদার্থের সত্যতা ভাবনার অনুগামী এবং ভাবনা সেই সেই কারণীভূত পদার্থের কারণ হইতে সমুদিত হয়[৩০]। যেমন ভাবনার দ্বারা বিষ অমৃত হয়, অসত্যও সত্যরূপে অনুভূত হয়, তেমনি, পদার্থও ভাবনার দ্বারা তত্তৎভাবে সমুৎপাদিত হয়[৩১]। * আবার ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে, কারণের উদ্রেক ব্যতীত কোনও প্রকার ভাবনা সমুদিত হয় না[৩২]। নিত্যোদিত একাদ্বয় ব্রহ্ম (চৈতন্য) ব্যতীত আর আর কার্য্য পদার্থ সকল সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বিনা কারণে সমুদিত হইতে দেখা যায় নাই[৩৩]। পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সেই বিশুদ্ধ চিৎ পদার্থ-ই বাসনার ও স্বপ্নের ন্যায় কার্য্য ও কারণভাব প্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্তির দ্বারাই জগদাকারে প্রতিপ্রকাশিত হইতেছে[৩৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! যদি বন্ধুবর্গ ভূরি ভূরি ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মবিহীন প্রেতকে অর্পণ করে; তাহা হইলে তাহার সেই সকল ধর্ম্ম নিষ্ফল হইবে? কি সফল হইবে? যে প্রেত জানে "আমার ধর্ম্ম নাই" তদ্বাসনাসমন্বিত সেই প্রেতের উদ্দেশে তদ্বন্ধুরা যদি "আমি ধর্ম্ম সমর্পণ করিলাম" ইত্যাকার দৃঢ় সত্য বাসনান্বিত হয়, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মপ্রদাতা প্রেতবন্ধুর সেই বাসনা ফলবতী হইবে? কি নিষ্ফল হইবে? বলবতী হইবে? কি দুর্ব্বলা হইবে?[৩৫।৩৬] বশিষ্ঠ বলিলেন, শাস্ত্রোক্ত দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যাদি অর্থাৎ তদুপলক্ষিত অনুষ্ঠানাদির দ্বারা তদ্বন্ধুগণের যে বাসনা সমুদিত হয়, সে বাসনা প্রেতবাসনা অপেক্ষা প্রবল। কেননা, শাস্ত্রানুসারী ফলজনক কার্য্য ও লৌকিক কার্য্য উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রানুসারী ফলজনক কার্য্যই সমধিক বলবান্ হইতে দেখা যায়। অতএব যে বিষয়ের উদ্দেশে যে বাসনা সমুদিত হয়, সেই বিষয়ে সেই বাসনার জয় হইয়া থাকে[৩৭]। ধর্ম্মদাতার ধর্ম্মদান-বাসনার দ্বারা প্রেতের যে "আমি ধার্ম্মিক" ইত্যাকার বাসনা জন্মে, তাহা শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্যে অনুমান করিবে। এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে, বন্ধুরবাসনার দ্বারাও প্রেতের বাসনা সমুদ্রেক হয়। বন্ধুগণ (পুত্রাদি) পিণ্ডদানাদির দ্বারা

* গরুড় উপাসকেরা সঙ্কল্পের দ্বারা বিষকে অমৃত করিতে পারে এবং যোগীরাও ভাবনার দ্বারা এক পদার্থকে অন্য পদার্থ করিতে পারে।

প্রেতের উপকার হয় বটে ; প্রেত যদি বেদবিদ্বেষ্টা নাস্তিক পাষণ্ডমতি না হয়। তাদৃশ (সেরূপ পাষণ্ড) প্রেতের (মৃত ব্যক্তির) নিকট বন্ধু-বাসনা অতীব দুর্ব্বলা[৩৮]। প্রবল দুর্ব্বলের মধ্যে প্রবলেরই জয় হইয়া থাকে এবং সেই কারণে আমি বলিয়া আসিয়াছি, যত্নপূর্ব্বক শুভা-ভ্যাসই করিবেক, অশুভ চিন্তা করিবেক না[৩৯]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যদি দেশকালাদির উৎকর্ষেই বাসনা সমুদিত হয়, তাহা হইলে মহাকল্পান্তে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে দেশ কালাদি থাকার সম্ভব কি? কি প্রকারে ও কোথা হইতে প্রথম সৃষ্টির কারণীভূত বাসনা উদ্রিক্ত হইয়াছিল? যদি ঐই সকল দৃশ্য বাসনা-কার্য্যই হয়, এবং ইহা যদি দেশকালাদি সহকারী কারণ দ্বারা সমু-দিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎকালে ঐ সকল সহকারী কারণ না থাকায় বাসনার অবস্থান কোথায় ও কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?[৪০।৪১]

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবাহো! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই সত্য। মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্ট্যারম্ভ কালের পূর্ব্বে দেশকালাদি কিছুই থাকে না এবং সহকারী কারণের অভাব নিবন্ধন দৃশ্যবিলাসেরও বিদ্য-মানতা থাকে না। অর্থাৎ কোন কিছু উৎপন্নও হয় না, প্রস্ফুরিতও হয় না। যেহেতু দৃশ্য বস্তু অভাবশালী, সেই হেতু যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সমস্তই অনাময় ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে[৪২।৪৪]। এই বিষয়টী অগ্রে যাইয়া আমি তোমাকে শত শত যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিব। এখন তুমি প্রযত্ন সহকারে প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রণিহিত হও[৪৫]।

লীলা ও সরস্বতী উক্তপ্রকারে পদ্মনগরে গমন করতঃ পদ্মনৃপ-তির মনোহর মন্দির অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই শীতল ও গুণযুক্ত মন্দিরটী পুষ্পসম্ভারে আকীর্ণ হওয়ায় যেন বসন্তকালীন শোভা ধারণ করিয়াছে[৪৬]। উহা রাজকার্য্যসংরম্ভযুক্ত রাজধানী সম-ন্বিত এবং তন্মধ্যে মন্দারকুন্দমাল্যাদির দ্বারা সমাচ্ছাদিত পদ্মনৃপতির শব সংস্থাপিত রহিয়াছে। শবের শিরোভাগে মঙ্গল সূচক পূর্ণ কুম্ভাদি সংস্থাপিত রহিয়াছে[৪৭।৪৮]। মন্দিরের গবাক্ষ সকল ও দ্বার অনাবৃত রহিয়াছে। দীপালোক ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়ায় উহার নির্ম্মল ভিত্তি শ্যামলবর্ণ হইয়াছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে সংসুপ্ত জনগণের শ্বাস নিঃসরণ

শব্দ সমভাবে নির্গত হইতেছে। মন্দিরটী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি-সম্পন্ন ও সৌন্দর্য্য গুণে পুরন্দরমন্দিরকে ও বিরিঞ্চির অধিষ্ঠানভূত পদ্ম-মুকুলান্তর্গত চারু শোভাকে নির্জ্জিত করিতেছে। এই ইন্দুকান্তি সদৃশ মনোহর মন্দির নিঃশব্দ হেতুক মুকবৎ অবস্থিতি করিতেছে॥১॥০০।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী সেই অন্তঃপুর মণ্ডপে গমন করতঃ দেখিলেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বে সমাগতা ও ভর্ত্ত্‌ মরণের পূর্ব্বে মৃতা সেই বিদূরথমহিষী অপ্রবুদ্ধ লীলা অবিকল সেই পূর্ব্বদৃষ্ট আকারে সেই বেশে সেই দেহে সেই চরিত্রে সেই বস্ত্রে সেইরূপ রূপে, গুণে, বয়সে, ভূষণে ও সৌন্দর্য্যে পদ্মনৃপতির শবগৃহে অবস্থান করিতেছেন এবং শবপার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া চামর গ্রহণ করতঃ নৃপতি পদ্মের শব-শরীর বীজন করিতেছেন। ইহাকে দেখিলেই মনে হয়, যেন নভোভূষণ তরুণ শশধর তত্রস্থ মহীতলে উদিত হইয়াছে[১]। তাঁহার বেশ, বয়স, আচার, আকার, দেহ, বস্ত্র, অঙ্গসৌন্দর্য্য, রূপ, লাবণ্য, অবয়বস্পন্দন, বস্ত্র পরিধান ও ভূষণ প্রভৃতি সমস্তই পূর্ব্ব সদৃশ। কেবল বিশেষ এই যে, তিনি প্রাক্তন ভবন (বিদূরথ গৃহ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদ্মভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। এই মনোহররূপ-সম্পন্না রমণী বামকরতলে বদনেন্দু নতভাবে বিন্যস্ত করতঃ মৌনা হইয়া রহিয়াছেন এবং ইহার অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ হইতে স্নিগ্ধ শুভ্র ও নির্ম্মল কিরণাবলি স্ফুরিত হইতেছে। দেখিবা মাত্র বোধ হয়, যেন এক সুন্দর বনস্থলীতে বিকসিত কুসুমা সর্ব্বলোকমনোহরা লতিকা সুষুমা বিতরণ করিতেছে[২]। এই লীলা যখন যে দিকে নেত্র পরিচালন করিতেছেন সেই দিকেই যেন মালতী অথবা উৎপল বর্ষণ হইতেছে এবং তাঁহার অঙ্গলাবণ্য যেন ক্ষণে ক্ষণে শত শত চন্দ্রের সৃষ্টি করিতেছে[৩]। এই লাবণ্যবতী লীলা যেন পুষ্পসম্ভার সমুদিত লক্ষ্মীর ন্যায় নরপাল রূপ বিষ্ণুর ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন[৭]। ইহার দৃষ্টি ভর্ত্তৃবদনে স্থাপিত, যেন কিছু নিপুণা হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। ইহার মুখ ম্লান, সুতরাং ম্লানচন্দ্র নিশার ন্যায় অল্লান্ধকার বিশিষ্ট[৮]।

সত্যসঙ্কল্পা প্রবুদ্ধ লীলা ও সরস্বতী উভয়ে অপ্রবুদ্ধ লীলাকে তাদৃশী অবস্থান্বিতা দেখিলেন, কিন্তু বালিকা অপ্রবুদ্ধ লীলা সত্যসঙ্কল্পতার অভাবে উক্ত উভয়কে দেখিতে পাইলেন না[৯]।

এই অবসরে রামচন্দ্র মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আপনি বর্ণন করিয়াছেন যে, পূর্ব্বলীলা পদ্মভবনের অন্তঃপুর মণ্ডপে দেহ রাখিয়া ধ্যানযোগে জ্ঞপ্তি দেবীর সহিত বিদূরথ ভবনে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বলিতেছেন, তিনি সরস্বতীসহ বিদূরথভবন হইতে পদ্মভবনে আগমন করিয়া অপ্রবুদ্ধ লীলাকে অগ্রে সমাগতা দেখিলেন। তাঁহার দেহ প্রাপ্তির কথা আর বলিলেন না। অতএব, তাঁহার সেই দেহ কি হইল, কোথায় গেল, তাহা এখনও আছে কি নাই, লীলা আপনার শরীর আছে কি নাই, তাহা দেখিলেন না, না দেখিয়াই সমাগতা লীলাকে দেখিতে লাগিলেন, ইহার কারণ কি আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলুন[১০]।[১১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! লীলার সে শরীর কোথায়? তাহা কি সত্য বস্তু? সত্যবস্তু নহে। দেহ প্রভৃতির জ্ঞান মরুভূমিতে জল-বুদ্ধির ন্যায় ভ্রান্তিমূলক। তাহা অর্থাৎ সে ভ্রান্তি বিদূরিত হওয়ায় লীলা আপনার পরিত্যক্ত শরীর অন্বেষণ করেন নাই। যাহা নাই তাহার আবার অন্বেষণ কি?[১২] বৎস রাম! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই আত্মা। এ রহস্য যে জানিয়াছে, তাহার আবার দেহাদি কোথায়? তুমিও যাহা যাহা দেখিতেছ, সমস্তই সেই চিন্মাত্রবপুঃ ব্রহ্ম[১৩]। লীলার বোধ যেমন যেমন উত্তরোত্তর পরিপক্ক হইয়াছে তাহার দেহও তেমনি তেমনি হিমবৎ বিগলিত অর্থাৎ বাধিত (নাই বলিয়া অবধৃত) হইয়া গিয়াছে[১৪]। লীলা যে এখন আতিবাহিক দেহে আপনার পরিকল্পিত দৃশ্য দেখিতেছেন অর্থাৎ "সমস্তই মনঃকল্পিত" এই ভাবে দেখিতেছেন, তাহা কে জানিতেছে? জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ইহার ভ্রান্তিতে এই সমস্তই ভূম্যাদি নামে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ এক্ষণকার আধ্যাত্মিক ভাবই পূর্ব্বে আধিভৌতিক ভ্রান্তিতে বিদ্যমান ছিল[১৫]। বস্তুতঃ আধিভৌতিক অর্থাৎ বাহ্যিক কিছুই নাই। শব্দ বল, আর অর্থ বল, কোনও কিছু বাস্তব নাই। এ সমস্তই শশশৃঙ্গের ন্যায় অসত্য[১৬]। আতিবাহিকের উপর "আমি আধিভৌতিক" এইরূপ ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইলে, তাহার আর, আমি আধিভৌতিক কি আতিবাহিক সে বিচার থাকে না। স্বপ্নকালে "যে পুরুষের আমি মৃগ" এইরূপ মতি উদিত হয়, যাবৎ স্বপ্ন থাকে তাবৎ কি সে আপনার মৃগত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত

অন্য মৃগ অন্বেষণ করে? তাহা করে না[১৭]। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম তিরোহিত হইলে, "এই সর্পজ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র" এইরূপ বোধ সমুদিত হয়, তেমনি, ভ্রান্ত জনগণের ভ্রম বিদূরিত হইলে যাহা সত্য তাহাই তাহাদের জ্ঞানে স্ফুরিত হয়[১৮]। অধিক কি বলিব, এই সমুদায় আধিভৌতিক প্রপঞ্চ অপ্রবুদ্ধ জীবের মনঃকল্পিত। সমুদায় অজ্ঞ জীব স্বপ্ন সন্দর্শনের অনুরূপে জগৎস্থৈাল্য দর্শন করিতেছে। 'বালক যেমন নৌকাবিঘূর্ণনে ভ্রমণ অনুভব করে, সেইরূপ, প্রত্যেক অজ্ঞ জীব দেহান্তর প্রাপ্তি অনুভব করে[১৯।২০]। * আত্মজ্ঞান হইলে তখন তাহার সেই আধিভৌতিক দেহ বাধিত হইয়া যায়। সেইজন্য যোগীদিগের দেহ আতিবাহিক।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন, আতিবাহিক দেহ অদৃশ্য ও অবিনশ্বর, যদি তাহাই হয়, তবে, কেন তাহা লোকের দৃষ্টিগোচর হয়? কেনই বা তাহাদের মরণ দেখা যায়? এবং কি নিমিত্ত মৃত্যুর পর আতিবাহিকতা প্রাপ্ত দেহ মোক্ষকালেও বিদ্যমান থাকে?[২১]

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় দেহ বিনষ্ট না হইলেও "বিনষ্ট হইয়াছে" এইরূপ জ্ঞান সমুদিত হয়, সেইরূপ, যোগীদিগেরও বিনা পূর্ব্ব দেহের বিনাশে সেই আতিবাহিক দেহেই দেহান্তর ধারণের কল্পনা উদিত হয়। † অপিচ, যেমন সূর্য্যের আলোকে হিমকণা ও শরৎকালের আকাশে শুভ্র মেঘ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ অদৃশ্য, তেমনি, যোগিদেহ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তাহা অদৃশ্য। ফলিতার্থ—শরদাকাশে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত মেঘাস্তিত্ব দর্শনের ভ্রম হয়[২২।২৩]। "শরীর এখনই যাউক, অদৃশ্য হউক" এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা কোন কোন যোগীর দেহ এত শীঘ্র অদৃশ্য হইয়া যায় যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, যোগীরাও তাহা দেখিতে পান না। খগেরা যেমন উড্ডীন হইয়া শীঘ্র

---

* আমি মরিলাম, পুনর্ব্বার জন্মিলাম, এ সকল জ্ঞান পরকীয় মিথ্যা জ্ঞানের বিবর্ত্তন। জাতিস্মর দিগের ঐ সকল জ্ঞানও নিরূঢ় (অনাদি) ভ্রান্তির মহিমা।

† ভাবার্থ এই যে, যোগী দিগের মরণ দ্বিবিধ। এক প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্ত ঐচ্ছিক, অপর প্রারব্ধ বিনাশে দেহপরিত্যাগ। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মরণে পূর্ব্ব দেহের অবাধে দেহান্তরের প্রাপ্তি কল্পনা এবং শেষোক্ত মরণে দেহের আত্যন্তিক অভাব হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত মরণ বুঝাইবার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন এবং দ্বিতীয় মরণ বুঝাইবার দৃষ্টান্ত শরৎকালের মেঘ।

আকাশে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ[২৪]। তাঁহারা যে জীবদ্দশায় জনগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন তাহা তাঁহাদের সত্যসঙ্কল্পতার প্রভাব। অর্থাৎ "ইহারা এইরূপে দেখুক" এইরূপ ইচ্ছা করেন বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়। কোন কোন ব্যক্তি যে স্বীয় সম্মুখে "এই যোগী মৃত, এই যোগী জীবিত" এইরূপে যোগিদেহ দর্শন করেন, সে কেবল সেই সেই দর্শকের বাসনানুরূপ বিভ্রম[২৫]। বস্তুতঃ যোগিদেহ কোনও কালে আধিভৌতিক নহে। যেমন সর্পজ্ঞান বিনষ্ট হইলে রজ্জুজ্ঞান সমুদিত হয়, তেমনি, ভ্রান্ত জনগণের জ্ঞানোদয় হইলে পূর্ব্বের দেহদর্শন ভ্রম বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে[২৬]। তখন অবধারণা হয় যে, দেহই বা কি, তাহার বিদ্যমানতাই বা কোথায়, এবং তাহার নাশই বা কি? সমস্তই অলীক, সমস্তই ভ্রান্তি। যাহা ছিল তাহাই রহিয়াছে; কেবল অবোধতাই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! এই আধিভৌতিক দেহই কি যোগের সামর্থ্যে আতিবাহিকতা প্রাপ্ত হয়? কি তাহা পৃথক্? বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি তোমাকে ঐ বিষয়টী অনেকবার বলিয়াছি; কিন্তু তুমি গ্রহণ করিতেছ না। অর্থাৎ, বুঝিতে পারিতেছ না। বৎস! একমাত্র আতিবাহিকই আছে, আধিভৌতিক নাই[২৮।২৯]। অধ্যাস দ্বারাই আতিবাহিকে আধিভৌতিকী মতি সমুদিত হয় এবং তাহার অর্থাৎ অধ্যাসের উপশম হইলে পুনর্ব্বার প্রাক্তন আতিবাহিকতার উদয় হয়[৩০]। যেমন, প্রবুদ্ধ হইলে তখন আর স্বপ্নদৃষ্ট নগরের কাঠিন্যাদি থাকে না, তাহার কাঠিন্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি, আতিবাহিক জ্ঞান সমুদিত হইলেও তখন আর এতদ্দেহের গুরুত্ব ও কাঠিন্য প্রভৃতি থাকে না, শমতা প্রাপ্ত হইয়া যায়[৩১]। যেমন "স্বপ্নে ইহা স্বপ্ন" এইরূপ জ্ঞান হইলে স্বপ্নদৃষ্ট স্বপ্নের বাধ হইয়া যায়, সেইরূপ, আতিবাহিক বোধ সমুদিত হইলেই আধিভৌতিকত্বের বাধ হয় এবং আধিভৌতিকের বাধ হইলে যোগী দিগের দেহ তূলবৎ লঘুতা প্রাপ্ত হয়[৩২]। জীব যেমন স্বপ্নে "আমি স্থূল নহি, ভারি নহি, আমি ইচ্ছা করিলে আকাশে সঞ্চরণ করিতে পারি" এই জ্ঞান হওয়ার পর স্বপ্নে আকাশ সঞ্চরণাদি করে, তেমনি, যোগীরাও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয়ে তূলবৎ লঘু হইয়া আকাশগমনযোগ্য হন[৩৩]। যাঁহারা দীর্ঘকাল তাদৃশ সঙ্কল্পময়

দেহে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগের স্থূল দেহ শবীভূত হউক, আর ভস্মীভূত হউক, সকল অবস্থাতেই তাঁহারা আতিবাহিক দেহে অবস্থিতি করিবেন, সন্দেহ নাই[৩৪]। যোগীরা প্রবোধের আতিশয্য দ্বারা জীবিত অবস্থাতেই ঐ প্রকার সূক্ষ্ম দেহ লাভে সমর্থ হন[৩৫]। "আমি সঙ্কল্পাত্মা, স্থূল নহি" এইরূপ স্মৃতি সমুদিত হওয়ায় তাঁহাদিগের স্থূল দেহও আকাশবিহারযোগ্য হয়[৩৬]। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় স্থূল ভ্রান্তি নিরন্তর প্রতিভাত হইতেছে বটে; পরন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, রজ্জুতে সর্প ভ্রম সমুদিত হয় বটে; পরন্তু রজ্জু কি তাহাতে সত্য সত্যই সর্পত্ব প্রাপ্ত হয়? তাহা হয় না। অধিকন্তু দেখা যায়, ভ্রম বিনষ্ট হইলে তখন আর সে সর্প থাকে না। তাহা তখন কোথায় বিলীন হইয়া যায়। অতএব, যে বস্তু যেরূপ, তাহাতে ভ্রম সমুদিত হউক, বা না হউক, তাহা তদ্রূপেই অবস্থিত থাকে। সদ্বস্তুর বাস্তব অন্যথা হয় না[৩৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বলীলা ও সমাগতা লীলা প্রভৃতি পদ্মভবনে গমন করিলে তদ্ভবনবাসীরা আতিবাহিক দেহধারিণী লীলাকে দর্শন করিতে অশক্ত হইলেও, লীলার "এই সমস্ত জনগণ আমাকে দর্শন করুক" এতদ্রূপ সত্য সঙ্কল্প দ্বারা তাঁহারা যদি তাঁহাকে দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে কি বোধ করিবেন?[৩৮] *

বশিষ্ঠ বলিলেন, তত্রস্থ জনগণ "ইনিই সেই রাজমহিষী, দুঃখিতা হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং এই রমণী (দ্বিতীয়া লীলা) ইঁহার বয়স্যা, কোন এক স্থানে সখিত্ব প্রাপ্তা এবং সম্প্রতি ইঁহার সহিত মিলিতা হইয়াছেন, এইরূপ বোধ করিবেন[৩৯]।

হে রামচন্দ্র! এ বিষয়ে সন্দেহ হইবার কারণ নাই। পশুগণ যেমন দৃষ্ট অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তেমনি, অবিবেকী মানবেরাও দৃষ্টানুসারে ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে[৪০]। লোষ্ট্র বৃক্ষাদিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বৃক্ষাদির মধ্যে প্রবেশ করে না, অধিকন্তু তাহা বৃক্ষেই বিশীর্ণ (ধূলিভাবপ্রাপ্ত, গুঁড়া হইয়া যাওয়া) হইয়া যায়, সেইরূপ, বিচারণাও পশুতুল্য অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না, সেইজন্য তাহাদের শরীর ও

* পদ্মভবনবাসিগণ কি তাঁহাকে ইনিই সেই এখানকার লীলা এই রূপ বোধ করিবেন, কি ইনি কোন অপূর্ব্বা দেবী, এইরূপ বোধ করতঃ জ্যেষ্ঠশর্ম্মাদির ন্যায় বিস্ময় প্রাপ্ত হইবেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। (জ্যেষ্ঠশর্ম্মা প্রবুদ্ধ লীলার পুত্র। পূর্ব্বে ইহার কথা অনেকবার বলা হইয়াছে।)

কাম কর্ম্ম বাসনাদি পূর্ব্ববৎ অবস্থিত থাকে[৪১]। যেমন জাগরিত হইলে স্বাপ্ন শরীর কোথায় যায় তাহা জানা যায় না, তেমনি, তত্ত্ববোধ উদিত হইলে আধিভৌতিকতাবোধ কোথায় পলায়ন করে, তাহা স্থির করা যায় না[৪২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! জাগ্রৎ উপস্থিত হইলে স্বপ্নদৃষ্ট পর্ব্বত কোথায় যায় তাহা আমাকে বলুন। ঐ বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে[৪৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, স্পন্দন যেমন বায়ুতেই লীন হয়, তেমনি, স্বপ্ন দৃষ্ট ও সঙ্কল্পদৃষ্ট পর্ব্বতাদি সম্বিদে (আত্মচৈতন্যে) মিলিত হইয়া থাকে[৪৪]। যেমন অস্পন্দ বায়ুতে সস্পন্দ বায়ু (স্থির বায়ুতে ঝটিকা বায়ু) প্রবেশ করে, সেইরূপ, বাস্তব-অস্তিত্ব-শূন্য স্বাপ্ন পদার্থ ও নির্ম্মলস্বভাব সম্বিদে প্রবিষ্ট হয়[৪৫]। একমাত্র সম্বিদই সেই সেই পদার্থের আকারে অবভাসিত ও প্রস্ফুরিত হইতেছে। যে দিন তাহা না হইবে সেই দিন সম্বিদের স্বভাবসুলভ অদ্বয়তা (একত্ব) প্রতিষ্ঠিত হইবে[৪৬]। জল যেমন দ্রবত্বের ও স্পন্দন যেমন বায়ুর সহিত অভিন্ন, তেমনি, স্বপ্নার্থও সম্বিদের সহিত অভিন্ন। সম্বিৎ ও স্বপ্নদৃষ্ট নানা সম্বেদ্য, উভয়ের বাস্তব পার্থক্য কোনও কালে ও কোনও ব্যক্তি কর্তৃক উপলব্ধ হয় নাই এবং হইবেও না[৪৭]। যেন তাহা পৃথক, যেন তাহা ভিন্ন, (জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই দুই যেন এক নহে, কিন্তু ভিন্ন) এই ভাবটীই অজ্ঞান নামের নামী এবং তাদৃশ অজ্ঞানই সংসার। সম্বিদই উক্ত অজ্ঞানের আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া সংসার আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে[৪৮]। সহকারী কারণ না থাকায় স্বাপ্ন সৃষ্টি মিথ্যা, সুতরাং ঐ সকল দ্বৈত পণ্ডদ্বৈত (পণ্ড=অলীক বা তুচ্ছ)[৪৯]। স্বপ্ন যেমন অসৎ, জাগ্রৎও সেইরূপ অসৎ। এ বিষয়ে অল্পমাত্রও সন্দেহ করিও না। কেননা স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি সহকারিকারণের অভাবে অসৎ। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুরনগরাদি অসৎ, তেমনি, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র অজ্ঞানোপহিত হিরণ্যগর্ভ-সম্বিদের অতিরিক্ত অন্য কোন সহকারিকারণ না থাকায় তদুদ্ভূত সৃষ্টিও অসৎ[৫০]। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ কোনও ক্রমে সত্য নহে। একমাত্র সম্বিদ্ই নিত্য সত্য, তদতিরিক্ত যে কিছু, সমস্তই অসত্য[৫১]। যেমন জাগরিত হইলে স্বাপ্নপর্ব্বতাদি তৎক্ষণাৎ নাস্তিতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নাই

হইয়া যায়, সেইরূপ, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, অথবা ক্রমে হউক, তত্ত্ব-জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা এই আধিভৌতিক জগৎ শূন্যতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে[৫২]। নিকটস্থ লোকেরা যে "এই ব্যক্তি মৃত ও এই ব্যক্তি উড্ডীন" এইরূপ দর্শন করে, তাহা তাহারা স্বস্বরূপানভিজ্ঞ আধি-ভৌতিকাভিমানী বলিয়াই করে। অর্থাৎ সেইপ্রকার দর্শন করে[৫৩]। এই সকল সৃষ্টি মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবে প্রকটিত ও মোহের প্রেরণায় অবস্থিত। এই ঐন্দ্রজালিকীবৎ দৃষ্টিভ্রান্তি স্বপ্নানুভূতির ন্যায় নিঃস্বরূপ। অনাদিভ্রমপ্রবাহ নিপতিত পুরুষ মরণমূর্চ্ছার পূর্ব্বক্ষণে আতিবাহিক দেহে ভ্রান্তি ক্রমে ভবিষ্যৎ ভোগের উপযুক্ত সৃষ্টিপ্রতিভাস অনুভব করে এবং যাহা যাহা অনুভব করে সে সমস্তই তাহাদের মনোমধ্যে। পরন্তু ভ্রান্তির মহিমায় সে সকলকে বহিঃস্থ বিবেচনা করে[৫৪।৫৫]।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রবুদ্ধ লীলা পদ্মশবপার্শ্বস্থিতা দ্বিতীয় লীলাকে ঐ প্রকারে দেখিতেছেন, ইত্যবসরে যোগীরা যেমন ইচ্ছার দ্বারা মনের স্পন্দন নিরুদ্ধ করেন, সেইরূপ, সত্যসঙ্কল্পা জ্ঞপ্তিদেবী সঙ্কল্পের দ্বারা সেই বিদূরথ-জীবকে নিরুদ্ধ করিলেন। অর্থাৎ শব-শরীরে প্রবিষ্ট হইতে দিলেন না। এই সময়ে লীলা ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! এই মন্দিরে মহীপাল পদ্ম শবীভূত ও আমি সমাধি লীনা হইলে, কত কাল গত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন[১,২]। দেবী বলিলেন, লীলে! অদ্য এক মাস অতিক্রান্ত হইল, এই ক্ষুদ্র বাস গৃহে এই দুই দাসী তোমার দেহ রক্ষার্থ অবস্থিতি করিয়া এক্ষণে নিদ্রা যাইতেছে[৩]। হে বরবর্ণিনি! তোমার দেহ কি হইল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি সমাধি লীনা হইলে তোমার দেহ পঞ্চদশ দিবসের পর ক্লিন্ন ও তাহার জলভাগ বাষ্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। * যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত থাকে, তেমনি, তোমার সেই নিৰ্জীব দেহও ভূপৃষ্ঠে নিপতিত ছিল। তৎকালে তোমার সেই শবীভূত দেহ কাষ্ঠ কুড্যের ন্যায় কঠিন ও হিমানীর ন্যায় শীতল হইয়াছিল[৪,৫]। অনন্তর মন্ত্রিগণ তোমার দেহের তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া অর্থাৎ পচিতেছে দেখিয়া স্থির করিলেন, ইনি মৃতা হইয়াছেন। তখন তাঁহারা তোমার সেই দেহকে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিলেন[৬]। এ বিষয়ে অধিক কি বলিব, তোমার সেই শবীভূত দেহকে তাঁহারা চিতায় নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত ও চন্দন-কাষ্ঠাদির দ্বারা দগ্ধ করিয়াছেন। অনন্তর তোমার পরিবারগণ "হায়! আমাদের রাজ্ঞীও মৃতা হইলেন" এই বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিয়া

---

* এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, লীলার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাই তাঁহার স্থূল দেহ বিষয়ক জ্ঞান রজ্জুতত্ত্ব জ্ঞানের উদয়ে সর্পজ্ঞানের পলায়নের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে। সেই জন্য তিনি আর পরিত্যক্ত স্থূলদেহের অনুসন্ধান করেন নাই। সরস্বতীও সে বিষয়ের প্রসঙ্গ করেন নাই। পরন্তু অন্য অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে লীলাদেহের যে অবস্থা ঘটনা হইয়াছিল তাহা বলা উচিত বিবেচনায় সরস্বতী তাহাই লীলার নিকট বর্ণন করিলেন।

তোমার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন[৭।৮]। * বৎসে! এখন যদি তোমাকে অত্রত্য জনগণ এই স্থানে সশরীরে সমাগতা দেখে, তাহা হইলে ইহারা তোমাকে, পরলোক হইতে সমাগতা ভাবিয়া চমকিয়া উঠিবে[৯]। হে সুতে! তুমি এক্ষণে আতিবাহিকদেহা সুতরাং মনুষ্য-গণের অদৃশ্যা হইলেও তদীয় সত্যসঙ্কল্পের প্রভাবে জনগণ তোমার এই স্বচ্ছ আতিবাহিক দেহ দর্শন করিয়াও পরমাশ্চর্য্য হইবেক[১০]। বালে! তোমার প্রাক্তন দেহের প্রতি যাদৃশী বাসনা সমুদিতা হইয়া-ছিল, তুমি তাদৃশ রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ[১১]। কেবল তুমি নহ, সংসারের সকল ব্যক্তিই স্ব স্ব বাসনানুসারে বাস্য দর্শন করিয়া থাকে। বালকের বেতাল দর্শন তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত। (বাল-কেরা যে ভূত দেখে, তাহা তাহাদের অমূলক সংস্কারের প্রভাব)[১২]। সুন্দরি! তুমি ইদানীং আতিবাহিকশরীরিণী, ব্রহ্মসম্পন্না সুতরাং সিদ্ধা হইয়াছ। তুমি প্রাক্তন অশুভবাসনাসম্পন্ন আধিভৌতিক দেহ বিস্মৃতা হইয়াছ[১৩]। আতিবাহিক জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হওয়াতে তোমার আধি-ভৌতিক জ্ঞান এককালে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। আধিভৌতিক দেহ অন্য কর্ত্তৃক দৃশ্যমান হইলেও প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে তাহা শরদা-কাশে শুভ্র মেঘের ন্যায় ক্ষণদৃশ্য[১৪]। আতিবাহিকভাব বদ্ধমূল হইলে সে দেহ তখন জলহীন জলদের ও গন্ধহীন কুসুমের সহিত উপমিত হয়[১৫]। অপিচ, আতিবাহিক সম্বিদ্ (জ্ঞান) অবিচলিত হইলে, সদ্বাসনা-শালী গণও যৌবনে বাল্য বিস্মরণের ন্যায় আধিভৌতিকদেহ বিস্মৃত হইয়া যান[১৬]। হে বরবর্ণিনি! আজ একত্রিংশ দিবসে আমরা এই মন্দিরাকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য প্রভাতে আমরা এই স্থানে সমুপস্থিত হইলে এই সমস্ত ভৃত্যগণ আমার ইচ্ছায় এখন নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। লীলে! আইস, এই সময়ে আমরা সত্যসঙ্কল্পতার খেলা দেখাইয়া এই অপ্রবুদ্ধ লীলাকে দর্শন প্রদান করি ও মানবোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই[১৭।১৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অনন্তর জ্ঞপ্তিদেবী "এই অপ্রবুদ্ধ লীলা আমাদিগকে দর্শন করুক" এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র জ্ঞপ্তি ও প্রবুদ্ধ

* লীলার দেহ পচিয়া গেল, আর রাজার দেহ থাকিল, এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকার বলেন, সত্যসঙ্কল্পা সরস্বতীর সঙ্কল্পের প্রভাবে রাজার দেহ জীবিতের ন্যায় ছিল, নষ্ট হয় নাই।

লীলা প্রদীপ্তভাবে প্রকাশমানা হইলেন[১৯]। অনন্তর বিদূরথমহিষী অপ্রবুদ্ধ লীলা গৃহের অভ্যন্তর ভাগ তেজঃপুঞ্জে ভাস্বর হইল দেখিয়া চঞ্চলনয়না হইলেন এবং সত্বর গৃহমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ দেখিলেন, যেন চন্দ্রে খোদাই করা অথবা ছাঁচে গড়া দ্রবণীতল প্রভাময়ী দুইটী রমণী তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছে। ইঁহাদের অঙ্গপ্রভায় গৃহভিত্তি সুবর্ণ-দ্রবলিপ্তের ন্যায় (সোনালী গিল্ট করার মত) দেখাইতেছে[২০।২১]। লীলা স্বীয় সম্মুখে তদ্রূপরূপিণী জ্ঞপ্তিদেবীকে ও প্রবুদ্ধ লীলাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মানা হইয়া তাঁহাদিগের চরণে নিপতিতা হইলেন এবং কহিলেন, হে জীবনপ্রদ দেবিদ্বয়! আপনাদিগের জয় হউক। আপনারা আমার মঙ্গলের নিমিত্তই এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমি আপনাদিগের পরিচারিকা হইয়া পূর্ব্বেই এই স্থানে উপনীতা হইয়াছি[২২।২৩]। লীলা এইরূপ কহিলে সেই বহুমানার্হ ও মত্তযৌবন (পূর্ণ-যৌবন) রমণীদ্বয় সুমেরুশিখরস্থ লতিকাদ্বয়ের ন্যায় উচ্চ আসনোপরি উপবিষ্টা হইলেন[২৪]। পরে জ্ঞপ্তিদেবী বলিলেন, সুতে! তুমি কোন্ পথ দিয়া কি কি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে দেখিতে ও কি প্রকারে এই দেশে আসিয়াছ?[২৫] বিদূরথ-লীলা বলিলেন, দেবি! আমি প্রথমতঃ সেই বিদূরথের গৃহে সেই সময়ে দ্বিতীয়া তিথির চন্দ্রকলার ন্যায় সূক্ষ্মা ও প্রলয়াগ্নি মধ্যপতিতার ন্যায় হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্তা হইলাম[২৬]। পরমেশ্বরি! সে সময়ে আমার সম বিষম, কোনও জ্ঞান ছিলনা। এবং আমার চঞ্চল পক্ষ্মান্তর্গত লোচন নিমীলিত হইয়া গিয়াছিল[২৭]। পরে আমার তাদৃশী মরণমূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেলে, জাগরিত হইয়া দেখিলাম, আমি গগনোদরে আপ্লুত হইতেছি[২৮]। পরে বায়ুরূপ রথে আরোহণ করিলাম। তৎপরে বায়ু যেমন সুগন্ধ বহন করে, সেইরূপ, সেই বায়ুরথ আমাকে এই [স্থা]নে বহন করিয়া আনিল[২৯]। দেবি! আমি এই স্থানে উপনীতা [হ]ইয়া দেখিলাম, এই গৃহ মদীয় নায়কে অলঙ্কৃত, দীপ্তদীপে সুশো-[ভি]ত ও মহামূল্য শয্যায় সমন্বিত রহিয়াছে[৩০]। অনন্তর আমি এই [প]তির প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ দেখিলাম, ইনি পুষ্পগুপ্তাঙ্গ হইয়া শয়ন [ক]রিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া আমি ভাবিলাম, ইনি ঘোরতর সংগ্রাম-[স]ংরম্ভ দ্বারা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। নিদ্রিত রহিয়া-[ছে]ন মনে করিয়া, আমি ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ করি নাই। এবং তৎপরে

আপনারা এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। হে দেবি! এক্ষণে আমি যথানুভূত সমুদয় বৃত্তান্ত মদনুগ্রহকারিণী ভবদীয়সমীপে নিবেদন করিয়া কৃতার্থা হইলাম[৩১।৩৩]।

অতঃপর জ্ঞপ্তি দেবী সহাস্য আস্যে উভয় লীলাকে নিকটে আহ্বান করতঃ কহিলেন, লোলিতলোচনে লীলাদ্বয়! আমি এই শয্যাশায়ী নৃপতিকে উত্থাপিত করিতেছি, অবলোকন কর[৩৪]। অনন্তর ভগবতী জ্ঞপ্তিদেবী ঐরূপ কহিয়া, পদ্মিনী যেমন সুগন্ধ পরিত্যাগ করে, সেই-রূপ, সেই নৃপতির অবরুদ্ধ জীবকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন সেই নৃপ-জীব নৃপতির নাসার নিকট গমন করতঃ অনিলের বংশরন্ধ্র প্রবেশের ন্যায় সত্বর তদীয় নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল[৩৫।৩৬]। অমনি মহীপতি পদ্ম, সমুদ্র যেমন স্বকীয় অন্তরে রত্ন ধারণ করেন, তাহার ন্যায় শত শত বাসনা স্বকীয় অন্তরে ধারণ করিলেন। বৃষ্টির অভাবে ম্লানি প্রাপ্ত পদ্ম যেমন বৃষ্টি প্রাপ্তে পুনঃ পরম শোভা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, জীবের সমাগমে নৃপতি পদ্মের মুখপদ্মে পূর্ব্ববৎ কান্তি আগমন করিল[৩৭]।

যেমন লতা সকল বসন্তের সমাগমে সরল ও সৌন্দর্য্যগুণান্বিত হয়, তেমনি, জীবসমাগমে ভূপতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অল্পে অল্পে সরস ও সৌন্দর্য্যগুণান্বিত হইতে লাগিল[৩৮]। এবং মুখমণ্ডলে পূর্ণিমা তিথির চন্দ্রের ন্যায় কান্তি আগমন করিল[৩৯]। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্ফুরিত ও পল্লবে বসন্ত সমাগমে কান্তি আগমনের ন্যায় সে সকলেও কান্তি আগমন করিল[৪০]। অনন্তর, যেমন ভুবনাত্মা বিরাট (ভগবানের বিশ্বমূর্ত্তি) স্বীয় চন্দ্রসূর্য্য স্বরূপ নেত্রতারকা উন্মীলন করেন, সেইরূপ, মহীপতি এখন সৌভাগ্য লক্ষণসম্পন্ন সর্ব্বমনোহর নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিলেন[৪১]। তদনন্তর বুদ্ধিমান্ বিন্ধ্যাচলের ন্যায় উত্থিত হইয়া মেঘের ন্যায় গভীর নিস্বনে কহিলেন "কে এ স্থানে বিদ্যমান আছ?"[৪২] এই সময় উভয় লীলা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন "কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।" রাজা স্বীয় সম্মুখে আকারে, প্রকারে, রূপে, গুণে, বাক্যে ও স্বরে, কার্য্যে ও কার্য্যোদ্যোগে সর্ব্বাংশে সমান উভয় লীলাকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? ইনিই বা কে? তোমরা কোথা হইতে আগমন করিয়াছ?

প্রবুদ্ধ লীলা তাঁহার পুরোবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, * দেব! ত্বদীয় আদেশানুসারে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন[৪৩।৪৫]। হে প্রভো! আমি আপনার সেই পূর্ব্বমহিষী লীলা। অর্থ যেমন বাক্যের সহিত মিলিয়া থাকে, সেইরূপ, আমিই আপনার সহিত চিরমিলিতা আছি। ইনিও আপনার মহিলা, ইঁহারও নাম লীলা, আপনার নিমিত্ত আমিই আমার প্রতিবিম্বরূপা ইঁহাকে অর্জ্জন (উৎপাদন) করিয়াছি। আর যিনি আপনার শিরোভাগে হৈম মহাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, ইনি সেই ত্রৈলোক্যজননী কল্যাণদায়িনী সরস্বতী দেবী। হে মহারাজ! আমরা বহুপুণ্যবলে এই দেবীর দর্শন প্রাপ্তা ও ইঁহার দ্বারা লোকান্তর হইতে এই স্থানে আনীতা হইয়াছি[৪৬।৪৯]।

অনন্তর রাজীবলোচন নরপতি লীলাপ্রমুখাৎ ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভগবতীর চরণ-যুগলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, হে সর্ব্বহিতপ্রদে দেবি! হে সরস্বতি! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে বরদে! আমাকে এইরূপ বর-প্রদান করুন যে, যেন আমি পরমার্থবুদ্ধিশালী, দীর্ঘায়ু ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হই। নৃপতি ঐরূপ বর প্রার্থনা করিলে, ভগবতী তাঁহাকে স্বীয় করে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, পুত্র! তুমি তোমার প্রার্থনানু-সারে দীর্ঘায়ু ও ধনাঢ্য হও[৫০।৫২]। তোমার সর্ব্বপ্রকার আপদ, দুষ্কৃত-দৃষ্টি ও পাপ বুদ্ধ্যাদি বিনষ্ট হউক। তুমি অনন্ত সুখে অবস্থান কর এবং তোমার এই রাষ্ট্রে জনতা সর্ব্বদা হৃষ্টপুষ্ট থাকুক ও ত্বদীয় রাজলক্ষ্মী নিশ্চলা হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক তদীয় ভবনে বিলাস করুন[৫৩]।

---

* প্রবুদ্ধ লীলার স্থূল শরীর ছিলনা দগ্ধ হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ইনি সঙ্কল্পের দ্বারা স্থূল শরীর রচনা করিয়া থাকিলেন। দ্বিতীয় লীলা সরস্বতীর বরে স্থূল শরীরেই পদ্মভবনে আসিয়াছেন। পদ্মরাজার স্থূল শরীর মৃত ও পুষ্পে ঢাকা ছিল। তাহা এখন বিদূরথের জীব প্রবেশ করায় পুনর্জ্জীবিত হইল। বিদূরথের স্থূলদেহ সেই রাজ্যে তদীয় বন্ধুগণের দ্বারা ভস্মীকৃত হইয়াছে।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টি সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সরস্বতী ঐ প্রকার বর দান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। ক্রমে প্রভাতকাল উপস্থিত হইল। তখন পঙ্কজগণের সহিত জনগণ প্রবুদ্ধ হইল[১]। নৃপতি স্বীয় মহিষী লীলাকে আনন্দভরে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন, এবং লীলাও পুনর্জ্জীবিত পতিকে মহানন্দসহকারে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন[২]। এদিকে রাজভবন আনন্দোন্মত্ত জনগণে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই গীত ও বাদ্য, জয় ও মঙ্গলাদি পুণ্য বাক্য, মহাকোলাহলে নির্ঘুষ্ট (ঘোষণার বিষয়) হইতে লাগিল। অচিরাৎ হৃষ্টপুষ্ট জনগণ দ্বারা রাজবাটী সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাঙ্গনভূমি অনুচরবর্গ ও পৌরজনগণ প্রভৃতি রাজলোকে পরিপূর্ণ হইল[৩।৪]। সেই রাজসদনে সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ আনন্দ সহকারে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ, মুরজ, কাহল, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত হইতে লাগিল[৫]। হস্তিবৃন্দ আনন্দভরে শুণ্ড উর্দ্ধীকৃত করতঃ বৃংহিত অর্থাৎ চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ নৃত্য করতঃ প্রাঙ্গন ভূমির অন্যান্য উল্লাস বৃদ্ধি করিতে লাগিল[৬]। জনগণের আনীত উপঢৌকন সকল পরস্পর সজ্ঘট্টিত হইয়া ভূমি পতিত হইতে লাগিল। প্রচুর পরিমাণে ঔৎসবিক পুষ্প বহনকারী মনুষ্যের সঞ্চারে রাজসদন পরম শোভা ধারণ করিল[৭]। মন্ত্রী, সামন্ত ও নাগরিক গণ মঙ্গলসূচক পুষ্প, লাজা ও মুক্তাদি চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চত্বরাকাশ নর্ত্তকীগণের ভুজ নিকরে আচি হইয়া সমৃণাল রক্তপদ্মশতশোভিত সরোবরের শোভা ধারণ করিল[৮]। আনন্দোন্মত্তা স্ত্রীগণের গ্রীবাদেশ বিলাসের সহিত সঞ্চালিত হওয়া তাহাদের কর্ণদেশস্থ রত্নকুণ্ডলের দোতুল্যমানতা যুবকগণের নয়ন মু করিতে লাগিল। অনবরত পাদসম্পাতে, নিপতিত কুসুমরাজি মর্দ্দি হওয়ায় রাজপথ পুষ্পরস কর্দ্দমে পিচ্ছিল হইয়া উঠিল[৯]। শরন্মেঘসদৃ বিস্তৃত ও পট্টবস্ত্র বিনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ দ্বারা সুশোভিত বিস্তৃত প্রাঙ্গ ভূমিতে বরাঙ্গনাগণের বদন দৃষ্টে দর্শকগণের মনে হইতে লাগিল, যে

চন্দ্র শতমূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবতরণ করতঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন[১০]। "আমাদিগের রাজ্ঞী (দ্বিতীয়া লীলা) ও মহারাজ উভয়ে পরলোক হইতে আগমন করিয়াছেন" এইরূপ বাক্য গাথার ন্যায় ক্রমক্রমে শত শত জন প্রমুখাৎ দেশদেশান্তরে গমন করিতে লাগিল[১১]। এদিকে পদ্মভূপাল সংক্ষেপে বর্ণিত স্বীয়মরণ ও পরলোক গমন সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পরে সমানীত চতুঃসাগর জলে স্নান করিলেন[১২]। অনন্তর অমরগণ যেমন অমরেন্দ্রকে অভিষেক করেন, তেমনি, আজ্ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজগণ সমবেত হইয়া সেই রাজার অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন[১৩]। পরে লীলা, দ্বিতীয় লীলা ও মহারাজ পদ্ম, এই তিন ব্যক্তি সরস্বতীদেবীর কৃপায় জীবন্মুক্ত হইয়া অমৃতসদৃশ স্ব স্ব প্রাক্তন বৃত্তান্ত কথোপকথন করতঃ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন[১৪]। এই প্রকারে সেই মহীভুজ পদ্ম স্বীয় পৌরুষ বলে ও সরস্বতীর বরপ্রভাবে শুভজনক ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত ও জ্ঞপ্তিদেবীপ্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ ও লীলাদ্বয় সমন্বিত হইয়া অষ্ট অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন[১৫,১৬]। তাঁহারা প্রজাদিগের নিত্য অভ্যুদয় সাধন দ্বারা সর্ব্বপ্রকারদোষরহিত, পাণ্ডিত্য সমাচার দ্বারা যশ, ধর্ম্ম ও সৌভাগ্যাদি পরিবর্দ্ধিত করতঃ প্রজানুরঞ্জন দ্বারা জনগণের সন্তোষপ্রদ রাজ্য বহুদিবস পালন করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া সিদ্ধসম্বিদ্ (পরিনিষ্ঠিত প্রবোধ প্রাপ্ত) ও বিদেহ মুক্ত হইয়াছিলেন[১৭,১৮]।

মণ্ডপোপাখ্যান সমাপ্ত।

একোনষষ্টি সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! পূর্ব্বে যে আমি "দৃশ্য নাই, সমস্তই মিথ্যা, এইরূপ বোধ দৃঢ় হইলে মন তখন আর দৃশ্য দর্শন করে না, দৃশ্য সকল মন হইতে উন্মার্জ্জিত হইলে তখন পরমা শান্তি প্রতিষ্ঠিতা হয়।" এইরূপ বলিয়া ছিলাম, সেই কথা সমর্থনার্থ আমি তোমার নিকট পাপনাশক মণ্ডপোপাখ্যান (লীলোপাখ্যান) বলিলাম। তুমি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া এই অসৎ জগতে সত্যতা বোধ পরিত্যাগ কর[১]। এইজন্য বলি, যে, দৃশ্যসত্তার সত্যতা বুদ্ধি ত্যাগ বা অপগত করা ব্যতীত দৃশ্যমার্জ্জনের অন্য উপায় নাই। যাহা সৎ অর্থাৎ বস্তুতঃ আছে, তাহারই উন্মার্জ্জন ক্লেশকর, কিন্তু যাহা নাই, তাহার উন্মার্জ্জনে ক্লেশ কি? অর্থাৎ জগতের মিথ্যাত্ব বুদ্ধ্যারোহ করিতে অল্পমাত্রও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না[২]। তত্ত্বজ্ঞগণ আকাশের ন্যায় নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানে দৃশ্য প্রপঞ্চকে মায়িক ভাসমানতা মাত্র মনে করেন এবং তদ্ভেদে এক অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিয়া আকাশের ন্যায় নিত্য অদ্বয় ভাবে অবস্থিতি করেন[৩]। পৃথ্ব্যাদিরহিত চিন্মাত্র বপুঃ স্বয়ম্ভু আপনাতে যে কিছু বিবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সমস্তই সেই চিন্মাত্রস্বভাব পরমাত্মার মায়িক আভাস[৪]। সেই চৈতন্যরূপী স্বয়ম্ভু যখন যে প্রকার যত্ন করেন তখন সেই প্রকারই হন। সৃষ্টিবিৎ স্বয়ম্ভুর সৃষ্টিযত্নে সৃষ্টি, স্থিতিযত্নে স্থিতি এবং লয়যত্নে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না[৫]। যদিও ব্রহ্মাত্মরূপ নির্ম্মল চিদাকাশে এই জগৎ আভাসিত এবং তদনুসারে জগৎ ব্রহ্মসৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তথাপি, সে বোধ পরমার্থতঃ অপরিচ্ছিন্নভাবে (ব্রহ্মবস্তুতে) স্থান প্রাপ্ত হয় না। সে বোধ বৌদ্ধ বলিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিবিকার বলিয়া, বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন বা বুদ্ধ্যুপাধিক জীবে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং তাহাতে এই নিষ্কর্ষ হইতেছে যে, বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন জীবের প্রযত্ন বিশেষে তাহাদিগেরই উপভোগার্থ ব্রহ্মে এতাদৃশ সৃষ্টির আরোপ হইয়াছে[৬]। সেই জন্যই বলিয়াছি, দৃশ্য নাই, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে তখন আর দৃশ্য

দর্শন হইবে না। যাহা কেবল ভ্রান্তি, তাহার আবার সত্তা কি? বাসনা কি? আস্থা কি? নিয়তি কি? এবং অবশ্যম্ভাবিতাই বা কি?[৭] মায়িক সৃষ্টির ব্যবস্থা এই যে, দৃক্‌পথে থাকিলেও অর্থাৎ দৃষ্ট হইলেও তাহা পরমার্থ দৃষ্টিতে নাই। যাহা মায়ার কার্য্য, তাহা কেবল মায়া, অন্য কিছু নহে[৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট যার পর নাই উত্তম জ্ঞান লাভ করিলাম। এই জ্ঞান তৃণের দাহদোষ (উদ্ভিজ্জদিগের শুষ্কতা) নিবারক চন্দ্রামৃতের ন্যায় সংসারসন্তপ্ত জনগণের শান্তি-বিধায়ক[৯]। কি আশ্চর্য্য! আমি আজ্ বহু দিনের পর অক্ষত জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞাত হইলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি এখন শ্রুত দৃষ্টান্তাদি অবলম্বনে জগত্তত্ত্ব বিচার করিয়া শান্ত নির্ব্বাণ নামক পরম পদ প্রাপ্তের ন্যায় হইলাম[১০।১১]। কিন্তু হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সেই কারণে পুনর্ব্বার আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সম্প্রতি আপনি আমার বক্ষ্যমাণ সংশয় বিনষ্ট করিলে আমার আর কোনও জ্ঞাতব্য অবশেষ থাকিবেক না। আমি আমার শ্রোত্ররূপ পাত্রের দ্বারা আপনার বচনামৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না[১২]। হে মহর্ষে! লীলাপতির বাশিষ্ঠ, পাদ্ম ও বিদূরথ, এই তিন সৃষ্টিতে কত কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছুক। তাহা কি এক অহোরাত্রাত্মক? কি মাসমাত্রক, কি বহুবর্ষাত্মক?[১৩] অপর সংশয় এই যে, সেই কাল কাহার জ্ঞানে অত্যন্ত দীর্ঘ কি না? এবং কাহার জ্ঞানে ক্ষণমাত্র কি না? কাহার জ্ঞানে বহু বর্ষ কি না? এবং কাহার জ্ঞানে অপূর্ণ বৎসর ও পূর্ণ বৎসর কি না?[১৪] ভগবন্! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বিষয় আমার নিকট পুনর্ব্বার আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। কেননা, শুষ্ক মৃৎপিণ্ডে এক বিন্দু জল নিপতিত হইলে তাহা তাহার উপকারে আইসেনা[১৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনঘ রামচন্দ্র! যে যে বিষয়কে যে প্রকারে জানে, সে বিষয় তাহার জ্ঞানে সেই প্রকারে সমুদিত হয়। অর্থাৎ তাহাই তাহার সম্বন্ধে সত্য হইয়া দাঁড়ায়[১৬]। তাহার দৃষ্টান্ত—সর্ব্বদা অমৃত ভাবনায় ভাবিত হইলে বিষও অমৃত হয় * এবং মিত্রসম্বেদনে

---

* গরুড় উপাসকেরা বিষ খাইলেও মরে না। তাহার কারণ, তাহাদের ভাবনাব অর্থাৎ আন্তরিক ভাবের (চিন্তার) সামর্থ্য অত্যধিক। তাহাবা বিষকে অমৃত জ্ঞানের জ্ঞেয় করিয়া

পরিভাবিত হইলে শত্রুও মিত্রতা প্রাপ্ত হয়[১৭]। পদার্থ সকল যে ভাবে ও যে আকারে পরিভাবিত হয়, ভাবনার অভ্যাস ও প্রভাব বশতঃ সে সকল সেই ভাবে ও সেই আকারে নিয়তির বশ্য হয়[১৮]। স্ফুরণ-স্বভাব সম্বিৎ৹চিত্তসঙ্কল্পের দ্বারা যে প্রকারে ও যাদৃশভাবে প্রস্ফুরিত হয়, সেই ভাব ও সেই আকার তদনুসারী অর্থক্রিয়াকারীও হয়[১৯]। তাহার দৃষ্টান্ত—যদি নিমেষ পরিমিত কালকে বহুকল্প বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে, সেই নিমেষই বহুকল্পের কার্য্য করিবে। আবার সেই বহুকল্প কাহার কাহার ভাবনায় নিমেষ বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকে। তৎপ্রতি কারণ, সেইরূপই চিৎশক্তির স্বভাব। অর্থাৎ সঙ্কল্পানুসারী হইয়া প্রকাশ পাওয়াই চিৎশক্তির স্বভাব[২০।২১]। তাহার দৃষ্টান্ত, দুঃখিতের রাত্রি কল্পতুল্য ও সুখের কল্পও ক্ষণতুল্য হইয়া অতিবাহিত হইয়া থাকে। অপিচ, স্বপ্নে ক্ষণও কল্প হয়, আবার কল্পও ক্ষণ হয়[২২]। স্বপ্নে "আমি মরিয়াছি, আবার জন্মিয়াছি, বালক ছিলাম, এখন যুবা, দীর্ঘকাল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, শত যোজন পথ পর্য্যটন করিয়াছি" এরূপ অনুভবও হইয়া থাকে; পরন্তু সে সকল এক ক্ষণের অতিরিক্ত নহে[২৩]। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকে দ্বাদশ বর্ষ অনুভব করিয়াছিলেন। লবণ নামে এক রাজা এক রাত্রে শতবর্ষ পরমায়ুর ভোগ সমাপ্ত করিয়াছিলেন[২৪]। যাহা প্রজাপতি ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত, তাহা মনুর পরমায়ু। যাহা বিরিঞ্চির পরমায়ুঃ, তাহা বিষ্ণুর এক দিন[২৫]। যাহা বিষ্ণুর পরমায়ু, তাহা বৃষভধ্বজ শিবের এক দিন। যাহাদের চিত্ত ধ্যান-পরিপাকে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা সমাধিলীন, তাহাদের দিবাও নাই, রাত্রিও নাই, দৃশ্য পদার্থও নাই এবং জগৎও নাই। তাহাদের কেবল সত্য আত্মাই থাকে, অন্য কিছু থাকে না। যদি তুমি কটু ভাবে চিন্তা কর, তাহা হইলে মধুর রসও কটু হইবে[২৬।২৭]। মাধুর্য্য চিন্তা করিলে কটুও মধুর হইয়া থাকে। ঐরূপে শত্রুও মিত্র ও মিত্রও শত্রু হয়[২৮]। * জপ, উপাসনা ও শাস্ত্র শ্রবণাদি বিষয়েও

অমৃতশক্তি সম্পন্ন করে, তাই তাহারা বিষ ভক্ষণে মরে না। বিষের মারকতা শক্তি অবষ্টব্ধ হইয়া যায়।

* এই যে চিন্তার কথা বলা হইতেছে, এ চিন্তা সামান্য চিন্তা নহে। দীর্ঘকাল প্রগাঢ় চিন্তা প্রবাহের ন্যায় ছুটাইতে পারিলে তবে তৎপরিপাকদশায় সেই সেই বিষয়ে সম্প্রজ্ঞাত

ঐ নিয়ম অব্যভিচরিত। অর্থাৎ জপ ও উপাসনাদি অতি অভ্যস্ত হইলে জপ্য (যাহা জপ করা যায় তাহা জপ্য) ও উপাসিততব্য চিন্তারই অনুরূপ হইয়া থাকে। অতএব, যেরূপ সম্বেদন, পদার্থও সেইরূপ। ভ্রান্তিসম্বেদন দ্বারাই নৌকাযাযিগণ, ভ্রমিপীড়িত ও রোগার্ত্তগণ ভূম্যাদির প্রচলন অনুভব করে[২৯।৩০]। কিন্তু যাহাদের ভ্রমসম্বেদন নাই, তাহারা পৃথিব্যাদির প্রচলন অনুভব করে না। সম্বেদনের প্রভাবে শূন্যও আকীর্ণ, নীলও পীত এবং শুক্লবর্ণও রক্তবর্ণ স্বপ্নের ন্যায় দৃষ্ট ও অনুভূত হইয়া থাকে। অপিচ, আপদ্‌ও উৎসব এবং উৎসবও আপদ্ (যথাক্রমে সুখও দুঃখপ্রদ এবং দুঃখও সুখপ্রদ) হয়, ইহা বালক দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। বালকেরা মোহ বশতঃ ঐ ঐ প্রকার অনুভব করে[৩১।৩২]। যক্ষ (ভূতাদি) নাই অথচ তাহা (যক্ষাদি) বিমূঢ়চিত্ত বালকগণের প্রাণবিনাশক হয় এবং স্বপ্নভাবিত মিথ্যা বনিতাও কখন কখন রতিপ্রদায়িনী হয়। আবার কখন কখন কুড্যও আকাশের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, যাহা যে আকারে চৈতন্যে ভাসমান হয়, তাহা সেই আকারেই স্থিরতা প্রাপ্ত হয়[৩৩।৩৪]। সম্বেদনও অসৎ, তথাপি তাহা আকাশসম। তাদৃশ, সম্বেদনই চিদাকাশে মেঘের শতহস্ত পরিমিত ছায়ার ন্যায় ও মিথ্যা নটের নর্ত্তনের ন্যায় জগদ্ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে[৩৫]। এই জগৎ কেবল মনের স্পন্দন (কল্পনা) এবং উক্ত চিদ্গগনে বিস্ফুরিত। সুতরাং ইহা পৃথক্ বস্তু নহে। ইহা মিথ্যা জ্ঞানরূপ পিশাচের প্রস্পন্দে আকৃতিমানের ন্যায় দেখা যায়[৩৬]। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ইহা কেবল মায়া—কেবল মায়া। যেহেতু মায়া, সেইহেতু ইহা ভিত্তিশূন্য ও অবোধক। ইহা সুপ্ত ব্যক্তির অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে মাত্র[৩৭]।

বৎস রাম! যেমন ব্যাপার রহিত স্তম্ভ, আপনাতে শালভঞ্জিকা (খোদাই করা পুত্তলিকা) ধারণ করে, তেমনি, পরমাত্মরূপ মহা-স্তম্ভ স্বয়ং ব্যাপার রহিত হইয়াও আপনাতে সৃষ্টি ধারণ করিতেছেন। যেরূপ মনুষ্য স্বপ্নে আপনাকে মহাযোদ্ধা কর্ত্তৃক বদ্ধ দর্শন করে, সেই মহাযোদ্ধা যেমন সৌষুপ্ত অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ, ঈশ্বর সৃষ্টিও তদীয় অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন শিশি-

---

সিদ্ধি হওয়ার পর চিন্তিতব্য পদার্থ সেই সেই আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাতঞ্জ-লাদি যোগশাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ আছে।

রান্তে অর্থাৎ বসন্তে মার্ত্তিক্য রসই পল্লবপুষ্পাদিস্বরূপে আবির্ভূত হয়, তেমনি, সৃষ্টির আদিতে এই সর্গও সেই পরম পদ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল। যেরূপ কনকের অন্তরে দ্রবত্ব অপ্রকাশিত ভাবে অবস্থিত থাকে,[৩৮।৪১] পরে অগ্নিসংযোগে তাহা প্রকটিত হয়, সেইরূপ, এই সৃষ্টিও সূক্ষ্মরূপে উক্ত পরম পদে অবস্থিত ছিল, জীবের অদৃষ্টযোগে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। যদ্রূপ দেহীর অবয়ব সংস্থান দেহী হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, এই জগৎও পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যেমন কোন ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় অন্য নরের সহিত স্বীয় যুদ্ধ সৎস্বরূপে দর্শন করে, আত্মস্বরূপ এই মায়িক জগৎও সেইরূপ সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব, এই জগৎ, সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি মহাকল্পান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা চিৎস্বভাবান্বিত, ইহাই বিদিত হইবে[৪২।৪৪]। ভাবিয়া দেখ, যেমন এতৎকল্পীয় হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্বকল্পীয় বাসনায় এতৎ জগৎ প্রতিভাসিত হইয়াছে, তেমনি, তৎপূর্ব্বকল্পীয় হিরণ্যগর্ভেরও তৎ পূর্ব্বকল্পীয় বাসনা সঞ্চিত ছিল। সৃষ্টিপ্রবাহ উক্ত ক্রমে অনাদি এবং সকল সৃষ্টিই চিৎসত্তায় অধিষ্ঠিত[৪৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! বিদূরথের এই পৌরগণ ও মন্ত্রিবর্গ, সকলে সমান আকারে প্রতিভাসিত হইবার কারণ কি তাহা বলুন [৪৬]; বশিষ্ঠ বলিলেন, যেরূপ সামান্য বাতলেখা প্রবল বাত্যা হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, সর্ব্বপ্রকার সম্বিদ্ই এক প্রধানতম মুখ্যচিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই চিত্তের অন্য নাম নিয়তি। অর্থাৎ তাহা সংস্কারপক্ষপাতী জীবচৈতন্য। তাদৃশ জীবচৈতন্য ঐরূপ প্রজাপালক, প্রজা, পুরবাসী ও মন্ত্রী প্রভৃতিরূপে পরম্পরানুসারে সমরূপে প্রস্ফুরিত হইয়াছিল, সেই কারণে উক্ত রাজকুলোদ্ভব, রাজা ও সেই সমস্ত বৈদূরথ পুরস্থিত জনগণ, সকলেই ঐ প্রকারেও ঐ বৈদূরথ পুরে প্রস্ফুরিত হইয়াছে[৪৭।৪৯]। চিন্তামণিনামক রত্ন অভীপ্সিতপ্রদস্বভাব কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহই সমর্থ নহে। স্বভাবের কারণ অন্বেষণ অনর্থক। এ স্থলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, যেমন চিন্তামণিরত্ন চিন্তকের মনোরথানুযায়ী স্বভাবে আবির্ভূত হয়, তেমনি, চিত্তসম্পন্ন জীবচৈতন্যও চিত্তসঙ্কল্পের অনুরূপ স্বভাবে সমুদিত হয়। রাজা বিদূরথ পূর্ব্বে "আমি অমুকপ্রকার কুলাচারাদিসম্পন্ন রাজা হইব"

এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার তৎসংস্কারসম্পন্ন সম্বিদ্ সেইরূপে উদিত হইয়াছিল[৫০।৫১]। বিদূরথ কেন, যে যে জীব যে যে সৃষ্টিতে যে যে সময়ে যে যে প্রকারে সমুদিত হয়, তাহারা সকলেই চিৎ-বিধাতার সর্ব্বব্যাপিতা কারণে সর্ব্বত্র স্বচিত্ত সংস্কারের অনুরূপেই সমুদিত হয়। যদি ব্রহ্মাকারা সম্বিৎ তীব্রবেগশালিনী হয় এবং যদি তাহা বিষয় দোষে অকম্পিত ও মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত একরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই সম্বিদ্ই পরম উৎকৃষ্ট স্থৈর্য্য অর্থাৎ মোক্ষ দর্শন করায়[৫২।৫৩]। ব্রহ্মাকারা সম্বিৎ ও জগদাকারা সম্বিৎ এই উভয় মধ্যে যাহার বল অধিক হইবে তাহারই জয় হইবে[৫৪]। যদি বল, জগজ্জ্ঞানই চিরাভ্যস্ত, সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞান দুর্লভ, বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা, ইহাও দেখা যায়, অযত্নজ বেগ অপেক্ষা যত্নজ বেগ অধিক বলশালী এবং সত্য বিজ্ঞানের নিকট মিথ্যা বিজ্ঞান অতীব দুর্ব্বল। অতএব, যদি অত্যধিক যত্নের সহিত ব্রহ্মসম্বিৎ উত্থাপন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার বেগ অযত্নসুলভ জগৎসম্বিদের বেগকে জয় করিবেই করিবে। অপিচ, ব্রহ্মসম্বিৎ বা ব্রহ্মজ্ঞান সত্য এবং জগৎসম্বিদ্ মিথ্যা। সে কারণেও ব্রহ্মসম্বিৎ জগৎসম্বিৎকে সমুদ্রের নদী গ্রাস করার ন্যায় গ্রাস করিবেক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই[৫৫]। যদি দেখ, ব্রহ্মাকারা ও জগদাকারা সম্বিৎ সমান ভাবে উদিত হইতেছে, তাহা হইলে তখন এরূপ যত্ন করিবে, যাহাতে বাহ্যসম্বিদ্ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বাহ্য জ্ঞান দুর্ব্বল হইলেই তাহা ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া যাইবেক[৫৬]। বৎস রামচন্দ্র! যাহা বলিলাম, তাহাই নিয়তির বা চিদ্বিলাসের স্বভাব। পরিচ্ছেদ ভ্রান্তিতে ভ্রান্তিমান জীব সমূহের মধ্যে সকলেই ঐরূপ সম ও বিষম সৃষ্টি আপন আপন সঙ্কল্পের প্রভাবে অনুভব করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। বর্ণিতপ্রকারের সৃষ্টি শত শত ও সহস্র সহস্র অতীত হইয়াছে ও হইবে এবং বর্ত্তমানেও রহিয়াছে[৫৭]। কিন্তু বস্তুতঃ অদ্যাপি কেহ কোথাও যায় নাই, কেহ কিছু নূতন পায় নাই, এবং পাইবেও না। যাহা ছিল তাহাই আছে, বাস্তব কিছু হয় নাই। যে কিছু বলিবে, সমস্তই শান্ত চিদাকাশ[৫৮]। এ সকল স্বপ্নদর্শনের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে বুঝিবে, যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা। যত্ন কর, অবশ্য এক দিন ভ্রমের আশ্রয় (স্বাত্মরূপ) দেখিতে পাইবে। তখন বুঝিবে, এই

জগত্তত্ত্ব কি প্রকার সূক্ষ্ম[৫৯]। যেমন একই বৃক্ষ পত্র, পুষ্প, ফল ও শাখা প্রশাখাদিরূপে অবস্থিত, তেমনি, সেই অনন্ত ও সর্ব্বশক্তি একই বিভু এই বিচিত্র দৃশ্যাকারে বা বিশ্বাকারে অবস্থিত। (পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা শুদ্ধ পক্ষে; পরন্তু এখন যাহা বলা হইল তাহা মায়িক পক্ষে) যে মুহূর্ত্তে বোধ হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই এ সকল বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। তখন প্রকাশ পাইবে, এ সকল কিছুই নহে ও কাহার নহে[৬০।৬১]। মায়িক নানাত্বের দ্বারা বস্তুর বাস্তব নানাত্ব সংঘটন হয় না। সুতরাং এ অবস্থায় দিক্‌কালাদিরূপের অবস্থিতি দেখিলেও ব্রহ্মবস্তু সদা শুদ্ধ অর্থাৎ সদা অবিকৃত। তাহা তমের অর্থাৎ অজ্ঞানের সাক্ষী (সাক্ষী=প্রকাশক)। তাহার উদয় নাই ও অস্ত নাই। তাহা সর্ব্বকালে এক ও অনাদি। তাহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্তও নাই। যেমন, যাহা জল তাহা স্বচ্ছ। তাহা নিরস্তরঙ্গাদি অবস্থায়ও জল এবং অস্বচ্ছ ও তরঙ্গাদি অবস্থায়ও জল। জল ছাড়া অন্য কিছু নহে। তেমনি, যাহা আত্মা তাহা ব্রহ্ম। তাহা ব্রহ্ম অবস্থাতেও আত্মা, জগৎ অবস্থাতেও আত্মা। আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নহে[৬২]। যেমন শূন্যলক্ষণ আকাশের শূন্যতাই তল, মালিন্য, মুক্তাপঙক্তি, কেশগুচ্ছ ও কটাহাকারাদি আকারে বিজ্ঞাত হয়, তেমনি, শুদ্ধবোধলক্ষণ একাদ্বয় চিদাত্মার স্বরূপনিষ্ঠ অবিদ্যাই তুমি, আমি, ইহা, তাহা, ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্র বিশ্বাকারে বিজ্ঞাত হইতেছে[৬৩]।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মহর্ষে! এই আমি, এবং এই জগৎ, এ ভাব বিনা কারণে সহসা যে প্রকারে উদিত হইয়াছিল (মূলে বা প্রথমে) তাহা পুনর্ব্বার বিশদ করিয়া বলুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যত প্রকার ভ্রান্তি হউক, সমস্তই সম্বিদের অর্থাৎ স্বরূপ চৈতন্যের অন্তর্নিবিষ্ট। অপিচ, সমস্তই অন্তরে, বাহিরে নহে। সম্বিৎ সর্ব্বত্র এক। সেইজন্য তাহা সর্ব্বাত্মক ও অজ অর্থাৎ জন্মাদি রহিত। যেহেতু তাহা এক, সেইহেতু জগদ্ভ্রান্তির পৃথক্ কারণ নাই[২]। ঘট, পট ও মঠ প্রভৃতি বিষয়বাচী শব্দ ও সে সকলের অর্থ, অর্থাৎ সেই সকল বিষয়, একই চৈতন্যে অবভাসিত হয়। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, ইত্যাদি ব্যবহার দৃষ্টে আপাততঃ মনে হইতে পারে বটে যে, জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন, পরন্তু ঘটাদি বিষয় বাদ দিয়া বুঝিতে হইলে জ্ঞানের (চৈতন্যের) একত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। একই চৈতন্যরূপ আধারে ইহা ঘট, ইহা পট, ইত্যাদি বিবিধ বা বিভিন্ন ভাব উদিত হইতেছে। বস্তুতঃ সে সকল ভেদ, চৈতন্যের নহে কিন্তু মনোবৃত্তির[৩]। আরও সূক্ষ্ম দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ঐ সকল বৃত্তিজ্ঞান বুদ্ধির অনতিরিক্ত। যেমন কটক হেম হইতে ও তরঙ্গ জল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ, এই জগৎও ঈশ্বর হইতে অপৃথক্। কটকাদি যেমন হেমাত্মক; অথচ হেমে কটকত্ব নাই, তেমনি, এই জগৎও ব্রহ্মাত্মক; অথচ ঈশ্বরে জগত্ত্ব নাই[৪।৫]। যেমন অবয়বী একই, অবয়ব অনেক, তেমনি, একই নিরাকার চৈতন্যের অনেক আকার। কিন্তু সে সকল আকার বাস্তব নহে। অর্থাৎ মায়িক। কেননা চৈতন্যই সর্ব্বাত্মক[৬]। প্রাণিগণের অন্তঃস্থ অজ্ঞানই এই জগৎ ও এই আমি ইত্যাদি আকারে উক্ত পরব্রহ্মরূপ আধারে প্রতিভাত হইতেছে। যেমন স্ফটিকশিলায় প্রতিবিম্বিত বনশৈলাদি স্ফটিক শিলা হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি, অন্তঃস্থ চৈতন্যে আরোপিত "এই জগৎ" "এই আমি" ইত্যাদি প্রতিভাস সেই ঘনচৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে[৭।৮]। যেমন সলিলরাশি ও তরঙ্গমালা জলাভিন্ন হইয়া অবস্থিতি করে, তেমনি, অন্তরনু-

ভূয়মান মিথ্যা সৃষ্টি অর্থাৎ দৃশ্য প্রপঞ্চ উক্ত পরব্রহ্মে অপৃথগ্ভাবে অবস্থিতি করিতেছে[৯]। প্রভেদ এই যে, সাবয়ব মহাসলিলে ঐ সাবয়ব তরঙ্গমালা সকল তাহার অবয়বরূপে অবস্থিতি করিতেছে, পরন্তু নিরবয়ব পরব্রহ্মে এই সৃষ্টি তাঁহার অবয়বরূপে অবস্থিতি করিতেছে না। বিস্পষ্ট সাবয়ব জগৎ কি প্রকারে নিরবয়ব ব্রহ্মের অবয়ব হইবে? অতএব, অবয়বরূপে অবস্থিত নহে, কিন্তু মায়িক প্রতিভাস রূপে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সৃষ্টি পরব্রহ্ম অথবা পরব্রহ্মে সৃষ্টি, দুয়ের কিছুই নহে। তাঁহাদের দৃষ্টিতে একই সত্তা বিদ্যমান, সৃষ্টি সেই সত্তা হইতে অভিন্ন[১০]। বায়ু যেমন আপনিই আপনার স্পন্দের কারণ হয়, মুখাবস্থিত চক্ষুঃ (দৃষ্টি) যেমন দর্পণপ্রতিহত ও পরাবৃত্ত হইয়া মুখ অবলোকন করে, সেইরূপ, পরমার্থচিদ্রূপ পরব্রহ্মও আপন পারমার্থিক রূপ আপন অজ্ঞানে আবৃত করিয়া আপনার সম্বিত্তির দ্বারা আপনাকে প্রপঞ্চরূপী কল্পনা করেন[১১]। সেই প্রথম কল্পনাকালে, সেই মায়াসম্বলিত পরব্রহ্ম, প্রথম আপনাকে ছিদ্রের ন্যায় (ছিদ্র=ফাঁক)। চেতিত করেন, তাহাতে যে ভাব ব্যক্ত হয়, সেই ভাবকে শাস্ত্রকারেরা শব্দতন্মাত্রের অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন[১২]। অনন্তর স্থির পবন যেমন এক এক সময়ে স্পন্দতা অনুভব করে, সেইরূপ, সেই আকাশাভিমানী ব্রহ্মও তৎপরে স্পর্শতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা আপনাকে অনিল বলিয়া অনুভব করেন। সেই ক্রমেই ব্রহ্ম অনিল স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। অনন্তর রূপতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা তেজঃস্বরূপে প্রকাশিত হন, শাস্ত্রকারেরা সেই প্রকাশ'কে তেজের উৎপত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১৩।১৪]। তদনন্তর রসতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা তেজোহভিমানী পরব্রহ্ম আপনাকে সলিল ভাবে অনুভব করেন। সেই ক্রমে দ্রবত্ববৎ জলের সৃষ্টি হইয়াছে[১৫]। তদনন্তর সেই সলিলাভিমানী চিদ্ব্রহ্ম গন্ধতন্মাত্রসংস্কার দ্বারা আপনাতে ঘনঘন পার্থিব ভাব অনুভব করেন এবং তদনুসারে ব্রহ্মসত্তাত্মিকা পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে[১৬]। * এস্থলে এমন মনে করিতে পারিবে না যে, যেই চক্ষুর উন্মেষ সেই

* এ সকল সংস্কার পূর্ব্বকল্পীয় অনুভবপ্রভব। পূর্ব্বকল্পেও চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্ম আপনাতে ক্রমান্বয়ে আপন মায়ার দ্বারা ঐ ঐ বিকার বা ভাব দেখিয়াছিলেন, অনুভব করিয়াছিলেন, তাই সে সকলের সংস্কার তদীয় মায়ায় অবশেষিত হইয়া ছিল।

জগদর্শন, সুতরাং ঐ প্রকারের ক্রমিক আরোপ কিরূপে সঙ্গত হইবে? এ সম্বন্ধে বোধ হয়, এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, এক নিমেষের লক্ষভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে পরব্রহ্মের পূর্ব্বোক্ত তন্মাত্রাদিরূপ প্রকট হইয়াছিল পরন্তু তাহা মায়িক আরোপের প্রভাবে কোটি কোটি কল্প বলিয়া সর্গপরম্পারায় প্রথিত হইয়া আসিতেছে। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম কালে কল্প কল্পান্ত ভ্রম হওয়া অবিরুদ্ধ। কেননা স্বপ্নেও ক্ষণকে কল্প বলিয়া অনুভূত হইতে দেখা যায়[১৭]। বিশুদ্ধ ও সংস্বরূপ অদ্বয় পরব্রহ্মই নিত্য স্বপ্রকাশ, অনাময় ও নিরাধার। তাহাই স্বীয় অন্তঃস্থ দৃশ্য ও এ সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। সেই সৎই বোধকালে অর্থাৎ ভ্রান্তির অপগমে মুক্ত এবং অবোধ দশায় সৃষ্টি ও প্রলয়[১৮।১৯]। যেহেতু ইনি সর্ব্বশক্তিমতী মায়ার আশ্রয়, সেইহেতু, যে যে মায়িক জীব ইহাকে যে যে ভাবে দেখে, তদ্বলে সেই সেই ভাবই ইহাতে মায়ার দ্বারা বিবর্ত্তিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না[২০]। সেই কারণে বলিতেছি, এই জগৎ সেই ব্রহ্মের বিলাসানুভব ব্যতীত অন্য আর কিছু নহে। মনঃপ্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয় বহির্মুখী বৃত্তির দ্বারা যাহা যাহা দেখে ও শুনে ও অনুভব করে, সে সমস্ত কেবল নাম ও কেবল কল্পনা, সুতরাং অসত্য[২১]। যেমন বায়ুতে গতি, তেমনি, পরব্রহ্মে জগৎ। বায়ু যেমন সঞ্চরণ কালে সত্য অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু স্থিরভাবে অবস্থিত থাকিলে সত্য বলিয়া অর্থাৎ আছে বলিয়া অনুভূত হয় না, সেইরূপ, এই জগৎও অজ্ঞানতার দ্বারা সত্য অর্থাৎ আছে বলিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অসৎ অর্থাৎ নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়[২২]। তেজ'কে আলোক দৃষ্টিতে না দেখিলে (আলোক ভাবিলে) তাহা অসত্য এবং তেজ ও আলোক অভিন্ন, এ ভাবে দেখিলে তাহা সত্য। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ভেদভাবে দেখিলে ভিন্ন, অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে অভিন্ন। যেমন তেজঃপদার্থের প্রকার ভেদ আলোক, তেমনি, চিদ্‌ব্রহ্মের প্রকারভেদ এই বিশ্ব। অতএব, বিশ্ব দৃষ্টিভেদে সত্য ও অসত্য উভয়রূপে প্রতীয়মান হয়[২৩]। যেমন মৃত্তিকায় ও কাষ্ঠে পুত্তলিকা ও মসীতে বর্ণ অনুৎকীর্ণ অবস্থাতেও অবস্থিত থাকে, সেইরূপ, এই জগৎও এক সময়ে পরব্রহ্মে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত ছিল[২৪]। ইদানীং সেই পরব্রহ্মরূপ মরুভূমিতে এই

ত্রিজগৎরূপ অসত্য মৃগতৃষ্ণিকা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে[২৫]। সেই ব্রহ্ম চিন্ময়তা প্রযুক্ত কখন সৃষ্টিপ্রপঞ্চাকারে প্রকাশিত হন, কখন বা বীজে বৃক্ষাবস্থানের ন্যায় ইহাকে আপনাতে প্রলীন রাখেন[২৬]। যেমন ক্ষীরে মাধুর্য্য, মরীচে তীক্ষ্ণতা, জলে দ্রবত্ব ও বায়ুতে স্পন্দন অনন্যরূপে অবস্থিতি করে, সেইরূপ, পরমাত্মাতেও এ সকল অভিন্নরূপে বিদ্যমান আছে। সুতরাং এই সৃষ্টি চিৎস্বরূপ পরমাত্মা-রই বিবর্ত্তিত রূপ[২৭।২৮]। যাহা জগৎ, তাহা ব্রহ্মরত্নেরই প্রকাশ। যেহেতু ইহা ব্রহ্মের অনতিরিক্ত, সেইহেতু ইহা অকারণ অর্থাৎ উৎপত্তি-বর্জ্জিত[২৯]। বাসনাময়চিত্তের দ্বারাই ইহার উদয় হইয়াছে, সুতরাং পুরুষকার দ্বারা (সমাধি ভাবনাদির দ্বারা) উক্ত বাসনাময় মনকে বিনষ্ট (ব্রহ্মে বিলীন) করিতে পারিলে আর ইহার উদয় হইবে না[৩০]। বস্তুতঃই এই জগৎ কোনও কালে উদিত বা অস্তমিত হয় না। কেননা ইহা সেই কেবল শান্ত অজ ব্রহ্ম[৩১]। যত দিন চিত্ত থাকিবে তত দিনই চিত্ত হইতে চিৎকণাত্মক জীবের জ্ঞানে সহস্র সহস্র সৃষ্টি প্রতিভাত হইবে। বিনা মায়ায় এরূপ সৃষ্টির সম্ভাবনা কি?[৩২] যেমন ঊর্ম্মী বল আর বুদ্বুদ বল জলের বা সলিলের অন্তরে গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয় ভাবেই অবস্থিতি করে, তেমনি, জীবের অন্তরে এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষু-প্ত্যাদিপরম্পরারূপিণী সৃষ্টি, প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় ভাবে স্থিতি করিতেছে[৩৩]। জীবগণের যদি বিষয়ভোগে অল্পমাত্রও অরতি জন্মে, তাহা হইলে সেই অরতি ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে তাহাকে উক্ত পরম পদ প্রাপ্ত করায়[৩৪]। স্পষ্টই দেখা যায়, জীব যাহাতে যাহাতে বিরক্ত হয়, তাহা তাহা হইতেই বিমুক্ত হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে জ্ঞান ও বৈরা-গ্যের দৃঢ়তা করিয়া তদ্দ্বারা দেহাদি বিস্মৃত হইলে ও অহম্ভাবের প্রতি বিরক্ত হইলে অবশ্যই জীব অহম্ভাব হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে। অহম্ভাব বিমুক্ত হইলে তখন আর কে জন্মমরণ ভ্রান্তি প্রাপ্ত হইবে? বা অনুভব করিবে?[৩৫] যাহা ঈশ্বরচৈতন্যাত্মিকা, জীবচৈতন্যাত্মিকা, অরূপিকা, অনামিকা ও নিকৃষ্টোপাধিশূন্যা চিৎ, তাহাকে যিনি আত্ম-অভেদে অবগত হইতে পারেন, তিনিই জয়লাভে সমর্থ হন[৩৬।৩৭]। এই বিশ্ব পদ্মজ ব্রহ্মার অহংময়ীভাবনাবিশিষ্ট চিৎসঙ্কল্প হইতে বিস্তৃত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, বিষ্ণুর এক নিমেষ বিধাতার দ্বিসপ্ততি

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, কল্পনার এমনি প্রভাব যে, এক পরমাণুকে ও এক নিমেষকে কল্পনার দ্বারা লক্ষ ভাগ করিলে তাহার একই ভাগে ঈদৃশ সহস্র ব্রহ্মাণ্ড ও সহস্র কল্প সত্যবৎ প্রতীত হইতে পারে। সেই-জন্যই বলিতেছি, এ সমস্তই ভ্রান্তি[১।২]। যেমন সলিলরাশির অন্তরে প্রবাহ ও আবর্ত্ত, তেমনি, এই বর্ত্তমান ও সেই সেই অনাগত ও অতীত সৃষ্টিপরম্পরা জীবের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে[৩]। যেমন মরু-তরঙ্গিণী মিথ্যা, তেমনি, সৃষ্টিপরম্পরাও মিথ্যা[৪]। অধিক কি বলিব, স্বাপ্ন ও ঐন্দ্রজালিক নগরী এবং ঔপন্যাসিক পুরী ও পর্ব্বতাদি এবং সঙ্কল্প-রচিত রাজ্য যেমন অসত্য হইলেও অনুভূতির গোচর হয়, তেমনি, সৃষ্টিপরম্পরা অসত্য হইয়াও অনুভূতিগোচর হইতেছে[৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে তত্ত্ববিদ্‌শ্রেষ্ঠ! জনগণ সম্যক্ বিচার দ্বারা ভ্রমপরিশূন্য ও পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট নির্ব্বিকল্প বিজ্ঞান লাভ করেন অথচ তাহারা ভ্রমমূলক দেহ ধারণ করেন। তাহার কারণ কি এবং দৈবই বা তাঁহাদের সম্বন্ধে কিরূপ, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[৬।৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! স্পন্দরূপিণী অবশ্যম্ভাবিনী সকলকল্পগামিনী ব্রাহ্মী চিৎশক্তিই আদি মহানিয়তি। * উক্ত মহানিয়তিই আদি সৃষ্টি-কালে মঙ্গলময় অক্ষয় পরব্রহ্মের সঙ্কল্পরূপে উদ্রিক্তা হয়। অর্থাৎ তিনি বহ্নি উষ্ণ ও ঊর্দ্ধজ্বলনস্বভাব হউক, জল দ্রবশীতলস্বভাব হউক, ইত্যাদি আকারের সংকল্প ধারণ করেন[৮।৯]। অপিচ, উক্ত মহানিয়তি মহাসত্য, মহাচিতি, মহাশক্তি, মহাদৃষ্টি. মহাক্রিয়া, মহোদ্ভব, মহাস্পন্দ ও মহাত্মা

---

* প্রাণীর অদৃষ্ট, বস্তুর শক্তি, এতদ্দ্বয় সহকৃত ঈশ্বরিক সঙ্কল্পের নাম মহানিয়তি ও মহাদৈব। তদ্দ্বারা সমস্ত ব্যবহারের অকাট্য ব্যবস্থা নির্ব্বাহ হয়। এবং জ্ঞানীর দেহধারণ করাও উক্ত মহানিয়তির অধীন। নিয়তির অন্তর্গত "প্রারব্ধ কর্ম্ম, ভোগ ব্যতীত ক্ষয় পাইবে না" এই নিয়ম দ্বারা জ্ঞানীর দেহ কিছু কাল বিধৃত থাকে। স্পন্দরূপিণী কথার অর্থ— সর্ব্বজগদ্ব্যবস্থিতি কারক· ব্যবহারপরম্পরা। অর্থাৎ নিয়মিত সুশৃঙ্খলায় জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া।

ইত্যাদি নামে খ্যাত হইয়া থাকে[১০।১১]। অতএব, সর্ব্বগ ও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম উক্তনিয়তির দ্বারা দৈত্য, দেব ও নাগাদি এবং তৃণ, বল্লী, তরু ও গুল্মাদির ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন এবং সে ব্যবস্থা কল্পান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রস্ফুরিত থাকে, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না[১২।১৩]। *

যদিও কোন অবস্থায় ব্রহ্মসত্তার অন্যথা হয় তথাপি নিয়তির অন্যথা হয় না। আকাশে চিত্রলিপি যদ্রূপ অসম্ভব, নিয়তির অন্যথা তদ্রূপ অসম্ভব। (তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় পরমার্থদৃষ্টি সুতরাং তৎকালে ব্রহ্মাদ্বৈত বা কেবল ব্রহ্মসত্তা। পরন্তু সংসারাবস্থায় ব্যবহার দৃষ্টি, সেজন্য তৎকালে ব্রহ্মসত্তার অন্যথা ভাব। অর্থাৎ ব্যবহার দশায় সৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মসত্তার প্রচ্ছাদন হইয়া থাকে)। ব্রহ্ম অনাদি অমধ্য অসীম ও অচল হইলেও অনভিজ্ঞের মলিন জ্ঞানে সসীম, সাদি ও সমধ্য বলিয়া অবভাসিত হন। কিন্তু বিরিঞ্চি প্রভৃতি আত্মবিৎ জ্ঞানীর জ্ঞানে বর্ণিত প্রকারের সৃষ্টি ও নিয়তি সমস্তই ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে[১৪।১৫]। যেমন স্ফটিকমণির অন্তরস্থ রেখাদি (দাগ বা কলঙ্কাদি) তাহার নিজ স্বচ্ছতার দ্বারা প্রকাশ পায়, তেমনি, সৃষ্টিসংস্কারযুক্তমায়াসমন্বিত প্রজাপতি ব্রহ্মাও স্বমায়ান্তঃস্থ সৃষ্টিনিয়তি বিজ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ সৃষ্টি করেন[১৬]। যেমন অঙ্গীর অঙ্গ (সাবয়বীর অবয়ব) দেহেরই অন্তর্ভূত, তেমনি, নিয়তি প্রভৃতিও মায়াসহায় ব্রহ্মের (হিরণ্যগর্ভের) অন্তর্ভূত[১৭]। অপিচ, তাহারও অন্য নাম দৈব এবং তাদৃশ দৈব সর্ব্বকালব্যাপী ও সর্ব্ববস্তুগামী হইয়া শুদ্ধস্বভাব ব্রহ্ম চৈতন্যে অবস্থিতি করিতেছে[১৮]। "অমুকের দ্বারা অমুক প্রকারে অমুক সময়ে অমুক প্রকার হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না" ইত্যাকার নিয়মকেও অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবিতাকেও দৈব বলা যায়, এবং তাদৃশ দৈব শাস্ত্রবক্তা দিগের নিকট অদৃষ্ট[১৯]। পূর্ব্বোক্ত দৈব ও অনন্তরোক্ত দৈব অর্থাৎ নিয়তি ও অদৃষ্ট পরস্পর পরস্পরের সহায়। সুতরাং বলা যায়, দৈব ও পুরুষকার বিশেষ এবং তাদৃশ দৈবই তৃণ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতি। হে রামচন্দ্র! বর্ণিতপ্রকারের নিয়তি উক্ত প্রকারে ভূতগণের আদি এবং এই জগৎ ও কাল প্রভৃতি সমস্তই উক্ত প্রকারের দৈব বা

* দৈত্যেরা ক্রূরাদি স্বভাব, দেবতারা সৌম্যমূর্ত্তি প্রভৃতি, নাগেরা সেই সেই প্রকার এবং তৃণাদি জঙ্গমভাবাপন্ন, ইত্যাদি ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সমানরূপে বাব স্থিত থাকিবে, ইহাও নিয়তি।

নিয়তি[২০]। অপিচ, যে নিয়তির কথা বলিলাম, সেই নিয়তির দ্বারাই পুরুষকারের ও পুরুষাদৃষ্টের অস্তিত্ব এবং পুরুষকারের ও পুরুষাদৃষ্টের দ্বারা নিয়তির সত্তা অর্থাৎ অবস্থিতি দৃষ্ট বা অনুভূত হইতেছে। যাবৎ ত্রিভুবন তাবৎ ঐরূপ জগদ্ব্যবস্থা এবং মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ ত্রিভুবনের অভাব-কালে উক্ত দৈব দ্বয়ের (নিয়তির ও অদৃষ্টের) ব্রহ্মে একাত্মভাব (মেলন বা ঐক্য) সম্পন্ন হয়[২১]। অতএব, নিয়তি (দৈব) ও পৌরুষ (পুরুষকার) উভয়ের সত্তা (অস্তিত্ব) জীবাদৃষ্টমূলক, আবার জীবা-দৃষ্টের ও নিয়তির সদ্ভাব পুরুষকারমূলক। নিয়তি ঐরূপ নিয়মে ও ক্রমে অস্মিতা লাভ করিয়া রহিয়াছে[২২]। হে রাঘব! অধিক কি বলিব, তুমি যে শিষ্য হইয়া আমার উপদেশ গ্রহণ করিতেছ, ইহাও নিয়তিকৃত। দৈব কি? পুরুষকার কি? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ যাহা বলিলাম, তুমি তাহা প্রতিপালন করিবে। এ সকল নিয়তি বলিয়া মান্য ও প্রতিপালন করিলে তাহা তোমার পুরুষকার বলিয়া গণ্য হইবে[২৩]। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কেবল দৈবপরায়ণ। তাহারা যে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষকারত্যাগী হয় (অজগর ব্রত অবলম্বন করে), তাহাও নিয়তিকৃত। অর্থাৎ তাহাও তাহাদের প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারজনিত নিয়তির (অদৃষ্টের) ফল[২৪]। পুরুষ বা জীব যদি পূর্ব্ব হইতেই (কল্পারম্ভ হইতেই) কেবল ও নিষ্ক্রিয় হইত, বা থাকিত, তাহা হইলে বুদ্ধি, বুদ্ধিপ্রযুক্ত কর্ম্ম, তৎপ্রযুক্ত ভূতভৌতিক বিকার অর্থাৎ আকৃতি ও সংস্থান, এ সকল কিছুই হইত না বা থাকিত না। অতএব, কল্পাদি ও কল্পান্ত মধ্যে যে কিছু ব্যবহার ও যে কিছু জগদ্-ব্যবস্থা, সমস্তই পুরুষক্রিয়ামূলক সুতরাং নিয়তির অধীন[২৫]। অধিক কি বলিব, যাঁহারা ঈশ্বর (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) তাঁহারাও নিয়তি উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন। কেননা নিয়তি অবশ্যম্ভাবিনীরূপিণী। নিয়তি অবশ্যম্ভাবিনী হইলেও তাহার ফলাফল পুরুষকারমূলক। অর্থাৎ যে নিয়তিঃ পুরুষকারে পরিণত হয় সেই নিয়তিরই ফল উত্তর কালে দৃষ্ট হয়। অতএব, যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা "নিয়তি যাহা করিবে তাহাই হইবে" এরূপ ভাবিয়া পুরুষকার পরিত্যাগী হন না[২৬।২৮]। নিয়তি পুরুষকারে পরিণত না হইলে তাহা নিষ্ফল হয় এবং পুরুষকারে পরিণত হইলে তাহা সফল হয়। যদি বল, পুরুষকার রহিত অজগর

বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহাতেও তৃপ্তিফল দেখা যায়, তদুত্তরে আমার বক্তব্য—তাহাতেও গ্রাস গ্রহণরূপ * পুরুষপ্রযত্ন থাকে। যে গ্রাসগ্রহণাদি প্রযত্ন পরিত্যাগ করে সে কদাচ তৃপ্তিফল পায় না। সে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া কিঞ্চিৎকাল জীবিত থাকে, তাহাতেও প্রাণ পরিচালনাত্মক প্রযত্ন বিদ্যমান থাকে[২৯]। যদি এমন বল যে, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রাণ প্রচলনও থাকে না, সে অবস্থা সর্ব্ববিশ্রান্তিদায়িনী, তখন সর্ব্বপ্রকার পুরুষকারের বিরাম দৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য—সেই অবস্থাই সর্ব্বপ্রকার পুরুষপ্রযত্নের শেষ ফল, অর্থাৎ তাহাই মোক্ষ। যদিও তৎকালে পুরুষকারের বিরাম হয়, তথাপি, তৎপূর্ব্বে তাহাকে প্রাণনিরোধাদি পুরুষকার অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেই অত্যুত্তম মোক্ষপদ অপৌরুষেয় নহে। তাহাও প্রাণনিরোধাদি (যোগানুষ্ঠান) রূপ পুরুষকারের ফল[৩০]। অতএব, হে রাঘব! সাধন কালে শাস্ত্রীয় পুরুষকার অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ এবং সিদ্ধি কালে তৎফলস্থানীয় অত্যন্ত নিষ্কর্ম্মাত্মক মোক্ষ পরম শ্রেয়ঃ। সাধ্য ও সাধন এই দুই অবস্থার মধ্যে যাহা জ্ঞানীদিগের অবস্থা তাহা অত্যন্ত প্রবল। অর্থাৎ মহাত্মাদিগের সেই সিদ্ধিরূপ নিয়তি নির্দ্দুঃখা (যে নিয়তিতে দুঃখের লেশ পর্য্যন্তও নাই বা থাকে না তাহা নির্দ্দুঃখা) এবং অবিদ্যাবিনাশিনী বলিয়া প্রবলা[৩১]। তাদৃশী নির্দ্দুঃখা নিয়তি কি? তাহা ব্রহ্মসত্তারই স্ফূর্ত্তিবিশেষ। যদি যত্নের দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় পুরুষকার দ্বারা নির্দ্দুঃখা নিয়তি স্থায়ী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে যার পর নাই পরিশুদ্ধ পরম পদ বা পরমাগতি সুসম্পন্না হয়[৩২]। বৎস রাম! বর্ণিত প্রকারের নিয়তি বিভাগ ব্রহ্মেরই বিলাস। অর্থাৎ ব্রহ্মই সেই সেই প্রকারে স্ফুরিত হইতেছেন। যেমন তৃণ বল, লতা বল, গুল্ম বল, সমস্তই পার্থিব রসের বিস্ফুরণ, তেমনি, নিয়তি কেন, সমুদায় জগৎসত্তা সেই পরব্রহ্মের মায়িক প্রস্ফুরণ[৩৩]।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

---

* অজাগর সর্প চুপ করিয়া থাকে। সম্মুখে কিছু আসিলে তখন তাহা গ্রাস করিয়া ফেলে। গ্রাস করা প্রযত্ন বা মুখব্যাদানাদি চেষ্টা ব্যতীত হয় না। সুতরাং অজগর ব্রতেও কিছু না কিছু পুরুষকার বিদ্যমান থাকে।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রস্তাবিত ব্রহ্মতত্ত্বের বিবরণ এই যে, তাহাই এই নানাপ্রকার, তাহাই সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্র বিরাজিত। তিনি সর্ব্বাকার, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বগ ও সর্ব্বস্বরূপ[১]। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা। এই আত্মা সর্ব্বশক্তিত্ব প্রযুক্ত কোথাও চিৎশক্তি, কোথাও বা জড়শক্তি এবং কোন আধারে উল্লাসশক্তি স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আবার কোথাও বা কোনওপ্রকার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন না[২]। তিনি যখন যে প্রকার ভাবনা করেন; তখন সেই প্রকার দেখেন বা সেই প্রকারে দৃষ্ট হন[৩]। বস্তুতঃ, সর্ব্বশক্তি পরব্রহ্মের যে যে শক্তি যে যে প্রকারে সমুদিত হয় তিনি সেই সেই প্রকারই হন[৪]। তাঁহার যে নানারূপিণী শক্তি আছে, তাহা স্বভাবতঃ তদভিন্না হইলেও ভেদ কল্পনা পূর্ব্বক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যবহার দৃষ্টিতে তদীয় সেই শক্তি নানারূপিণী; পরন্তু পরমার্থ দর্শনে তাহা একই[৫]। ভেদকল্পনা ব্যবহারাশ্রিত। সেজন্য তাহা পরমাত্মায় অনবস্থিত[৬]। যেমন জলে ও তরঙ্গে, জলে ও সাগরে, অলঙ্কারে ও সুবর্ণে, অবয়বে ও অবয়বীতে ভেদ অবাস্তব, একতাই বাস্তব, তেমনি, ব্রহ্মে ও ব্রহ্মশক্তিতে ভেদ অবাস্তব এবং অভেদই বাস্তব[৭]। যাহা যে প্রকারে চেতিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধি যে প্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম সেই প্রকারই হন বটে; পরন্তু তাহা রজ্জুর সর্প হওয়ার অনুরূপ[৮]। তিনি সর্ব্বাত্মা বলিয়া সর্ব্বসাক্ষী অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী[৯]। ব্রহ্মই এই বিশ্বের আকারে বিস্তৃত রহিয়াছেন। সৃষ্টিশক্তি ও স্রষ্টা বিভিন্ন, এ সকল অজ্ঞানীর কল্পনা, পারমার্থিক নহে[১০]। অনাদি অনন্ত শক্তি মিথ্যাজ্ঞান সাধু বা অসাধু যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া আলোচনা করে, তদুপহিত চিৎ তাহাই করেন ও ভবিষ্যতে তাহার ফল দর্শন করেন। অতএব, ব্রহ্মচৈতন্যই প্রকাশমান আছে, অন্য কিছু নাই[১১]।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাঘব! পরমাত্মাই মহেশ্বর। তিনি সর্ব্বব্যাপী, আদ্যন্তবিবর্জ্জিত, স্বচ্ছ, স্বপ্রকাশ ও আনন্দস্বরূপ। সেই শুদ্ধচিন্মাত্র পরমাত্মা হইতে চিত্তশালী জীব (ব্রহ্মা) সমুৎপন্ন ও তাহার চিত্ত হইতে জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে[১।২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! কি প্রকারে স্বপ্রকাশ অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জীবের পৃথক সত্তা উৎপন্ন হয়?[৩] বশিষ্ঠ বলিলেন, চিন্ময় আনন্দস্বরূপ অব্যয় একমাত্র ব্রহ্মই নিত্যাবস্থিত। সেই শুদ্ধ শান্ত পরম পদ পণ্ডিতগণেরও অনির্দ্দেশ্য। তাদৃশ পরব্রহ্মের, যে রূপ সম্বিদাত্মক প্রাণধারণাত্মক ও চলনশক্তিযুক্ত, * সেই রূপ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীব নামের নামী। সেই চিদ্ব্যোমস্বরূপ পরমাদর্শে এই অনুভবাত্মক অসঙ্খ্য জগৎ প্রতিবিম্বিত হইতেছে[৪।৭]। হে রাঘব! যেমন বায়ুশূন্য সমুদ্রের ও দীপের যৎকিঞ্চিৎ প্রচলন, তেমনি, ব্রহ্মের যৎকিঞ্চিৎ প্রস্ফুরণ জীব[৮]। অঙ্গ! নির্ম্মল নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রচ্ছাদিত হইলে যে অল্পসম্বেদন অর্থাৎ পরিচ্ছেদ ভ্রান্তি (অহং) উদিত হয়, জীবকে তুমি তদাত্মক বলিয়া জানিবে। সেই জীবরূপ পরিচ্ছেদ ব্রহ্মের স্বাভাবিক প্রস্ফুরণ[৯]। যেমন বায়ুর চঞ্চলতা, কৃশানুর উষ্ণতা ও তুষারের শীতলতা স্বভাবসিদ্ধ, আত্মার জীবভাবও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ[১০]। সেই চিৎস্বরূপ আত্মতত্ত্বের স্বাভাবিক সম্বেদনভাবই জীব[১১]। অগ্নিকণা যেরূপ ইন্ধনাদির আধিক্য দ্বারা উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ, বাসনা দার্ঢ্যের দ্বারা পরব্রহ্ম পরম হইলেও অহন্তাবস্থ প্রাপ্ত হন[১২]। দর্শকের চক্ষুঃ আকাশের যে পর্য্যন্ত গমন করে, অর্থাৎ দৃষ্টি যে পর্য্যন্ত বিস্তার করে, সেই পর্য্যন্ত আকাশকে সে নির্ম্মল নিরাকার দেখে। পরন্তু দর্শকের

---

* যে রূপ অবিদ্যাংশ সত্ত্ব গুণের উদ্রেক নিবন্ধন উদ্ভবের ন্যায় প্রকটিত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধির আবির্ভাবে পরব্রহ্মের পরমত্ব প্রচ্ছাদন ও পরিচ্ছিন্নপ্রায়তা ঘটনা হয়, ব্রহ্মের সেই আবির্ভূত রূপটী জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা অবিদ্যার উদ্রেক ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

দৃষ্টি আকাশের যে ভাগ বিষয় করিতে অসমর্থ হয়, সে ভাগে মালিন্য না থাকিলেও দর্শক সে ভাগকে ভ্রান্তিক্রমে মলিন দেখে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অহন্তাবশূন্য জীবও স্বাত্মদর্শনের অভাবে আপনাতে অহন্তাব ভাবনা করে[১৩]। সে অহন্তাব পূর্ব্বসঙ্কল্পসংস্কার দ্বারা উদিত হয়, কারণান্তরে নহে। অপিচ, সেই অহন্তাব বাতস্পন্দের ন্যায় দেশকালাদিরূপে প্রস্ফুরিত ও চিত্ত, জীব, মন, মায়া ও প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে[১৪।১৬]। তাদৃশ চিত্তের সঙ্কল্পাত্মক চিত্ত ভূততন্মাত্রা কল্পনা করতঃ পঞ্চতা প্রাপ্ত এবং সেই পঞ্চতাপ্রাপ্ত চিত্ত সঙ্কল্প দ্বারা বীজের অঙ্কুরত্ব প্রাপ্তির ন্যায় ক্রমশঃ তেজস্কণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (তেজঃকণ=সূক্ষ্ম বা দুর্লক্ষ্য চেতন)। অনন্তর সেই তেজস্কণ জলের ঘনীত্ব প্রাপ্তির ন্যায় কল্পনা দ্বারা কথন অণ্ডতা প্রাপ্ত, কথন দিব্যদেহভাবনা করতঃ শীঘ্র দেবাদিদেহত্ব, কথন সঙ্কল্পানুসারে দেবত্ব ও গন্ধর্ব্বত্ব, কথন স্থাবরত্ব, কথন জঙ্গমত্ব, কথন বা আকাশচর পক্ষিত্ব ও রাক্ষসত্ব, এবং কথন পিশাচাদিত্ব প্রাপ্ত হয়[১৭।২২]। যিনি অভিহিত প্রকারে অবস্থিত, তাঁহা হইতেই সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতির উৎপত্তি ও প্রজাপতি হইতে এই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে[২৩]। প্রজাপতি যাহা সঙ্কল্প করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তৎস্বরূপে পরিণত হন। সুতরাং তিনি চিৎস্বরূপতা প্রযুক্ত সর্ব্বকারণত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। অনন্তর সংসারের কারণ হইয়া কার্য্যনির্ম্মাণে অবস্থিত হন[২৪।২৫]। যেমন জল স্বকীয় স্বভাবের বশে ফেনরূপে প্রকাশ পায়, তেমনি, স্বভাবের প্রভাবে চিৎ হইতেই চিত্তের প্রস্ফুরণ হয়। জলে কোন কিছু আবদ্ধ হয় না, কিন্তু জলোদ্ভব ফেনে নৌকাদির বদ্ধতা হয়, তেমনি, স্বতঃবদ্ধ স্বভাব না হইলেও তিনি কর্ম্মরূপ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হন[২৬]। চিৎ বদ্ধ হয় না, কিন্তু চিত্ত বদ্ধভাব ধারণ করে। আমরা যেমন প্রথমে নিঃসঙ্কল্প থাকি, পরে সঙ্কল্প দ্বারা অন্তরে ঘটপটাদি রচনা করি, পশ্চাৎ তাহাই বাহিরে নির্ম্মাণ করি, তেমনি, জীবও, নিষ্ক্রিয়ভাব হইতে উত্থিত হইয়া সঙ্কল্প কল্পনা করেন, পশ্চাৎ কর্ম্মকলাপ বিস্তৃত করেন[২৭]। যেমন বীজের অন্তরে অঙ্কুর প্রথমতঃ সূক্ষ্মভাবে থাকে, পশ্চাৎ তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, পল্লব ও পুষ্পফলাদির আকারে পরিণত হয়, তেমনি, হিরণ্যগর্ভ জীবের অন্তরেও জীব সকল সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ছিল, পরে তাহারা

তদীয় সঙ্কল্পে এতদ্রূপে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই সমস্ত ব্যক্ত জীব আবার স্ব স্ব বাসনা দ্বারা স্ব স্ব দেহাদি আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এ স্থানে বুঝিতে হইল যে, হিরণ্যগর্ভ জীবই সঙ্কল্প দ্বারা ভূতগণের আশ্রয় স্বরূপ দেহ ভাব প্রাপ্ত হন, পরে আবার স্ব কর্ম্মানুসারে জন্মমৃতির কারণতা প্রাপ্ত হন। কর্ম্ম কি? কর্ম্ম চিৎস্পন্দন ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৮।৩০]। ফলতঃ যাহা কর্ম্ম তাহাই চিৎস্পন্দ, তাহাই দৈব ও তাহাই শুভাশুভলক্ষণ চিত্ত। হে রাম! কথিত প্রকারে, বৃক্ষ হইতে কুসুমরাজি আবির্ভাবের ন্যায় প্রজাপতি হইতে ভুবন সমূহ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইতেছে[৩১]।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

[পূর্ব্ব ফরমার শেষ পত্রাঙ্ক ৫০৪ হইবে।]

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই পরম কারণ হইতে প্রথমে মনের উৎপত্তি হয়। যে কিছু ভোগ্য, সমস্তই তদাত্মক অর্থাৎ মনোময়। যে কিছু দৃশ্য, সে সমুদায়ের স্থিতি মনে এবং মনও স্বকারণের অনতিরিক্ত। যেমন দোলা বামে ও দক্ষিণে পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনি, মনও, ইহা এইরূপ তাহা এরূপ নহে, এবম্প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়[১।২]। অতএব, রাম! যে কিছু ভেদ, সমস্তই মনঃকল্পিত। যেহেতু মনঃকল্পিত, সেইহেতু মনের অপগমে এ সকলের বা ভেদের অপগম ও একের প্রতিষ্ঠা হয়। যখন মনের বিলয়ে একাদ্বয় আত্মা অবস্থিতি করেন, তখন কোনও প্রকার ভেদ থাকে না। তখন ব্রহ্ম (ব্রহ্মা), জীব, মন, মায়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, জগৎ, এ সকল ভেদ লোপ প্রাপ্ত হয়[৩]। আত্মা স্বয়ং সম্বিদ্রূপ সলিলসঙ্কুল চিদর্ণবে নিমগ্ন রহিয়াছেন। অস্থিরতাপ্রযুক্ত অসত্য ও প্রতিভাসত্ব হেতুক সত্যবৎ এই সদসদাত্মক জগৎ ও চিত্ত উভয়ই স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বা অলীক[৪।৫]। সেইজন্য বলা যায়, চিত্তের জগদ্দর্শন এক প্রকারে সৎ এবং অন্য প্রকারে অসৎ। মনের দ্বারাই এই সংসাররূপ দীর্ঘকালস্থায়ী বৃথা স্বপ্ন অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন অসম্যক্‌দর্শী স্থাণুতে পুরুষ দর্শন করে, তেমনি, মনঃও পরমাত্মদর্শনের অভাবে মিথ্যা জগদ্দর্শন করিতেছে[৬।৭]। সেই আখ্যারহিত সর্ব্বশান্তিরূপ আত্মার চেত্যোন্মুখতা * প্রযুক্ত চিত্ত, পরে চিত্ত হইতে জীবত্ব, জীবত্ব হইতে অহম্ভাব, অহম্ভাব হইতে চিত্ততা, (চিত্ততা=চিত্তের বিষয় তন্মাত্রা) হইতে ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াদি হইতে দেহাদি, দেহাদি হইতে দেহাদিগত মোহ, এবং তন্মাত্র হইতে বীজাঙ্কুরের ন্যায় আরম্ভসংরূঢ় (নানা কার্য্য পটু) দেহ, কর্ম্ম ও কর্ম্মানুযায়ী বন্ধন, মোক্ষ, স্বর্গ ও নরকাদি বিস্তৃত হইয়াছে[৮।১১]। যেমন আত্মা, ব্রহ্ম, জীব, এ তিনের বাস্তব প্রভেদ নাই, সেইরূপ, জীব ও চিত্ত, এ উভয়েরও প্রভেদ নাই। যেমন জীব ও চিত্ত অভিন্ন, সেইরূপ,

---

* চেত্যোন্মুখতা—সৃষ্টির উদ্রেক। প্রাকৃতিকগুণের সাম্যভঙ্গ।

দেহ ও কর্ম্ম পরস্পর অভিন্ন। বস্তুতঃ কর্ম্মই দেহ। কর্ম্ম ভিন্ন অর্থাৎ ব্যতীত পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট দেহ নাই। সুতরাং সেই কর্ম্মই চিত্ত, সেই চিত্তই অহম্ভাববিশিষ্ট জীব এবং সেই জীবই আবার চিৎ ও মঙ্গল-স্বরূপ[১২।১৩]।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যেমন একই দীপ বহুদীপ হয়, তেমনি, সেই একই পরম বস্তু নানারূপে প্রজাত হন। সুতরাং যদি বিচার চক্ষে তাঁহার অনারোপিত রূপ দেখা যায়, তাহা হইলে আর অনুশোচনা করিতে হয় না। চিত্ত কর্তৃক জীবত্বকল্পনা ও বন্ধন এবং তত্ত্ব-বোধে অর্থাৎ জীবত্বের মিথ্যাত্ব বোধে মোক্ষ হইয়া থাকে। কারণ, আত্মতত্ত্ব নামরূপ বর্জ্জিত[১।২]। জীব কি? চিত্তই জীব। যদি বিচার দ্বারা চিত্তের উপশম (অদর্শন) হয় তাহা হইলে এই চিত্তদৃশ্য জগৎ শান্ত হইয়া যায়। যাহার দুই পা চর্ম্ম পাদুকায় আবৃত, সে পৃথিবীকে চর্ম্ম-আচ্ছাদিত ভাবে[৩]। কদলীতরু কতকগুলি পত্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেইরূপ জগৎ ভ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নহে[৪]। চিত্তই ভ্রম বশতঃ আপনিই আপনার "জন্ম, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মরণ, স্বর্গগমন, নরক-গমন" ইত্যাদিবিধ নৃত্য দর্শন করিতেছে[৫]। যেমন সুরার (মদ্যের) নিরাকার আকাশে পরস্পর সংশ্লিষ্ট অসংখ্য বুদ্বুদ পরম্পরা দেখাইবার সামর্থ্য আছে, তেমনি, চিত্তেরও বিচিত্র সৃষ্টি দেখাইবার সামর্থ্য আছে[৬]। যদ্রূপ পিত্তাদিদোষদূষিত অক্ষি শঙ্খের পীতত্ব ও শশাঙ্কাদির দ্বিত্ব সন্দর্শন করে, তদ্রূপ, চিত্তসমাক্রান্তা (চিত্তে উপহিত) চিৎ ঈদৃশী সংসারভ্রান্তি দর্শন করিতেছে[৭]। যেমন মদিরোন্মত্ত ব্যক্তি মত্ততার দ্বারা পাদপের ভ্রমণ অবলোকন করে, তেমনি চিৎও (চিৎ=আত্মচৈতন্য) চিত্তসমাক্রান্ত হইয়া সংসার অবলোকন করে[৮]। বালকগণ যেমন ভ্রমণক্রীড়া দ্বারা জগৎকে কুলাল-চক্রের ন্যায় ভ্রমণশীল দর্শন করে, তেমনি, চিত্তের দ্বারাই এই সকল দৃশ্য অনুভূত হইয়া থাকে[৯]। বৎস রামচন্দ্র! চিৎ যখন দ্বিত্ব অনুভব করে, তখনই একত্বে দ্বিত্বভ্রম সমুৎপন্ন হয়; কিন্তু সেই চিৎ যখন দ্বিত্ব অনুভব না করে, তখন এই দ্বৈতপ্রপঞ্চ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। দ্বৈতক্ষয় হইলেই এক অবশেষ থাকে, তাহা বলা বাহুল্য[১০]। হে রাঘব! বহ্নি যেমন ইন্ধনের অভাবে নির্ব্বাপিত হয়, তেমনি, অভ্যাস বশতঃ চিত্তও বিষয় দর্শনের অভাবে উপশান্ত হইয়া যায়। চেত্য নাই,

অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত কিছুই নাই, এই জ্ঞান ও তাহার দৃঢ়তা কারক যোগ (সমাধি) অভ্যস্ত হইলে তদ্দ্বারা চিত্তের বিষয় দর্শন লুপ্ত হইয়া যায়[১১]। জীব যখন যখন তাদৃশ জ্ঞানী ও যোগী হয়, অর্থাৎ যখন যখন নির্ব্বিকল্প সমাধি সাক্ষাৎকার করে, তখন তখনি তিনি ব্যবহার রত থাকুন বা না থাকুন, "মুক্ত পুরুষ" এই আখ্যায় অভিহিত হন[১২]। মনুষ্য যেমন অল্প মত্ততায় (অল্প নেশায়) চিত্তের বিক্ষোভ ও অত্যন্ত মত্ততায় নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্যাপার (জড়বৎ নিপতিত, হতজ্ঞান) হয়, তেমনি, চৈতন্যের অল্প প্রকাশেই চিত্তের চেত্য দর্শন ও চৈতন্যের নিবিড়তায় চেত্য দর্শনের উপশম হইয়া থাকে। চৈতন্যের ঘনতা নির্ব্বিকল্প সমাধির সুসাধ্য[১৩]। ঘনতাপন্ন নিবিড় চৈতন্যই পরম পদ। সে পদে আরূঢ় হইলে চিত্ত তখন না থাকার ন্যায় হয় ও নির্ব্বিষয় হইয়া থাকে[১৪]।

চিৎই চিত্তের দ্বারা চেত্যভাব* প্রাপ্ত হইয়া "আমি, আমি জাত, আমি জীবিত, আমি মৃত, আমি দর্শন করিতেছি, আমি স্মরণ করিতেছি" এইরূপ ভ্রমপরম্পরা সত্যবৎ অনুভব করে[১৫]। বায়ু যেমন স্পন্দ ব্যতীত নহে, তেমনি, চিত্তও চেত্যের অতিরিক্ত নহে। যেমন উষ্ণতা অপগত হইলে বহ্নিও যায়, থাকে না, তেমনি, চেত্য দর্শন অভাবগ্রস্ত হইলে চিত্তও থাকে না[১৬]। চিৎ যাহা অনুভব করে বা দেখে তাহাই চেত্য। পরন্তু সে দর্শন রজ্জুতে সর্প দর্শনের অনুরূপ। যেমন রজ্জুতে সর্প দর্শন অবিদ্যাভ্রম বা আবিদ্যক অর্থাৎ এক প্রকার মিথ্যা জ্ঞান, তেমনি, চিত্তের চেত্য দর্শনও আবিদ্যক বা ভ্রমবিশেষ[১৭]। এই যে সংসারনামা ব্যাধি, এ ব্যাধির এক মাত্র ঔষধ সম্বিৎ। অর্থাৎ সংসারের মিথ্যাত্ব ও আত্মার সত্যত্ব অববোধ। ঐ বোধ অর্জ্জন করিতে চিত্তের ক্রিয়া (যোগ বা সমাধি) ব্যতীত অন্য প্রকার উপায় স্বীকার করিতে হয় না[১৮]। রাম! যদি তুমি বাহিরে দৃশ্য দর্শন পরিত্যাগ ও অন্তরে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাক, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই ক্ষণেই মুক্ত হইবে[১৯]। যেমন সম্যক্ দর্শন দ্বারা রজ্জুবিষয়ক সর্পবোধ তিরোহিত হয়, তেমনি, সম্বিৎ (তত্ত্বজ্ঞান) দ্বারাও এই সংসার ভ্রান্তি

* চিৎ আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য। চিত্ত বুদ্ধিতত্ত্ববিশেষ। চেত্য=দৃশ্য সমুদায়। অর্থাৎ অনুভবের বিষয়।

তিরোহিত হয়[২০]। অঙ্গ! যদি বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করা যায়। সুতরাং মোক্ষ অধিক দুষ্কর নহে[২১]। যাহাতে অভিলাষ, তাহার জন্য যখন প্রিয়তম প্রাণকেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ কর না, তখন অভিলাষ মাত্র ত্যাগের জন্য কৃপণ হইবার কারণ কি?[২২] তুমি যদি অভিলষনীয় ও অভিলাষ উভয় পরিত্যাগী হইয়া নিশ্চল নিষ্কম্প নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থান কর, তাহা হইলে তন্মুহূর্ত্তে কৃতার্থ হইতে পার[২৩]। সেই পরমাত্মার অজত্বাদি (জন্মাদিবিকারশূন্যতা) করতলস্থিত বিল্ব ফলের ন্যায়, সম্মুখবর্ত্তী অট্টালিকার ন্যায় ও পুরোবর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায় প্রত্যক্ষ[২৪]। যেমন একই অপ্রমেয় সমুদ্র তরঙ্গভেদ দ্বারা বিভিন্নাকারে প্রতিভাত হয়, তেমনি, অজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে এক পরমাত্মাই জগৎস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। পরমাত্মা পরিজ্ঞাত হইলেই মোক্ষ ও সিদ্ধি লাভ করস্থ হয়, কিন্তু তাঁহাকে না জানিতে পারিলে সংসারবন্ধনজনিত যন্ত্রণা দুষ্পরিহার্য্য হয়[২৫]।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! মন-উপাধিক জীব পরমাত্মার কে? তাদৃশ জীবের সহিত পরমাত্মার কি সম্বন্ধ? কি প্রকারেই বা জীব পরমাত্মায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং জীবই বা কি? এই সকল কথা পুনর্ব্বার আমার নিকট বিশদ করিয়া বলুন[১]। *

বশিষ্ঠ বলিলেন, মায়াসমাশ্রিত সুতরাং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম যখন যে শক্তিতে প্রস্ফুরিত হন, তখন তিনি আপনাকে সেই শক্তি সম্পন্ন দেখেন[২]। সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতে যে চেতনরূপিণী শক্তি (জীবশক্তি) পরিজ্ঞাত হইয়াছেন সেই চেতনশক্তি এক্ষণে জীব শব্দের অভিধেয়। সে শক্তি সঙ্কল্পরূপিণী[৩]। সেই চিত্তসংস্কারময়ী চিৎশক্তি † স্বভাব বশতঃ সঙ্কল্পের উদ্রেক হেতু সদ্বয়ত্ব প্রাপ্ত হন, পরে জননমরণাদি নানা ভাব প্রাপ্ত হন[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনে! যদি তাহাই হয়, তবে, দৈব, কর্ম্ম ও কারণ, এ সকল কথার অর্থ কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, বৎস! যেমন আকাশে স্পন্দাস্পন্দ স্বভাব বায়ু ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, তেমনি, এই দৃশ্য বিশ্বে স্পন্দাস্পন্দ স্বভাবযুক্ত চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নাই। যখন স্পন্দস্বভাব প্রকটিত হয় তখন তিনি সৃষ্ট্যুন্মুখী হন, অন্যথা তিনি শান্ত বা শুদ্ধ থাকেন[৫।৬]। চিৎ যে আপনার স্বাভাবিক চিদ্ভাবকে স্বাশ্রিত ও স্ববিষয়ক অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান দ্বারা চিত্ত (মন) বলিয়া কল্পনা করেন,

---

* এবার রামচন্দ্রের জিজ্ঞাস্য—জীব কি পরমাত্মার অংশ? কি পরমাত্মার কার্য্য (যদুৎপন্ন)? কি পরমাত্মাই? যদি পরমাত্মাই জীব, তবে পরমাত্মায় জীবের উৎপত্তি, এ কথা অসঙ্গত। যদি উৎপত্তি পক্ষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে জিজ্ঞাস্য—পরিণাম ক্রমে? কি বিবর্ত্ত ক্রমে? জীবকে যদি পরমাত্মার অতিরিক্ত বলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য—জীব পরমাত্মার সজাতীয়? কি বিজাতীয়? এই কয়েকটী প্রশ্ন উপরোক্ত কথায় উদ্ভাবিত করিতে হইবে।

† মন যাহা করে তাহার সংস্কার তাহাতে সংলগ্ন হয়। সেই সংস্কারে যে আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই প্রতিবিম্ব চৈতন্যকে চিত্তসংস্কারময়ী চিচ্ছক্তি বলা হইল।

অর্থাৎ আপনিই আপনার দৃশ্য হন, তাহাই পণ্ডিতগণের মতে চিৎ-স্পন্দ। অন্যথা তিনি অস্পন্দ অর্থাৎ শান্ত ব্রহ্ম। আরও স্পষ্ট কথা—চিতের তাদৃশ স্পন্দনই সংসার ও অস্পন্দন শাশ্বত (নিত্য) ব্রহ্ম। অপিচ জীব, কারণ, কর্ম্ম, এ সকল চিৎস্পন্দের প্রভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৭।৮]। * ফলতঃ যিনিই সাক্ষাৎ অনুভূতি, অনধীন চৈতন্য, তিনিই কথিত প্রকারের চিৎস্পন্দ। সেই চিৎস্পন্দ জীবাদি নামে কথিত ও সংসারের বীজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে[৯]। চিতের আভাস (স্বীয় অবিদ্যায় স্বপ্রতিবিম্ব), স্ফুরিত হওয়ায় যে দ্বৈত, সেই দ্বৈত অর্থাৎ তাদৃশ দ্বিভাব হইতে শাস্ত্রোক্ত ক্রমে দেহাদির উৎপত্তি হয়। সুতরাং চিৎ-স্পন্দই স্বনিষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টির আদিতে বিবিধাকার প্রাপ্ত হন, পরে সঙ্কল্পানুসারে নানা যোনি প্রাপ্তও হইয়া থাকেন। সেই সকল যোনির মধ্যে কোন কোন চিৎস্পন্দ (জীব) বহুকাল পরে মুক্ত হয়, কোন কোন চিৎস্পন্দ জন্মসহস্রে মুক্ত হয় এবং কেহ বা এক জন্মেই মুক্ত হইয়া থাকে[১০।১১]। যে উপাধির সহিত সংসৃষ্ট হয়, সেই উপাধির আকারে আকারিত হওয়াই চিতের স্বভাব। সেই কারণে চিৎ স্বোৎ-পন্ন দেহকারণের (দেহকারণ=ভূতসূক্ষ্ম) সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃশরীর হইতে শুক্রাদি রূপে নির্গত হয়, পরে স্বর্গ, অপবর্গ, নরক ও বন্ধের কারণ স্বরূপ দেহবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১২]। অতএব, ইনি পিতা, ইনি পুত্র, এ প্রভেদ উপাধিকৃত। চিতের উপাধি শরীর ও তাহা বিভিন্ন বলিয়া ভিন্নের ন্যায় হইয়া প্রতীত হয়। নচেৎ চৈতন্য একই অর্থাৎ অভিন্ন। যেমন সুবর্ণাংশে ভেদ না থাকিলেও আকারগত প্রভেদ দ্বারা ইহা বলয়, ইহা কেয়ূর, ইত্যাদি প্রভেদ প্রতীত হয়, সেইরূপ, চৈতন্যাংশে অভেদ থাকিলেও চৈতন্যাশ্রিত দেহের প্রভেদে চৈতন্যপ্রভেদের ভ্রম হইয়া থাকে। দেহের উপাদান মহাভূত, তাহার নানা বিকার, তদনুসারে প্রভেদও অসঙ্খ্য[১৩]। চিৎ বস্তুতঃ অজাত হইলেও উক্ত কারণে "আমি জাত, আমি অবস্থিত, আমি মৃত" ইত্যাদি প্রকার ভ্রান্তি অনুভব করে। যেমন ভ্রমার্ত্ত ব্যক্তি আপনার মিথ্যা পতন অনুভব করে, সেইরূপ, অহং-মম-ভ্রান্তি-যুক্ত চিত্তও বিবিধ আশাপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সেই সেই

* অভিপ্রায় এই যে, প্রাণস্পন্দনঘটিত নাম জীব, স্বান্তর্গত কার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে নাম কারণ, শরীর পরিচালনাদি বিবক্ষায় কর্ম্ম, এবং তাহারই সূক্ষ্মাবস্থার নাম দৈব।

মিথ্যা দর্শন বা ভাব অনুভব করে[১৪।১৫]। যেমন মথুরাধিপতির শ্বপচভ্রম (শ্বপচ=চণ্ডাল) হইয়াছিল, * তাহার ন্যায় চিত্তও ভ্রমবশতঃ জগৎস্থিতি অনুভব করিতেছে[১৬]। হে রামচন্দ্র! এ সমস্তই মনোময় সুতরাং ভ্রান্তির উল্লাস। মনই জলতরঙ্গের ন্যায় জগদাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে[১৭]। যেমন সৌম্য অর্থাৎ নিস্তরঙ্গ (স্থির) জলধি হইতে প্রথমে অল্প স্পন্দ অর্থাৎ 'স্বল্প তরঙ্গ প্রকটিত হয়, তেমনি, সেই মঙ্গলময় পূর্ব্বকারণ পরমাত্মা হইতে চেতনোন্মুখী (সৃষ্ট্যুন্মুখী) চিৎ সমুদিত হইয়া থাকে[১৮]। সেই চিৎস্বরূপ বারি ব্রহ্মরূপ জলধিতে জীবরূপ আবর্ত্ত, চিত্তরূপ উর্ম্মি ও স্বর্গাদিরূপ বুদ্বুদের উৎপত্তি করে[১৯]। হে সৌম্য' রামচন্দ্র! সেই মায়া-বন্ধন'বিনাশক অচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্মের যে স্বতনিষ্ঠ মায়িক বিজৃম্ভণ, যাহা জীবরূপে অবস্থিত, তাহাই প্রকারান্তরে বিষয়রূপে অর্থাৎ দৃশ্যরূপে প্রকটিত ও ব্যবহৃত হইতেছে[২০]। সুতরাং সেই চিৎই সম্বিদ দ্বারা বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, মায়া, ইত্যাদি অভিধাযুক্ত ও জীবসঙ্কল্পাত্মক মন নামে খ্যাত[২১]। মনই তন্মাত্রাদিকল্পনাপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অসত্য অথচ সত্যসঙ্কাশ জগৎ বিস্তার করিয়াছে[২২]। সর্ব্বশূন্য আকাশে মিথ্যা মুক্তা-বলী দর্শন ও স্বপ্নে ভ্রান্তি দর্শন যদ্রূপ, চিত্তের সংসার দর্শন তদ্রূপ[২৩]। নির্দ্দোষ নির্ব্বিকার নিত্য তৃপ্ত আত্মা শান্ত, সমস্থিত ও সত্য। তিনি কিছু দেখেন না, দেখিবারও কিছু নাই সত্য, তথাপি, তিনি স্বমায়া-রচিত এই চিত্তনামক স্বপ্ন বা বিভ্রম অনুভব করিতেছেন[২৪]। রাঘব! সেইজন্য বলিতেছি, তুমি এই সংসারদর্শনকে জাগ্রৎ, অহঙ্কারকে স্বপ্ন, চিত্তকে সুষুপ্তি ও চিন্মাত্রকে তূর্য্য অর্থাৎ অবস্থাত্রিতয়ের অতীত বলিয়া জানিবে[২৫]। যাহা অত্যন্ত শুদ্ধ, তন্মাত্র ও নিরাময়, তাহাই অবস্থাত্রয়াতীত পরম পদ। সেই পদে অবস্থিত হইলে শোকের মূলোচ্ছেদ হয়, আর কখন শোক করিতে হয় না[২৬]। এই দৃশ্যমান জগৎ সেই তূর্য্য পদে নির্ম্মল নভো-মণ্ডলে অসৎ মুক্তাবলীর ন্যায় সমুদিত হয় আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। যেমন মুক্তাবলী নিজেও নাই, আকাশেও নাই, তেমনি,

* মথুরার রাজপুত্র শৈশবে চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া চণ্ডাল সকাশে বিক্রীত ও চণ্ডাল কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল। সেই কারণে উক্ত রাজপুত্র যৌবনেও "আমি চণ্ডাল" এইরূপে আপনাকে বিদিত হইত। পরে অন্বেষণ দ্বারা তদীয় অমাত্যগণ সে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া উক্ত রাজপুত্রকে গৃহানীত করিয়া, তুমি চণ্ডাল নহ, রাজপুত্র, এইরূপে প্রতিবোধিত করিয়াছিল।

ইহাও নিজে নাই এবং তাঁহাতেও ইহা নাই[২৭]। আকাশ, বৃক্ষের বৃদ্ধি করে না, বৃক্ষকে বাড়ায় না, মাত্র, বৃদ্ধির অনিবারক হয়। তাই লোকে ও শাস্ত্রে আকাশকে বৃক্ষোন্নতির কারণ বলে। তেমনি, চিদ্রূপী পরমাত্মা কোন কিছু না করিলেও অনিবারকত্ব প্রযুক্ত এই মায়াকৃত সর্গের (সৃষ্টির) কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন[২৮]। যেমন সন্নিধান মাত্র কারণে আদর্শকে প্রতিবিম্বের কারণ বলা হয়, তেমনি, সন্নিধান মাত্র কারণে আত্মচৈতন্যকে এই সকল অর্থবেদনের (জ্ঞানের) কারণ বলা যায়[২৯]। বীজ যেমন অঙ্কুর ও পত্রাদিক্রমে ফলের উৎপাদক হয়, সেইরূপ, চিৎও চিত্ত ও জীবাদি ক্রমে মনের উৎপাদক হয়[৩০]। যেমন জীবসংযুক্ত বৃষ্টিজলবিন্দু বৃক্ষ-শস্যাদিতে প্রবেশ করে * ও পুনর্ব্বার বীজত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, জীববাসনাবাসিত (জীব ধর্ম্মের সংস্কারে প্রলিপ্ত) চিৎও প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার চিত্ত চেত্যাদি সৃষ্টির আকারে বিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারে না[৩১]। যদিও বীজের বৃক্ষজনন শক্তি ও ব্রহ্মের জগৎজনন শক্তি একাংশে সম-দৃষ্টান্ত, তথাপি, উক্ত উভয়ের মধ্যে শক্তিভেদের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। মনে কর, বীজই বৃক্ষ, এই জ্ঞানে অদ্বয় সত্য ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন না। কিন্তু ব্রহ্মই বিশ্ব, এই জ্ঞান সাক্ষাৎকৃত হইলে দীপে রূপাভিব্যক্তি হওয়ার ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়[৩২।৩৩]। ভূমির যে স্থানে খুঁড়িবে সেই স্থানেই আকাশ দৃষ্ট হইবে। সেইরূপ যে যে দৃশ্য বিচারারূঢ় করিবে সেই সেই দৃশ্যই একে একে চৈতন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে[৩৪]। স্ফটিকের উদরে (মধ্যে) বনের প্রতিবিম্ব, যে তাহা না জানে, সে বনই দেখে। সেইরূপ অজ্ঞ দর্শকেরা শুদ্ধ ব্রহ্মের উদরে মিথ্যা জগৎ দেখিতেছে[৩৫]। যেমন স্ফটিক পিণ্ড (স্ফটিক = স্বচ্ছ নির্ম্মল প্রস্তর বিশেষ। পিণ্ড = খণ্ড) বনভূমি না হই-লেও ফল, পত্র, লতা, গুল্ম ও সে সকলের আধার মৃত্তিকাদির আকারে প্রতিভাত হয়, তেমনি, ব্রহ্মও দৃশ্য জগদাকারে প্রতিভাত হইতেছেন[৩৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, অহো! কি অদ্ভুত! জগৎ অসত্য হইয়াও সত্য-বৎ প্রতীত হইতেছে। গুরো! জগৎ যে প্রকারে বৃহৎ, যে প্রকারে

* শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জীব যখন সুকৃতভোগান্তে পৃথিবীতে আইসে, তখন আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি, এই সকল অবলম্বন করিয়া পৃথিবী প্রাপ্ত হয়। বৃষ্টিজলের সঙ্গে মৃত্তি-কায় আগত, তথা হইতে শস্য মধ্যে প্রবেশ, পরে তদ্ভক্ষণকারী জীবের শুক্র শোণিতস্থ হয়। তাহাই জীবের বীজ ভাব প্রাপ্তি।

স্বচ্ছ, যে প্রকারে প্রস্ফুট ও যে প্রকারে সূক্ষ্ম তাহা শুনিলাম। যে প্রকারে পরব্রহ্মে এই প্রতিভাসাত্মা নীহারকণসদৃশ তন্মাত্রগুণসম্পন্ন * গোল অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রস্ফুরিত হইতেছে তাহা বিদিত হইলাম। এক্ষণে যে প্রকারে বৈপুল্য অথাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি দেহ জন্মে ও যে প্রকারে আত্মভূ অর্থাৎ সমষ্টি-ব্যষ্টি-স্থূলদেহাভিমানী বৈশ্বানর ও বিশ্ব (বিরাট্ ও এক একটী দেহী) উৎপন্ন হন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[৩৭।৩৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন বেতাল নিরাকার হইলেও বালকের হৃদয়ে আকার বিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশ পায়, তেমনি, জীবের রূপ অত্যন্ত অসম্ভব হইলেও তাহা সর্ব্বাগ্রে পরব্রহ্মে প্রকাশতা প্রাপ্ত হয়[৪০]। পূর্ব্ব-কল্পীয় জীববাসনার সংস্কার বা সম্পর্ক উক্ত জীবভাব প্রকাশের কারণ সুতরাং জীব বাসনোদ্ভব, অথচ শুদ্ধ, সত্য অথচ অসত্য, ভিন্ন অথচ অভিন্ন ও পরব্রহ্মের প্রস্ফুরণ বিশেষ[৪১।৪২]। ব্রহ্ম যেমন জীবকল্পনার দ্বারা আশু জীবভাব প্রাপ্ত হন, তেমনি, জীবও মননবেদনাদির দ্বারা† আশু মনোরূপে সমুদিত হন[৪৩]। অনন্তর সেই মন তন্মাত্র বিষয়ক মনন করিয়া আপনাকে তন্মাত্ররূপে আবির্ভূত দেখেন। পরে সেই অবিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ বায়বীয় পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম তন্মাত্রাত্মক মন চিদাকাশে স্ফূর্ত্তি পায়। যেমন আকাশে অসঙ্খ্য নীহারকণা সূর্য্যের আলোকে ভাসমান হয়, তেমনি, পূর্ব্বোক্ত চিত্তে (সমষ্টিমনোরূপ হিরণ্যগর্ভে) অসঙ্খ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত সূক্ষ্ম দেহাদি অঙ্কিতের ন্যায় প্রকাশ পায়[৪৪।৪৫]। তাই তিনি তখন তাদৃশ সাকারতায় আপনার বিশেষ পরিচয় পান না। না পাওয়ায়, "অহং কিং? আমি কি?" ইত্যাকার সম্বিদ অর্থাৎ সম্মুগ্ধ জ্ঞান অনুভব করেন। পরে পুরুষার্থ-বিচার সহিত প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধে তাহাতে জগত্তত্ত্বশব্দার্থ ও তত্তদ্‌বিষয়ক অস্ফুট জ্ঞানের উদয় হয়[৪৬।৪৭]। পরে তাদৃশ অস্ফুট অহম্ভাব দেহোপরি প্রস্ফুট হওয়ায় বাহিরে রসের ও মুখবিলাদি প্রদেশে রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের (জিহ্বার) উৎপত্তি হওয়া অনুভব করেন। ঐ রূপে বাহিরে রূপ ও শরীরে রূপগ্রাহক চক্ষুঃ হওয়া দর্শন করেন ও সেই সেই প্রকারে

* তন্মাত্রগুণসম্পন্ন=রূপরসাদির উদ্ভব যুক্ত। জীব, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার, এই পাঁচ সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্ব্বোধ তথ্যের পদার্থে পরিব্যাপ্ত।

† মননবেদন অর্থাৎ সংকল্প বিকল্প। সংস্কারের উদ্রেক ও তাহার অনুগুণ অনুভব।

গন্ধ ও গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয় হওয়া অনুভব করেন। জীব যাবৎ কাল ঐরূপে শ্রোত্রাদিভাবে অবস্থিত থাকেন, তাবৎ কাল শব্দাদি দৃশ্য পদার্থ সকল ঐরূপে উপভোগ করিতে বাধ্য হন[৪৮।৪৯]। উক্তবিধ জীবাত্মা ঐ প্রকারে কাকতালীয় ন্যায়ে অল্পে অল্পে বাসনানুরূপ সন্নিবেশ অর্থাৎ আপনার দেহিত্ব অনুভব করেন[৫০]। অতঃপর সেই জীবমূল অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় সম্পন্ন হয় এবং সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিঘটিত সন্নিবেশের শব্দভাবৈকদেশকে শ্রবণার্থ স্বরূপে, স্পর্শভাবৈকদেশকে ত্বক্‌-শব্দার্থরূপে, রসভাবৈকদেশকে রসনার্থরূপে, রূপভাবৈকদেশকে নেত্রার্থরূপে এবং গন্ধভাবৈকদেশকে নাসিকার্থরূপে গ্রহণ (আমার বলিয়া জ্ঞান বা কল্পনা) করেন এবং ঐ প্রকার ভাবময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভাবময় দেহকে বাহ্যার্থসত্তাপ্রকাশকরণযোগ্য ইন্দ্রিয়নামক রন্ধ্র সম্পন্ন অবলোকন করেন[৫১।৫৪]। রাম! কথিত প্রকারে আদিজীবের অর্থাৎ জীবঘন ব্রহ্মার ও অদ্যতন জীবের অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবের প্রতিভাসময় (ভাবময়) আতিবাহিক দেহ সমুৎপন্ন হয়[৫৫]। আখ্যারহিত পরা সত্তাই (ব্রহ্মবস্তুই) কথিত প্রকারে অজ্ঞানাবৃত হইয়া আতিবাহিকতা প্রাপ্তের ন্যায় হন এবং জ্ঞান হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না[৫৬।৫৭]। সত্য সত্যই সেই পরা সত্তা "ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ও পৃথক্‌ জ্ঞান দ্বারা পৃথগভাবে অর্থাৎ জীবাদিভাবে ব্যবস্থিত হন[৫৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! চিন্মাত্র পরব্রহ্মে অজ্ঞানাবস্থানের সম্ভাবনা কি? তাহা সর্ব্বথা অসম্ভব। সুতরাং ব্রহ্মাদ্বয়তা অসিদ্ধ নাই, প্রত্যুত সিদ্ধই আছে। যদি তাহাই থাকে, তবে মোক্ষ, মোক্ষপ্রাপক বিচার ও তদুপযোগী জীবাদিকল্পনা, এ সমস্তই ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতেছে[৫৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তোমার প্রশ্ন সিদ্ধান্ত কালেরই উপযুক্ত, অন্য সময়ের নহে। যেমন অকালজাত কুসুমের মালা শোভাপূর্ণ হইলেও অমঙ্গলজনক বলিয়া শোভমান হয় না, তেমনি, অসাময়িক প্রশ্নও ফলপ্রদ হয় না। বস্তু সকল যোগ্য কালেই শোভা প্রাপ্ত হয়, অযোগ্য কালে নহে। অকাল পুষ্পের মালা তাৎকালিক উপভোগ-সাধন-সমর্থ হইলেও ভবিষ্যৎ অনিষ্টের আশঙ্কায় হর্ষোৎপাদিকা না হওয়ায় নিরর্থক হইয়াই থাকে[৬০]। সুতরাং কালেই সকল পদার্থের

শোভমানতা মনুষ্যগণের স্বীকার্য্য হইয়া থাকে[৬১,৬২]। জীব উপযুক্ত কালে আপনাতে পিতামহত্ব অনুভব করতঃ উপাসনার ফলস্বরূপ হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত হয়[৬৩]। সেই হিরণ্যগর্ভ প্রণব উচ্চারণ ও প্রণবার্থ সম্বেদন পূর্ব্বক (প্রণবের অর্থ=জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি) এই মনোরাজ্য বিস্তৃত করিয়াছেন। সেই শূন্যরূপী সমষ্টিমনোরাজ্য, পরমাত্মায় যে প্রকার অসৎ, ব্যষ্টিমনোরাজ্যরূপ শূন্যাত্মক মেরু প্রভৃতি উচ্চাকৃতি পর্ব্বতবিশিষ্ট এই জগৎও চিদাকাশে তদ্রূপ অসৎ[৬৪,৬৫]। এই জগতে বাস্তবতঃ কিছুই জাত বা বিনষ্ট হয় না। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যা জগদাকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন[৬৬]। পদ্মজের সত্তা যদ্রূপ সদসন্ময়ী, দেবগণ, ও সামান্য ক্ষুদ্র জন্তুগণের সত্তাও তদ্রূপ সদসন্ময়ী[৬৭]। এ সকল উৎপন্ন হইলেও রজ্জু-সর্পের ন্যায় সম্বিদ্বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা। মিথ্যা বলিয়াই সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত দৃশ্যের বিলোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে[৬৮]। উৎপত্তি, ব্রহ্মার ও কীটের সমান; তবে প্রভেদ এই যে, কীট ভৌতিক মালিন্যের প্রচ্ছাদনে তুচ্ছকর্ম্মকারী, পরন্তু ব্রহ্মা নির্ম্মল সত্বের প্রাবল্যে তদ্বিপরীত[৬৯]। যেমন উপাধি, তেমনি জীব। এবং তাহার পৌরুষও সেইরূপ। আবার যেমন পৌরুষ, তেমনি কর্ম্ম, এবং তাহাদের ফলানুভবও সেইরূপ[৭০]। সুকৃতের ফলে ব্রহ্মার ও দুষ্কৃতের ফলে কীটের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুকৃতের পরম উৎকর্ষ ব্রহ্মত্ব ও দুষ্কৃতের চরম ফল কীটত্ব। যতই বিভিন্ন ফলাফল দৃষ্ট হউক, সমস্তই চিন্মাত্রতা পরিজ্ঞানের অভাবের প্রভাব। অর্থাৎ স্বাত্মভ্রান্তি মূলক। সেইজন্য তত্বজ্ঞানে ঐ ভ্রান্তির ক্ষয় হয়[৭১]। বিশুদ্ধ চিদ্রূপ পরব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞানত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব অবতরণ করে না। সুতরাং দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই শশবিষাণের ও আকাশপদ্মের সহিত সমান। অর্থাৎ যাবৎ পর্য্যন্ত জ্ঞাতা (জীব) ভেদ জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞেয় দর্শন করে, তাবৎ দ্বৈত বিদ্যমান থাকে[৭২]। যেমন কোশকার কৃমি আপনারই লালাদার্ঢ্যে আপন বন্ধন অনুভব করে, তেমনি, আনন্দ ব্রহ্মই ভুবনাদি ভাবের নিবিড়তায় ভ্রান্ত হইয়া দ্বৈত অনুভব করিতেছেন[৭৩,৭৪]। সমষ্টিমনোরূপ আদি প্রজাপতি ব্যষ্টি ভোক্তার (জীবের) অদৃষ্টানুসারে যে বস্তুকে যে প্রকারে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, সে বস্তু সেই প্রকারই হয়,

তাহার অন্যথা হয় না। ইহাই নিয়তির ব্যবস্থা[৭৫]। * সুতরাং যাহা যাহা উৎপন্ন তাহা তাহাই অবস্তু অর্থাৎ অলীক। উৎপত্তিও অলীক, বৃদ্ধিও অলীক, বিলয়ও অলীক, ভোগও অলীক[৭৬]। অতএব, পরমার্থ দর্শনে ইহাই স্থির হয় যে, শুদ্ধ, সর্ব্বগত, আনন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মই স্বাত্মাববোধের বিপর্য্যয়ে অশুদ্ধ, অসৎ, অনেক ও অসর্ব্বগরূপে বিবেচিত হইতেছেন[৭৭]। "জল ও তরঙ্গ ভিন্ন" এই ভেদ যেমন অজ্ঞমতির কুকল্পনা-কল্পিত ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সেইরূপ, অসম্যগ্‌-দর্শীরাই রজ্জুতে সর্পকল্পনার ন্যায় এই সকল ভেদ পরিকল্পিত করিতেছে। সুতরাং ঐ ভেদ বাস্তব ভেদ নহে। যেমন একই ব্যক্তিতে পরস্পরবিরুদ্ধ শত্রুতা ও মিত্রতা অসম্ভব হয় না, সম্বন্ধ ভেদে সম্ভবই হয়, তেমনি, ব্রহ্মেও ঐরূপ ভেদাভেদ শক্তির অবস্থান সম্ভব হয়[৭৮]। যেহেতু অসম্ভব নহে, সেই হেতু ব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ ভেদাভেদাত্মক শক্তির দ্বারা অদ্বয় ও সদ্বয় ভাবে অবিস্তৃত ও বিস্তৃত হন। যেমন সলিলে তরঙ্গকল্পনা করিবা মাত্র সলিল ও তরঙ্গ পৃথক্ রূপে প্রস্ফুরিত হয়, যেমন সুবর্ণে বলয় ভাবনা করিবা মাত্র সুবর্ণ ও বলয় ভিন্নভাবে প্রথিত হয়, সেইরূপ, তিনিও আত্মা অনাত্মা বা অপৃথক্ ও পৃথক্ রূপে স্ফুরিত হন। প্রথমে আত্মাই মন, পরে মন হইতেই অহং। প্রথম মন নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষের অনুরূপ। পরে তাহাই অহম্ভাব কল্পনার প্রভাবে অহং[৭৯।৮০]। সেই অহংসম্বলিত মন স্মৃতি (পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্ফুরণ) অনুভব করে। তদনন্তর মন ও অহঙ্কার পূর্ব্বানুভূত স্মরণের দ্বারা তন্মাত্রা সৃজন করেন। ঐরূপে তন্মাত্র কল্পনার পর চিত্তাত্মা জীব কাকতালীয় ন্যায়ে ব্রহ্মে জগৎ দর্শন করিতে থাকেন। বস্তুতঃ চিত্ত দীর্ঘকাল যাহা সৎ বলিয়া পরিভাবিত করে, তাহা সৎ হউক, বা অসৎ হউক, ভাবনার দৃঢ়তায় সংস্বরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে[৮১।৮২]।

---

* বটবীজে বটবৃক্ষই হয়, কুটজবৃক্ষ হয় না। বুদ্বুদ এক নিমেষ মাত্র থাকে, অধিক কাল থাকে না। ব্রহ্মাণ্ড কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী হন, তাহার অন্যথা হয় না। এ সমস্তই পূর্ব্বোক্ত নিয়তির, নিয়ম বা ব্যবস্থা। তুমি আমি ইচ্ছা করিয়া কোন কিছু কল্পনা করিলে নিয়তি তাহার বাধক হয়।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

কর্কটী রাক্ষসীর ইতিহাস।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি তোমার নিকট রাক্ষসীর কথিত জটিল প্রশ্ন সমন্বিত এক পুরাতন ইতিহাস আদ্যোপান্ত বর্ণন করি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর[১]।

হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক অতিভয়ঙ্করী রাক্ষসী বাস করিত। এই রাক্ষসীর এক নাম কর্কটী ও অপর নাম বিষূচিকা। কেহ কেহ ইহাকে অন্যায়বাধিকা নামেও উল্লেখ করিত। (অন্যায়বাধিকা= আচারবিহীন মনুষ্যের পীড়া দায়িনী) ইহার বর্ণ ও মূর্ত্তি যেন কজ্জল-কর্দ্দমের দ্বারা চিত্রিত ও নির্ম্মিত এবং কার্য্যও তদনুরূপ ভীষণ। রাক্ষসী কৃশকায় হওয়ায় দেখিতে এরূপ হইয়াছিল, যেন অতিবিস্তীর্ণ বিন্ধ্যারণ্য কোনি অনির্ব্বাচ্য কারণে শুষ্ক হইয়া অতিভয়ঙ্কর আকারে রহিয়াছে[২।৩]। ইহার বল অসামান্য, চক্ষুঃ প্রদীপ্তহুতাশনের ন্যায়, বর্ণ কৃষ্ণ এবং বস্ত্রও কৃষ্ণবর্ণ। দেখিবা মাত্র বোধ হইত, যেন মূর্ত্তিমতী ঘোর অন্ধকার রাত্রি। ইহার দেহ এত বিস্তীর্ণ যে দেখিলে বোধ হইত, যেন আকাশের এক অর্দ্ধ তদীয় দেহে প্রপূরিত হইয়া রহিয়াছে[৪]। ইহার উত্তরীয় বস্ত্র দেখিলে সজল জলদ বলিয়া ভ্রম জন্মিত। এই রাক্ষসী লম্বমান মেঘবিম্বের ন্যায় সর্ব্বদা উল্লসিতা থাকিত। ইহার উর্দ্ধ শিরোরুহ তিমিরবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল, জানুদ্বয় তমাল তরুর ন্যায় বিশাল, নখ বৈদূর্য্য প্রস্তর সদৃশ প্রদীপ্ত ও শূর্পাগ্র অপেক্ষাও বিস্তির্ণ। হাস্য কালে তাহার বিকট বদন হইতে যেন ভস্ম, নীহার অথবা ধূমরাশি নির্গত হইত[৫।৬]। রাক্ষসী সর্ব্বদাই নরকঙ্কাল মালায় বিভূষিতা থাকিত। এই রাক্ষসী যখন বেতালগণের সহিত নৃত্য করিত তখন তাহার ভীষণ কঙ্কালকুণ্ডল এরূপ আন্দোলিত হইত, যেন প্রলয় মারুতে মন্দরাচল দোলায়িত হইতেছে। ইহার উর্দ্ধীকৃত ভুজদ্বয় দেখিলে মনে হইত, রাক্ষসী যেন সূর্য্যগ্রহ গ্রাস করিবার জন্যই হস্তোদ্যম করিতেছে[৭।৮]। এই বিপুল-দেহা ভীষণা রাক্ষসীর দুরোদর ভরণের উপযোগী আহার দুর্ল্লভ হও-

য়াতে তদীয় জঠরানল সর্ব্বদা অর্ণবলেখার ন্যায় (বাড়বানলের ন্যায়) অতৃপ্ত থাকিত[৯]। বাড়বানল যেমন ভক্ষণে তৃপ্ত হয় না, তেমনি, এই মহোদরা রাক্ষসী এক দিনের জন্যও আহারে পরিতৃপ্ত হইত না।

রাক্ষসী একদা ক্ষুধার্ত্তা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, সমুদ্র যেমন অসংখ্য নদ নদী গ্রাস করে, তদ্রূপ, যদি আমি অনবরত এই জম্বু-দ্বীপস্থিত সমস্ত জীব জন্তু এক নিশ্বাসে ও এক কবলে গ্রাস করি, তাহা হইলে আমার এই দুঃসহ ক্ষুধাযন্ত্রণা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু যুগপৎ সর্ব্ব মনুষ্য ভক্ষণ করার উদ্যম যুক্তিসিদ্ধ কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। এ বিষয়ে এমন কোন যুক্তি উদ্ভাবন আবশ্যক, যাহা অবলম্বন করিলে বিপদ কালেও জীবন রক্ষা পাইতে পারে[১০,১২]। কিন্তু এক দিনে সর্ব্বমনুষ্যভক্ষণ যুক্তি বাধিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, এই সমস্ত জনগণের অনেকেই মন্ত্র, ঔষধ, নীতি, দান ও বেদপূজাদির দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। সুতরাং ইহাদিগকে যুগপৎ ভক্ষণ করা দুষ্কর ব্যতীত সুকর নহে[১৩]। যাহাই হউক, যাহাতে আমি এই সমস্ত জনগণকে যুগপৎ গ্রাস করিতে পারি, এরূপ উপায় লাভের নিমিত্ত অখিন্নচিত্তে উগ্রতম তপস্যার অনুষ্ঠান করিব। শুনিয়াছি, মহোগ্র তপস্যার দ্বারা অত্যন্ত দুর্ল্লভও সুলভ হইয়া থাকে[১৪]।

রাক্ষসী ঐরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বজন্তু জিঘাংসায় দুর্গম হিমাচলে তপস্যার্থ গমন করিল। তড়িন্নয়না, কৃষ্ণবর্ণ মেঘমণ্ডলীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, বিশাল হস্তপদাদিসম্পন্না, দীর্ঘদেহশালিনী, চন্দ্রসূর্য্যসদৃশপ্রদীপ্তলোচনা রাক্ষসী হিমপর্ব্বতে গমন করতঃ তাহার শিখরদেশে আরোহণ করিল। পরে স্নান সঙ্কল্পাদি করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্তা হইল। রাক্ষসী এক পদে দণ্ডায়মানা হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং তাহার চন্দ্র সূর্য্যসদৃশ দুই চক্ষু তখন নিশ্চল নিস্পন্দ হইল। পর্ব্বত যেমন শীত বাত আতপ সহ্য করে, রাক্ষসী সেইরূপ সে সকল সহ্য করিতে লাগিল। ক্রমে দিবস, পক্ষ ও মাস প্রভৃতি একে একে গত হইতে লাগিল[১৫,১৮]। ঊর্দ্ধ-কৃষ্ণবর্ণ-কেশ-সমন্বিতা রাক্ষসীও নিশ্চল মেঘের ন্যায় স্তিমিতাকৃতি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহার সেই ঊর্দ্ধীকৃত বিশাল দেহ দেখিলে বোধ হইত, রাক্ষসী যেন আকাশ গ্রাসে উদ্গতা হইতেছে[১৯]।

অনন্তর হংসবাহন ব্রহ্মা দেখিলেন যে, শীত ও রুক্ষ বায়ুর দ্বারা

রাক্ষসীর কলেবর জর্জ্জরিত হইয়াছে। তাহার কৃশাঙ্গে ত্বক্ লম্বমান হইয়া বল্কলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এই সময় সেই আকাশের অর্দ্ধভাগপ্রপূরণী রাক্ষসীর কজ্জলসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ পবনকম্পিত ঊর্দ্ধগ শিরোরুহ সকল তারানিকরের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বোধ হইয়াছিল, যেন সেই সমস্ত কেশকলাপ মুক্তামালায় বিভূষিত। বিরাটাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা রাক্ষসীর তথাবিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া দয়াপরতন্ত্র হইলেন এবং বরদানের নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন[২০]।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।
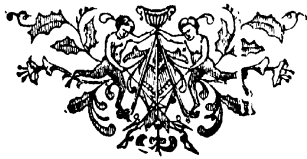
একোনসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসীর সেই কঠোর তপস্যায় সহস্র বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বৃত্তাকে বর প্রদান করিতে তথায় আগমন করিলেন। ব্রহ্মা দুর্ব্বৃত্তার তপস্যায় প্রসন্ন হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেন-না, যখন তপোবলে বিষাগ্নিও শীতল হয়, তখন আর রাক্ষসীর ব্রহ্মপ্রসাদ লাভের অসম্ভাবনা কি? শাস্ত্রকারেরাও বলিয়া থাকেন, তপস্যার অসাধ্য কার্য্য নাই[১]।

অনন্তর রাক্ষসী ভূতভব্যেশ ব্রহ্মাকে অবলোকন করতঃ মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিল। এবং মৌনা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, কিরূপ বর গ্রহণ করিলে আমার দুঃসহ ক্ষুধার শান্তি হইতে পারে। কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্থির করিল, এক্ষণে আমি বিভুর নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করি যে, যেন আমি আয়সী ও অনায়সী সূচী হই। (অনায়সী=ব্যাধিরূপিণী জীবসূচী। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিসূচিকা কীট। আর আয়সী লৌহময়ী সূচী। যাহাকে সূচ বলে, যাহার দ্বারা সীবন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা)[২।৩]। ঐরূপ বর প্রাপ্ত হইলে আমি জনগণের অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতসারে ঘ্রাণাকৃষ্ট সুগন্ধ যেমন জনগণের হৃদয়প্রবেশ করে সেইরূপে আমি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছানুসারে ক্রমে সকল জগৎ গ্রাস করিতে পারিব। এবং তৎক্রমে আমার এই দুঃসহ ক্ষুধার শান্তি হইতে পারিবে। ক্ষুধা নিবারণ হওয়াই পরম সুখ[৪।৫]।

রাক্ষসী মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিতেছে, অন্তর্যামী কমলাসন ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিলেন। শম, দম ও দয়া প্রভৃতিই তপস্বীদিগের ধর্ম্ম, পরন্তু রাক্ষসী তাহার বিরুদ্ধে লোকহিংসায় অভিলাষিণী হইয়াছে। জানিয়াও তিনি মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গলধ্বনিকারিণী রাক্ষসীকে প্রশংসা করতঃ বলিতে লাগিলেন, হে পুত্রি! হে রাক্ষসকুলরূপপর্ব্বতের মেঘমালা! হে কর্কটিকে! তুমি গাত্র উত্থাপিত কর। তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর গ্রহণ কর[৬।৭]।

কর্কটী কহিল, হে ভগবন্! হে বিধে! হে ভূতভব্যেশ! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আয়সী ও অনায়সী দ্বিবিধ সূচিকা হই৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা সেই রাক্ষসীকে 'তাহাই হউক' বলিয়া বর প্রদান করতঃ বলিলেন, তুমি নানা উপসর্গ সমন্বিতা বিসূচিকা (ব্যাধি) হইবে। তুমি দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক অপরিমিতভোজী, দুর্দ্দেশবাসী, অশুদ্ধদ্রব্যাদি ভক্ষণকারী, মূর্খ, দুষ্ক্রিয়ারত ও অশাস্ত্রীয়ব্যবহারপরায়ণ জনগণকে হিংসা করিবে। তুমি বায়বীয়পরমাণুতুল্য হইয়া জীবের প্রাণবায়ু (শ্বাস প্রশ্বাস) অবলম্বনে জনগণের অপান দেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত অধিকার (আক্রমণ) করতঃ তাহাদিগের হৃৎপদ্মসন্নিহিত প্লীহা, যকৃৎ ও বস্তিশিরাদির পীড়া উৎপাদন করতঃ তাহাদিগকে হিংসা করিবে। তুমি বাতলেখাত্মিকা বিসূচিকা ব্যাধি হইয়া কি সগুণ কি নির্গুণ সকল ব্যক্তিকেই অলক্ষ্যভাবে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। পরন্তু সগুণ জনগণের (সদাচারী ব্যক্তি দিগের) চিকিৎসার্থ এই মহামন্ত্র কহিতেছি, তাহারা তদ্দ্বারা তোমার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

ওঁ হ্রীং হ্রাং রীং রাং বিষ্ণুশক্তয়ে নমঃ।
ওঁ নমোভগবতি বিষ্ণুশক্তিমেনাং।
ওঁ হর হর নয় নয় পচ পচ মথ মথ
উৎসাদয় উৎসাদয় দূরে কুরু স্বাহা।
হিমবন্তং গচ্ছ জীব সঃ সঃ সঃ।
চন্দ্রমণ্ডলগতোঽসি স্বাহা।"

মন্ত্রের অর্থ এইরূপ।—ওঁকারাদিবীজস্বরূপা বিষ্ণুশক্তিকে আমি নমস্কার করি। হে ভগবতি! বিষ্ণুশক্তে! তোমার অংশস্বরূপা এই রোগাত্মিকা বিষ্ণু শক্তিকে তুমি হরণ কর, হরণ কর, গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, পচন কর, পচন কর, মন্থন কর, মন্থন কর, উৎসাদন কর, উৎসাদন কর, দূর কর। হে স্বাহারূপিণি রোগশক্তে! তুমি তোমার স্বস্থান হিমালয়ে গমন কর। *

* ইহা উক্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ। বিস্তৃতার্থ এইরূপ—বৈষ্ণবী শক্তি দ্বিবিধা। প্রথম মায়া-

মন্ত্রবান্ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করতঃ "তুমি মদীয় ভাবনার প্রভাবে চন্দ্রমণ্ডল-প্রাপ্ত হইলে।" এইরূপ চিন্তা করিবেন। পরে আপনার বামকরতলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লিখিয়া সংযতচিত্তে সেই হস্তের দ্বারা রোগীর গাত্র পরিমার্জ্জন করিবেন এবং দৃঢ় চিত্ত হইয়া ভাবিবেন, কর্কটী নাম্নী বিসূচিকারূপিণী রাক্ষসী উক্ত মন্ত্রমুদ্গরে মর্দ্দিত হইয়া রোদন করিতে করিতে হিমশৈলাভিমুখে পলায়ন করিল ও রোগী চন্দ্রমণ্ডলস্থ অমৃতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় জরা মরণ বর্জ্জিত ও সর্ব্বপ্রকার আধি-ব্যাধিবিমুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রবান্ সাধক আচমনাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া উপরি উক্ত মন্ত্রের দ্বারা রোগরূপিণী বিসূচিকা রাক্ষসীকে ক্ষয় করিতে পারিবেন। ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া গগনে গমন করতঃ গগন-বিহারী সিদ্ধগণ কর্তৃক অভিবাদিত হইলেন এবং তথায় কার্য্যান্তর-সিদ্ধ্যর্থ সমাগত পুরন্দরকে উক্ত বিসূচিকা মন্ত্র প্রদান করিয়া তৎকর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া নিজপুরে গমন করিলেন[১]।১৮।

শক্তি। অন্যান্য শক্তি যে মায়া শক্তির অধীন সেই শক্তি। দ্বিতীয়া মায়াশক্তির অধীন বস্তুশক্তি। বস্তুশক্তি প্রত্যেক বস্তুতে অনুগতরূপে বিরাজমান এবং তাহা সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী ভেদে নানা প্রকার। তন্মধ্যে যে শক্তি প্রাণিগণের দুষ্কর্ম্মের ফল উৎপাদন করে, সে শক্তির অন্যতম কার্য্য রোগ। তাহা তামসী সংহার শক্তির অংশ। তাহারই উপশমার্থ আদ্যা মায়া শক্তিকে ওঁ হ্রীং হ্রাং রীং রাং এই পাঁচ রহস্য বীজ দ্বারা সংবোধিত করতঃ নমস্কার করা হইয়াছে। পরে ওঁ নমঃ অর্থাৎ পরব্রহ্মাত্মিকায়ৈ নমঃ, এই বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছে। ভগশব্দের অর্থ মাহাত্ম্য অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব শক্তি। অর্থ—হে আদ্যবিষ্ণুশক্তে। তুমি এনাং বিষ্ণুশক্তিং—তোমারই অংশস্বরূপা এই রোগরূপা দ্বিতীয়া বিষ্ণুশক্তিকে ওঁ অর্থাৎ সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরে উপসংহার কর—উপসংহার কর। নয় নয় অর্থাৎ যথাগত স্থানে লইয়া যাও। পচ পচ অর্থাৎ পরিপাকের দ্বারা ইহার উগ্রতা বিনাশ কর। মথ মথ অর্থাৎ বিলোড়ন কর। উৎসাদয় উৎসাদয় অর্থাৎ এ স্থান হইতে স্থানান্তরে নিক্ষেপ কর। অথবা অন্য কোন প্রকারে ইহাকে দূর কর। অতঃপর আদ্যাশক্তির অধীন রোগশক্তিকে বলা হইতেছে। তুমি স্বস্থান হিমালয়ে গমন কর। পরে রোগীকে বলা হইতেছে। দুষ্কর্ম্মে অভিভূত তুমি রোগাভিভূত তুমি ও মৃত্যুকরাক্রান্ত তুমি মন্ত্রের সামর্থ্যে ও আমার ভাবনার প্রভাবে মৃত-সঞ্জীবনসমর্থ অমৃতে পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিলে। এইরূপ ভাবিয়া ও ঐরূপ বলিয়া মন্ত্রী অনন্যচিত্তে ভাবিবেন যে, হোতা যেমন প্রদীপ্ত অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করে, সেইরূপ, মন্ত্রপূত রোগীকে চন্দ্রমণ্ডলে নিক্ষেপ করিলাম। বলা বাহুল্য যে, এই কার্য্য শুচি হইয়া আচমনাদি বৈধ কার্য্য করিয়া এক মন এক চিত্তে নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতম সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, অনন্তর সেই কৃষ্ণবর্ণা পর্ব্বতাকারকায়াধারিণী রাক্ষসী কজ্জলের ন্যায় ও অম্বুদলেখার ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল[১]। (কজ্জল=সূর্ম্মা। অনুক্ষণ একটু একটু গ্রহণ করিলে এক কৌটা সূর্ম্মা যেমন শীঘ্র কমিয়া যায়, সে সেইরূপ কমিয়া গেল)। প্রথমতঃ মেঘখণ্ডের ন্যায়, তদনন্তর বৃক্ষশাখার ন্যায়, তদনন্তর পুরুষ-প্রমাণ, তদনন্তর হস্তপ্রমাণ, তদনন্তর প্রাদেশপরিমাণ, তদনন্তর অঙ্গুলি-প্রমাণ, তদনন্তর মাষশিম্বীসদৃশ হইল। তৎপরে স্থূল সূচীর, তৎপরে কৌষেয়-সীবন-যোগ্য সূক্ষ্মতম সূচীর আকার ধারণ করিল। পদ্মের সূক্ষ্ম কিঞ্জল্করেণু যদ্রূপ, রাক্ষসী তখন দেখিতে তদ্রূপ হইল। যেমন মনঃ-কল্পিত পর্ব্বত শীঘ্র দুর্লক্ষ্যতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই পর্ব্বতাকার রাক্ষসীও শীঘ্র পরমাণুর ন্যায় দুর্লক্ষ্য হইয়া গেল[৩।৪]। রাক্ষসী ঐরূপে কৃষ্ণকায়া লৌহসূচী ও রোগরূপা জীবসূচী, দ্বিবিধ সূচীর আকারে বিরাজিতা, আকাশচরী ও আকাশবাসিনী হইল এবং পূর্য্যষ্টক * সহ গতিবিধি করিতে লাগিল[৫]।

রামচন্দ্র! রাক্ষসীর সূচীত্ব প্রাপ্তি দৃশ্যভ্রান্তি ব্যতীত বাস্তব নহে। লৌহসূচীর ন্যায় দৃশ্যমানা হইলেও তাহাতে লৌহের সংস্পর্শও ছিল না।† ইহা সহস্র সহস্র সম্বিৎভ্রমের অন্যতম ভ্রম, সুতরাং বাস্তব নহে[৬]। রাক্ষসী এখন রশ্মিরেখার ন্যায় ও রত্নসূচীর ন্যায় মসৃণা, বৈদূর্য্যসম নির্মলা, পরমসুন্দরী ও সর্ব্বমনোহারিণী অদ্ভুততম রূপে প্রতীয়মানা হইতে লাগিল[৭]। অপিচ, বায়ু যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘপিণ্ডের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা বহন করে, উড়ায়, রাক্ষসী এক্ষণে তাহার ন্যায় আকারবতী হইল। দিব্য দৃষ্টি

---

* পূর্য্যষ্টক=মহাভূত, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ, কাম ও কর্ম্ম, দেহ এতৎ সমূহাত্মক। তাহার সহিত। মর্ম্ম=তত সূক্ষ্ম হইলেও তাহার ঐ সকল ছিল। অথবা মনুষ্যের ঐ সকল আক্রম করিত।

† ভাবার্থ এই যে,প্রকৃত লৌহ সূচ নহে, রক্তক্ষয় সূচীবেধ ও কণ্টকবেধ প্রভৃতি ক্লেশ।

থাকিলে দেখা যায়, তাহার মস্তকাংশে তদনুরূপ সূক্ষ্মছিদ্রের অভ্যন্তরে তাহার উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ নেত্র তারকা বিরাজ করিতেছে[৮]। ইহার মুখ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম। তৎকালে আরও দেখা গেল, পুচ্ছাগ্রভাগ পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম। সূচী তাদৃশসূক্ষ্মপুচ্ছাগ্রাদিবিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর গ্রহণার্থ স্বীয় দেহবৈপুল্যের বিপর্য্যয়ে প্রসন্নমনে তপস্যাচরণ করিয়াছিল। পূর্ব্বে ইহার সমুজ্জ্বল নয়নদ্বয় দূর হইতে দুইটী প্রজ্জ্বলিত দীপের ন্যায় দৃষ্ট হইত, কিন্তু এক্ষণে সূচীভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা শূন্যসম অদৃশ্য হইয়া গেল। রাক্ষসী যখন লব্ধবরা হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইতেছিল, তখন তাহার দেহের অন্তর্গত আকাশ, দেহের সূক্ষ্মতা নিবন্ধন ক্রমেই যেন বাহিরে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তৎকালে এরূপ বোধ হইতে লাগিল, রাক্ষসী যেন বর প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নবদনে আকাশ উদ্গীরণ করিতেছে[১০]। এক্ষণে সে দূরপ্রসৃত দীপ শিখার ন্যায় (বিরলাবয়ব রশ্মিরেখার ন্যায়) সূক্ষ্মা ও সদ্যোজাত বালকের কেশের ন্যায় কোমলা হইল[১১]। মৃণাল ভাঙ্গিলে তন্মধ্য হইতে যেমন সূক্ষ্ম তন্তু নির্গত হয়, এবং সুষুম্না নাম্নী সূক্ষ্মা নাড়ী যেমন মূলকন্দ (মূলাধার) হইতে উদ্গত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলের অভিমুখে গমন করে, রাক্ষসী এখন ঠিক্ তদনুরূপ রূপধারিণী হইল[১২]। তাহার তাদৃশ সূক্ষ্ম শরীর হইলেও তাহারই মধ্যে যথাযথ স্থানে যথাযোগ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল এবং জীবনও যথাযথ বিদ্যমান রহিল। রাক্ষসী ঐরূপে সজীব অনায়সী সূচীভাব প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধগণের ও তার্কিকদিগের বিজ্ঞানের ন্যায় জনগণের অলক্ষিত হইয়া গেল[১৩]। * অধিক কি বলিব, এই অনায়সী সূচী শূন্যবাদী বৌদ্ধের শূন্য পদার্থের অনুরূপা। আয়সী সূচী এই অনায়সী জীবসূচীর আশ্রিতা। ইহার রূপ আকাশের নীলিমার ন্যায়। ইহার অধীন যে জীবসূচী, তাহাও মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত চিদাভাসের অনুরূপ। যেমন বিনশ্যদবস্থাপন্ন সূক্ষ্ম দীপের কিরণ দৃষ্টিগোচর হয় না

* বৌদ্ধেরা আলয় বিজ্ঞানকে (একটী মূলীভূত অবিচ্ছিন্ন অহং অহং—আমি আমি, এতদ্রূপ জ্ঞানধারাকে) আত্মা বলে। তাদৃশ আত্মা কেবল তাহারাই বুঝে, অন্য কোন পণ্ডিত বুঝেন না। তার্কিকেরাও অর্থাৎ অপর এক বৌদ্ধেরাও তাদৃশ জ্ঞানধারার অস্তিত্ব সাধক দ্রষ্টা বা সাক্ষী থাকা স্বীকার করেন না। সেজন্য তাহাও অন্যের অবোধ্য। ফলিতার্থ—বৌদ্ধের ও তার্কিকের সম্মত আত্মা যদ্রূপ দুর্লক্ষ্য, এই সূচীও তদ্রূপ দুর্লক্ষ্য।

অথচ তাহার অন্তরে তীক্ষ্ণ দাহিকা শক্তি অস্পষ্ট ভাবে অবস্থিতি করে, তেমনি, এই সূচীভাবাপন্না রাক্ষসী নিতান্ত অদৃশ্যা হইলেও তাহার অন্তরে যথাযথ বাসনাদি বিদ্যমান ছিল[১৪।১৫]। দুঃখের বিষয় এই যে, রাক্ষসী ভক্ষণতৃপ্তি লাভার্থ সূচী হইল বটে, পরন্তু উদর না থাকায় তাহাতে তাহার সুবিধাবোধ হইল না। এখন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমি এই উদরবিহীন সূচীত্ব পরিগ্রহ করিয়া কি মূর্খতার কার্য্যই করিয়াছি![১৬] এইরূপ ও অন্যান্যবিধ চিন্তা করিয়া সে তুচ্ছ গ্রাস চিন্তাকে ও স্বীয় গ্রাসচেষ্টিত চিত্তকে নিরর্থক মনে করিতে লাগিল[১৭]। অনর্থবুদ্ধি জীবের চিত্তে পূর্ব্বাপর বিচারণার স্ফূর্ত্তি হয় না।" তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, মূঢ়মতি রাক্ষসী অবিচারপরায়ণা হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বৃথা সূচী ভাব গ্রহণ করিল[১৮]। কোন এক বিষয়ে অতি নির্ব্বন্ধ ভাল নহে। তাহাতে অভিমত পদার্থের অন্যথা হইয়া যায়, সুতরাং উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। দর্পণকে অতিরাগে পুনঃ পুনঃ সম্মুখবর্ত্তী করিতে গেলে নিঃশ্বাসে তাহা মলিন হইয়া যায়, প্রতিবিম্বদর্শন দূর-পরাহত হইয়া যায়[১৯]। রাক্ষসী পীবরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূচীত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেও তাহা সুখবৎ সহ্য করিতে বাধ্য হইল[২০]। কি আশ্চর্য্য! যাহারা এক বস্তুর প্রীতি অতি অনুরাগী, তাহাদের দুর্গতি ব্যতীত সুগতি হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত—রাক্ষসী আহারের প্রতি অতি অনুরাগিনী হইয়া আপনার বৃহৎ শরীর তৃণবৎ পরিত্যাগ করিল[২১]। জীব এক বস্তুর অত্যাস্বাদে অন্যান্য সম্বিদ্ (জ্ঞান) হারা হইয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত—রাক্ষসী অতি ভোজনের আস্বাদে আপনার দেহ বিনাশ ভাবনা করিল না[২২]। এক বস্তুর অনুরাগী অজ্ঞ লোকেরা বিনাশকেও সুখ জ্ঞান করে। তাহার নিদর্শন—রাক্ষসী আহারের অনুরাগে সূচী হইল, বিদেহ হইল, তথাপি সে তাহাতেও অসুখী হইল না, প্রত্যুত সুখী মনে করিতে লাগিল[২৩]। রামচন্দ্র! কর্কটী রাক্ষসী যে জীববিসূচিকারূপিণী অর্থাৎ ব্যাধিবিশেষরূপিণী হইল, তাহার বিবরণ এইরূপ—ব্যোমাত্মিকা সুতরাং নিরাকারা। তাহার লিঙ্গদেহও আকাশের তুল্য। যেমন সূক্ষ্ম তেজঃপ্রবাহ সেইরূপ। কুণ্ডলিনীশক্তির যে আকার, জীববিসূচিকারও সেই আকার। এই জীববিসূচিকা সূক্ষ্ম সূর্য্যকিরণের কিংবা চন্দ্রকিরণের ন্যায় সুন্দরবর্ণা[২৪।২৫]। ইহার মনোবৃত্তি পাপময়ী ও ক্রূরা

এবং অয়ঃসূচী অপেক্ষাও তীক্ষ্ণা। যেমন ফুলের গন্ধ নিশ্বাসযোগে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তেমনি, এই পাপীয়সী পরমাণু অপেক্ষাও সুসূক্ষ্মা হইয়া বায়ুভরে প্রাণিদেহে প্রবেশ করতঃ লীনা হইত ও অতিচতুরতার সহিত হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিত। পাপীয়সী পরের প্রাণ অর্থাৎ নিশ্বাস মাত্র অবলম্বন করিয়া পরকায় দেহে প্রবিষ্টা হইত ও নিজ মনোরথ সিদ্ধি করিত[২৬।২৭]। হে রঘুনাথ! রাক্ষসী অভিহিত প্রকারে কার্পাসাংশুসদৃশসূক্ষ্মা সূচীদ্বয়ময়ী ও নীহারকণসদৃশী তরলা, হইয়া সূক্ষ্ম দেহদ্বয় গ্রহণ করতঃ নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে হিংসা করতঃ দশ দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল[২৮।২৯]।

হে রাঘব! বস্তু সকল স্বীয় সঙ্কল্পের প্রভাবেই গুরু অথবা লঘু হইয়া থাকে। তাহারই দৃষ্টান্ত—কর্কটী স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারা বিশালদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম সূচীত্ব প্রাপ্ত হইল[৩০]। অতি তুচ্ছ বস্তুও দুর্ব্বুদ্ধি জীবের প্রার্থনীয় হয়। তাহার উদাহরণ—রাক্ষসী তপস্যা করিয়া সূচারূপে পৈশাচী বৃত্তি উপার্জ্জন করিল[৩১]। পুণ্য অর্জ্জনে প্রবৃত্তা হইয়াও যাহার যাহার জাতীয় কুস্বভাব শমতা প্রাপ্ত হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—তপস্যার দ্বারা পূতশরীরা হইয়াও রাক্ষসীর জাতীয় স্বভাব পরিত্যাগ হইল না। রাক্ষসী কেবল পরপীড়নার্থই তপস্যার দ্বারা সূচীদেহ উপার্জ্জন করিল[৩২]।

অনন্তর কর্কটীর সেই বৃহৎ শরীর প্রচণ্ডবাতবিশীর্ণ শরদভ্রের ন্যায় বিগলিত হইলে সে সূক্ষ্ম সূচীদেহ প্রাপ্ত হইয়া দিগ্দিগন্ত পরিভ্রমণে প্রবৃত্তা হইল। সেই জীবসূচী তখন বায়ুকণার ন্যায় স্বীয় অদৃশ্য সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা বিবশাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ ও বিপুলাঙ্গ জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ বিসূচিকাব্যাধিরূপে ও কৃশকায় স্বস্থ ও সুধী দিগের অন্তরে গমন করতঃ দুর্লক্ষ্য দুর্ব্বুদ্ধিরূপা অন্তর্ব্বিসূচিকারূপে প্রবেশ করতঃ স্বমনোরথ সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্তা হইল। সেই সূচিকা উক্ত প্রকারে জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ কখন পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল এবং কখন বা পুণ্য, মন্ত্র, ঔষধ ও তপস্যাদির দ্বারা নিবারিত হইতেও লাগিল[৩৩।৩৬]।

অনন্তর সেই সূচী বর্ণিতপ্রকারের দেহ গ্রহণ করতঃ কখন আকাশে কখন বা ভূমিতলে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিল[৩৭]। ভূতলে ধূলি-

কণার দ্বারা, আকাশে প্রভার দ্বারা, হস্তে অঙ্গুলির দ্বারা, বস্ত্রে সূত্রের দ্বারা তিরোহিত থাকিত। এবং জনগণের স্নায়ুতে, ব্যভিচারাদি দোষদুষ্ট উপস্থেন্দ্রিয়ে, হস্তপদাদির রূক্ষ রেখায়, সূক্ষ্ম রোমকূপে, নষ্ট সৌন্দর্য্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, সত্তাবশূন্য ও সৌভাগ্যবিহীন নষ্টকান্তি জনগণের অন্তরে, রুগ্ন ব্যক্তির নিশ্বাসে, মক্ষিকাদি কীট দুষ্ট ও রূক্ষ দুর্গন্ধ বায়ুযুক্ত তৃণাদ্যাবৃত প্রদেশে, শ্রীবৃক্ষ বর্জ্জিত প্রদেশে, * দুর্গন্ধবায়ুযুক্ত হরিদ্বর্ণ তৃণক্ষেত্রে,[৩৮।৪০] পশুনরাদির অস্থিবলিত (পরিব্যাপ্ত) প্রদেশে, সর্ব্বদা প্রবলরূপে বহমান বায়ুযুক্ত স্থানে, সাধু সজ্জন বর্জ্জিত প্রদেশে, অপবিত্রবসন ব্যক্তিগণের আবসথে অর্থাৎ নীচবৃত্তি ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদির সঞ্চার স্থানে,[৪১] কীটক্ষতবৃক্ষকোঠরবাসী বায়সাদি পক্ষীতে, শীতাধিক্য দ্বারা রূক্ষ ও শব্দায়মান বায়ু যুক্ত স্থানে, ঘনীভূতনীহারপটলসঞ্চার-স্থানে, ব্রণরোগীর ক্ষুদ্র (অল্পায়তন) বাস স্থানে, পুরুষপদচিহ্নিত প্রদেশে, বল্মীক মধ্যে, পর্ব্বতে, মরুভূমিতে, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও অজগরাদি সমাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যে, জীর্ণপর্ণসমাকীর্ণ শুষ্কবিরূপ দুর্গন্ধ পল্বল মধ্যে, শীতল সমীরণ বিশিষ্ট দুর্গন্ধজল গর্ত্তে, কুল্যাদিপরিবৃত প্রদেশে ও বহুল নিশ্বাস যুক্ত পান্থশালায়, ছারপোকা ও মশা প্রভৃতি নররক্তপায়ী কীট পরিব্যাপ্ত স্থানে গমনাগমন করিতে লাগিল[৪২।৪৬]। হয়হস্ত্যাদি পরিপূর্ণ নগরে ও পথিক গণের বিশ্রাম স্থানে গতায়াত করিতে লাগিল। অহে কুলপাবন রাম! সেই সূচিকা ঐরূপে বহুকাল পর্য্যটন করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্তা হইল[৪৭]। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে রথ্যানিক্ষিপ্ত ছিন্ন বস্ত্রাদি অবলম্বন করতঃ, বলীবর্দ্দ যেমন অরণ্যমধ্যে শৃঙ্গ দ্বারা বল্মীক প্রভৃতি মৃত্তিকাস্তূপ বিদীর্ণ করে, তেমনি, সে জনগণের জরাতপ্ত কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিল[৪৮]। কোন কোন লোক তাহাকে সীবন কার্য্যের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে সে যখন সীবন কার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইত, তখন সে বিশ্রামের নিমিত্ত সীবনকারীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও অদৃশ্য হইত[৪৯]। সূচী, বেধন-স্বভাব হইলেও কৌতুক কারণে সীবন কারীর হস্তাদি বিদ্ধ করিত না।

---

* শ্রীবৃক্ষ=বিল্ববৃক্ষ ও তুলসীবৃক্ষ। অথবা শ্রীবৃদ্ধিকারী বাস্তুবৃক্ষ। যে স্থলে তুলসী বা বিল্ববৃক্ষাদি না থাকে সে স্থল রোগরূপিণী বিসূচিকা পরিভ্রমণ করিতে ভালবাসিত। এ কথার অর্থ—ঐ সকল বিসূচিকা কীটের নাশক।

এবং কার্য্য হইতে অপসৃত হইলেও স্বীয় ক্রূর স্বভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইত না[৫০]। সে মুখ দ্বারা পরপ্রযুক্ত সূত্রপ্রান্ত গ্রাস করিত; সুতরাং পরপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরাধীন উদর পুরোণোদ্যম দ্বারা তাহাকে সুস্থচিত্ত থাকিতে হইত। রামচন্দ্র! অভিহিত লক্ষণাক্রান্তা অয়ঃসূচী ঐরূপে জীবসূচীর সহিত দিক্‌বিদিক্ সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিতে লাগিল[৫১]। যেমন বায়ুর দ্বারা তুষকণা ভ্রামিত হয়, সেইরূপ, সূচীও দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করিত। দুর্ম্মতি কর্কটী পূর্ব্বে সূচীত্ব পরিগ্রহের নিমিত্ত প্রফুল্ল-চিত্তে উৎকট তপঃক্লেশ সহ করিয়াও পরহিংসার দ্বারা উদর পূরণের অভিলাষ করিয়াছিল, এক্ষণে সে সূচীত্ব পরিগ্রহ পূর্ব্বক মাত্র পরপ্রযুক্ত সূত্রপ্রান্ত বদনে ধারণ করিয়া সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ক্রূরবুদ্ধি রাক্ষসী ক্ষীণ দিগকেও নির্দ্দয়ভাবে বেধন করিত। তাহার দৃষ্টান্ত—বস্ত্রসকল অত্যন্ত জীর্ণ হইলেও তাহাদিগকে সীবন করিতে ক্ষান্ত থাকিত না। এই দুঃশীলা রাক্ষসী অনল্প তপস্যার দ্বারা সূচীদেহ উপা-র্জ্জন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পরপ্রযুক্ত সূত্রাগ্রদ্বারা উদরপূরণ করা অযোগ্য অর্থাৎ অনুচিত বিবেচনা করিয়াছিল এবং সেই ক্ষীণোদরকারী তপঃকর্ম্মের নিমিত্ত অনুতপ্তা হইয়াছিল। মনোমধ্যে অনুতাপ ধারণ করিলেও সে স্বীয় রাক্ষসীস্বভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। সেইজন্য সে সর্ব্বদা বেধন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিত[৫২।৫৮]। যেমন জীবের মরণ-কালে বিষয়বাসনারূপ সুদীর্ঘ তন্তু (সুতা) উদ্ভূত বা আবির্ভূত হইয়া জীবচেতনাকে তদনুরূপ শরীরে সঞ্চারিত করে, তেমনি, সেই বেধন-চতুরা সূচী বস্ত্রে সূত্র সঞ্চারিত করিত[৫৯]। সে সীবনকার (ওস্তা-গর) কর্ত্তৃক সীবন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে সে স্বীয় মুখ যেন বস্ত্রদ্বারা গোপন করিয়াই তন্তুবেধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইত। যাহারা দুর্জ্জন—তাহারা অপ্রকাশ্য মুখেই (আড়ালে থাকিয়াই) জনগণের মর্ম্ম ভেদ করিয়া থাকে[৬০]। এই নির্দ্দয়া রাক্ষসী কখন নারীগণের কণ্ঠলগ্ন উত্ত-রীয় বসনে নিবদ্ধ হইয়া (ওড়্‌নায় ফুটিয়া থাকিয়া) স্বীয় ছিদ্ররূপ নেত্রদ্বারা তাহাদিগের বদন নিরীক্ষণ করতঃ "হায়! আমি ইহা-দিগকে কি প্রকারে বিদ্ধ করিব" এইরূপ চিন্তা করিত। যাহারা ক্রূর ও দুর্জ্জন—তাহারা ঐরূপেই পরহিংসা করিয়া থাকে[৬১]। কি মৃদুকোমল কৌশেয় বস্ত্র, কি রূক্ষ দৃঢ় ও কঠিন বল্কলাদি, সকল

স্থানেই তাহার স্বভাব সমভাবে কার্য্য করিত। যাহারা মূর্খ—তাহারা দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করে না৬২। সীবনকারের অঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা দীর্ঘসূত্রধারিণী সেই সূচীকা যখন সীবনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত—তখন তাহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন সে স্বীয় উদর হইতে অন্ত্র সকল উদ্গীরণ (পেট দিয়া নাড়ী বাহির) করিছে৬৩। তীক্ষ্ণা হইলেও হৃদয় না থাকায় তাহার সরস নীরস জ্ঞান ছিল না; সুতরাং সে রসাস্বাদ-বিহীনা হওয়ায় সূত্রনিরুদ্ধ হইয়া সকল পদার্থেই প্রবেশ করিত৬৪। হায়! সূচীর কি দুর্দ্দশা! সূচী নিষ্ঠুরভাষিণী নহে, অথচ ইহার বদন সূত্রদ্বারা আবদ্ধ। কাহাকেও সন্তাপিত করে না, অথচ সে সন্তপ্তা হয়। শরীরে ছিদ্র আছে, অথচ উদর নাই। যেমন কোন কোন রাজপুত্রী বুদ্ধিদোষে দুর্ভগা হয়, সেইরূপ, সূচীও বুদ্ধিদোষে দুর্ভাগ্য-শালিনী হইয়াছে৬৫। সূচী সচ্ছিদ্রা। সূচী পূর্ব্বে নিরপরাধী জনগণের সংহার বাসনা করিয়াছিল, এক্ষণে সে তাহারই প্রতিফলস্বরূপ সূত্র-নিবদ্ধ হইয়া কর্ম্মপাশে প্রলম্বিতা হইতে লাগিল৬৬। হে রামচন্দ্র! সূচী সীবক হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া কখন কখন অদূরে নিপতিত হইত, কখন বা উৎসঙ্গাদিতে (উৎসঙ্গ=ক্রোড়) নিপতিত হইয়া তত্রত্য কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত রোমরাজিকে মিত্রজ্ঞান করতঃ তৎসমীপে শয়ন করিত। আরও দেখাগিয়াছে, সেই রাক্ষসী সমভাব মূঢ়চিত্ত দিগেরই সহিত অবস্থান করিত। কে আপনার তুল্য সঙ্গতি পরি-ত্যাগ করে৬৭।৬৮? সে কখন কখন লৌহকার দিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইত, তন্নিবন্ধন সে কখন বা অগ্নিতে সন্তাপিত হইত ও ভস্ত্রাবাত-দ্বারা বিচলিত হইয়া গগনে উদ্গমন করিত। কখন প্রাণ ও অপান বায়ুর প্রবাহে অবস্থান করতঃ জনগণের হৃৎপদ্মে গিয়া বিচরণ করিত। এইরূপে সেই দুঃখপ্রদায়িনী ঘোরা দুঃখশক্তিস্বরূপা সূচিকা জীবশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া কখন সমান, উদান ও ব্যান বায়ুর প্রবাহে অবস্থান করতঃ জনগণের ব্যাধি উৎপাদন ও সর্ব্বাঙ্গে দোষ সঞ্চারণ করিত। কখন বা শূলরোগাত্মক বায়ুতে প্রবেশ করতঃ জনগণের হৃৎকণ্ঠে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের বৈবর্ণ্য উৎপাদন করিত ও কখন বা উন্মত্ত করিত। কখন লৌহসূচী হইয়া কম্বলাদি সীবন-কালে মেষপালকের হস্তে অবস্থান করতঃ উর্ণাকোটরে নিদ্রা যাইত।

কথন বালকগণের হস্তাঙ্গুলিরূপ শয্যা বিদ্ধ করতঃ ক্রীড়া করিত। কথন জনগণের পাদপ্রবিষ্টা হইয়া রুধির পান করিত। কথন পুষ্পমালা গ্রথনে নিযুক্ত হইয়া যৎসামান্য পুষ্পগুচ্ছ ভোজনেই পরিতৃপ্তা হইত। কথন চিরকালের নিমিত্ত কর্দ্দমকোষে অধোমুখে শয়ন করিয়া থাকিত; এবং যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যক্তিগণ দ্বারা গৃহীত হইয়া তাহাদিগের আলয়ে গমন করিত[৬৯।৭০]।

হে লম্বিতভুজ! পরহিংসাদ্বারা রাক্ষসীর কোন প্রকার স্বার্থসাধন না হইলেও সে নিরর্থক পরপ্রাণ বিনাশ করতঃ স্বীয় আত্মাকে ক্রূরতা দোষে দূষিত করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল। যাহারা নীচাশয়, কলহ তাহাদিগের উৎসব অপেক্ষা অধিক সুখপ্রদ হয়। রাক্ষসী কণামাত্র রক্ত লাভের নিমিত্ত সন্তুষ্টচিত্তে পরপ্রাণ হিংসা করিত। যাহারা কৃপণ, তাহারা অর্দ্ধ কপর্দ্দককেও বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহার রাক্ষসকুলোচিত পর-হিংসাভিমান দুরুচ্ছেদ্য ছিল। সর্ব্বদাই দেখা যায়, জনগণের অভিমান নিতান্ত দুরুচ্ছেদ্য[৭৬।৭৭]। মূঢ়মতি রাক্ষসী সূচীত্ব লাভ করিয়া মোহের বশবর্ত্তিনী ও সর্ব্বজন বিনাশের নিমিত্ত বৃথা অভিলাষিণী হইয়াছিল। অহো! যাহারা মূঢ়চেতা, তাহারা স্বার্থসাধক জ্ঞানে অস্বার্থ বিষয়ে অর্থাৎ নিজের অনিষ্টকর বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। "আমি বস্ত্রতন্তু বেধন দ্বারা শীঘ্র পরহিংসাবৃত্তি অভ্যাস করিতে পারিব" এইরূপ মনে করিয়া সে সন্তুষ্ট থাকিত[৭৮।৭৯]। হায়! সূচীর কি দুর্দ্দশা! যেমন কোন প্রসিদ্ধ সূচী স্থাপিত (কার্য্য বিরত) থাকিলে ঘর্ষণের অভাবে মলিন হইয়া যায়, তেমনি, এ সূচীও অন্যের অনপরাধে দুঃখ প্রাপ্তা হইয়াছিল। সেই সূক্ষ্মা অদৃশ্যা বেধনকরী তীক্ষ্ণা ক্রূরা ও উৎপাতরূপা সূচী ক্ষণে ক্ষণে আত্মবিস্মৃতা হইত এবং অন্য সময়ে জনগণের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। যাহারা দুর্জ্জন হয়, তাহারা যে কোন প্রকারে হউক, পরহিংসা করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়[৮০।৮২]।

হে মহাবাহো রামচন্দ্র! সেই রাক্ষসী অভিহিত প্রকারের দেহদ্বয় গ্রহণ করিয়া কখন পল্বলাদির পঙ্কে নিমগ্ন থাকিত, কথন আকাশে গমন করিত, কথন আকাশীয় বায়ুর সহিত দিক্‌তটে বিহার করিত, কথন পাংশুরাশি মধ্যে, কথন ভূমিতলে, কথন অরণ্যে, কথন পর্য্যঙ্কে, কথন গৃহে, কথন অন্তঃপুরে, কথন হস্তে এবং কথন বা জনগণের

কর্ণস্থ পদ্মপুষ্পে শয়ন করিত। কখন মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত কুড্যাদির সূক্ষ্ম ছিদ্রে অবস্থান করিত। কখন বা মনুষ্যাদির হৃদয়ে বসতি করিত। সূচিকা পূর্ব্বোক্ত সেই সেই আকারে ও সেই প্রকারে মন্ত্রসিদ্ধ ও দ্রব্যশক্তিসম্পন্ন মায়াবী জনের ও যোগিগণের ন্যায় সকল স্থানেই গমনাগমন করিত[৮৩]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে বুদ্ধিমন্! বশিষ্ঠদেব এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন; এমন সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। তখন সভাস্থজনগণ পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতকালে সেইসমস্ত জনগণ পুনর্ব্বার সেই সভায় আগমন করত স্ব স্ব স্থানে ও আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন[৮৪]।
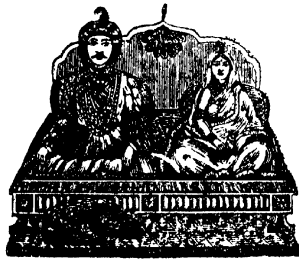
সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সূচীরূপা কর্কটী ঐরূপে বহুকাল নরমাংসাদির আস্বাদ গ্রহণ করিল অথচ পরিতৃপ্তা হইল না। তাহার সুদুর্জ্জয়া ক্ষুধা অল্প রুধিরে উপশমিত হইবার নহে[১।২]। অনন্তর রাক্ষসী তাদৃশী দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া একদা চিন্তা করিতে লাগিল—হায়! আমি কি অকার্য্যই করিয়াছি? ওঃ আমার কি কষ্ট! উঃ কি দুঃখ! কেন আমি ইচ্ছা করিয়া সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত ও হতশক্তি হইলাম! আমার ভক্ষণ শক্তি এত অল্প হইয়াছে যে, আমার উদরে এক গ্রাসেরও স্থান নাই[৩]। আমার সেই পূর্ব্বতন বিশাল অঙ্গ এক্ষণে কোথায় গেল? আমার সেই মেঘকান্তি বিশাল দেহ এক্ষণে নাই, তাহা জীর্ণ পর্ণের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়াছে[৪]। আমি কি দুর্বুদ্ধি! কি হতভাগিনী! সম্প্রতি বসাসুবাসিত রক্ত মাংস প্রভৃতি সুস্বাদু ভক্ষ্য সকল অতিমাত্র অল্প হইলেও আমার নিকট অপরিমিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে[৫]। আমি এখন জনগণের পদদ্বারা আহত, পঙ্কান্তরে নিমগ্ন, ভূতলে নিপতিত ও শুক্রধাতুতে নিমগ্না হইতেছি[৬]। * হায়! হায়! আমি এখন হতা ও অনাথা! এমন বন্ধু নাই যে, আমাকে আশ্বাস দেয় ও আশ্রয় দান করে। আমি সূচী হইয়া এক সঙ্কট হইতে অন্য এক ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াছি এবং ক্ষুদ্র দুঃখ হইতে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি[৭]। হায়! হায়! আমি এখন এমন দুঃখিনী যে, আমার সখী, দাসী, মাতা, পিতা, বন্ধু, ভৃত্য, ভ্রাতা, সন্তান, দেহ, স্থান, অধিক কি, এখন আমার কোন প্রকার উপজীব্য, কিছুই নাই। আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানও নাই। এখন আমি সর্ব্বদা অরণ্যে নিপতিত ও শুষ্ক পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি[৮।৯]। আমি আপদ্ সমূহের সম্মুখে অবস্থান করিতেছি, নিদারুণ বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়াছি, সর্ব্বদা মরণাভিলাষ করিতেছি, তথাপি মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিতেছে না[১০]। আমি কি

* বিসূচিকা কীট প্রায়ই শুক্রধাতু দূষিত ও আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়।

মূঢ়মতি! মূঢ় ব্যক্তিরাই কাচ বলিয়া হস্তগত চিন্তামণি পরিত্যাগ করে। তাহাদের ন্যায় আমিও মূঢ়চেতনা হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি[১১]। এখন বুঝিলাম, আমার মনই এই মহৎ দুঃখের হেতু। মোহগ্রস্ত মনই দুর্ব্বুদ্ধিরূপ আপদ্ বিস্তার করতঃ দুঃখপরম্পরা বিস্তার করে[১২]। কি দুঃখ! কি বিষাদ! আমি যে এখন, কখন ধূমে অবস্থিত, কখন পথি মধ্যে খরোষ্ট্রাদি জন্তুগণ দ্বারা মর্দ্দিত এবং কখন বা তৃণাদিতে প্রক্ষিপ্ত হইতেছি, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক দুঃখের অবস্থা হইতে পারে? আমি এখন নিত্য পরপ্রচালিত ও পরসঞ্চারিত হইতেছি। হায়! আমি এখন যার পর নাই দৈন্যতা প্রাপ্তা ও পরের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি[১৩।১৪]। আমার সেই রক্তমাংসাদির আস্বাদ লালসা এখন কেবল মাত্র পরপীড়াদায়িনী হইয়াছে! (উদর ও জিহ্বা না থাকায় স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইয়াছি, সুতরাং কেবল পরপীড়া প্রদানই আমার সার হইয়াছে) আমি নিতান্তই হতভাগিনী। কেননা, সূচী হওয়ায় আমার দুর্ভাগ্যের পরিসীমা রহিল না[১৫]। আমি তপস্যার দ্বারা যাহার শান্তি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে তাহাই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। কেন আমি আমার আত্মবিনাশ আনয়ন করিলাম! আমার এ ঘটনা, ভূত ছাড়াইতে ভূতে পাওয়ার অনুরূপ[১৬]। কেন আমি আমার তাদৃশ বিশাল দেহ পরিত্যাগ করিলাম। কেনই বা আমার দেহবিনাশকারিণী অশুভা মতি সমুদিত হইয়াছিল? এখন বুঝিলাম, বিনাশের পূর্ব্বে জীবের দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে[১৭]। এক্ষণে আমি কীটাণু হইতেও সূক্ষ্মা। এখন পাংশুচ্ছন্ন প্রদেশে নিপতিত আমাকে কে উদ্ধার করিবে? মানবগণ উদ্ধার করিতে পারেন বটে; কিন্তু দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহারাও আমাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন না[১৮]। সূক্ষ্মদর্শী যোগীরাই আমার উদ্ধারে সমর্থ, কিন্তু মাদৃশ হতাশয়গণ কি প্রকারে সেই গিরিবাসী বিবিক্তমনা উদাসীন যোগিগণের অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইবে[১৯]? আমি অজ্ঞতারূপ মহাসমুদ্রে অবস্থান করিতেছি, আর আমার অভ্যুদয়ের প্রত্যাশা নাই। যাহারা অন্ধ, তাহারা কি কখন নখদর্পণদর্শী জনগণের ন্যায় দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হয়[২০]? হায়! হায়! আমি যে আর কত কাল এরূপ আপদ্ সমূহে পরিবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া এই আপদ্‌পরিপূর্ণ গর্ত্তে

লুণ্ঠিত হইব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না[২১]। আর কি আমি সেই অঞ্জনমহাশৈলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিশাল দেহ ধারণ করতঃ গগনতলস্পর্শী স্তম্ভের ন্যায় অবস্থান করতঃ প্রাণিসংহারে প্রবৃত্ত হইতে পারিব? আর কি আমি সেই জলধরপটল সন্দর্শনে নর্ত্তনশীলা শিখণ্ডিনীর ন্যায় নিশ্বাসপবন দ্বারা নর্ত্তিত ও লোলায়িত স্তনদ্বয় বিশিষ্ট শ্যামবর্ণ লম্বোদর দেহ প্রাপ্ত হইব? আর কি আমি আকাশের-মানদণ্ড (মাপের বাঁশ) স্বরূপ অত্যুচ্চকেশকলাপসম্পন্ন, মেঘবিম্বসদৃশ দীর্ঘভুজদ্বয়শালিনী ও বিদ্যুৎসদৃশ নয়ন সম্পন্না হইতে পারিব[২২।২৪]? আর কি আমি হাস্যবিনির্গত তেজঃশিখারদ্বারাদগ্ধ অরণ্যের ভস্মরাশির দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করতঃ কৃতান্তের ন্যায় সকল প্রাণী গ্রাসে উদ্‌যোগিনী হইতে পারিব? আর কি আমি সেই ভীষণ আকার লাভ করিতে পারিব? আর কি আমি জলন্ত উলূখল সদৃশ নয়ন সম্পন্ন ও সর্পমালারূপ স্রগ্‌দাম (হার) ভূষিত হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে পারিব[২৫।২৬]। আর কি আমি গিরিগুহোপম ভাস্বর মহোদর বিশিষ্টা শরন্মেঘোপম স্নিগ্ধনখরাবলী সম্পন্না রক্ষঃকুল বিদ্রাবণ কারিণী হইয়া হাস্য সহকারে মহারণ্যে আনন্দে স্ফিগ্‌বাদ্য করতঃ (স্ফিক্=নিতম্বপার্শ্ব, পাছা।) নৃত্য করিয়া বেড়াইতে পারিব? আর কি আমি মদিরাকুম্ভ ও মৃতমাংসাস্থিসমূহের দ্বারা আমার সেই দুরোদর পূর্ণ করিতে সমর্থা হইব? আর কি আমি তাদৃশ পীতবর্ণাভ আরক্ত প্রান্ত নয়ন প্রাপ্ত হইব? আর কি আমি সেইরূপ হৃষ্টা পুষ্টা প্রদীপ্তা থাকিয়া সুখনিদ্রা লাভ করিতে সমর্থা হইব[২৭।৩০]?

হায়! কি নিমিত্ত আমি অশুভফলপ্রদ তপস্যারূপ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে সেই উগ্র মহাবপু ভস্মীভূত করিলাম? কি নিমিত্ত আমি সেই সুবর্ণরূপ মহাশরীর পরিত্যাগ করিয়া লৌহরূপ অয়ঃসূচীত্ব গ্রহণ করিলাম[৩১]? অহো ভাগ্য! আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি! আমার সেই দিক্‌পরিব্যাপ্ত অঞ্জনশৈলসঙ্কাশ (অঞ্জনশৈল=কজ্জলেরপর্ব্বত) বিশাল মহাদেহ এখন কোথায় গেল? আমার সেই তাদৃশ মহাদেহই বা কোথায়? আর এই ডাঁশ পোকার পাদাগ্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম সূচীদেহই বা কোথায়[৩২]? ভ্রান্তির বশবর্ত্তিনী হইয়াই আমি এই সূচীত্ব লাভের নিমিত্ত তাদৃশ ভাস্বর মহাবপুরূপ কনকাঙ্গদকে মৃত্তিকা জ্ঞান করিয়া

পরিত্যাগ করিয়াছি[৩৩]! হায়! আমার সেই বিশাল দেহ এখন কোথায় রহিল? হে মদীয় বিন্ধ্যাচলগুহোপম মহোদর! কি নিমিত্ত তুমি করিবিঘাতী সিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া অদ্য তদীয় বিয়োগ-দুঃখরূপ হস্তীকে সংহার করিতেছ না[৩৪]? হে মদীয় নির্ভিন্নগিরি-শিখরোপম বিশাল ভুজদ্বয়! তোমরা কি কারণে আজ চন্দ্রসদৃশ নখরপঙ্‌ক্তির দ্বারা উদিত চন্দ্রকে দেবভোগ্য পুরোডাশ জ্ঞানে বাধা প্রদান করিতেছ না[৩৫] (বিদীর্ণ করিতেছ না?) হে বৈদূর্য্যপংক্তি-পরিশোভিতগিরীন্দ্রতটসদৃশসুন্দর বিশাল বক্ষঃ? কি নিমিত্ত তুমি যূক-রূপ সিংহাদিপরিবৃত রোমবন (যূক=মৎকুণ ছারপোকা বা উকুন। রোমবন=লোমসমূহ) ধারণ করিতেছ না[৩৬]? হে মদীয় কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর অন্ধকাররূপ ও শুষ্কেন্ধনপ্রোদ্দীপনকারী অনলসদৃশ নেত্রদ্বয়! তোমরাই বা কেন আজ্ দৃগ্‌জ্বালা (জ্বলিত দৃষ্টি) বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক বিভূষিত করিতেছ না[৩৭]?

অহে স্কন্ধ! তুমিও কি এই হতভাগিনী কর্তৃক মহীতলে পরিত্যক্ত হইয়া কালকর্তৃক বিনিষ্পিষ্ট, শিলাতলে নিঘৃষ্ট ও বিনষ্ট হইয়াছ[৩৮]? অহে মদীয় মুখচন্দ্র! তুমিও কি মদীয় কু-তপস্যারূপ হুতাশনে দগ্ধ হইয়া কল্পান্তাগ্নিবিদগ্ধ শশাঙ্কবিম্বের ন্যায় মলিনতা প্রাপ্ত হইলে[৩৯]? অহে সুদীর্ঘ লম্বমান ভুজদ্বয়! তোমরা এখন কোথায় গেলে? হায়! আমি কি হতভাগিনী! আমি তাদৃশ বিশাল শরীর পরিত্যাগ করিয়া এখন কি না মক্ষিকার খুরাগ্রসদৃশ সূক্ষ্ম সূচীদেহ গ্রহণ করিলাম! হায়! আমার সেই পূর্ব্বতন বিন্ধ্যপর্ব্বতের গভির গহ্বরের ন্যায় পায়ুগর্ত্তযুক্ত (পায়ুগর্ত্ত=মলদ্বার) ও স্থূলবৃক্ষমূলযুক্ত হ্রদের ন্যায় যোনিছিদ্রযুক্ত নিতম্বদেশ এখন কোথায় গেল? আমার সেই গগনস্পর্শী বিপুল দেহই বা কোথায়, আর এই তুচ্ছ সূচী দেহই বা কোথায়? রোদোরন্ধ্র (স্বর্গের ও মর্ত্তের মধ্য ভাগ) সদৃশ বদন কুহরই বা কোথায়, আর এই সূক্ষ্ম সূচীমুখই বা কোথায়? প্রভূত মাংসসম্ভার-বহুল ভোজনই বা কোথায়, আর এই সূক্ষ্মসূচীমুখ দ্বারা কণামাত্র রক্তভোজনই বা কোথায়? হায়! হায়! আমি কেবল আত্মক্ষয়ের নিমিত্তই তপস্যা করিয়াছিলাম এবং এইরূপ সূক্ষ্ম সূচীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম[৪০]।[৪২]।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মূঢ়মতি সূচী প্রাক্তন দেহের নিমিত্ত ঐরূপ ঐরূপ বিলাপ ও অনুতাপ করতঃ অবশেষে মৌনা হইয়া একাগ্র চিত্তে নিশ্চলভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর স্থির করিল যে, আমি পূর্ব্বতন দেহ লাভের নিমিত্ত অবিলম্বে পুনর্ব্বার তপস্যার্থ গমন করিব। সূচী ঐরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া জনবিনাশবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই হিমালয় শৃঙ্গে গমন করিল এবং তপস্যায় প্রবৃত্তা হইল। সে প্রথমে আপনার মনঃকল্পিত সূচীত্ব অনুভব করিল, পরে প্রাণবায়ুময়ী জীবসূচীকে কল্পনার দ্বারা কল্পিত লৌহসূচীতে প্রবিষ্ট করিল। অর্থাৎ জীবসূচী ভাবান্বিত আপনাতে সেই লৌহসূচী ভাব সমারোপিত করিল। রাঘব! সেই প্রকারে সেই কর্কটী প্রাণবায়ুর সহিত অভিন্নশরীরা হইয়া ক্রিয়াশক্তি লাভ করতঃ হিমাচলশৃঙ্গে গমন করিয়াছিল। *

---

* অভিপ্রায় এই যে, আত্মা নিষ্ক্রিয়, সে জন্য তাঁহার গমন অসম্ভব, সূচীও নিরিন্দ্রিয় সে জন্য তাহাতেও ক্রিয়া শক্তি নাই। সুতরাং সূচীর হিমালয় যাত্রা সর্ব্বথা অসম্ভব। তাই বশিষ্ঠ বলিলেন, লৌহসূচী ও জীবসূচী উভয় সূচীই কর্কটীর মানস ভ্রান্তি। এক্ষণে উক্ত ভ্রমময় সূচীদ্বয় অন্য বিভ্রম দ্বারা পরস্পর একীভাব ভাবনায় ভাবিত হইয়া যাওয়ায় প্রাণবায়ুরূপিণী জীবসূচীর ক্রিয়াশক্তি তাহাকে গতিশক্তি সম্পন্না করাইল। অর্থাৎ সে ভাবিল, আমি হিমালয়ে গেলাম। অথবা শরীরস্থ ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রাণবায়ুই শরীরকে এখানে সেখানে লইয়া যায়, তাই আরোপ ক্রমে লোকে বলে, অমুক অমুক স্থানে গিয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার গমনাগমন না থাকিলেও শরীরের গমনে তাঁহারও গমন লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ বিষয়ের ক্রম বা প্রণালী এই যে, কর্কটী, আমি সূচী হইয়া কষ্ট পাইতেছি এইরূপ মনে করিয়াছিল। তাই এক্ষণে সে কল্পনার দ্বারা জীবসূচী, লৌহসূচী, প্রাণবায়ু ও মন, এ সকল প্রভেদ বর্জ্জিত হইয়া, মনের দ্বারা সুতরাং প্রাণবায়ুযুক্ত জীব শরীর দ্বারা, হিমালয় গামী হইলাম, এইরূপ ভাবনায় ভাবিত হইতে লাগিল। প্রাণবায়ু ও মন জীবশরীরের পরিচালক। বশিষ্ঠদেব এই কথা অগ্রে যাইয়া স্পষ্ট করিয়া বলিবেন। অগ্রে যাইয়া আরও বলিয়াছেন যে, সূচী এক গৃধ্রশরীরে প্রবেশ করিয়া হিমাচলে গিয়াছিল।

অনন্তর সেই ইন্দ্রনীলশিলাভা দৃঢ়ব্রতপরায়ণা সূচী হিমগিরিশৃঙ্গে গমন করতঃ মরুভূমিতে অকস্মাৎ সঞ্জাত তৃণাঙ্কুরের ন্যায় তত্রস্থ সর্ব্ব-ভূতবিবর্জ্জিত, দাবানল দগ্ধ, আতপতাপরূক্ষ, পাংশুবিধূসর, নিস্তৃণ বিপুল স্থলভাগে গিয়া আবির্ভূতা হইল[৬]। সেই সূক্ষ্মা একপদী সূচীর সম্বিদই (জ্ঞানই) কল্পনার দ্বারা পদদ্বয়ে বিভক্তা কৃত হইল, অনন্তর সে সেই কল্পিত ভাগদ্বয়ের অগ্রার্দ্ধভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরার্দ্ধ ভাগ দ্বারা ভূতল আশ্রয় করতঃ একপদী হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্তা হইল[৭]। * সূচী আপনার সুসূক্ষ্ম পাদাগ্রভাগ বসুধারেণুতে বিদ্ধ করতঃ পার্শ্ব, পশ্চাৎ, ও সম্মুখ না দেখিয়া ঊর্দ্ধমুখে ও এক দৃষ্টিতে অবস্থিতি করিতে লাগিল[৮]। †

সে তখন কৃষ্ণবর্ণ বদন দ্বারা পবন গ্রাসের নিমিত্তই যেন ঊর্দ্ধমুখী হইয়াছিল এবং ধূলিকণা ও উপলখণ্ডাদি সমাকীর্ণ সঙ্কট স্থানে যেন তাহার সেই একমাত্র পদ যত্ন সহকারে সুস্থির রাখিয়াছিল[৯]। যেমন জলৌকাগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দূরস্থিত আহার দর্শনের নিমিত্ত মুখোত্তোলন করতঃ দেহের নিম্নভাগদ্বারা তৃণপর্ণাদির অগ্রভাগে স্থিরভাবে দণ্ডায়-মান থাকে, সেইরূপ, সূচীও বায়ু ভক্ষণের নিমিত্ত ঊর্দ্ধমুখে ও এক-পদে সুস্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল[১০]। তাহার মুখরন্ধ্রবিনির্গত সূচীর ন্যায় আকার সম্পন্ন ভাস্করদীধিতি তাহার সখীত্ব গ্রহণ করতঃ তাহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিল[১১]। ‡ অহো! নীচ ব্যক্তি স্বজনকল্প হইলে, তাহার প্রতিও মহতের স্নেহ ভাব জন্মে। অধিক কি বলিব, সূচীর ছায়াও সেই অরণ্যমধ্যে

---

* ভাবার্থ এই যে, মনুষ্যতপস্বীরাই একপায়ে দাঁড়াইয়া কঠোর তপস্যা করে; পরন্তু সূচী মনুষ্যের ন্যায় দ্বিপদ নহে। তবে কি প্রকারে সে এক পায়ে দাঁড়াইবে? তাই বশিষ্ঠদেব বলিলেন, সূচী আপন সম্বিদের (কল্পনার) দ্বারা আপনাকে দ্বিপদ ভাবনায় ভাবিত করিয়াছিল, অথবা আপনার অগ্রভাগের লেশমাত্র ভূমিস্পৃষ্ঠ করিয়া খাড়া হইয়াছিল, এবং তাহারই রূপক বা উৎপ্রেক্ষা এক পদে তপস্যা।

† ভাবার্থ এই যে, সূচী বিষয় দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া সমাধিস্থা হইল।

‡ ইহাতে এইরূপ বলা হইল যে, সূচীর সূক্ষ্মছিদ্র প্রদেশে যে সূর্য্যরশ্মি প্রতি-ফলিত হইতেছিল, সেই প্রতিফলনকে বলা হইল, ঠিক্ যেন আর একটী সূচী এবং সে সূচী যেন এ সূচীর সখী। সর্ব্বদা সঙ্গে থাকায় সখী।

তাহার সখী ও দ্বিতীয়া তাপসী হইয়াছিল। সূচিরূপিণী মলিনা ছায়া স্বীয় সখীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করতঃ তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিল[১২।১৩]। অনন্তর সূচীরন্ধ্র নির্গতা সূর্য্যদীধিতিরূপা সূচী সখী ছায়াসূচীতে নিপতিত হইয়া তাহার চক্ষুঃস্বরূপ হইল এবং সেই ছায়াও দীধিতিসখীকে ধারণ করতঃ তাহার মূল স্বরূপ হইল। এইরূপে তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য দ্বারা স্ব স্ব বল সংরক্ষণ ও দৃঢ় করিতে লাগিল। রাঘব! সূচীর এতাদৃশ তপস্যার প্রভাবে সম্মুখস্থ দ্রুমলতাদিরাও সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সমস্ত লতাদ্রুমাদি স্বস্বকুসুমসুবাসিত অনিলদ্বারা মহাতপস্বিনী সূচীর বায়ুভোজন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল[১৪।১৫]। অপিচ, তপোবিষয়ে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত স্বস্বপ্রসূত সুগন্ধি কুসুমনিকর ও পুষ্প-রজোরাজি দেবতাদিগকে ও অন্য কাহাকে প্রদান না করিয়া সমস্তই তাহাকে সমর্পণ করিতে লাগিল[১৭]। সূচীর তপোবিঘ্ন সাধনের নিমিত্ত বাসব কর্ত্তৃক যে সকল আমিষাদি ও অপবিত্র রজোরাজি বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহার ছিদ্ররূপ বদনকুহরে প্রবিষ্ট হইত, তপঃপরায়ণা সূচী অপবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহা ভক্ষণ করিত না। কারণ, অন্তরে সারভাগ সমুদিত হইলে অত্যন্ত লঘুচেতারাও স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য রক্ষা করিতে তৎপর হয়[১৮।১৯]। সেই রাক্ষসী সেই সমস্ত অপবিত্র রজোরাজি ভক্ষণ করিল না দেখিয়া মহেন্দ্রপ্রেরিত পবন, লোকে সুমেরু উন্মূলিত দেখিলে যদ্রূপ বিস্মিত হয়, তদপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইলেন[২০]। তপস্যায় লীনচেতসী তপস্বিনী সূচী পঙ্কে আপাদ মস্তক নিমগ্না, মহা অশনির দ্বারা প্রপীড়িতা, প্রচণ্ডানিল দ্বারা বিকম্পিতা, বনবহ্নির দ্বারা দগ্ধা, অশনিপতন দ্বারা বিশীর্ণা, তড়িৎ ও ভূকম্পাদির দ্বারা বিভ্রামিতা, জলদপটল দ্বারা উদ্বেজিতা ও ভীষণ মেঘগর্জ্জন দ্বারা বিক্ষোভিতা হইলেও সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছাসুপ্ত জনগণের ন্যায় নিষ্পন্দ থাকিল, পাদাগ্রভাগও বিচলিত করিল নাই[২১।২৩]।

ঐরূপে সেই স্পন্দরহিত সূচিকা তপস্বিনীর সেই স্থানে ক্রমে বহুকাল গত হইল। বহুকাল তপস্যার পর তাহার হৃদয়ে জ্ঞানালোক সমুদিত হইল। তখন সেই কর্কটী পরাবরদর্শিনী ও নির্ম্মলা হইল। (পরাবরদর্শিনী=সগুণ-নির্গুণ-ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবতী। নির্ম্মলা=অজ্ঞান

মালিন্য বর্জ্জিতা।) সেই দুর্ব্বুদ্ধি কর্কটী এখন তপস্যার দ্বারা বিদিত-বেদ্যা হইয়া স্বীয় দুঃখদ সূচীদেহকে অধুনা সুখপ্রদ বলিয়াই বিবেচনা করিল[২৫।২৬]।

সূচী এক্ষণে উক্তপ্রকারে ঊর্দ্ধমুখে সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ভুবনসন্তাপ-কারিণী দারুণ তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার সেই ভীষণ তপস্যারূপ অগ্নিতে সেই মহাগিরি ও জগৎ প্রজ্বলিত প্রায় হইয়া উঠিল[২৭]। এই অবস্থায় বাসব দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! কোন্ ব্যক্তির উগ্রতর তপস্যায় এই জগৎ সূর্য্যবৎ জ্বলিত হইতেছে[২৮।২৯]?

নারদ বলিলেন, হে মহাবিজ্ঞানসম্পন্ন বাসব!' ইহা সূচীর তপস্যার প্রভাব। সূচী সপ্তসহস্রবর্ষব্যাপিনী সুদীর্ঘ তপস্যায় প্রবৃত্তা হইয়াছে। তাহার সেই ক্ষয়মায়াসদৃশী (ক্ষয়মায়া=জগৎসংহারিণী রুদ্রশক্তি) ভয়-ঙ্করী তপস্যার দ্বারাই এই জগৎ প্রজ্বলিত, নাগনিচয় নিশ্বসিত, নগগণ বিচলিত, বৈমানিক সমূহ অধঃপতিত, জলধি ও জলধর শুষ্কপ্রায় হইয়াছে এবং দিক্‌সকল দিক্‌প্রকাশক সূর্য্যের সহিত মলিনীকৃত হইয়াছে[৩০।৩১]।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! দেবরাজ ইন্দ্র নারদ সকাশে সূচীর সেই ভয়াবহ তপোবৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ তাহার ভোগ প্রকারাদি (উদ্দেশ্য বিবরণ) শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কুতূকাক্রান্ত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবর্ষে! জড়বুদ্ধি কর্কটীর ন্যায় তুচ্ছবিষয়ভোগচপলা আর নাই। যাহাই হউক, কর্কটী তপস্যার দ্বারা সূচীত্ব উপার্জ্জন করিয়া কি কি প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিল তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১।২]।

নারদ বলিলেন, সুররাজ! কর্কটী তপস্যার দ্বারা অদৃশ্যস্বভাব পিশাচীর ন্যায় অলক্ষ্যস্বভাব সূক্ষ্ম জীবসূচীত্ব উপার্জ্জন করিলে, কৃষ্ণবর্ণা আয়সী সূচী (আয়সী=লৌহময়ী) তাহার সমবল ও আশ্রয় হইয়াছিল। পরে সে সেই আশ্রয়স্বরূপা আয়সী সূচীকে পরিত্যাগ করতঃ পক্ষিণীর ন্যায় নভোমার্গে সমুড্ডীন হইত ও আকাশীয়বায়ুরূপ রথে আরোহণ করতঃ জীবগণের প্রাণবায়ুর (নিশ্বাস প্রশ্বাসের) দ্বারা তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিত[৩।৪]। জীবসূচী সেই প্রকারে পাপাত্মগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ আন্ত্রতন্ত্রীসমূহের রন্ধ্রভাগ দ্বারা (নাড়ীছিদ্র দিয়া) গমন করতঃ দেহান্তর্নিলীন স্নায়ু, মেদ, বসা ও শোণিতাদিতে ও যাহাতে রোগের আশ্রয়স্বরূপ দুষ্টবায়ু প্রবাহিত হয়, সেই সমস্ত নাড়ীতে অবস্থান পূর্ব্বক অত্যুগ্র অগ্নিপিণ্ড বিদাহের ন্যায় দাহ ও শূল (বেদনা) উৎপাদন করিত এবং তথায় অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত প্রাণিগণের ভোজনোচিত পদার্থসমুদয় ও প্রভূত নরমাংসাদি ভোজন করিত[৫।৭]।

হে শক্র! এই জীবসূচী কান্ত-বক্ষ-ন্যস্ত-কপোলা, মুগ্ধা ও কান্তাশ্লেষামোদিতা, স্রগ্‌দামবিভূষিতা কামিনীগণের শরীরে তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগের ভোগ্যজাত ভোগ করিত[৮]। বিহঙ্গমগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া কল্পদ্রুমরাজির সুগন্ধ মকরন্দ হইতেও দ্বিগুণতর সুরভিসম্পন্ন শোকাপনোদনকারী কমলবন-বীথিতে বিহার করিত[৯]।

ভ্রমরী শরীরে অবস্থান করতঃ মন্দারবনে সুগন্ধ মকরন্দকণাসব পান ও ভ্রমরগণের সহিত এলাবনে ক্রীড়া করিত[১০]। বৃদ্ধা গৃধ্রীগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সহিত রন্ধ্রীকৃত শবদেহ চর্ব্বণ করিত এবং খড়্গাধারে অবস্থান করতঃ সংগ্রামে বীরদেহ সকল ছিন্নভিন্ন করিত[১১]। শক্র! বায়ুলেখা যেমন অবাধে দিক্‌বিদিক্ পরিভ্রমণ করে, সূচী তাহার ন্যায় দেহীর দেহান্তরাকাশে, নাড়ীর্ত্তে ও নীলবর্ণ ব্যোমবীথিতে পরিভ্রমণ করিত[১২]। যেমন বিরাটাত্মা পিতামহের (ব্রহ্মার) হৃদয়ে সমষ্টি প্রাণবায়ুস্পন্দ সচ্ছন্দে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, এই জীবসূচী প্রতিদেহেই প্রস্ফুরিত হইত। যেমন সমুদায় প্রাণিদেহে চিৎশক্তি প্রতিভাত হয়, তাহার ন্যায় এই সূচীও প্রতিদেহে প্রতিভাত হইত[১৪]। সূচী বারিতে দ্রবশক্তির ন্যায় জীবরুধিরে লীন ও অব্ধিতে আবর্ত্তের ন্যায় জঠরমধ্যে বল্গিত হইত, এবং ও অনন্তাঙ্গে (অনন্ত=শেষনাগ) বিষ্ণুর ন্যায় মেদোমধ্যে অবস্থিতি করিত[১৫।১৬]। অপিচ, এই রোগাত্মিকা সূচী বায়ুরূপিণী হইয়া দেহিগণের অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগের শরীরস্থ অশুক্ল রস (রক্ত) ভক্ষণ করিত[১৭]। ইতঃপূর্ব্বে সে ঐ সব করিত কিন্তু এখন সে তপস্যায় স্থাণুবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করতঃ পবিত্রা সর্ব্বপাপরহিতা পরমতাপসী হইয়াছে[১৮]।

হে মহেন্দ্র! এই জীবসূচীই পূর্ব্বে অদৃশ্যভাবে মারুতরূপ তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া অয়ঃসূচীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রধাবিতা হইত। এই জীবসূচীই ইতিপূর্ব্বে অসংখ্য প্রাণিদেহে অবস্থান করিয়া সেই সমস্ত প্রাণিগণের সহিত অদৃশ্যভাবে পান, ভোজন, বিলাস, দান, ক্রীড়া, আহরণ, নর্ত্তন, গান, শাসন ও হিংসা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করিয়াছে[১৯।২০]। এই আকাশরূপিণী অদৃশ্যশরীরা সূচী স্বীয় মন ও পবনদেহ দ্বারা যাহা না করিয়াছে, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় নাই। এই জীবময়ী সূচী সর্ব্বপ্রাণিবিনাশে সমর্থা হইলেও আলাননিবদ্ধ করিণীর অল্পস্থান পরিভ্রমণের ন্যায় মাংস রক্তাদি অন্বেষণার্থ কতিপয় প্রাণিদেহেই বিচরণ করিয়াছিল[২১।২২]। এই ভোগপ্রমত্তা সূচী প্রাণিগণের দেহরূপ প্রত্যক্ষ নদীতে বেগদ্বারা বৈকল্য উৎপাদন করতঃ বহুল কল্লোল সমুৎপন্ন করিয়াছিল[২৩]। এই সূচী প্রভূত মেদোমাংসাদি নিগীরণ (উদরে অর্পণ) করিতে অসমর্থ হইয়া, বহুল

অনেক ভোজনে অসমর্থ, বহুল ধনসম্পন্ন, ভোজনলোলুপ বৃদ্ধ ও আতুর গণের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিল[২৪]। যেমন অঙ্গন্যস্ত বলয় ও অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার রঙ্গভূমিস্থিতা নর্ত্তনশীলা নর্ত্তকীগণের অঙ্গে নৃত্য করে, তাহার ন্যায় এই রোগাত্মিকাসূচী অজ, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণের দেহে অবস্থান করতঃ নৃত্য করিয়াছিল[২৫]। এই রোগশক্তিরূপা সূচী, গন্ধলেখার ন্যায় (লেখা=লেশ) বাহ্য ও আন্তর বায়ুর সহিত মিশ্রিতা ও বায়ুগতির বশীভূতা হইয়া প্রাণিগণের অন্তরে প্রবেশ ও অবস্থান করিত[২৬]। সূচী এবম্বিধা রোগরূপিণী হইয়া প্রাণিদেহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে রোগাক্রান্ত কোন কোন ব্যক্তি মন্ত্র, ঔষধ, তপস্যা, দান ও দেবপূজাদির দ্বারা তাহাকে বিতাড়িত করিত[২৭]। তাহাতে সে তথা হইতে তাড়িতা হইয়া গিরিনদীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গ যেমন স্বীয় আশ্রয়ে (নদীবক্ষে) লীন হয়, তাহার ন্যায় সে তাহাদের দেহ হইতে বহির্ভাগে পলায়ন করিয়া স্বীয়অন্তর্দ্ধান শক্তির দ্বারা অদৃশ্যভাবে স্বীয় আশ্রয় অয়ঃসূচীতে গিয়া প্রবিষ্ট হইত এবং তথায় লীনভাবে অবস্থান করতঃ আতুরীর ন্যায় বিশ্রাম- সুখ অনুভব করিত। হে দেবেন্দ্র! * সকল ব্যক্তিই স্বীয় বাসনানুরূপ আস্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং রাক্ষসীও আপন বাসনানুসারে তাহার সেই সূচীভাবের আস্পদ বা আশ্রয় সূচীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেমন দুর্ব্বুদ্ধি লোক দিক্ সকল পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে আপদে আপন আস্পদ (বাসস্থান) গ্রহণ করে, তাহার ন্যায়, এই জীবসূচীও সকল স্থলে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে লৌহসূচীতে আস্পদ (স্থান) গ্রহণ করিয়াছিল[২৮।৩০]।

হে শক্র! ভোগচেষ্টাপরায়ণা জীবসূচী অভিহিত প্রকারে দশ দিকে পরিভ্রমণ করিয়া ভোগবিষয়ে কথঞ্চিৎ মানসিকী তৃপ্তি লাভ করিলেও কিছুমাত্র শারীরিকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই[৩১]। কেননা, দেহধারী জীবেরাই দৈহিকী তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। অসতী নারীরা কি কখন সতী রমণীর ধর্ম্ম ও সুখ অনুভব করিতে সমর্থা হয়[৩২]?

---

* যেখানে যেখানে ইন্দ্রের সম্বোধন দেখিবে, সেই সেই স্থানে বুঝিতে হইবে, নারদ ইন্দ্রকে বলিতেছেন।

অনন্তর, একদা সেই দৈহিকসুখভোগবিহীনা সূচীর প্রাক্তন বৃহৎ দেহের কথা স্মরণ হইল। তখন সে পূর্ব্বের ভোজনপরিতৃপ্ত রাক্ষস-দেহের নিমিত্ত অতীব দুঃখিতা হইল। মনে মনে অবধারণ করিল, আমি সেই পূর্ব্বের বিশাল দেহের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উগ্রতম তপস্যা করিব। অনন্তর সে তপস্যার নিমিত্ত স্থান নির্ণয় করিল এবং অনতিবিলম্বে প্রাণমারুত-মার্গ অবলম্বন (নিশ্বাস বায়ু অবলম্বন) করিয়া পক্ষিণীর নীড় প্রবেশের ন্যায় এক আকাশবিহারী তরুণ গৃধ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ রোগসূচী হইয়া তাহার অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিল। গৃধ্র তখন বাধ্য হইয়া স্বশরীরপ্রবিষ্টা রোগরূপিণী সূচীর অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অবিলম্বে একটি লৌহসূচী গ্রহণ করিয়া অন্তরস্থা রোগসূচীর অভিলষিত পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিল[৩৬।৩৭]। পরে সেই রোগরূপা পিশাচীর প্রেরণায় সেই তরুণ গৃধ্র তাহাকে (গৃহীত লৌহসূচীকে) তৎপর্ব্বতস্থ নির্জ্জন মহারণ্যে নিক্ষেপ করিল[৩৮]। যেমন যোগিগণ পরম পদে চেতনা সমর্পণ করেন, তেমনি, সূচীও সেই অদ্রিশিখরস্থ নির্জ্জন মহারণ্যে লৌহসূচীকে সমর্পণ করিল ও অবিলম্বে তাহাকে তথায় প্রতিমার ন্যায় স্থাপন করিল[৩৯]। তখন সেই লৌহসূচী অন্তঃসূচীরূপ পিশাচীর বশীভূতা ও গৃধ্রকর্তৃক হিমাচলশিখরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া স্বীয় সূক্ষ্মতম পদৈকপ্রান্তভাগ দ্বারা রজঃকণার উপরি ভাগে শিখীর ন্যায় (শিখী=ময়ূর) ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সেই খগহৃদয়প্রবিষ্টা রোগরূপা জীবসূচী লৌহসূচীকে অভিলষিত অদ্রিশিখরে গৃধ্রকর্তৃক তদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত অবলোকন করতঃ খগদেহ হইতে বহির্গমনোন্মুখী হইল[৪০।৪১]। অনন্তর অনিল হইতে গন্ধলেখার ন্যায় খগদেহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক লৌহসূচীকে আশ্রয় করিল। জীবসূচীর অনুপ্রবেশে লৌহসূচী তখন চেতনোন্মুখী হইল, এবং গৃধ্রও নির্ব্যাধি জনের ন্যায় স্বস্থ হইয়া ভার পরিত্যক্ত ভারিকের ন্যায় সূচীভার পরিত্যাগ করতঃ স্বস্থানে প্রতিগমন করিল[৪২।৪৩]।

হে মহেন্দ্র! সদৃশ ব্যক্তির সহিত সদৃশ ব্যক্তির সংমিলন শোভনত্ব প্রাপ্ত হয়। জীবসূচী আজ সেই কারণে লৌহসূচীকে আধার স্বরূপে কল্পনা করিয়াছিল। ঈশ্বরও আধার ব্যতিরেকে কার্য্য সাধন করিতে

সমর্থ হন না; তাই জীবসূচী আজ লৌহসূচীকে আধার স্বরূপে গ্রহণ করতঃ একনিষ্ঠ হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়াছিল[৪৪।৪৫]।

অনন্তর সে শিংশপাবৃক্ষে পিশাচীর ন্যায় এবং বায়ুতে গন্ধলেখার ন্যায় লৌহসূচীতে পরিলীন হইয়া সুদীর্ঘ তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্তা হইল[৪৬]। সেই অবধি অদ্য যাবৎ সে তপস্যায় বহু বর্ষ অতিক্রান্ত করিয়াছে এবং সে এখনও সেই নির্জ্জন মহারণ্যে উক্তপ্রকারে অবস্থান করতঃ তপস্যা করিতেছে। হে কর্ত্তব্য-কোবিদ বাসব! এখন আপনি তাহাকে বরদানার্থ যত্নবান্ হউন্। (অর্থাৎ তাহাকে কোন এক তুচ্ছ বর দিয়া নিবৃত্তা করিবার চেষ্টা করুন) নচেৎ তাহার তপস্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সকল লোক গ্রাস করিবে[৪৭।৪৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বাসব নারদের এবম্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণ করতঃ সূচীর অন্বেষণার্থ মারুতকে দশ দিকে গমন করিতে আদেশ করিলেন[৪৯]। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মারুত (বায়ু) দেবরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সূচীদর্শনের নিমিত্ত দশ দিকে গমন করিল। মারুত নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে অবরোহণ পূর্ব্বক দিক্ বিদিক্ পরিভ্রমণ করতঃ সূচীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ভ্রমণপরায়ণা সর্ব্বত্রগামিনী ত্বরাবতী মারুতসম্বিদ্ (বায়ুদেবতা) প্রথমতঃ দেখিতে পাইল, সপ্তসমুদ্রান্তে লোকালোকপর্ব্বতযুক্ত বিপুল কাঞ্চনী ভূমি রহিয়াছে[৫০।৫১]। ঐ ভূমি মণিময় বলয়ের আকার সম্পন্ন স্বাদূদক সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৎপরে বলয়াকার পুষ্করদ্বীপ দেখিল। এই দ্বীপ সুরাসমুদ্রে পরিবেষ্টিত। তৎপরে দেখিল, ইক্ষুরসসমুদ্রে পরিবেষ্টিত বলয়াকার গোমেদক দ্বীপ। তদনন্তর দেখিল, বলয়াকার ক্ষীরসমুদ্রে পরিবেষ্টিত উপদ্রবশূন্য ক্রৌঞ্চ দ্বীপ। তৎপরে দেখিল, ঘৃতোদক সমুদ্রে পরিবেষ্টিত শ্বেতদ্বীপ। তৎপরে দেখিল, বলয়াকার কুশদ্বীপ। তদনন্তর দেখিল, দধি সমুদ্রে পরিবেষ্টিত বলয়াকার শাক দ্বীপ অবস্থিত রহিয়াছে। তৎপরে জম্বুদ্বীপ প্রাপ্ত হইল। এই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে লবণসমুদ্র বলয়াকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে[৫২।৫৫]।

সেই বায়ুসম্বিদ্ এই কুলপর্ব্বতসঙ্কুল মহামেরুবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপ দর্শন করতঃ বাতমণ্ডল হইতে তথায় বায়ুরূপে অবতীর্ণ হইল। বেগে গমন পূর্ব্বক যে স্থানে সেই তপস্বিনী সূচী তপস্যা করিতেছিল, সেই

হিমাচলশিখর-স্থিত মহারণ্য প্রাপ্ত হইল[৫৩।৬০]। এই গিরিস্থল দ্বিতীয় আকাশের ন্যায় বিস্তৃত ও সূর্য্যসন্নিহিত প্রযুক্ত প্রাণিসঞ্চার বর্জ্জিত, অসঞ্জাততৃণ ও রজোময়। রজোগুণবিকারীভূত এই গিরিস্থল, সংসার রচনার ন্যায় বিস্তৃত ও রজঃপরিপূর্ণ। শত শত অর্থাৎ অসংখ্য ইন্দ্রধনুশঙ্কাশ মৃগতৃষ্ণিকা নদী প্রবাহিত হওয়াতে এইস্থল যেন মৃগতৃষ্ণিকানদী সমূহের স্বার্থপরিপূরক সমুদ্র হইয়া রহিয়াছে। এই গিরিশৃঙ্গস্থ মহাভূমি, পবনকর্ত্তৃক কুণ্ডলাকারে প্রবাহিত, ধূলিপটলরূপ কুণ্ডলে বিভূষিত, সূর্য্যকিরণরূপ কুঙ্কুমে পরিলিপ্ত, চন্দ্রাংশুরূপ চন্দনে চর্চ্চিত ও বায়ুরূপ কান্তের মুখ চুম্বনে শব্দায়মান হওয়ায় ব্যোমবিলাসিনী রমণীর অনুকরণ করিতেছে[৬১।৬৬]।

দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণকারী পবন ক্লান্ত হইয়া সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র পরিলাঞ্ছিত সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করতঃ অবশেষে এই গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ গিরিস্থল প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল[৬৭]।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বায়ু সেই অদ্রিশৃঙ্গস্থিত মহারণ্যে সূচীকে মধ্যমা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রোথিত দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, সূচী এক-পদে দণ্ডায়মানা হইয়া তপস্যা করিতেছেন[১]। উষ্ণকিরণে তাঁহার শিরোদেশ শুষ্ক হইয়াছে, ও উদরত্বক্ পিণ্ডীভূত হইয়াছে। যেন তিনি একবার একবার মাত্র আস্য বিস্তার করিয়া আতপানিল গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতেছেন। প্রচণ্ডসূর্য্যকিরণযুক্ত বনবায়ুদ্বারা তাঁহার দেহ জর্জ্জরী ভূত হইয়াছে। তিনি স্বস্থান হইতে অবিচলিত ও চন্দ্রকিরণে স্নাপিত (ধৌত) হইতেছেন[২।৪]। তাঁহার মস্তক রজোরাশির (ধূলিরাশির) দ্বারা সমাচ্ছন্ন। যেন তিনি রজোগুণকে আশ্রয় প্রদান না করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন[৫]।

অনন্তর পবন সেই সূচীকে তাদৃশী ও তদ্‌ভাবাপন্না দেখিয়া বিস্ময়াকুললোচনে ও ভীতচিত্তে সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু সূচীর তেজঃপ্রভাবে সঙ্কুচিত হইয়া কি নিমিত্ত তিনি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন না[৬।৮]। পবন "অহো! ভগবতী সূচী কি মহা তপস্যা করিতে-ছেন" মনে মনে কেবল এই মাত্র চিন্তা করিয়াই আকাশে গমন করিলেন এবং সত্বর অভ্রমার্গ উল্লঙ্ঘন, সিদ্ধলোকে উত্তরণ ও বায়ুমণ্ডল অতিক্রমণ করতঃ সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন। অনন্তর নক্ষত্র-মণ্ডল অতিক্রমণ করতঃ শক্রপুরে উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই সূচীদর্শনপবিত্রাত্মা বায়ু পুরন্দর কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও জিজ্ঞাসিত হই-লেন। বায়ু তখন যথাদৃষ্ট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিতে লাগিলেন, এবং দেবগণ সহ দেবরাজ তাহা শুনিতে লাগিলেন[৯।১২]।

মহাত্মা বায়ু বলিতেছেন, দেবরাজ! জম্বুদ্বীপে হিমবান্ নামে এক অত্যুন্নত শৈলেন্দ্র আছে। তাহার হিমালয় নাম। সর্ব্ববিদিত ভগবান্ শশিশেখর মহেশ্বর তাঁহার যামাতা[১৩]। এই হিমাচলের উত্তর মহাশৃঙ্গের

পৃষ্ঠভাগে মহাতেজস্বিনী তপস্বিনী সূচী অবস্থিতি করতঃ অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন[১৪]। অধিক আর কি বলিব, বায়ু ভক্ষণও না করিতে হয়, এই অভিপ্রায়ে সূচী স্বীয় উদরকোটর পিণ্ডাকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন[১৫]। তাঁহার আস্যদেশ স্বভাবতঃ বিকসিত হইলেও শীতবাতাশন নিবৃত্তির নিমিত্ত তিনি রজোরাশির দ্বারা তাহা সঙ্কুচিত করিয়াছেন[১৬]। হে দেব! তুহিনাকর মহাশৈল হিমবান্ তাঁহার তীব্রতপঃপ্রভাবে তুহিনাকরত্ব পরিহার পূর্ব্বক অনলসদৃশ বা তপ্তায়ঃপিণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিতান্ত অপরিসেব্য হইয়াছেন[১৭]। অতএব, এখন যদি কোন উপায় না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সেই সুমহত্তপস্যা অনর্থসংঘটনের হেতু হইবে। সেই জন্য বলিতেছি, আসুন, আমরা তাঁহাকে বর প্রদানার্থ পিতামহের নিকট গিয়া অনুরোধ করি[১৮]। অনন্তর দেবরাজ বায়ুকর্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ বিভু পিতামহের নিকট "সূচীকে বর প্রদান করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা "অদ্যই আমি সূচীকে বর দিতে হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিব" এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, দেবরাজ উদ্বেগ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন[১৯।২০]।

এ দিকে সূচী তপোরূপ তাপ দ্বারা অমরমন্দির সন্তাপিত করতঃ সপ্তসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া পরম পবিত্রা হইল[২১]। বিজৃম্ভিতবদনা সূচীর মুখরন্ধ্রে রবিকিরণ প্রবিষ্ট হওয়ায়, সে দৃশ্য তখন এইরূপে উপমিত হইতে লাগিল যে, যেন সেই সূচী নয়নশালিনী হইয়া স্বীয় তপস্যার সঙ্কলিত বস্তু অবলোকন করিতেছেন[২২]। অপিচ, মেরু ভূধর তাঁহার স্থৈর্য্যগুণে নির্জ্জিত ও লজ্জিত হইয়া অম্বুনিধিতে নিমগ্ন হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্তই যেন সেই সূচীর ছায়া প্রাতে ও সায়াহ্নে দীর্ঘাকার হইত এবং অন্যান্য সময়ে যেন তাঁহার গৌরববর্দ্ধনের নিমিত্তই সেই ছায়া সূচী তাঁহাকে দূর হইতে অবলোকন করিত। সঙ্কটে নিপতিত হইলে জনগণের গৌরবরক্ষারূপ সৎক্রিয়া বিস্মৃত হইতে হয়, সেই ভাব প্রদর্শনার্থই যেন মধ্যাহ্ন কালে সেই সুতীক্ষ্ণা ছায়া সন্তাপ ভয়ে ভীতা হইয়া সূচীর প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্টা হইত[২৩।২৪]। অসী, বরুণা ও গঙ্গা, এতত্ত্রিতয়ের অন্তরালস্থিত পবিত্রা বারাণসীর

ন্যায় সেই ছায়া, সূচী ও লৌহসূচী, এতত্রিতয়ের অন্তরালস্থিত ত্রিকোণ-সম্পন্ন স্থান তপস্যার দ্বারা অতীব পবিত্র হইয়াছিল। এমন কি তত্রত্য বায়ু ও পাংশু প্রভৃতি সমস্তই মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়াছিল। হে রামচন্দ্র! জীবসূচী কেবল একাদ্বয় প্রত্যগাত্মচেতনসম্বিদের বিচার দ্বারাই পরমকারণ পরব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল[২৫।২৮]।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।
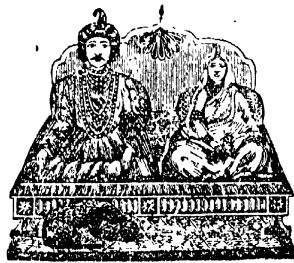
পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

---*---

বশিষ্ঠ বলিলেন, সহস্র বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা সেই তপস্বিনীর নিকট আগমন করতঃ কহিলেন, পুত্রি! বর গ্রহণ কর[১]। কিন্তু সেই জীবাংশরূপিণী জীবসূচী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাব (কর্ম্মেন্দ্রিয়=বাগিন্দ্রিয়) নিবন্ধন কোন কিছু বলিতে পারিল না। সে সমষ্টিমনোবপু ব্রহ্মাকে বাক্যের দ্বারা কিছু বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু মন থাকায় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল[২]।

আমি আর বর গ্রহণ করিয়া কি করিব! আমি পূর্ণা ও বিগত-সর্ব্ব সন্দেহা হইয়া পরমা শান্তি (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। সকল সন্দেহ উপশান্ত হওয়ায় আমার জ্ঞাতব্য জানা শেষ হইয়াছে। আমার বিবেক সম্পূর্ণ বিকসিত হইয়াছে। এখন আর আমার বরে প্রয়োজন কি[৩।৪]? আমি যে প্রকারে অবস্থান করিতেছি, চিরকাল এই প্রকারে অবস্থিত থাকিব। সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা বর গ্রহণে আর আমার প্রয়োজন নাই[৫]। যেমন বালিকাগণ স্বীয় সঙ্কল্প সমুদিত বেতাল কর্ত্তৃক আক্রান্তা হয়, তেমনি, মদীয় সঙ্কল্প সমুদিত অবিবেকই এতাবৎ কাল আমাকে বিভীষিকা দেখাইয়া ছিল। অধুনা আত্মবিচারদ্বারা সে স্বয়ং শমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর আমার ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত কোন কিছুতে প্রয়োজন নাই এবং কোন কিছুতে আর আমার ইষ্টানিষ্ট সংঘটন হইবে না[৬।৭]।

সূচী এবম্প্রকার চিন্তা করতঃ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, নিয়তি-সহকৃত ব্রহ্মা সেই কর্ম্মেন্দ্রিয়বিহীনা চিন্তাপরায়ণা বীতরাগা প্রসন্নবুদ্ধি জীবসূচীর তাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, পুত্রি! বর গ্রহণ কর। তুমি এই অবনীমণ্ডলে কিছুকাল ভোগ্য ভোগ কর, পশ্চাৎ পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। যাহা বলিতেছি, তাহাই সর্ব্ব ভূতের অনিবার্য্য নিয়তির নিয়ম[৮।১১]। হে উত্তমে! এই তপস্যার

দ্বারা তোমার সঙ্কল্প সফল হউক। পুত্রি! তুমি যে পূর্ব্বে জলদ-সদৃশ ভীষণ রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তুমি পুনর্ব্বার সেই দেহ গ্রহণ কর। হে পুত্রি! বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর যেমন বৃক্ষতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, তুমি, যে বিশাল দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়াছ, পুনর্ব্বার তুমি সেই দেহে সংযুক্ত হও। তুমি রাক্ষসশরীর প্রাপ্ত হইলেও বিদিতবেদ্যতা প্রযুক্ত (তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায়) কাহাকেও বাধা প্রদান করিবে না। কেবল অন্তঃশুদ্ধা হইয়া শারদীয় অভ্রমণ্ডলীর ন্যায় মাত্র স্পন্দনশীলা হইবে[১২।১৪]। তুমি সর্ব্বাত্মধ্যানরূপিণী হইয়া অবিশ্রান্ত ধ্যানপরায়ণা হইবে এবং ব্যবহারাত্মক ধ্যানধারণার আধার স্বরূপিণী হইয়া বায়ুস্বভাবের ন্যায় মাত্র দেহপরিস্পন্দন দ্বারা বিলাস করিবে। হে পুত্রি! তুমি সর্ব্বাত্মধ্যানে নিরত হইবে এবং যদি কদাচিৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হও—তাহা হইলে ত্বদীয় রাক্ষসোচিত অশাস্ত্রীয় হিংসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত ন্যায়ানুসারে প্রাণিহিংসা করিবে। তুমি স্বয়ং অর্থাৎ অন্যের অননুরোধে ন্যায়বৃত্তির অনুসারিণী হইয়া অন্যায়পথবর্ত্তী জনগণের হিংসাসাধন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া স্বদেহে প্রাপ্ত বস্তু বিবেককে প্রতিপালন করিবে[১৫।১৮]।

পিতামহ ব্রহ্মা সূচীকে এবম্প্রকার বর প্রদান করিয়া গগনমণ্ডলে গমন করিলেন। সূচী মনে মনে চিন্তা করিলেন, অব্জজ ব্রহ্মার বাক্যে আমার ক্ষতি কি? তাঁহার বচনার্থ নিবারণেই বা আমার প্রয়োজন কি? অনন্তর চিন্তাপরায়ণা সূচী দেখিতে দেখিতে পরি-বর্দ্ধিত হইয়া রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হইল[১৯]। সেই অত্যন্ত সূক্ষ্মা সূচী প্রথমে প্রাদেশ, পরে হস্ত, অনন্তর ব্যাম ও তদনন্তর বিটপ প্রমাণ দেহ প্রাপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে স্বীয় অভ্রমালা-সদৃশ বিস্তৃত সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন বৃহৎ রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হইল। এই-রূপে সেই সূচী স্বীয় সঙ্কল্পক্রম কণিকা হইতে অঙ্কুরাদিক্রমে দেহলতাত্ব প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্পক্রমবন-পুষ্পের ন্যায় পূর্ব্বতিরোহিত, শক্তিসম্পন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই অবিকল রূপে প্রাপ্ত হইল[২০।২১]।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম সর্ষ বর্ষাকাল আগতে স্থূল[১] অর্থাৎ বৈপুল্য প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সেই সূক্ষ্মা সূচী স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব পরিত্যক্ত রাক্ষসদেহ পুনঃ প্রাপ্ত হইল[১]। রাক্ষস দেহ পাইল বটে; পরন্তু রাক্ষসোচিত ভাব (মনোবৃত্তি) পাইল না। সে স্বাত্মভূত ব্রহ্মাকাশ লাভে প্রমুদিতা হওয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রভাবে রাক্ষসভাব কঞ্চুকবৎ (কঞ্চুক=খোলস) পরিত্যাগ করিল[২]। বদ্ধপদ্মাসনা ও ধ্যানপরায়ণা হইয়া একমাত্র বিশুদ্ধ সম্বিদ্ অবলম্বন করতঃ সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে শৃঙ্গবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল[৩]। প্রাবৃট্-কাল আগতে জলদমণ্ডলের ভীষণ নিনাদ শ্রবণে শিখণ্ডিনী যেমন কাম কর্ত্তৃক উত্থাপিতা হয়, সেইরূপ, সমাধিযোগে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তপস্বিনী সূচী প্রবুদ্ধা হইল, ও সাতিশয় ক্ষুধাকাতরা সুতরাং বাহ্যবৃত্তিসম্পন্না হইল। দেহ ও দেহাভিমান যত কাল থাকে, তত কাল ক্ষুধাদিস্বভাবের নিবৃত্তি হয় না[৪।৫]।

রাক্ষসী ক্ষুৎপরায়ণা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, আমি এখন কি গ্রাস করি! অন্যায়ে পরজীব ভক্ষণ করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে[৬]। যাহা আর্য্যজনগর্হিত ও অন্যায়ে উপার্জ্জিত, তাহা ভক্ষণ করা অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যু শ্রেয়স্কর[৭]। অনাহারে প্রাণ ত্যাগ হয় সেও ভাল তথাপি অন্যায় ভক্ষণ স্বীকার করিব না। কেননা, অন্যায় ভোজন গরলস্বরূপ। যাহা লোকপরম্পরায় অপ্রচলিত, সে ভোজনে আমার প্রয়োজন কি? আমার জীবনে ও মরণে কিছুই ইষ্টানিষ্ট দেখি না[৮।৯]। আমি কে? দেখিতেছি, আমি ব্যতীত অন্য কিছু নাই।[৮] এই যে, মনোদেহাদি, ইহা ভ্রমের বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আত্মবোধ দ্বারা ভ্রম বিনষ্ট হইলে দেহাদির সারত্ব কোথায় থাকিবে"[১০]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসী ঐ প্রকারে দেহাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি

করিতে লাগিল। সেই সময়ে সে গগনমণ্ডল হইতে বায়ুর বক্ষ্যমাণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিল[১১]।

"হে কর্কটিকে। তুমি যাও—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ় দিগকে গিয়া প্রবোধিত কর। কেননা, মূঢ় উদ্ধার করাই তত্ত্ববিদ্‌গণের স্বভাব[১২]। যে সমস্ত মূঢ় তোমাকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াও প্রবুদ্ধ না হইবে, নিশ্চই তাহারা আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং তাহারাই তোমার ন্যায়ানুসারী ভক্ষ্য হইবে"[১৩]।

কর্কটী ঐরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, "আমি আপনার দ্বারা অনুগৃহীত হইলাম"। অনন্তর সে সেই রাত্রে হিমাচল-শিখর হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিল। সেই অঞ্জনশৈলাভা নিশাচরী সেই অচলের অধিত্যকা অতিক্রম করতঃ উপত্যকাতটে আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে সেই অচলের নিম্নভাগস্থ অন্ন, পশু, লোক, শস্য, ওষধি, আমিষ, মূল, পান, মৃগ, কীট ও খগ প্রভৃতি বহুবিধপ্রাণীতে, বহুবিধ দ্রব্যে ও বহুল উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ কিরাত-জনপদে প্রবেশ করিল[১৪।১৭]।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসীর প্রবেশে তথায় তখন অতি ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা নিশা উপস্থিত হইল। ঐ রাত্রের সে অন্ধকার যেন হস্তগ্রাহ্য হইল[১]। (এত গাঢ়, যেন হাতে ধরা যায়)। সুধাকর যেন অমৃত-লুণ্ঠন ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, তাই যেন আজ্ গগন ইন্দুবিহীন হইয়াছে। (চন্দ্রের সর্ব্বস্ব অমৃত, রাক্ষসী যেন তাহা কাড়িয়া লইবে, সেই ভয়ে যেন চন্দ্র পলায়ন করিয়াছেন, তাই আজ্ গগনে চন্দ্র নাই।) সেই পরিপুষ্টকলেবরা গাঢ়ান্ধকারযুক্তা রজনী অতি নিবিড় তমাল বনের সহিত উপমিত হইতে পারে। যেন সর্ব্বদিকে কৃষ্ণা বিভাবরীর নেত্রকজ্জল প্রলিপ্ত হইয়াছে। ঐ রজনীতে অন্ধকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গিরিগ্রামকোটরে অতি মন্থরভাবে গমন করিতেছে। গৃহে গৃহে ও চত্বরে চত্বরে দীপালোক সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সে দৃশ্য নবযৌবনা কৃষ্ণা যুবতীর বিলাস সঞ্চরণের অনুকারী। গবাক্ষাদি হইতে বিনির্গত দীপালোক সে শোভার বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই অতি-ভীষণা তামসী নিশা যেন কর্কটীর বয়স্যা—কর্কটীর সঙ্গীভূতা। এই নিস্তব্ধা রজনী যেন ভূত প্রেত পিশাচ গণের নৃত্যাদি ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে মৌনা হইয়া রহিয়াছে[২।৫]। সুসুপ্ত মৃগাদি প্রাণীর দেহের ও সুনিবিড় নীহারের দ্বারা যেন এই রজনী অনন্তকায়া হইয়াছে[৬]। ভেক সকল সরোবরে ও কাকাদি পক্ষী সকল বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছে। অন্তঃপুর সকল নায়ক নায়িকার মধুরালাপে রণিত হইতেছে। জঙ্গল সমুদায় যেন প্রলয়ানলে প্রজ্বলিত হইতেছে। * নভোমণ্ডলে শত শত নয়নসদৃশ সমুজ্জ্বল নক্ষত্রবৃন্দ সমুদিত হইয়াছে। সঞ্চরমাণ পবন অরণ্যস্থিত দ্রুম হইতে পুষ্প ও ফল নিপাতিত করিতে লাগিল[৭।৮]। বৃক্ষকোটরস্থ বায়সগণ যেন কৌশিকের (এক প্রকারনিশাচর পক্ষীর)

---

* অন্ধকার নিশায় বনৌষধি হইতে আলোক প্রকটিত হয়। দূরস্থ দর্শকেরা মনে করে, বনে আগুণ লাগিয়াছে। অথবা কেহ অগ্নিকাণ্ড করিয়াছে।

রব শ্রবণ করিয়া ভয়ে নিঃশব্দভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কোন কোন গ্রামবাসী, তস্কর কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় কর্কশ ক্রন্দন ধ্বনি করিতে লাগিল[১০]। বন সকল ঈষৎ মৌন, * নগর নিস্তব্ধ, সমীরণ সঞ্চারিত ও পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড়ে নিদ্রিত, এবং সিংহগণ পর্ব্বত গুহায় ও শ্বাপদগণ বনকুঞ্জে শয়িত। দেখিবামাত্র মনে হয়, কজ্জলজলদসঙ্কাশা তিমিরমাংসলা পঙ্কপিণ্ডসদৃশী নিবিড়া † ও তদ্‌বিধা রজনী যেন আকাশে ও বিপিন মধ্যে মৌনভাবে বিচরণ করিতেছে। এই ভয়ঙ্করী অসিতা বিভাবরী একার্ণবের ও পর্ব্বতগুহার ন্যায় স্নিগ্ধকলেবরা ও অঙ্গারকোটরের ন্যায় ও মহাপঙ্কের ন্যায় নিবিড়া ও ভৃঙ্গগণের পৃষ্ঠ-পক্ষাদৃশ শ্যামলা হইয়া বিরাজ করিতেছে[১১।১৫]।

ঈদৃশ রজনীতে কিরাত রাজ্যের কোন এক মহাতেজস্বী রাজা মন্ত্রিসমবেত হইয়া তস্করাদিবধচর্য্যার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা নগর হইতে নির্গত হইয়া অদূরবর্ত্তী বিক্রম নামক ভীষণ অটবী মধ্যে প্রবেশ করিলেন[১৬।১৭]। নিশাচরী কর্কটী সেই রাত্রে বেতালদর্শনোন্মুখী ‡ ধৈর্য্যশালী ধৃতাস্ত্র সমন্ত্রী কিরাতরাজকে অটবী-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, ভাগ্যক্রমে আমি আজ্ ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইলাম। এই দুই ব্যক্তি নিশ্চই আত্মজ্ঞানবিহীন সুতরাং মূঢ়। ইহাদের দেহ অবশ্যই ইহাদের দুর্ব্বহ-ভারস্থানীয়। মূঢ়লোকেরা ইহলোকে আত্মবিনাশের নিমিত্ত ও পরলোকে দুঃখ ভোগের নিমিত্ত জীবন ধারণ করে। সুতরাং তাহারাই আমার ভক্ষ্য ও বিনাশ্য। আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ়দিগের জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেয়স্কর। কেননা, মৃত্যু হইলে তাহাদের পাপ উপার্জ্জনের বিরাম হয়। কিন্তু জীবিত থাকিলে তাহাদের পাপপঙ্ক দিন দিন বাড়িতেই

---

* বনসকল ঈষৎ মৌন অর্থাৎ অল্পশব্দ যুক্ত। অর্থাৎ দুই একটী রাত্রিচর জীবের শব্দ মাত্র শুনা যাইতেছে।

† কজ্জলজলদ=কাজলের মেঘ। তিমিরমাংসল=অন্ধকারের স্থূলতা। পঙ্কপিণ্ড=পাঁক। তাহার ন্যায় নিবিড় অর্থাৎ ঘন।

‡ গ্রামের বহির্ভাগে যে সকল গ্রাম্য দেবতার ও অমানব জীবের গমনাগমন স্থান থাকে, রাজা ও তদীয় মন্ত্রী সেই সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাদের দর্শন লাভ করিতে ইচ্ছুক।

থাকে[১৮।২১]। সেইজন্য আদিসৃষ্টিকালে পদ্মজ ব্রহ্মা কর্তৃক আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ়চেতাগণ হিংস্র জীবগণের ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে[২২]। অতএব, বোধ হয় অদ্য এই দুই ব্যক্তি মদীয় ভক্ষ্যভূত হইয়া আগমন করিয়াছে। বোধ হয় কেন? সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব, আমি আজ এই দুই ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিব। এ বিষয়ে উপেক্ষা বা আলস্য করা পণ্ডিতোচিত কার্য্য নহে। যাহারা ভাগ্যমান নহে তাহারাই নির্দ্দোষ অর্থ * উপেক্ষা করিয়া থাকে[২৩]।" রাক্ষসী এই রূপ আলোচনা করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিল, 'না—পরীক্ষা না করিয়া ভক্ষণ করা উচিত নহে। কেননা, ইহারা গুণযুক্ত মহাশয় ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন। যদি ইহারা গুণসম্পন্ন মহাশয় ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আমার অভক্ষ্য। তাদৃশ ব্যক্তির বিনাশে আমার অভিরুচি নাই[২৪]। আগে ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখি; যদি ইহারা তাদৃশ গুণান্বিত হন, তাহা হইলে ভক্ষণ করিব না। পণ্ডিতেরাও বলিয়া থাকেন, গুণিগণকে কখনই হিংসা করিবেক না[২৫]। অকৃত্রিম সুখ, কীর্ত্তি, আয়ু ও বাঞ্ছিত দ্রব্য ত্যাগ করিয়াও গুণিগণের পূজা করিবেক। অতএব, বরং দেহ পরিত্যাগ করিব, তথাপি গুণবান্ ব্যক্তি ভক্ষণ করিব না। আপনার জীবন অপেক্ষা সাধুদিগের চিত্ত অধিক সুখপ্রদ[২৬।২৭]। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াও গুণিগণকে পূজা করিবেক। কেননা, গুণিগণের সংসর্গরূপ বশীকরণ ঔষধ দ্বারা মৃত্যুও মিত্রত্ব প্রাপ্ত হয়[২৮]। আমি যখন রাক্ষসী হইয়াও গুণশালিগণের রক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়াছি, তখন আর কোন্ মূঢ় গুণিগণকে অলঙ্কাররূপে হৃদয়ে ধারণ না করিবে[২৯]? গুণযুক্তদেহিগণ স্বীয় সঙ্গতির দ্বারা এই ভূমণ্ডলকে চন্দ্রমার ন্যায় সুশীতলকরিয়া থাকেন[৩০]। গুণিগণের তিরস্কারই (তিরস্কার=বধ অথবা নির্য্যাতন) দেহিগণের মৃত্যু এবং গুণিগণের সংশ্রয়ই দেহী দিগের জীবন। গুণিগণের সংসর্গ, স্বর্গ ও অপবর্গ হইতেও সমধিক শুভপ্রদ[৩১]। অতএব, এই কমলনয়ন ব্যক্তিদ্বয় কিরূপ জ্ঞানবান্, কতগুলি প্রশ্নলীলার দ্বারা তাহা আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, পরে যথা কর্ত্তব্য করিব। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয়

---

* নির্দ্দোষ অর্থ=অনায়াসলভ্য ও ন্যায়ানুসারে লভ্য প্রয়োজনীয় বস্তু।

অনুশাসন এই যে, জনগণ অগ্রে ব্যক্তিগণের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবেক, পশ্চাৎ যদি তাহারা গুর্ণহীন হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোপপত্তির (উপপত্তি=যুক্তি) বশীভূত হইয়া সেই নির্গুণ দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ড প্রদান করিবেক। কিন্তু যদি তাহারা স্বগুণ হইতে অধিকতর গুণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সেই গুণযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড করা সর্ব্বথা অবিধেয়৩২।৩৩।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর রাক্ষসকুল কাননের মঞ্জরী স্বরূপ সেই রাক্ষসী ঐ প্রকার চিন্তা করিয়া সেই ভীষণ অন্ধকারে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর নিনাদ করিয়া উঠিল[১]। যেমন গর্জ্জনের পর বজ্রপতন ধ্বনি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, রাক্ষসীও হুঙ্কার-ধ্বনির অন্তে বক্ষ্যমাণ পরুষ বাক্য সকল বলিতে লাগিল[২]। যথা—ভো! এতদরণ্যরূপ আকাশের চন্দ্রসূর্য্যস্বরূপ ও মহামায়ান্ধকাররূপ শিলাকোটরের ক্ষুদ্র কীট-স্বরূপ ব্যক্তিদ্বয়! তোমরা কে! তোমরা কি মহাবুদ্ধিসম্পন্ন? অথবা অতিদুর্ব্বুদ্ধি? তোমরা কি এই মুহূর্ত্তে মদীয় গ্রাসে নিপতিত হইয়া মরণ প্রাপ্ত হইবে?[৩।৪]

রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, ওহে অদৃশ্য কুৎসিতপ্রাণিন্! তুমি কে? তোমার ক্ষুদ্র দেহ কোথায় অবস্থান করিতেছে? আমাদিগের দর্শন পথে আগমন কর। ভৃঙ্গধ্বনি (ভৃঙ্গ=ভ্রমর) সদৃশী তোমার উচ্চারিত ধ্বনিতে কে ভয় প্রাপ্ত হয়[৫]? অর্থিগণ অর্থোপরি সিংহবৎ মহাবেগে নিপতিত হইয়া থাকে। অতএব হে অর্থিনি! তুমি বাহ্য সংরম্ভ (ক্রোধের উদ্যোগ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার সামর্থ্য প্রদর্শন কর। হে সুব্রত অর্থাৎ হে জ্ঞানী জীব! তোমার অভিলাষ কি, তাহা ব্যক্ত কর। আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত প্রদান করিব। তুমি কি সংরম্ভ ও শব্দ করিয়া সত্য সত্যই আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ? অথবা নিজে ভীত হইয়াছ? ভয় কি! শীঘ্র তুমি তোমার শরীর ও শব্দের সহিত আমাদিগের সম্মুখীন হও। দীর্ঘসূত্রী (যাহারা এখন হবে তখন হবে করিয়া কাল কাটায় তাহারা দীর্ঘসূত্রী) হওয়া ভাল নহে। দীর্ঘসূত্রিগণের আত্মক্ষয় ব্যতীত অন্য কিছু সুসিদ্ধ হয় না[৬।৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! রাক্ষসী কিরাতাধিপতির তদ্বিধ বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া তুষ্টা হইল। "এ ব্যক্তি মনোরম বাক্যই বলি-

য়াছে” এইরূপ চিন্তা করিয়া, যেন আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত অধৈর্য্যা হইল। পরে ভীষণ নিনাদ ও বিকট হাস্য করিতে লাগিল। নৃপতি ও মন্ত্রিবর সেই বিকট হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তন্মুহূর্ত্তে দেখিলেন, সম্মুখে এক বিকটাকৃতি রাক্ষসী ভীষণ শব্দ দ্বারা দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতেছে। প্রলয়জলদ-নির্ম্মুক্ত অশনির দ্বারা নিষ্পিষ্ট অদ্রিতটের ন্যায় তাহার বৃহৎ শরীর তদীয় অট্টহাসসমলঙ্কৃত দশনপ্রভার দ্বারা প্রকাশীকৃত হইতেছে। তদীয়-নেত্ররূপ বিদ্যুদ্দ্বয়ের ও শংখবলয়রূপ বলাকার দ্বারা তত্রস্থ নভোমণ্ডল সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে[৯।১১]। নিশাচরী যেন সেই ভীষণ অন্ধকাররূপ অপার মহার্ণব মধ্যে বাড়বানল জ্বালায় পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। আরও দেখিলেন, চৌর, ব্যাঘ্র ও জম্বুক প্রভৃতি রাত্রিঞ্চর সেই স্নিগ্ধ-ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জনশীলা বলদর্পগর্জ্জিতা পীবর-কলেবরা অসিতকন্ধর-সম্পন্না রাক্ষসীর কটকটায়মান দশনসংরম্ভ দ্বারা নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে। সেই উর্দ্ধকেশী শিরাপরিবৃতাঙ্গী (সর্ব্বাঙ্গে শিরা উঠিয়াছে) কপিলনয়না তমোময়ী ও যক্ষ, রক্ষঃ, পিশাচগণের ভয়প্রদা-য়িনী রাক্ষসী স্বর্গমর্ত্ত্যপরিব্যাপ্ত কজ্জলবর্ণ স্তম্ভ স্বরূপে অবস্থান করি-তেছে এবং তদীয় দেহরন্ধ্র (ছিদ্র) মধ্যে প্রবিষ্ট নিশ্বাসপবনের ভীষণ ভাঙ্কার ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। বজ্রবিদীর্ণ বৈদূর্য্যশিখর স্থলীর ন্যায় বিস্তৃতদেহিনী অট্টহাসিনী তমোময়ী রাক্ষসী মুসল, উলূখল, দগ্ধকাষ্ঠ, হল ও ছিন্নসর্প সমূহ মস্তকে আভরণ রূপে ধারণ করতঃ অট্টহাসিনী দানবঘাতিনী কালরাত্রির ন্যায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে[১২।১৫]। মহাজলদজালসদৃশদেহিনী, গাঢ় তমস্বিনীরূপিণী রাক্ষসী সেই অটবীরূপ ভীষণ আকাশে শরদভ্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার ইন্দ্রনীল-সদৃশ মহাকৃষ্ণবর্ণ বক্ষে লম্বমান অভ্রযুগলোপম কৃষ্ণবর্ণ স্তনদ্বয় উলূ-খলাদিগ্রথিত হারজালে ভূষিত রহিয়াছে এবং তদীয় মহাতনু অঙ্গারকাষ্ঠ দ্বারা খচিত রহিয়াছে[১৬।২০]।

রাম! বিবেকবিকসিতচিত্ত উক্ত বীরদ্বয় শিরাপরিবৃতদীর্ঘভুজদ্বয়সম্পন্না রাক্ষসীর তথাবিধ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াও পূর্ব্ববৎ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃই অবনীমণ্ডলে এমন ভয়ঙ্কর কিছুই নাই, যাহা বিবেকিগণের চিত্তে মোহ বা ভয় উৎপাদনে সমর্থ হয়[২১]।

অনন্তর মন্ত্রী কহিলেন, হে মহারাক্ষসি! তুমি কি মহাত্মা? যদি তুমি মহাত্মা হও, তাহা হইলে এরূপ সংরম্ভ (কোপ), শোভার বিষয় নহে। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা অত্যল্প কার্য্যের নিমিত্ত এরূপ মহা আড়ম্বর করেন না। (অভিপ্রায় এই যে, যদি তোমার আহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা বাক্যব্যয় করিলেই অর্থাৎ একটা কথা বলিলেই পাইতে পার। তাহারজন্য এত সংরম্ভ কেন?) যদি তুমি ক্ষুদ্র হও, তবে সে পক্ষেও সংরম্ভের প্রয়োজন দেখি না। কোন্ মহাত্মা ক্ষুদ্র সত্ত্বের (জীবের) কোপে ভীত হয়? অতএব হে রাক্ষসি! তুমি এই তুচ্ছ ক্রোধ পরিত্যাগ কর। তোমার পক্ষে এতাদৃশ নিস্ফল সংরম্ভ উপযুক্ত নহে। স্বার্থসাধক ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সংরম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন[২২।২৩]। হে অবলে! তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র মশক আমাদিগেয় ধীরতারূপ প্রচণ্ড মারুত দ্বারা শুষ্কতৃণপর্ণবৎ নিরস্ত হইয়াছে[২৪]। সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর এবং ধীরতা অবলম্বন কর। প্রাজ্ঞগণ, সংরম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থ ও স্থিরবুদ্ধি হইয়া ব্যবহারোচিত যুক্তির দ্বারা স্বার্থ সংসাধন করিয়া থাকেন। যোগ্য ব্যবহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ হউক বা না হউক, ভ্রমাত্মক সংরম্ভের বশ্য হওয়া উচিত নহে[২৫।২৬]। কেননা, কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি মহানিয়তিরই অধীন। হে অর্থিনি! তুমি সংরম্ভ পরিত্যাগ করতঃ এই মুহূর্ত্তেই অভিমত প্রার্থনা কর। ইহা নিশ্চয় জানিবে, স্বপ্নেও আমাদিগের পুরোগত অর্থী অলব্ধস্বার্থ হইয়া গমন করে নাই[২৭]।

অনন্তর রাক্ষসী মন্ত্রিবরের এবম্বিধ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল "এই পুরুষসিংহদ্বয়ের আচার ও স্বত্ব (ধৈর্য্য বা মনের বল) অতি অদ্ভুত! ভাবে বোধ হইতেছে, ইঁহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইঁহাদিগের বাক্য, বক্ত্র ও নয়ন, এই তিন যেন একমত হইয়া ইহাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে। যেরূপ সরিৎ সমূহের জলরাশি সঙ্গমদ্বারা একীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ, মহাত্ম দিগেরও বাক্য, বক্ত্র ও নয়ন দ্বারা তাহাদের আশয় (অন্তরস্থ ভাব) একীভূত হইয়া থাকে। (একাদ্বয় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়)। ইঁহারা আমার মনোগত অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়াছেন এবং আমিও ইঁহাদের

অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি। ইঁহারা অবিনাশিস্বভাব আত্মা; সুতরাং আমার বিনাশ্য নহেন। অনুমান হয়, ইঁহারা আত্মজ্ঞ হইবেন। কেননা, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সদসদ্ভাবরূপ জীবনমরণপ্রত্যয় (আমি মরিব, আমি বাঁচিব, ইত্যাদিবিধ মিথ্যা জ্ঞান) অস্তমিত হয় না। এক্ষণে আমি ইঁহাদিগের নিকট আমার সমুদিত সন্দেহের বিষয় কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব। কারণ, যাহারা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া সন্দেহাদির বিষয় জিজ্ঞাসা না করে, তাহারা অধম জীব"[২৮।৩৩]।

রাক্ষসী ঐরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় অভিপ্রেত জিজ্ঞাসার নিমিত্ত হাস্য সংযমন করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে অনঘদ্বয়! ধীরমানবসদৃশ তোমরা কে? তাহা আমাকে শীঘ্র বল। মন্ত্রী বলিলেন, নিশাচরি! ইনি কিরাতগণের অধিপতি, আমি ইঁহার মন্ত্রী। আমরা তোমার ন্যায় হিংস্র জনগণের নিগ্রহার্থ রাত্রিবিচরণে উদ্যত হইয়াছি। দিবারাত্র দুষ্ট প্রাণিগণকে বিনিগ্রহ করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা রাজধর্ম্মপরিত্যাগী হয় তাহার প্রজ্বলিত অনলে দেহ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর[৩৪।৩৭]।

রাক্ষসী বলিল, হে রাজন! তুমি দুর্ম্মন্ত্রী (যাহার মন্ত্রী দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট সে দুর্ম্মন্ত্রী)। যে দুর্ম্মন্ত্রী, সে রাজা নহে, সে দস্যু। রাজার সন্মন্ত্রী সহায় হওয়াই উচিত। কেননা, রাজা বিবেচনা সহকারে সৎ মন্ত্রী নিয়োগ করিলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন এবং তদীয় প্রজাগণও রাজার ন্যায় আর্য্যভাব প্রাপ্ত হইতে পারে[৩৯]। হে রাজন্! গুণসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞানই উৎকৃষ্ট, এবং যে রাজা অধ্যাত্মজ্ঞানবিৎ সেই রাজাই যথার্থ রাজা। অপিচ, যে মন্ত্রী বিচাররহস্যবিৎ (সৎ অসৎ অবধারণে সক্ষম) সেই মন্ত্রীই যথার্থ মন্ত্রী। যে রাজা ও যে মন্ত্রী আত্মবিদ্যার দ্বারা প্রভুত্ব ও সমদৃষ্টিত্ব অবগত নহে, সে রাজা রাজা নহে, এবং সে মন্ত্রীও মন্ত্রী নহে। যদি তোমরা ঐ রহস্য পরিজ্ঞাত থাক, তাহা হইলে শ্রেয়োলাভ করিবে; নচেৎ তোমরা আমার ভক্ষ্য হইবে[৪০।৪২]। অতএব, হে অজ্ঞদ্বয়! তোমাদিগের পরিত্রাণের এই একমাত্র উপায় আছে যে, যদি তোমরা আমার প্রশ্নরূপ পিঞ্জর (খাঁচা) স্ব স্ব বুদ্ধির দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া মদীয় প্রীতি বর্দ্ধন করিতে পার, তাহা হইলে পরিত্রাণ পাইবে[৪৩]। হে কিরাতপতে! বক্ষ্যমাণ প্রশ্নজাল বিচার করতঃ

শীঘ্রপ্রত্যুত্তর প্রদান কর। অথবা হে মন্ত্রিন্! তুমিই আমার বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন সমূহের অর্থ নির্দ্দেশ কর। আমি ঐ বিষয়েই তোমাদিগের নিকট নিতান্ত অর্থিনী। তোমরা আমার ঐ অর্থ (প্রার্থনীয়) পরিপূরণ কর। রাজন্! অবনীমণ্ডলে এমন কোনও ব্যক্তি বিদ্যমান নাই যে, অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান না করিলে ক্ষয়কর দোষে সমাশ্লিষ্ট না হয়৷৷।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম সর্গ।

---*---

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসী ঐরূপ কহিলে, কিরাতাধিপতি তাহাকে প্রশ্ন করণার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। রাক্ষসী রাজার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রশ্নাবলী কহিতে আরম্ভ করিল।° হে রাঘব! অবধান পূর্ব্বক সেই সমস্ত মহাপ্রশ্ন শ্রবণ কর[১]।

রাক্ষসী কহিল, হে রাজন্! এক অথচ অনেক, এরূপ কোন্ পরমাণুর (যার পর নাই সূক্ষ্ম পদার্থের) উদরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড, সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হইতেছে? (১) আকাশ অথচ আকাশ নহে, এরূপ কি বা কোন্ বস্তু? (২) কি কিঞ্চিৎ ও অকিঞ্চিৎ? (৩) আমি কে তুমিই বা কে[২]? (৪) কে গমনশীল অথচ গমন করে না? (৫) কে অবস্থান না করিয়াও অবস্থিত? (৬) কে চেতনস্বরূপ হইয়াও পাষাণবৎ অচেতন? (৭) আকাশে কোন্ ব্যক্তি বিচিত্র চিত্র উৎপাদন করে[৩।৪]? (৮) বহ্নি কে? কোন্ বহ্নি অদাহক? কোন্ অবহ্নি হইতে নিরন্তর বহ্নি সমুৎপন্ন হইতেছে[৫]? (৯) অহে প্রাজ্ঞ! কে চন্দ্র, অর্ক, অগ্নি ও তারকাদি না হইয়াও চন্দ্র অর্ক ও অগ্ন্যাদির অবিনাশী প্রকাশক? (১০) ইন্দ্রিয়ের অগোচর এমন কোন্ নিরিন্দ্রিয় বস্তু হইতে প্রকাশ প্রবর্ত্তিত (উৎপন্ন) হইয়াছে[৬]? (১১) জন্মান্ধ লতা, গুল্ম ও অঙ্কুরাদি ও অন্যান্য বস্তু সমুদয়ের উত্তম আলোক কি[৭]? (১২) কে আকাশাদির জনক? (১৩) সত্তার স্বভাবপ্রদ কে? (১৪) জগৎরত্নের কোষ কি? জগৎ কোন্ মণির কোষ[৮]? (১৫)। পরম সূক্ষ্ম কি? কে প্রকাশ ও তমঃ? কেইবা অস্তি ও নাস্তি হয়? (১৬) কোন্ অণু দূরে অদূরে অবস্থান করিতেছে? (১৭) কে সূক্ষ্মতম অণু হইয়াও মহাপর্ব্বতস্বরূপ[৯]? (১৮) কে নিমেষস্বরূপ হইয়াও মহাকল্প? (১৯) কে কল্পস্বরূপ হইয়াও নিমেষ? (২০) কোন্ প্রত্যক্ষ অসদ্রূপ? (২১) কোন্ চেতন চেতন নহে[১০]? (২২) কে বায়ু হইয়াও অবায়ু? (২৩) শব্দ কে ও অশব্দই বা কে? (২৪) কে সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও কিছুই নহে? (২৫) কে অহং হইয়াও অনহং[১১]? (২৬) হে রাজন্! কোন্ বস্তু বহুজন্মে লব্ধ

থাকিয়াও অলব্ধপ্রায় থাকায় প্রযত্নশতলভ্য এবং কোন্ বস্তু পূর্ণ অথচ পাওয়া দুর্লভ[১২]? (২৭) কে স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়া আত্মহারা হইয়াছে? (২৮) কোন্ অণু সুমেরুপর্ব্বতকে, এমন কি ত্রিভুবনকে, তৃণবৎ ক্রোড়ীকৃত করিয়াছে[১৩]? (২৯) কোন্ অণুর দ্বারা শত যোজন পরিপূর্ণ হয়? (৩০) অণু অথচ যোজনশতমধ্যে পর্য্যাপ্ত হয় না, এমন বস্তু কি আছে[১৪]? (৩১) কাহার কটাক্ষে জগৎরূপ বালক নৃত্য করিতেছে? (৩২) কোন্ অণুর উদরে সমগ্র ভূধরসহ ভূমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াছে[১৫]? (৩৩) কোন্ অণু সুমেরু অপেক্ষাও অধিক স্থূলতা ধারণ করিয়াও অণুত্ব পরিত্যাগ করে নাই? (৩৪) কোন্ অণু কেশাগ্রশত ভাগের ভাগৈকস্বরূপ হইয়াও বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ[১৬]? (৩৫) কোন্ অণু প্রকাশের ও অন্ধকারের প্রকাশক? (৩৬) অসংখ্য জ্ঞানকণা (বৃত্তিজ্ঞান) কোন্ অণুর উদরে অবস্থিত[১৭]? (৩৭) কোন্ অণু নিঃস্বাদ হইয়াও মধুরাদি রস আস্বাদন করে? (৩৮) সমগ্র জগৎ কোন্ সর্ব্বত্যাগী অণুর আশ্রিত[১৮]? (৩৯) কোন্ অণু আপনাকে আচ্ছাদন করিতে অশক্ত অথচ সকল জগৎ আচ্ছাদন করে? (৪০) প্রলয়কালে এই জগৎ কোন্ অণুর অন্তরে সজীবভাবে অবস্থান করে[১৯]? (৪১) কোন্ অণু জাতশরীর না হইয়াও সহস্রকরলোচন? (৪২) কোন্ নিমেষ মহাকল্প ও কল্পকোটীশত স্বরূপ[২০]? (৪৩) বীজ মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতির ন্যায় এই জগৎ প্রলয়কালে কোন্ অণুর মধ্যে অবস্থিতি করে? (৪৪) বস্তুতঃ অনুদিত স্বভাব হইলেও এই ত্রিজগৎ সৃষ্টিকালে কোন্ অণুতে পরিস্ফুটভাবে উদিত বা প্রকাশিত হয়[২১]? (৪৫) কোন্ অণুর নিমেষের মধ্যে মহাকল্প বীজমধ্যে অঙ্কুরের অবস্থিতির ন্যায় অবস্থিতি করে? (৪৬) কে কারক সমূহ ব্যাপারিত করেনা, অথচ কর্ত্তা[২২]? (৪৭) কোন্ নেত্রহীন দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন-নিমিত্ত আপনাকেই দৃশ্যরূপে দর্শন করে[২৩]? (৪৮) কেইবা আপনার জ্ঞানে আপনাকে অখণ্ডিত দর্শন করিয়া দৃশ্য দর্শনে পরাঙ্মুখ হয়[২৪]? (৪৯) কে আপনাকে দৃশ্য ও দর্শন উভয়রূপে প্রকাশিত করে? (৫০) কোন্ ব্যক্তি সুবর্ণে বলয়াদি আরোপের ন্যায় আপনাতে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন, এই তিন্ প্রকারে আরোপিত করিতেছে[২৫]? (৫১) যেমন তরঙ্গমালা সলিলরাশি হইতে অপৃথক্, তেমনি, কোন্ পদার্থ হইতে এ সমুদায় অপৃথক্?

(৫২) কাহার ইচ্ছায় সলিলরাশি হইতে উর্ম্মির (উর্ম্মি=তরঙ্গ) ন্যায় এ সকল পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয়[২৬]? (৫৩) কোন্ এক অদ্বয় বস্তু দিক্‌কালাদিতে অনবচ্ছিন্ন ও অসতের (মিথ্যার) সৎ অর্থাৎ প্রকাশক? (৫৪) দ্বৈতই বা কাহা হইতে সলিলরাশি হইতে তরঙ্গের ন্যায় অপৃথক্[২৭]? (৫৫) কোন্ ত্রিকালগামী দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, প্রকাশাবস্থা ও তিরোহিতাবস্থার সহিত জগৎকে স্বকীয় অন্তরে ধারণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে[২৮]? (৫৬) যেমন বীজের অন্তরে বৃক্ষ থাকে, তেমনি, কাহার অন্তরে ভূত, ভবিষৎ ও বর্ত্তমান জগদ্বৃন্দরূপ বৃহদ্‌ভ্রম অবস্থিতি করিতেছে? (৫৭) কে অনুদিত স্বভাব হইয়াও দ্রুম হইতে বীজের ও বীজ হইতে দ্রুমের ন্যায় উদিত হয় অথচ আপনার একরূপতা ত্যাগ করে না[২৯,৩০]? (৫৮) অহে রাজন্! মেরুভূধর কাহার নিকট মৃণাল তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অথবা কাহার ইচ্ছায় মৃণাল তন্তু সুমেরু অপেক্ষাও সুদৃঢ় এবং এমন কি আছে যে, যাহার উদরে তদ্রূপ বহুসংখ্য মেরু-মন্দরাদি অচলবৃন্দ অবস্থিত রহিয়াছে[৩১]? (৫৯) কাহার দ্বারাই বা এই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে? (৬০) অপিচ, তুমি কোন্ সারে সারবান্ হইয়া ব্যবহার কার্য্য সম্পাদন ও প্রজাপুঞ্জ শাসন এবং পালন করিতেছ? (৬১) কাহার দর্শনে তুমি শান্তিদায়িনী নির্ম্মলা দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ[৩২]? (৬২) এই সমস্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর তুমি স্বমরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বল। চন্দ্রের কলাকলঙ্করূপ আবরণেব ন্যায় মদীয় চিত্তের সংশয়রূপ আবরণ শীঘ্রই বিগলিত হউক। যাহার দ্বারা আমার এই সংশয় উন্মূলিত না হইবে সে পণ্ডিত শব্দের বাচ্য নহে[৩৩]। অহে সুবুদ্ধি পুরুষদ্বয়! যদি তোমরা আমার ক্রমোক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিয়া মদীয় চিত্তগত সংশয় শীঘ্র উচ্ছেদ করিতে না পার, তাহা হইলে অচিরাৎ তোমরা রাক্ষসজঠরহুতাশনের ইন্ধনত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার এই জনপদও আমার উদরসাৎ হইবে। আমার বিবেচনা হয়, তোমরা মদীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে অযোগ্য হইলে তোমার রাজ্যাদি থাকিবেক না। কেননা, মূর্খদিগের রাজ্য নিশ্চিত আত্মক্ষয়ের কারণ হয়[৩৪,৩৫]।

অনন্তর সেই বিকটাকৃতি রাক্ষসী উল্লসিতচিত্তে মেঘগম্ভীর-নিস্বনে ঐসকল কথা কহিয়া শরৎকালীন সুনির্ম্মল মেঘমণ্ডলের ন্যায় তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল[৩৬]।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই মহারণ্যমধ্যে সেই মহানিশায় সেই মহারাক্ষসী ঐ সকল মহাপ্রশ্ন উত্থাপিত করিলে মন্ত্রী সে সকলের প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১]। মন্ত্রী ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, অয়ে তোয়দসঙ্কাশে! কেশরী যেমন মত্ত গজরাজকে বিদীর্ণ করে, তেমনি, আমিও তোমার ক্রমোক্ত প্রশ্নজাল ভেদ (মর্ম্মব্যাখ্যা) করিব, শ্রবণ কর[২]। হে পিঙ্গল-নয়নে! তোমার বাগ্‌ভঙ্গীর দ্বারা বুঝা গেল, তুমি পরমাত্মারি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ[৩]। নামবর্জ্জিত, মনের, বুদ্ধির ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া চিন্মাত্র পরমাত্মাই যথার্থ অণু এবং আকাশ অপেক্ষাও সুসূক্ষ্ম[৪]। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতি, সেইরূপ, পরমসূক্ষ্ম চিন্ময় পরমাত্মায় এই জগৎ সৎস্বরূপে ও অসৎস্বরূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। (প্রলয়কালে অসৎ (অবিদ্যমান) স্বরূপে এবং সৃষ্টিকালে সৎ (বিদ্যমান) স্বরূপে[৫]। সেই যে অণু সর্ব্বাত্মক পরমাত্মা, তাহাই স্বভাবতঃ সৎস্বরূপ। এবং তদীয় সত্তার অধীনে এতজ্জগৎ সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে, জগতের সত্তা (অস্তিত্ব) সাক্ষাৎ অনুভবাত্মক চিৎসত্তার অধীন। চিৎ-সত্তাই সত্তা। জগতে যে সত্তার (অস্তি, আছে, এতদ্রূপ ভাবের) উপলব্ধি হয়, সে উপলব্ধি আত্মচৈতন্যমূলক[৬]) (উঃ ১) সেই অণু বাহ্য শূন্যত্বপ্রযুক্ত আকাশ এবং চিৎস্বরূপতাপ্রযুক্ত অনাকাশ (উঃ ২)। সেই অণু ইন্দ্রিয়ের অতীত সুতরাং সে ভাবে তাহা কিছুই নহে। অথচ সেই অণু অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ[৭]। সর্ব্বাত্মকত্ব প্রযুক্ত সেই চিদণু কর্ত্তৃক সকল বস্তু ভুক্ত হয় এবং সে সকল নিগীর্ণ হইলে সেই চিৎ-নামক যৎকিঞ্চিৎ অবশেষিত থাকে। সুবর্ণে অসত্য বলয়াদির ন্যায় সেই একাদ্বয় চিদণুর প্রতিভাস অনেক উপাধিতে অনেকস্বরূপে উদিত হইয়া থাকে[৮]। এই অণুই সূক্ষ্মতানিবন্ধন অলক্ষিত ও এই অণুই পরমাকাশ। এই অণু সর্ব্বাত্মক হইয়াও মনের ও ইন্দ্রিয়ের অতীত[৯]। যেহেতু সর্ব্বাত্মক সেই হেতু তাহা শূন্য নহে। সুতরাং নাস্তিত্ব কথা আত্মাণুতে বাধিত অর্থাৎ বাস্তব নহে বা মিথ্যা। সেই আত্মাণুই বক্তা ও মন্তা[১০]।

যেমন কর্পূর লুক্কায়িত থাকে না, তেমনি, সতের সত্তাও অপ্রকট থাকে না[১১]।

সেই চিন্মাত্রাণুই মনোরূপে অবস্থিত। সে কারণ তাহা সর্ব্বস্বরূপ। চিদণু সর্ব্বস্বরূপ হইলেও ইন্দ্রিয়াতীত। সে ভাবে তাহা অতি নির্ম্মল[১২]। সেই অণুই এক ও সর্ব্বভূতের আত্মবেদন (অহংজ্ঞানের জ্ঞেয়) বলিয়া অনেক। তিনি এই ত্রিজগৎ ধারণ করিতেছেন, সে নিমিত্ত তিনি জগৎ-রত্নের কোষ[১৩]। অহে নিশাচরি! কিন্তু ত্রিজগৎ চিত্তরূপ মহাসমুদ্রের বীচী ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং এই জগত্রয় চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে। যেমন দ্রবত্ব হেতু সমুদ্রে আবর্ত্তের উদয় হয়, তেমনি, চিদ্বিশিষ্টতা হেতু চিত্ত হইতেই প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞানুরূপ (প্রজ্ঞা=বাসনা) জগৎ উদ্ভূত হয়। সেই কারণে প্রজ্ঞার দ্বারা এই জগৎ পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে[১৪]। সেই অণু ব্যোমরূপী হইয়াও স্বীয় সম্বেদন (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) দ্বারা লভ্য সুতরাং অশূন্য[১৫]। (উঃ ৩) তিনিই দ্বৈত সম্বেদন দ্বারা তুমি ও আমি ইত্যাদি রূপে সমুদিত হন। কিন্তু তাঁহার বোধরূপ বৃহদ্বপু উদিত হইলে তিনি আর তখন তুমি-আমি-রূপে প্রকাশিত হন না[১৬,১৭]। (উঃ ৪) এই অণু সম্বিদদ্বারা যোজন শত গমন করেন, স্বতন্ত্র ভাবে গমন করেন না। অথচ, সেই অণুর অন্তরে শত শত যোজন অবস্থিত[১৮]। দেশকালাদি সেই অণুর সত্তাস্বরূপ। সুতরাং সেই অণু দেশকালাদিরূপ স্বীয় সত্তা-কাশকোশে অবস্থান করিয়াও অনবস্থিত এবং কোথাও গমন না করিয়াও সর্ব্বত্র গত বা প্রাপ্ত[১৯]। গমনদ্বারা প্রাপ্তব্য দেশান্তর যাহার শরীরস্থ, বা এক দেশস্থ, তিনি আর কোথায় গমন করিবেন? মাতার কুচকোটরগত পুত্র, মাতা ব্যতীত আর কি দর্শন করে[২০]? যে সর্ব্বকর্ত্তা, সমস্তই যাহার অন্তঃস্থ, সে আবার কোথায় যাইবে[২১]? কুম্ভকে স্থানান্তরিত করিলে যেমন আকাশের গমন উপচরিত হয়, তেমনি, আত্মাণুর গমনাগমন উপচার ব্যতীত বাস্তব নহে[২২]। তিনি জগতের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হইলেই জড়, নচেৎ চেতন। সুতরাং উভই তিনি[২৩]। (উঃ ৫-৬) অহে রাক্ষসি! যখন সেই চিদ্বপু পাষাণ সত্তা অবলম্বন করেন, তখন তিনি পাষাণভাব প্রাপ্ত হন[২৪]। (উঃ ৭) আদ্যন্ত বিবর্জ্জিত পরমাকাশে সেই চিদ্বপুঃ পরমাত্মা কর্ত্তৃক এই বিচিত্র জগৎ চিত্রিত হইয়াছে। এই জগৎ-চিত্র মিথ্যাজ্ঞানের বিস্তৃতি সুতরাং

অকৃত[২৫]। (উঃ ৮) সংবিৎরূপ পরমাত্মাই প্রসিদ্ধ বহ্নির অস্তিত্ব সাধক (জনক)। পরমাত্মরূপ বহ্নি সর্ব্বব্যাপী অথচ অদাহক। বহ্নি যেমন প্রকাশক হয়, তেমনি, আত্মসম্বিত্তিও (চৈতন্য) সর্ব্বপ্রকাশক। সেই জন্য তাহা অদাহক বহ্নি[২৬]। (উঃ ৯) অতিনির্ম্মল ও অতিজ্বলন্ত চেতনাত্মা হইতে অগ্নি সমুৎপন্ন হয় এবং সেই একমাত্র সম্বেদনই (চেতন পরমাত্মাই) সূর্য্য চন্দ্রাদির অবিনাশী প্রকাশক। পরমাত্মার প্রভা (মহিমা,) এই জগৎ) মহাপ্রলয়পয়োদমণ্ডলীর দ্বারাও অনাবরণীয়[২৭।২৮]। (উঃ ১০) চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অতীত, হৃদয়রূপ গৃহের প্রদীপ, সমুদায় পদার্থের সত্তাপ্রদ, অনন্ত ও যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্টপ্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতি আত্মা। এই ইন্দ্রিয়াতিগ আত্মাণু হইতে আলোক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে[২৯।৩০]। (উঃ ১১) যিনি লতা, গুল্ম, অঙ্কুর ও অন্যান্য নিরিন্দ্রিয় বস্তুর পুষ্টি সাধন করেন, সেই অনুভবাত্মক পরমাত্মা লতা গুল্মাদিরও উত্তম আলোক[৩১]। (উঃ ১২) কাল, আকাশ, ক্রিয়া, সত্তা, জগৎ, সমস্তই আত্মবেদনে (চৈতন্যে) অবস্থিত ও বিজ্ঞাত। সুতরাং আত্মবেদনই স্বামী, কর্ত্তা, পিতা (জনক) ও ভোক্তা[৩২]। (উঃ ১৩) যেহেতু সমস্তই আত্মা, সেই হেতু ঐ আকাশাদির অর্থাৎ সত্তার সমুদায় জগতের স্বাভাবিক অস্তিত্বের হেতু। (উঃ ১৪) সেই পরমাত্মারূপ অণু স্বীয় অণুত্ব (সূক্ষ্মতা বা দুর্লক্ষ্যতা) পরিত্যাগ না করিয়াই জগৎ রত্নের সমুদ্গক (পেটরা) বৎ হইয়াছেন[৩৩]। যেহেতু তিনি জগৎরূপ সম্পুটকে অবস্থিতি করেন, প্রতীত হন, সেইহেতু এই জগৎ সেই পরমাত্ম-মণির এবং পরমাত্মমণি এই জগতের কোষ[৩৪]। (আবরক বা আধার) (উঃ ১৫) তিনি নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য সুতরাং তিনিই পরম সূক্ষ্ম। পরমাত্মা দুর্ব্বোধ বলিয়া তমঃ এবং চিন্মাত্র বলিয়া প্রকাশ। যেহেতু সম্বিৎরূপী, সেই হেতু তিনি আছেন। এবং যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়ের অলভ্য, সেই হেতু তিনি নাই[৩৫]। (উঃ ১৬) তিনিই দূরে ও নিকটে অবস্থান করেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের অলভ্য, সুতরাং দূরে অবস্থিত। তিনি চিদ্রূপ, সুতরাং সমীপে—অতিসমীপে (হৃদয়ে) অবস্থিত[৩৬]। (উঃ ১৭) তিনি অণু হইয়াও সর্ব্বসম্বেদনতা বিধায় মহাশৈলস্বরূপ। সকলেই তাঁহাকে অহং—আমি ইত্যাকার জ্ঞানে পুরোবর্ত্তিরূপে মহাশৈলের ন্যায় জ্ঞাত হয়। এই প্রকাশমান জগৎ তাঁহারই সম্বিত্তি সুতরাং তাহারই মধ্যে (সুষি-

ত্তির অর্থাৎ জ্ঞানের মধ্যে) সুমেরু প্রভৃতির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়। যেহেতু পরম সূক্ষ্ম (নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য) আত্মচৈতন্যের একাংশে মেরু মন্দরাদির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়, সেই হেতু পরমসূক্ষ্ম পরমাত্মা অণু হইয়াও মহামেরু (মহা স্থূল) বলিয়া গণ্য[৩৭]। (উঃ ১৮) তিনি যখন নিমেষরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি নিমেষ। যখন কল্পরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি কল্প[৩৮]। যেমন মনোমধ্যে কোটীযোজন বিস্তৃত নগরপুর দেখা যায়, তেমনি, মনোমধ্যেই কল্পব্যাপিনী কালক্রিয়ার বিলাসও নিমেষরূপে অনুভূত হয়। যেমন অল্পায়তন মুকুর মধ্যে মহানগর প্রতিভাসিত হয়, তেমনি, নিমেষজঠরেও কল্প সমুদিত বা প্রতিভাসিত হয়[৩৯।৪০]। নিমেষ, কল্প, পর্ব্বত, নগর, সমস্তই যখন দুর্ব্বিজ্ঞেয় স্বভাব চৈতন্যের অন্তঃস্থ, তখন আর দ্বৈতই বা কি? একতাই বা কি? অর্থাৎ সমস্তই ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ[৪১]। মনে উদিত হইলে সত্যও অসত্য এবং অসত্যও সত্য হয়। সুতরাং নিমেষও কল্প হয় এবং কল্পও নিমেষরূপে প্রতিভাত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন[৪২]। বস্তুতঃ কাল দুঃখে সুদীর্ঘ ও সুখে অত্যন্ত অল্প বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—রাজা হরিশ্চন্দ্রের এক রাত্রে দ্বাদশবর্ষ অনুভূত হইয়াছিল[৪৩]। সুতরাং বুঝা উচিত যে নিমেষ, কল্প, অদূর ও দূর, এ সকল বাস্তবতঃ নাই। সমস্তই চিদণুর প্রতিভাস। সুবর্ণে হার কেয়ূরাদির ন্যায় ঐ সকল সেই সত্যাত্মায় বিরাজিত[৪৪।৪৫]। যে ভাবে চিৎ ও দেহ পরস্পর অভিন্ন, সেই ভাবে আলোক ও অন্ধকার, দূর ও অদূর এবং ক্ষণ ও কল্প অভেদ[৪৬]। (উঃ ১৯-২০) তিনি ইন্দ্রিয়গণের সার, সুতরাং তিনিই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। তিনিই দৃষ্টির অবিষয়ীভূত সুতরাং তিনি সে ভাবে অপ্রত্যক্ষ বা অসদ্রূপ। অথবা তিনিই দৃশ্যরূপে সমুদিত হন বলিয়া প্রত্যক্ষ[৪৭]। যেমন, যাবৎ কটক জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাবৎ হেম জ্ঞান থাকে না, তেমনি, যাবৎ দৃশ্যজ্ঞান থাকে, তাবৎ দর্শন (আত্মচৈতন্য) জ্ঞান থাকে না[৪৮]। যেমন কটক জ্ঞান তিরোহিত হইলেই সুবর্ণ জ্ঞান স্থায়ী হয়, তেমনি, কল্পিত দৃশ্যজালের জ্ঞান তিরোহিত হইলেই সেই একাদ্বয় পরম নির্ম্মল প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হন[৪৯]। তিনি সর্ব্বত্বহেতুক সদ্রূপ এবং দুর্লক্ষ্যত্ব প্রযুক্ত অসদ্রূপ। (উঃ ২১) সেই আত্মা আত্মত্বরূপে চেতন এবং জগদ্রূপতা প্রযুক্ত চেতন নহেন অর্থাৎ অচেতন[৫০]। (উঃ ২২) এই বায়ুসমান চঞ্চল জগৎ চৈতন্য ব্যতীত অন্য

কিছু নহে[৫১]। যেমন প্রচণ্ড আতপের বিস্ফুরণ মৃগতৃষ্ণা, তেমনি, চৈতন্যের প্রাচুর্য্য অদ্বৈত এবং চৈতন্যের প্রচ্ছাদন জগৎ[৫২]। সূর্য্য-কিরণ যে কাঞ্চনকণা নির্ম্মাণ করে, তাহাতে যেমন অস্তি নাস্তি দ্বিভাব বিরাজিত, তেমনি, ব্রহ্মে সৃষ্টিও অস্তি নাস্তি এই দ্বিভাবে পরিচিত[৫৩]। অনেক সময়ে আকাশে কিরণ কণিকা সকলকে সুবর্ণ কণিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে দেখা যায়। সে ভ্রান্তির মূল অজ্ঞান। তদনুরূপে চিন্ময় আত্মাতে অজ্ঞানের বিলাসে ভ্রান্তির মহিমারূপ সৃষ্টিদর্শন হইতেছে[৫৪]।

অহে রাক্ষসি! এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট, গন্ধর্ব্বনগর ও সঙ্কল্পপুরীর ন্যায় অসৎ। ইহা এক প্রকার দীর্ঘ ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৫]। যে সকল মহাত্মা জগৎ মিথ্যাত্ব উপপাদক যুক্তিবিষয়ে পটু, পরিভাবিত ও অভ্যস্ত, সেই সকল মহাপুরুষ নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন[৫৬]। অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের চিদাকাশে আর মিথ্যা সৃষ্টি উদিত হয় না। যুক্তিপরিস্কৃতচিত্ত তত্বজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে সৃষ্টি আদৌ হয় নাই এবং তাহার স্থিতিও নাই।

দৃশ্যই দর্শনের (জ্ঞানের) ভেদক। যখন দৃশ্য জ্ঞান লুপ্ত থাকে, তখন কুড্য ও আকাশ অভিন্ন হইয়া যায়। ইহা ব্রহ্মা হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবের অনুভূতিগম্য[৫৭।৫৮]। যেমন বীজের অন্তর্গত বৃক্ষ অতিসূক্ষ্মতা নিবন্ধন ব্যোমসদৃশ, তদ্রূপ, ব্রহ্মের অন্তর্গত জগৎও চিদেকরূপতা বিধায়ে ব্রহ্মসদৃশ সূক্ষ্ম, ইহা উক্ত সেই সেই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে হইবে[৫৯,৬১]।

অহে নিশাচরি! সেই শান্ত সর্ব্বময় অজ অনাদি ও অনন্ত দ্বন্দ্ব রহিত একমাত্র আত্মাই আভাসরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে প্রকাশমান রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই[৬২]। *

---

* মন্ত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলেন। মন্ত্রীর অভিপ্রায়, রাজা অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন। কেননা, রাজমর্য্যাদা রক্ষা করা মন্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতম সর্গ।

রাক্ষসী বলিল, মন্ত্রিন্! তোমার কথিত আশ্চর্য্য পরমার্থ বাক্য শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে রাজীবলোচন রাজা অবশিষ্ট প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দান করুন[১]।

রাজা বলিলেন, নিশাচরি! পণ্ডিতেরা যাহাকে জগৎপ্রত্যয়নিবৃত্তি রূপী উৎকৃষ্টপ্রত্যয় (তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান) বলেন * এবং যাহা সর্ব্বসঙ্কল্পপরিত্যাগরূপী বা সর্ব্বসংকল্পের বিরাম স্থল, এবং যাহা তন্মাত্র-নিষ্ঠতারূপ চিত্ত পরিগ্রহের (চিত্তসংযমের) ফলস্বরূপ[২], যাঁহার মায়িক সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি সম্পাদিত হইতেছে, যিনি বাক্যের অগোচর, অথচ বেদান্ত বাক্যের নিষ্ঠা (তাৎপর্য্য), যিনি অস্তি নাস্তি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অথচ উক্ত উভয় যাহার স্বরূপে সন্নিবিষ্ট, এই চরাচর জগৎ যাঁহার চিত্তময়ী লীলা এবং বিশ্বাত্মা হইলেও যাহার অপরিচ্ছিন্নতা অলুপ্ত, আমি মনে করিতেছি, তুমি সেই শাশ্বত ব্রহ্মের কথাই বলিতেছ[৩।৫]। হে ভদ্রে! উক্ত শাশ্বত ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম বলিয়া অণু। এবং উক্ত ব্রহ্মাণু আপনাকে বায়ুভাবে দর্শন করিয়া মায়ার বিবর্ত্তনে বায়ু হইয়াছেন। সেইজন্য তাহা অন্যথাগ্রহরূপ (গ্রহ=জ্ঞান) ভ্রান্তির মহিমা। সুতরাং পরমার্থ দর্শনে তিনি অবায়ু ও ভ্রান্তিদর্শনে তিনি বায়ু। যাহা বায়ু, বস্তুতঃ তাহা শুদ্ধ চেতন ব্যতীত বস্তন্তর নহে[৬]। (উঃ ২৩) সেইরূপ, তিনিই শব্দসংবেদন দ্বারা শব্দ এবং তাহা ভ্রান্তিদর্শনমূলক বলিয়া শব্দ নহে। অর্থাৎ পরমার্থ দর্শনে তিনি অশব্দ। অশব্দ অর্থাৎ শব্দের দ্বারা অবোধ্য। (উঃ ২৪) অপিচ, সেই

---

* জগৎপ্রত্যয়=জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রিতয় বিষয়ক বোধ। অর্থাৎ দ্বৈত বিজ্ঞান। তাহার নিবৃত্তি=তত্ত্ববোধ বা তত্ত্বজ্ঞান। অথবা অদ্বয় আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার। এই অদ্বয়াত্মসাক্ষাৎকার শাস্ত্রে পরপ্রত্যয় ও উৎকৃষ্টপ্রত্যয় প্রভৃতি নামে পরিভাষিত হইয়াছে। অপিচ, তাহাই এতন্মতের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তাহাই সর্ব্বসঙ্কল্পের তিরোধানের পর অর্থাৎ সমুদায় চিত্তবৃত্তি নিরোধের পর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অণু সর্ব্বস্বরূপ অথচ তাহা কিছুই নহে। কিছুই নহে কথার অর্থ—ভেদ-বর্জ্জিত, অথবা অদ্বৈত। (উঃ ২৫) ঐরূপ, অহম্ভাবতা নিবন্ধন তিনি অহং এবং অহম্ভাববিহীনতাপ্রযুক্ত তিনি নাহং। (উঃ ২৬) অপিচ তিনিই বাস্তব ও অবাস্তব বৈচিত্র্যের কারণ ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহারই আবিদ্যক ভ্রান্তিপ্রতিভা অবাস্তবের ও স্বাভাবিকপ্রতিভা বাস্তবের কারণ[৭,৮]। সেই আত্মা যত্নশতদ্বারা প্রাপ্য, এবং তিনি অহংরূপে লব্ধ থাকিয়াও প্রকৃত পক্ষে অলব্ধ। তাঁহাকে লাভ করিলেও উক্তরূপে লাভ করা লাভ না করা বলিয়া গণ্য হয়[৯] *। (উঃ ২৭) যাবৎ না মূলাজ্ঞাননাশক বোধ উদিত হয় তাবৎ জন্ম বসন্ত ও সংসার লতা বিকশিত হইবেই হইবে। যে অণু-ব্রহ্মের আকার চিৎসত্তা বলিলাম, সে অণু সাকারভাব প্রাপ্তির পর দৃশ্যতুল্য হইয়াছে। সেই জন্য বলা যায়, তিনি স্বস্থ ও জীবিত থাকিয়াও আত্মহারা[১০,১১]। (উঃ ২৮) এই সম্বিদাণুই (সূক্ষ্ম চিদ্‌ব্রহ্মই) ত্রিভুবনকে তৃণতুল্য ও সুমেরুকে ক্রোড়ীকৃত করিয়াছেন। (উঃ ২৯) সেই বিমল সংবিদ্ বাহ্যে ও অন্তরে আপনাকে মায়াময়রূপে অবলোকন করেন[১২]। বস্তুতঃই চিদণুর অন্তরে যে যে দৃশ্য বিদ্যমান, বাহিরেও সেই সেই দৃশ্য বিদ্যমান। ইহার দৃষ্টান্ত—অনুরাগীদিগের সাঙ্কল্পিক অঙ্গনালিঙ্গন[১৩]। সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নিত্য চিৎ যেরূপে সমুদিত হন, উদয়ের পরেও তিনি তদ্রূপেই পরিদৃষ্ট অথবা পরিলক্ষিত হন। তাঁহার সেই প্রাথমিক সংকল্প নিয়তি নামে খ্যাত[১৪]। চিৎ যখন যে ভাবে আবির্ভূত হন তিনি তখনই সেই বিষয়ই দেখেন, তাহার অন্যথা হয় না। শিশুদিগের মনঃ উক্ত বিষয়ের অন্যতম উদাহরণ[১৫]। সূক্ষ্মতম চিদণুর দ্বারা শতযোজনের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত বিশ্ব পরিপূরিত হইয়া আছে[১৬]। (উঃ ৩০) উক্ত অণু সর্ব্বগামী, অনাদি ও রূপাদি বিহীন, অথচ তাহা লক্ষ লক্ষ যোজনেও মিত হয় না। অর্থাৎ ধরে না[১৭]। (উঃ ৩১) যেমন ধূর্ত্ত লম্পট পুরুষেরা অপাঙ্গবিক্ষেপণাদির দ্বারা যুবতী দিগকে বশীভূত করে, তেমনি, শুদ্ধ চিদালোক (চিদাত্মা) উপাধিচেষ্টানুসারে (উপাধি=মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তদ্দ্বারা) এই পর্ব্বতাদি

---

* কেননা, উক্ত প্রকারের লাভ মোক্ষ কারণ নহে। জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ কারণ অদ্বৈত লাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর। আত্মাদ্বৈত সাক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষ নাই। সুতরাং ব্রহ্ম আছেন, এই মাত্র জানা না জানার সহিত সমান।

ও তৃণাদি শালী জগৎকে নর্ত্তিত করিতেছে[১৮।১৯]। (উঃ ৩২) সেই অনন্ত অণু ব্রহ্ম (সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্বিজ্ঞেয় পরমাত্মা) স্বীয় সম্বিদ্ দ্বারা বস্ত্রের ন্যায় মেরু প্রভৃতিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন[২০]। (উঃ ৩৩) * এই অণু দিক্‌কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং সুমেরু মহা শৈল অপেক্ষাও বৃহৎ এবং মনোরূপী বা জীবরূপী বলিয়া সূক্ষ্ম। (উঃ ৩৪) তিনি উক্তপ্রকারে বৃহৎ বলিয়া স্থূলতরাকৃতি ও উচ্চ এবং জীব বলিয়া কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য[২১]। হে রাক্ষসি! যেমন মেরুর সহিত সর্ষপের তুলনা হয় না, তেমনি, সেই শুদ্ধ সংবেদন স্বরূপ আকাশাত্মা পরমাত্মার সহিত পরমাণু তুলিত হইতে পারে না। তবে যে, তাঁহাতে অণু ও পরমাণু শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তাহা গৌণ প্রয়োগ, মুখ্য নহে। পরমাণু নিতান্ত দুর্লক্ষ্য, পরমাত্মাও নিতান্ত দুর্লক্ষ্য। সেই ভাবে অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মায় পরিচ্ছিন্নতম পরমাণু ও অণু শব্দ প্রয়োজিত হয়[২২]। মায়াই পরমাত্মায় অণুত্ব সৃজন করিয়াছে। মায়ার তাদৃশী সৃষ্টি অবিরুদ্ধ। যেমন সুবর্ণে বলয়ের সৃষ্টি, তেমনি, পরমাত্মায় নানাত্বের সৃষ্টি[২৩]। (উঃ ৩৫) অভিহিত পরমাত্মদীপ আলোক অন্ধকার উভয়েরই প্রকাশক। কেননা, আত্মা ব্যতীত অন্য কাহারও স্বাতন্ত্র্যে প্রকাশসামর্থ্য নাই। অপিচ, কোনও কালে আত্মপ্রকাশের অভাব নাই। আছে বলিতে গেলে "আমি নাই" বলিতে হয়। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি, সমস্তই জড়, সুতরাং আত্মার অভাবে সমুদায় পদার্থের নাস্তিত্ব ও আত্মার অস্তিত্বে সমুদায়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। পরন্তু আত্মার অভাব প্রমাণ ও অনুভব উভয় বিরুদ্ধ। যাহা শুদ্ধ ও কেবল সৎ, তাহাই আত্মা। তাহাতে যে চিত্ত অবস্থিতি করিতেছে, আত্মা তাহারই দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে আলোক ও অন্ধকারের কল্পনা করেন[২৪।২৬]। সূর্য্যের, চন্দ্রের ও বহ্নির তেজ তেজস্ত্বে ভিন্ন নহে। ভিন্নতা বর্ণে। অর্থাৎ রঙ্গের প্রভেদ[২৭]। অপিচ, উহারা সকলেই জড় সুতরাং উহারা কোন কিছুর প্রকাশক নহে। কজ্জল বর্ণ নিবিড় নীহার (বাষ্প)ই মেঘ। অতএব, মেঘের ও নীহারের যদ্রূপ প্রভেদ,

* বস্ত্র ঘট্টিত করিয়া তদগাত্রে পর্ব্বত চিত্রিত করে। সেই চিত্রিত পর্ব্বতকে বস্ত্র বেষ্টিত বলা যাইতে পারে। বস্ত্র গুটাইলে তন্মধ্যে চিত্রিত পর্ব্বত অবস্থিতি করে। চিত্রিত পর্ব্বত যেমন মিথ্যা, আত্মচৈতন্যে চিত্রিত জগৎব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ মিথ্যা।

আলোকের ও অন্ধকারের বস্তুতঃ সেই রূপই প্রভেদ। অধিক কি বলিব, সমুদায় জড়ের উপলব্ধির অর্থাৎ প্রকাশের নিমিত্ত একমাত্র চিদ্রূপ মহান্ সূর্য্য নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনিই ঐ সকলের অস্তিত্বাদি প্রমাণিত করিতেছেন। তিনি না থাকিলে ঐ সকল থাকিত না[২৮।২৯]। সেই চিৎস্বরূপ আদিত্য আলস্য পরিহীন হইয়া দিবারাত্র সমান সর্ব্বত্র এমন কি প্রস্তর মধ্যেও আলোক প্রদান করিতেছেন[৩০]। তাঁহারই কর্তৃক ত্রিলোক প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এখনও তাহা দুর্লভ নহে। এমন কি, শিলোচ্চয়ের অভ্যন্তরেও তদীয় প্রকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দেহ বৎপরৌনাস্তি তমঃ। অথচ চৈতন্যালোক ইহাকে বিনাশ করেনা, অধিকন্তু গ্রহণ অর্থাৎ প্রকাশ করে। প্রথমে ইহাকে (দেহকে), পরে জগৎকে প্রকাশ করে। যদ্রূপ প্রতাপশালী সূর্য্য কর্তৃক পদ্ম ও উৎপল প্রকাশিত (বিকশিত) হয়, তদ্রূপ, চিত্ত কর্তৃক প্রকাশ ও তমঃ উভয়ই প্রকাশিত হয় (আছে বলিয়া অবধারিত হয়)। সূর্য্য অহোরাত্র সৃজন করিয়া স্বীয় আকৃতি প্রদর্শন করেন, সেইরূপ চিৎসূর্য্যও সৎ ও অসৎ অবভাসিত করিয়া স্বকীয় স্বরূপ (আকৃতি) প্রদর্শন করেন[৩১।৩৪]। (উঃ ৩৬) যেমন বসন্তশ্রীর (বাসন্তী শোভার) মধ্যে পত্রফলপুষ্পাদির শোভা নিবিষ্ট থাকে, তেমনি, প্রোক্ত চিদণুর অন্তরেই সমস্ত অনুভব (জ্ঞানকণা বা বৃত্তিজ্ঞান) বিদ্যমান রহিয়াছে। (উঃ ৩৭) যেমন বসন্ত ঋতুর উদয়ে সৌন্দর্য্যপরম্পরা সমুদিত হয়, সেইরূপ, সমস্ত অনুভবই চিদণু হইতে সমুদিত হয়[৩৫।৩৬]। সেই পরমাত্মাণু রসাদি বিহীন, সুতরাং নিঃস্বাদু, অথচ তাহা হইতে সমগ্র স্বাদুসত্তার আবির্ভাব হয়। সুতরাং তিনি স্বয়ং নিঃস্বাদু হইয়াও স্বাদ গ্রহণ করেন বা স্বাদ বিজ্ঞাত হন[৩৭]। যে কোন রস, সমস্তই জলে অবস্থিত। সুতরাং জলই রসস্বরূপ। তাদৃশ জল আবার আত্মমূলক; সুতরাং মূল রস আত্মা (উঃ ৩৮) সেই চিৎপরমাণু সর্ব্বত্যাগী অথচ সকল পদার্থে অবস্থিত। সেই জন্য বলা যায়, সমগ্র জগৎ তাঁহারই আশ্রিত। তাঁহার অস্ফুরণে জগতের অভাব এবং স্ফুরণে জগতের ভাব পরিত্যাগ হয়। সুতরাং তাঁহারই স্ফুরণ সকল পদার্থের আশ্রয়[৩৮।৩৯]। (উঃ ৩৯) তিনি আপনাকে গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া চিত্তরূপ অণু বিস্তার করতঃ তদ্দ্বারা এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়া

বাখিয়াছেন। যদ্রূপ হস্তী দূর্ব্বাক্ষেত্রে আত্মগোপন করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ, আকাশাত্মা পরব্রহ্মও কোনও স্থলে আত্মগোপন করিতে সমর্থ নহেন[৪০।৪১]। (উঃ ৪০) যদ্রূপ বাসন্তী রসের উদ্বোধে বনাবলী বিচিত্র শ্রীসম্পন্ন হয়, তদ্রূপ, এই জগৎ প্রলয়পরিলীন হইলেও সেই চিৎপরমাণু অবলম্বনে সজীব (পুনরুত্থানযোগ্য) থাকে। বস্তুতঃই বসন্ত-রসোদ্বোধে বনখণ্ডের উল্লাসের ন্যায় একমাত্র চিত্তসত্ত্বা দ্বারা জগৎ সর্ব্বদা সমুদিত হইয়া থাকে। যেমন পল্লব ও গুল্ম বসন্তকালীন রস হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ, এই জগৎকে তুমি সেই চিন্ময় হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিবে[৪২।৪৫]। (উঃ ৪১) চিদ্বপুঃ পরমাত্মা সর্ব্বভূতের (প্রাণীর) সার (আত্মা) বলিয়া সহস্রকরলোচন, এবং যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম বলিয়া অন-বয়ব[৪৬]। (উঃ ৪২) সেই চিদণু নিমেষও বটে এবং কল্পও বটে। স্বপ্নদৃষ্ট বার্দ্ধক্য ও বাল্য যদ্রূপ, নিমেষ, মহাকল্প, ও কোটীকল্প তদ্রূপ[৪৭]। * অভুক্ত ব্যক্তির "আমি ভোজন করিয়াছি" এতদ্রূপ ব্যর্থ জ্ঞানের ন্যায় এবং ভোজন না করিয়াও "আমি ভোজন করিলাম" এতদ্রূপ জ্ঞান-শালীর জ্ঞানের ন্যায় এবং স্বপ্নানুভূত মরণ জ্ঞানের ন্যায় নিমেষকেও কল্প বলিয়া অবধারণ হইয়া থাকে[৪৮।৫০]। (উঃ ৪৩) প্রলয়কালে এই জগজ্জাল চিদাত্মরূপ পরমাণুতে অবস্থিত থাকে। বীজে বৃক্ষাবস্থানের ন্যায় সমুদায় জগৎ সেই চিৎ পরমাণুতে অবস্থান করে। যাহাতে যাহা থাকে, তাহা হইতেই তাহা আবির্ভূত হয়। বিকার (বিকৃতি) সাবয়ব পদার্থেই দৃষ্ট হয়, নিরাকার বা নিরবয়ব পদার্থে নহে[৫১]। (উঃ৪৪) এই সমুদায় ভূত (যাহা হয় তাহা ভূত) বৃক্ষ যেমন বীজে অবস্থান করে, সেইরূপ, চিৎ পরমাণু মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় বিশিষ্ট জগৎ অবস্থিতি করে[৫২।৫৩]। তণ্ডুল যেমন তুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তেমনি, নিমেষ ও কল্প, উভয়ই অণু আত্মার এক-দেশ আশ্রয় করতঃ তদ্বেষ্টিত রূপে অবস্থিত রহিয়াছে[৫৪]। (উঃ ৪৫-৪৬) আত্মাণু উদাসীনবৎ অবস্থান করেন কিছুতেই সংসৃষ্ট হন না, অথচ স্বমায়ায় ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্জ্জন করতঃ সর্ব্বজগতের কর্ত্তা হন[৫৫]। আত্মরূপ পরমাণু হইতেই জগৎ সমুদিত হয় পরন্তু যাহা বিশুদ্ধ চিৎ

---

* লীলোপাখ্যানে এই বিষয় উত্তম রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাহা ভোগসম্বন্ধরহিত হইয়াই অবস্থিতি করে। ফলতঃ পরমার্থ দৃষ্টিতে তিনি জগতের কর্ত্তা ও ভোক্তা নহেন। ' অপিচ, ইহার কিছু মাত্র বিলীন হয় না। ইহা সেই চিতের ব্যবহার দৃষ্টি মাত্র। (উঃ ৪৭) হে নিশাচরি! জগত্ব হেতুক তিনি "ঘনচিৎ" এই উপশব্দে (নামে) ব্যবহৃত হন। সেই চিদণু দৃশ্যভোগসিদ্ধির নিমিত্ত স্বসংস্থিত আন্তরিক চিচ্চমৎকৃতিকে বাহ্যরূপে ধারণ পূর্ব্বক নেত্র বিহীন হইয়াও তাহা দর্শন করিয়া থাকেন[৫৬।৫৯]। (উঃ ৪৮) *

হে রাক্ষসি! ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু না থাকিলেও সাধক দিগের শিক্ষার নিমিত্ত "অন্তঃস্থ" "বহিষ্ঠ" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা পরিকল্পিত হয়[৬০]। বস্তুতঃ পূর্ণস্বভাব পরমাত্মায় পদার্থান্তরের অবস্থান অসম্ভব। সুতরাং বুঝা উচিত যে, তিনিই দ্রষ্টা এবং তিনিই দৃশ্য। অর্থাৎ আপনিই আপনাকে দর্শন করিতেছেন অথচ নিজে অখণ্ডিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। (উঃ ৪৯) হে নিশাচরি, পরমাত্মাতে কিছুই বিস্মৃত হয় না। সুতরাং তিনি বাস্তব দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব প্রাপ্ত হন না[৬১।৬২]। আত্মচৈতন্যই প্রকৃত লোচন, চক্ষুঃ তাহার দ্বার মাত্র। সেই চেতনরূপ দৃষ্টি বাসনা-ভাবরহিত স্বীয় বপুকে দৃশ্যরূপে কল্পনা করতঃ দ্রষ্টৃরূপে সমুদিত হন[৬৩]। যেমন পুত্র ব্যতিরেকে পিতৃতা ও দ্বিত্ব ব্যতিরেকে একত্ব সম্ভাবিত হয় না, তেমনি, দ্রষ্টৃতা ব্যতিরেকে দৃশ্যতা কদাচ সম্ভাবিত হয় না। যেমন পিতা ব্যতিবকে পুত্র ও ভোক্তা ব্যতিরেকে ভোগ্য সম্ভাবিত নহে, তেমনি, দ্রষ্টৃতা ব্যতিরেকে দৃশ্যতাও সম্ভাবিত নহে[৬৪।৬৫]। (উঃ ৫০) সুবর্ণ শক্তির দ্বারা বিনির্ম্মিত কটকাদির ন্যায় চিৎ শক্তির দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্য পরিনির্ম্মিত হয়। সুবর্ণই কটক নির্ম্মাণ করে, কটক সুবর্ণ নির্ম্মাণ করে না[৬৬]। দৃশ্য সকল জড়ত্ব হেতু দ্রষ্টৃ নির্ম্মাণে সমর্থ নহে। যেমন সুবর্ণে কটকভ্রম হয়, তেমনি, চিৎই জগদ্ভাব প্রকাশন-সমর্থতা প্রযুক্ত মোহের কারণীভূত অসৎ দৃশ্যকে সৎস্বরূপে আরোপিত অর্থাৎ কল্পনা করিয়া থাকে। কটকতা অবভাসিত হইলে যেমন হেমের হেমত্ব থাকে না, তদ্রূপ, দৃশ্যতা অবভাসিত হইলে দ্রষ্টৃবপুঃ প্রকাশিত হয়

* চিৎচমৎকৃতি—অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত মায়া শক্তি। সেই মায়া শক্তি বাহ্যিকরূপে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে। ফলিতার্থ—দৃশ্যপ্রপঞ্চ স্বপ্ন ভ্রান্তির ন্যায় মায়িক ভ্রান্তির মহিমা মাত্র।

না। কিন্তু কটকসংবিত্তিকালেও কাঞ্চন কাঞ্চনভাবেই অবস্থিতি করে, এবং দ্রষ্টার দৃশ্যভাবে অবস্থান কালেও তাঁহার দ্রষ্টৃভাব বিদ্যমান থাকে। বস্তুতঃ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দুই সত্তার অন্যতর সত্তা অবভাসিত হইলে তৎকালে কদাচ উভয়সত্তা প্রতিভাসিত হয় না। যেমন পুরুষজ্ঞান নিশ্চয় হইলে তৎকালে তাহাতে আর পশুজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না[৬৭।৭১], সেইরূপ, যৎকালে বলয়জ্ঞান না থাকে, তৎকালে হেমের অকটকতা অর্থাৎ কেবল হেমত্ব প্রতিভাসিত হয়। উক্ত দৃষ্টান্ত অগ্রসর করিয়া বুঝিতে হইবে যে, দৃশ্যবোধ বিগলিত হইলে দ্রষ্টৃসত্তাই ভাসমান থাকে[৭২।৭৩]। সেই চিদ্বপুঃ আত্মা দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্য দর্শন করেন। দৃষ্টৃত্ব কালে দৃশ্যতা দর্শন অবশ্যম্ভাবী। অপিচ, দৃশ্য সকল দ্রষ্টাতেই অবভাসিত হয়। যদি দৃশ্যজ্ঞান বিগলিত হয় তবে অহং দ্রষ্টা—আমি দেখিতেছি, এ জ্ঞানও বিলুপ্ত হয় এবং অহং দ্রষ্টা, এ জ্ঞান লুপ্ত হইলেও ইহা আমি দেখিতেছি, এ জ্ঞানও বাধিত হয়। অর্থাৎ লুপ্ত হয়। যে কালে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃজ্ঞান তিরোহিত হয়, সে কালে (সমাধিকালে) বাক্য পথাতীত স্বস্থতত্ত্ব অবশেষিত হয়। অর্থাৎ মাত্র তাহাই থাকে। দীপ যেমন স্ব-পরপ্রকাশক, অর্থাৎ আপনাকে ও দৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তেমনি, সেই চিদ্বপুঃ পরমাত্মাও আপনাকে, স্বনিষ্ঠদৃষ্টৃত্বজ্ঞানকে ও দৃশ্যকে অবভাসিত করিতেছেন। অধিক কি বলিব, সেই চিন্ময় আত্মাণু কর্তৃক এ সমস্তই সুসম্পন্ন হইতেছে[৭৪।৭৬]। প্রমাতৃত্ব, প্রমাণত্ব ও প্রমেয়ত্ব, এই তিনই অসৎ ও আগন্তুক। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞান ঐ তিন জ্ঞানকে (প্রভেদবিজ্ঞানকে) গ্রাস করে[৭৭]। যেমন কোনও ভৌতিক পদার্থ জলভূম্যাদি পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, সেইরূপ, সেই স্বতঃসিদ্ধ অণু (আত্মা) হইতে কোনও পদার্থ ব্যতিরিক্ত নহে[৭৮]। যে হেতু তিনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্বানুভবরূপী, সেই হেতু একত্বানুভবরূপ যুক্তিতে আত্মাদ্বৈত নিরূঢ় হইয়া থাকে[৭৯]। (উঃ ৫১) তাঁহারই ইচ্ছায় ইচ্ছানুরূপ প্রভেদ সম্পন্ন হইতেছে। তরঙ্গ যেমন জলরাশি হইতে অপৃথক্, তেমনি, এ সমস্তই তদীয় ইচ্ছা হইতে অপৃথক্। (উঃ ৫২) এবং তাঁহারই ইচ্ছায় অর্থাৎ মায়ার দ্বারা এ সকল সলিল রাশি হইতে তরঙ্গ মালার পার্থক্যের ন্যায় পৃথক বলিয়া প্রতীত হয়[৮০]। (উঃ ৫৩) কেবল অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন এক পরমাত্মাই আছেন। এবং তিনি সকলের আত্মা ও

স্বতঃসিদ্ধ ও সাক্ষাৎ অনুভূতি[৮১]। তিনি সর্ব্বভূতের চেতন ও দর্শনের (চক্ষুরাদির) অগোচর এই নিমিত্ত তিনি সৎ ও অসৎ। চেতন ভাবে সৎ এবং ইন্দ্রিয়াগোচরভাবে অসৎ। চিদ্রূপী বলিয়া তিনিই অসতের প্রকাশক। (উঃ ৫৪) অপিচ, উক্ত মহান্ আত্মায় দ্বিত্ব ও একত্ব উভয়ই উক্ত প্রকারে বিদ্যমান। পরন্ত বিবেচ্য এই যে, যদি দ্বিতীয় থাকে, তবে একত্ব সিদ্ধ হয়। কেননা, দ্বিত্ব ও একত্ব আতপ ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর পরস্পরের সাধক[৮২।৮৩]। উক্ত নিয়মের ফল এই যে, যখন দ্বিত্ব নাই তখন একত্বও নাই। অপিচ, একত্বের অসিদ্ধিতে উভয়ের অসিদ্ধতা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। যাহা তত্ত্ব তাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। যাহা উক্ত উভয় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াও উক্ত উভয় ধর্ম্মীর ন্যায় অবস্থিত আছে, তাহা তদবভাসিত দ্বৈতাদ্বৈত হইতে অপৃথক্। যেমন দ্রবত্ব জল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ[৮৪।৮৫]। (উঃ ৫৫) যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতি, তেমনি, ব্রহ্মের অন্তরে (একাংশে) ত্রিজগতের অবস্থিতি[৮৬]। বলয় যেভাবে সুবর্ণ হইতে পৃথক্, দ্বৈতও সেই ভাবে অদ্বৈত হইতে পৃথক্। তত্ত্ববোধ উদিত হইলে দ্বৈতভাব সৎ বলিয়া অনুভূত হয় না[৮৭]। বস্তুতঃ, যেমন দ্রবতা সলিল হইতে, স্পন্দন বায়ু হইতে ও শূন্য ব্যোম হইতে পৃথক্ নহে, তেমনি, দ্বৈতও অদ্বয় ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে[৮৮]। ইহা দ্বৈত ইহা অদ্বৈত এতদ্রূপ জ্ঞান দুঃখের প্রকৃত কারণ। যাহা উভয়ভাববর্জ্জিত সুতরাং কেবল সত্তা, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই পরম বলেন[৮৯]। উক্ত পরম ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের কোনও কালে অনবস্থিত নহেন। তাদৃশ সর্ব্বসাক্ষিচিদাত্মরূপ পরমাণুতে দ্রষ্টা, দর্শন, ও দৃশ্য, সমস্তই কল্পিত জানিবে। যেমন, পবনাঙ্গে স্পন্দন, তেমনি, এই জগৎরূপ অণু (ক্ষুদ্র পদার্থ) পরমাত্মাণুর অঙ্গে (একাংশে) বিস্তৃত এবং উপসংহৃত হইতেছে[৯০।৯১]। (উঃ ৫৬) অহো! মায়া কি ভীষণা! মায়ার কি আশ্চর্য্য শক্তি! পরমাণুর (সূক্ষ্ম চৈতন্যের) অন্তরে ত্রিজগৎ, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে[৯২]। অহো! আশ্চর্য্য! বাস্তব সত্তা না থাকিলেও চিৎপরমাণুতে জগতের অবস্থান। অথবা অসম্ভব নহে। মায়ার দ্বারা সমস্তই সুসম্ভব হয়। ত্রিজগৎ কি? ত্রিজগৎ এক প্রকার বৃহৎ ভ্রম। এমন কিছুই নাই, যাহা ভ্রমের অপ্রদর্শনীয়। (উঃ ৫৭) যেমন ভাণ্ডস্থ বীজে বৃহৎ বৃক্ষের

অবস্থান, তেমনি, চিদণুর অন্তরে জগতের অবস্থান[৯৩।৯৪]। বৃক্ষ যেমন বীজকোটরে শাখা, পল্লব, ফল ও পুষ্প সহ বৃক্ষে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ, চিদণুর উদরে জগৎ অবস্থিতি করিতেছে[৯৫]। সেই জন্য তাহা কেবল যোগিদিগেরই দৃষ্টি গোচর হয়। বৃক্ষ আপনার পত্র পুষ্পাদি সমন্বিত বপুঃ পরিত্যাগ না করিয়া বীজমধ্যে অবস্থিতি করে, জগৎও আপনার দ্বৈতাদ্বৈতরূপ অপরিত্যাগে চিৎপরমাণুর অন্তরে অবস্থিতি করে[৯৬]। (উঃ ৫৮) চিৎপরমাণুর অন্তরস্থিত দ্বৈতরূপ জগৎকে যিনি অদ্বৈতরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন[৯৭]। বস্তুতঃ দ্বৈত বা অদ্বৈত দুএর কিছুই তত্ত্ব নহে। ইহা জাতও নহে, অজাতও নহে[৯৮]। ইহার বিদ্যমানতাও নাই, অবিদ্যমানতাও নাই। ইহা প্রশান্তও নহে, ক্ষুব্ধও নহে। আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি জগৎ চিদণুর অন্তরে বিদ্যমান নাই[৯৯]। একমাত্র শুভ চিৎই বিদ্যমান আছে, আর সব তুচ্ছ অর্থাৎ নাই। সর্ব্বাত্মিকা চিৎ যখন যেখানে যেরূপ সৃষ্টিপ্রভার দ্বারা সমুদিতা হন, তখন সেস্থানে তিনি সেই রূপেই ব্যবহার প্রাপ্ত হন[১০০]। এই পরমাত্মারূপ পরমাণু অনুদিতস্বভাব হইয়াও প্রতিভাসক্রমে (মায়িক প্রচ্ছাদনে বা প্রতিবিম্বনে) সৃষ্টিস্বরূপে উদিত হইয়া থাকেন। ইনি প্রপঞ্চরহিত ও একাত্মা হইয়াও সর্ব্বাত্মকস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পরম তত্ত্বই এই জগৎ রূপে সমুদিত হইয়া জন্মমরণাদির বশীভূত হইতেছেন। হে নিশাচরপুত্রি! সেই পরম তত্ত্ব এই জগৎভঙ্গীতে প্রকটিত। সে তত্ত্ব ত্যাগাত্যাগরূপী। অসঙ্গস্বভাব বলিয়া সর্ব্বত্যাগী এবং সর্ব্বগত বলিয়া সর্ব্ব অত্যাগী। সে তত্ত্ব স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার[১০১।১০৩]। পরমাণুর নিকট মৃণালতন্তু মহামেরু। কেননা, মৃণাল তন্তু দেখা যায়, পরমাণু দেখা যায় না। সুতরাং সেভাবে তাহা মহামেরু। আবার আত্মার নিকট পরমাণু মহামেরু। কেননা, পরমাণু দৃষ্টির অগোচর থাকিলেও বুদ্ধিগম্য; কিন্তু পরমাত্মা সেরূপ নহেন। পরমাণু অপেক্ষা সুদুর্লক্ষ্য পরমাত্মারূপ পরমাণু মধ্যে শত শত মেরু মন্দরাদি ভূধর অবস্থিত রহিয়াছে[১০৪।১০৫]।

হে রাক্ষসি! একমাত্র সেই শ্রেষ্ঠ পরমাণুই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এবং তৎকর্ত্তৃক এই জগৎ বিস্তৃত, বিরচিত, কৃত ও তাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বিরচিত বিশ্বপ্রপঞ্চ আকাশে গন্ধর্ব্ব-

নগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ইহা বিবিধ বিচিত্র হইলেও শূন্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সচ্চিদানন্দ সুন্দর দ্বৈতহীন ক্ষুদ্র জগৎ উক্ত প্রকারে পরমার্থপিণ্ডরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে[১০৬।১০৭]।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।
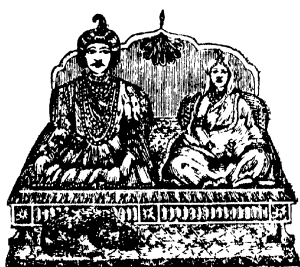
দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, নিশাচরী কর্কটী কিরাতরাজ সকাশে আপন প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া ব্রহ্মপদপ্রচ্যুতিকারক সংসার চাপল্য পরিত্যাগ করিল[১]। এবং সন্তাপশূন্যা হইয়া যেমন বর্ষাগমে ময়ূর ও কৌমুদীসমাগমে কুমুদ্বতী অন্তঃশীতলতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ অন্তঃশীতলতা ও পরম বিশ্রান্তি পদ লাভ করিল[২]। যেমন মেঘরব শ্রবণে বকীর আনন্দোদয় হয়, রাজার তদ্বিধ বচনপরম্পরা শ্রবণে নিশাচরীর সেইরূপ আনন্দোদয় হইল[৩]। তখন সে কহিল, হে ধীরদ্বয়! এখন বুঝিলাম, আপনাদিগের বুদ্ধি অতি পবিত্র ও সারসম্পন্ন জ্ঞানার্কে উদ্ভাসিত[৪]। যেমন নির্ম্মল শশিমণ্ডল হইতে শুভ্র সুশীতল জ্যোৎস্না প্রসূত হয়, সেইরূপ, ভবদীয় বিশুদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে বিবেকামৃত প্রসূত হইয়া আমাকে সুশীতল করিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, ভবাদৃশ বিবেকিগণ পরম পূজ্য ও সেবনীয়। যেহেতু, কুমুদ্বতী যেমন চন্দ্রসংসর্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আমি আজ্ সেইরূপ আপনাদের সংসর্গে পরম প্রফুল্লতা লাভ করিলাম[৫।৬]। যেমন কুসুম সংসর্গে সৌরভ লাভ হয়, সেইরূপ, সাধুসংসর্গে শুভ লাভ হইয়া থাকে। যেমন অর্ক-সংসর্গে পদ্মিনীর ম্লানতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, মহতের সংসর্গে দুঃখ সংযোগের বিনাশ হইয়া থাকে। প্রজ্বলিত দীপ হস্তে থাকিলে কোন্ ব্যক্তি অন্ধকারে অভিভূত হয়[৭।৮]? আমি আজ্ জঙ্গলমধ্যে ভূভাস্করসদৃশ আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনারা আমার সৎকারার্হ। সেজন্য আমার ইচ্ছা—আমি বর প্রদান দ্বারা আপনাদিগের সৎকার করি। অতএব হে নরবরদ্বয়! আপনাদিগের বাঞ্ছিত কি তাহা শীঘ্র বলুন[৯]।

রাজা বলিলেন, হে রাক্ষসকুলকাননমঞ্জরি! এই জনপদে জনগণ বিষূচিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাতিশয় সন্তাপ ভোগ করে। সেই হৃদয়শূলন রোগ ঔষধে শমতা প্রাপ্ত হয় না দেখিয়া আমি রাত্রিচর্য্যায় বহির্গত হইয়াছি। আমাদিগের অভিপ্রায়—ভবদ্বিধ ব্যক্তির নিকট মন্ত্র (মন্ত্রণা) লাভ করি। যাহারা তোমার ন্যায় অজ্ঞলোকবিনাশী, তাহা-দিগকে দমন করিব। ইহাও আমাদের অন্যতম বাসনা। হে শুভে!

এক্ষণে তোমার নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে, তুমি যেন আর প্রাণিহিংসা না কর। সম্প্রতি আমাদের প্রার্থনা পূরণে অঙ্গীকার করিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হই[১০।১৪]।

রাক্ষসী হৃষ্টা হইয়া বলিল, রাজন! আমি সত্য বলিতেছি, অদ্য-প্রভৃতি আর প্রাণিহিংসা করিব না[১৫]।

রাজা বলিলেন, হে ফুল্লপদ্মাক্ষি! পর দেহ ভক্ষণ করাই তোমার একমাত্র জীবিকা। সেজন্য আমার আশঙ্কা—যদি তুমি পরশরীর ভক্ষণ না কর, তাহা হইলে মৎসমীহিত অহিংসা ব্রত গ্রহণ করিলে কিরূপে তোমার দেহ রক্ষা হইবে[১৬]? রাক্ষসী কহিল রাজন্! আমি এই পর্ব্বতে ছয় মাস সমাধিস্থা ছিলাম। সম্প্রতি সমাধি হইতে উত্থিতা হওয়ায় আমার ভোজনবাসনা হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্ব্বার পর্ব্বতশিখরে গমন পূর্ব্বক সমাধি গ্রহণ করিয়া যত কাল ইচ্ছা, শালভঞ্জিকার ন্যায় নিশ্চল-ভাবে সুখে অবস্থিতি করিব[১৭।১৮]। আমি স্থির করিতেছি যে, আমি ধ্যানাবলম্বন করতঃ যত দিন ইচ্ছা, দেহ ধারণ করিব, পরে যথা কালে দেহ পরিত্যাগ করিব। মহারাজ! যত দিন শরীর ধারণ করিব, তত দিন আর আমি পরপ্রাণ বিনাশ করিব না। এক্ষণে আমি যাহা বলি, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর[১৯]।

উত্তর দিকে হিমবান্ নামে এক উন্নত মহাশৈল অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ শৈল জ্যোৎস্নাসদৃশ সুশুভ্র ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি সেই মহাশৈলের হেমশৃঙ্গ নামক শৃঙ্গে তত্রস্থ দরীরূপ গৃহে (দরী=পর্ব্বতের গুহা) আয়সী (লৌহসূচী) হইয়া মেঘলেখার ন্যায় বাস করিতাম। আমি রাক্ষসকুলসম্ভূতা এবং আমার নাম কর্কটী[২০।২২]। একদা আমি জনবিনাশ বাসনায় ব্রহ্মার আরাধনা করিলে, তিনি আমার তপস্যায় বশীভূত হইয়া আমার প্রার্থনানুসারে আমাকে প্রাণঘাতিনী সূচী ও বিসূচী হওয়ার বর প্রদান করিলেন[২৩]। আমি বর প্রাপ্তা হইয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত বিসূচিকারূপে অসংখ্য প্রাণি ভক্ষণ করিয়াছি। পরন্তু আমি তাঁহারই নিয়মানুসারে তৎপ্রকাশিত মহামন্ত্রের বশবর্ত্তিনী হওয়ায় গুণবান্ ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সমর্থ হই না[২৪।২৫]। হে রাজন্! আপনি সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার হৃদয়শূলন উপ-শান্ত হইবে। পূর্ব্বে আমি জনগণের হৃদয় আক্রমণ করতঃ শোণিত

শোষণ করিলে তাহাদের নাড়ী সকল বিকল (রক্তশূন্য) হইয়া যাইত। আমি রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া যে সমস্ত জনগণকে পরিত্যাগ করিতাম, সেই সুদুর্ব্বলনাড়ী ব্যক্তি হইতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিত, তাহারাও তদনুরূপ বিকলনাড়ী (রক্তশূন্য) হইত। পরিষ্কার কথা এই যে, মদীয় আক্রমণ সাংঘাতিক; পরন্তু যদি দৈবাৎ মদীয় আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইত তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তান পরম্পরা রুগ্ন ভুগ্ন বিকলেন্দ্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিত[২৬।২৮]।

হে রাজন্! সত্ত্বশালী জনগণের অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব, আপনি সেই বিসূচিকা মন্ত্র অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। হে নরপতে! নাড়ীকোশস্থিত শূলের পরিশান্তির নিমিত্ত ভগবান্ ব্রহ্মা যে মন্ত্র কহিয়াছিলেন, আপনি শীঘ্র তাহা গ্রহণ করুন। হে ভূমিপাল! আসুন, আমরা নদীতীরে গমন করি; কৃতাচমন ও সংযত হই, পরে আপনি আমার নিকট সেই মহামন্ত্র গ্রহণ করুন[২৯।৩১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই রাত্রে সেই রাক্ষসী সেই মন্ত্রী ও ভূপতির সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর সুহৃদ্ভাবে নদীতীরে গমন করিল[৩২]। রাজা ও মন্ত্রী রাক্ষসীর সৌহৃদ্য অবগত হইয়া তাহার শিষ্য হইলেন[৩৩]। পরে রাক্ষসী ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত সেই বিসূচিকামন্ত্র তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। অনন্তর নিশাচরী সুহৃদ্ভাবাপন্ন রাজাকে ও রাজমন্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গমনোদ্যতা হইলে, রাজা তাহাকে কহিলেন, হে মহাবংশালিনি! আপনি আমাদিগের গুরু ও বয়স্যা। অতএব, হে সুন্দরি! আমরা প্রযত্নসহকারে আপনাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি; আপনি কদাচ আমাদিগের প্রণয় মিথ্যা করিবেন না। আমরা জানি, সুজনের সৌহার্দ্দ, দর্শন মাত্রেই পরিবর্দ্ধিত হয়। তাই আমাদের প্রার্থনা—আপনি স্বীয় শরীরকে অল্পমাত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া আমার গৃহে আগমন পূর্ব্বক যথাসুখে অবস্থিতি করুন[৩৪।৩৮]।

রাক্ষসী বলিল, রাজন্! আমি মানবী রূপ ধারণ করিলে আপনি আমাকে মনুষ্যোচিত ভোজন পানাদি দানে সমর্থ হইবেন। যদি রাক্ষসী মূর্ত্তিতে থাকি, তাহা হইলে কি দিয়া আমার তৃপ্তিসাধন করিবেন? রাক্ষসদিগের ভক্ষ্য বস্তু আমার তৃপ্তিজনক হইতে পারিবে, পরন্তু সামান্য জনগণের খাদ্যে আমার তৃপ্তিসাধন হইবে না। কেননা, যাবৎ দেহ,

তাবৎ পূর্ব্বসিদ্ধ স্বভাব নিবৃত্ত হয় না[৩৯।৪০]।

রাজা বলিলেন, হে অনিন্দিতে! তুমি কিছুদিন মানবস্ত্রীরূপ ধারণ করতঃ মাল্যধারিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে আমার গৃহে বাস কর। পরে শত শত পাপাচারপরায়ণ চৌর ও অন্যান্য বধার্হ ব্যক্তি রাজ্য হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তোমাকে সুভোজন প্রদান করিব। তুমি তখন মানবীরূপ পরিত্যাগ ও রাক্ষসীরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত গ্রহণ করতঃ হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিয়া যথাসুখে ভক্ষণ করিবে। যাহারা মহাভোজী, নির্জ্জনে ভোজন করা তাহাদের সুখের হেতু। ঐরূপে, তৃপ্তিলাভ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিবে। পরে পুনর্ব্বার সমাধিস্থা হইবে। সমাধি হইতে বিরতা হইয়া পূনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক অন্যান্য বধ্য জনগণ লইয়া যাইবে। এরূপ হিংসা তোমার অধর্ম্মজনক হইবে না। ধম্মবিৎগণের নির্ণয়—ধম্মানুসারে হিংসা করুণার সদৃশ। ভদ্রে! ভরসা করি, তুমি সমাধি বিরতা হইলে অবশ্যই আমার নিকট আগমন করিবে। আমরা জানি—অসৎদিগেরও বদ্ধমূল সৌহৃদ্য নিবৃত্ত হয় না[৪১।৪৭]।

রাক্ষসী কহিল, রাজন্! আপনি উপযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন। অবশ্যই আমি আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। কোন্ ব্যক্তি সুহৃদ্‌বাক্য অবহেলন করে[৪৮]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর সেই রজনীতে রাক্ষসী হার, কেয়ূর কটক ও স্রগ্দাম ধারিণী বিলাসপরায়ণা রমণী হইয়া "মহারাজ! আগমন করুন" এই বাক্য কহিয়া সেই গমনশীল ভূপতির ও মন্ত্রীর অনুগামিনী হইল[৪৯।৫০]। পরে রাজসদন প্রাপ্ত হইয়া এক রমণীয় গৃহে গমন করতঃ তাহারা পরস্পর কথোপকথন দ্বারা সেই রজনী অতিবাহিত করিল। পরে রাক্ষসী প্রভাতকালাবধি স্ত্রীরূপে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং রাজা ও মন্ত্রী ইঁহারা জনপালন ও বধ্য বধ প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন[৫১।৫২]।

অনন্তর ছয় দিবসের মধ্যে রাজা স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে তিন সহস্র বধ্য সংগ্রহ করিয়া রাক্ষসীকে প্রদান করিলেন। তখন সে নিশাকালে কৃষ্ণবর্ণা ভীষণা রাক্ষসী হইয়া রাজার অনুমতিক্রমে দরিদ্রগণ হেমের ন্যায় সেই তিন সহস্র লোককে ভুজমণ্ডলে গ্রহণ পূর্ব্বক হিমা

চলশৃঙ্গে গমন করিল[৫৩।৫৬]। পরে সেই সমস্ত লোক ভক্ষণ পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করতঃ দিনত্রয় সুখনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার সমাধিস্থা হইল। রাক্ষসী সেই প্রকারে চারি বা পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সেই রাজসভায় গমন পূর্ব্বক বিশ্রম্ভালাপ দ্বারা কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার বধ্য গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ববৎ ভক্ষণ করিত[৫৭।৫৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অদ্যাপি সেই রাক্ষসী জীবন্মুক্ত হইয়া সেই গিরিস্থিত অরণ্যে ধ্যানপরায়ণা হইয়া অবস্থিতি করে এবং সমাধি হইতে উত্থিতা হইয়া সৌহৃদ্য বশতঃ সেই কিরাতরাজসমীপে আগমন পূর্ব্বক বধ্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে[৬০]।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তদবধি সেই কিরাতরাজ্যে যে সমস্ত ভূপাল জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের সহিত সেই রাক্ষসীর মিত্রতা জন্মিয়া থাকে[১]। রাক্ষসী তদবধি সেই কিরাতরাজ্যের পিশাচভয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মহোৎপাত ও সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারণ করে[২]। রাক্ষসী বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ধ্যাননিরতা থাকে, ধ্যান ভঙ্গের পর কিরাতমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক রাজ-সঞ্চিত বধ্যদিগকে গ্রহণ করে[৩]। অদ্যাপি তত্রত্য মহীপালগণ সুহৃদের সম্মান রক্ষার্থ বধ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন[৪]। সেই রাক্ষসী কিরাত-জনপদে "কন্দরা" ও "মঙ্গলা" এই দুই নামে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া তত্রত্য গগনস্পর্শী প্রাসাদোদরে অবস্থিত রহিয়াছেন। তদবধি তথায় যিনি ভূপালপদে অধিরূঢ় হন, ভগবতী কন্দরার প্রতিমা নষ্ট হইলে তিনি অন্যপ্রতিমা নির্ম্মাণ করতঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করেন[৫।৭]। যে নৃপাধম ভগবতী কন্দরা দেবীর প্রতিষ্ঠা না করে, কন্দরা তাহার সমস্ত প্রজা বিনষ্ট করেন[৮]। তাঁহার পূজা করিলে জনগণের বাসনা পূর্ণ হয় এবং তাঁহার পূজা না করিলে কাহার কোন প্রকার বাসনা পূর্ণ হয় না। অধিক কি বলিব, সেই ব্যক্তি বহুবিধ অনর্থপরম্পরার ভাজন হয়[৯]। সেই দেবী বধ্যলোকোপহারদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। অদ্যাপি তথায় তাঁহার ফলদায়িনী চিত্রস্থা প্রতিমা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বপ্রকারে বালবৎসগণের মঙ্গল বিধান করেন এবং পরমবোধবতী সেই রাক্ষসী কিরাতমণ্ডলের দেবতা হইয়া জয়যুক্তা হইতেছেন[১০।১১]।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! আমি হিমপর্ব্বত স্থিতা কর্কটী রাক্ষসীর মনোহর উপাখ্যান তোমার নিকট আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম[১]। রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! হিমালয়গহ্বর-স্থিতা রাক্ষসী কিরূপে কৃষ্ণ-বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল? এবং তাহার কর্কটী নাম হইবারই বা কারণ কি? আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন[২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাক্ষসদিগের কুল (বংশ) অসংখ্য। তাহারা স্বভাবতঃ কেহ শুক্ল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ হরিত এবং কেহবা উজ্জ্বল বর্ণ[৩]। এই রাক্ষসীর কৃষ্ণবর্ণতা কুলানুরূপ এবং কর্কটপ্রাণিসদৃশ কর্কট নামক রাক্ষস হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কর্কটী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল[৪]। ইহারও আকৃতি কর্কটের সদৃশ (কাঁকড়ার ন্যায় দীর্ঘ হস্তপদাদি) ছিল। রাঘব! আমি বিশ্বরূপ (ব্রহ্ম) নিরূপণোদ্দেশে ও অধ্যাত্মকথা প্রসঙ্গে কর্কটীর প্রশ্ন স্মরণ করতঃ সেই পরমার্থনিরূপিকা আখ্যায়িকা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম[৫]।

এই আদ্যন্তরহিত অসম্পন্ন জগৎ সেই একমাত্র পরম কারণ হইতে সম্পন্নবৎ প্রকাশ পাইতেছে[৬]। যদ্রূপ বারিমধ্যে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান অসংখ্য তরঙ্গ অবস্থিতি করে সেইরূপ এই সৃষ্টিপরম্পরাও সেই পরম পদে অবস্থিত রহিয়াছে[৭]। যেমন কাষ্ঠমধ্যগত বহ্নি অপ্রজ্বলিত অবস্থাতেও মর্কটাদির শীত নিবারণ করে, তেমনি, ব্রহ্ম, নানা কর্ত্তার ন্যায় হইয়া নানাপ্রকার জগৎ সৃষ্টি করেন অথচ তাঁহার স্বাভাবিক সৌম্যতা পরিত্যাগ হয় না[৮।৯]। যেমন কাষ্ঠে বৃথা শালভঞ্জিকা (প্রতিমা) বুদ্ধি উদিত হয়, তেমনি, এই জগৎ, সৃষ্ট না হইলেও সৃষ্টরূপে অনুভূত হয়[১০]। অঙ্কুর ও বীজ অভিন্ন অর্থাৎ একই বস্তু, অথচ তদ্দ্বয় মনোমধ্যে ভিন্ন প্রকারে সমুদিত হয়। সেইরূপ চিত্ত ও চেত্য (চিত্তের জগৎ দর্শন শক্তি) অভিন্ন বা এক, অথচ তদ্দ্বয় ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়[১১।১২]। ভেদ অবিচার মূলক। সুতরাং তাহা বাস্তব নহে। ভেদের অবাস্তবতা এইজন্য বলা যায় যে, সদ্বিচার উদিত হইলে তখন

আর ভেদ থাকে না[১৩]। হে রঘুনাথ! এ ভ্রান্তি যেস্থান হইতে আসিয়াছে, সেই স্থানেই গমন করুক। অথবা তুমি প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্ম অবগত হইয়া এই ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর[১৪]। মদীয় বাক্যরূপ অস্ত্রদ্বারা তোমার ভ্রান্তিগ্রন্থি ছিন্ন হইলে, তুমি অভেদ বুদ্ধির দ্বারা সেই পরম বস্তু অবগত হইতে পারিবে। অবশ্যই তুমি মদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া এই চিৎসমুৎপন্ন অনর্থশ্রী ও ইহার মূল কারণ অবিদ্যা বিনষ্ট করিতে পারিবে। তুমি আমার বাক্যাবলম্বনে প্রবুদ্ধ হইলে "জগৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং সমস্তই ব্রহ্ম" এই সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই[১৫।১৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ভিন্নরূপে পরিদৃশ্যমান এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ কি প্রকারে সেই পরম পদ হইতে অভিন্ন? বশিষ্ঠ বলিলেন, অভিন্নতাই বাস্তব; ভিন্নতা কাল্পনিক। কেবল উপদেশের নিমিত্তই অর্থাৎ শিষ্যদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই ভেদ বোধক শব্দরাশি সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব, পরমাত্মার সহিত জগতের যে ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ব্যবহারিক মাত্র। বাস্তবিক নহে। যেমন বালকের উপদেশ উদ্দেশে উপদেশকগণ বেতালাদির কল্পনা করেন, সেইরূপ[১৮।২০]। ফলতঃ যাহাতে দ্বিত্ব বা একত্ব কিছুই নাই, তাহাতে সঙ্কল্প বিকল্পের সম্ভাবনা কি? অজ্ঞানীরাই ভেদ জ্ঞান বহন করতঃ বহুবিধ বিবাদ করে। কারণ-কার্য্য, স্বত্ব-স্বামিত্ব, হেতু-হেতুমান্, অবয়ব-অবয়বী, ব্যতিরেক-অব্যতিরেক, পরিণাম-অপরিণাম, বিদ্যা-অবিদ্যা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ইত্যাদি যে কিছু ভেদ ব্যবহার সমস্তই অজ্ঞদিগের মিথ্যাময়ী কল্পনা ও অনভিজ্ঞবোধার্থ অনুবাদ। যাহা বস্তু তাহাতে কোনও প্রকার ভেদ নাই। তাহা এক অখণ্ড অদ্বৈত। তত্ত্ব জ্ঞান হইলে অদ্বৈতই অবশেষিত হয়[২১।২৫]। রাম! যখন তোমার তত্ত্ব বোধ উদিত হইবে তখন তুমি বুঝিবে যে, আদ্যন্তবর্জ্জিত, বিভাগরহিত এবং এক অখণ্ডিত পরমাত্মাই সর্ব্বময় এবং তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই[২৬]। হে রঘুনাথ! যাহারা বুদ্ধ নহে, তাহারাই আপন আপন বিকল্প জ্ঞানের (শব্দশ্রবণজনিত মিথ্যা ভেদজ্ঞানের) প্রশ্রয়ে ঐরূপ ঐরূপ বিবাদ করে পরন্তু যাহারা বুদ্ধ, বোধপ্রাপ্ত, তাহাদের দ্বিধাভাব থাকে না, অস্তমিত হইয়া যায়। দ্বৈত মিথ্যা হইলেও তাহা ব্যবহার দশার অর্থাৎ তত্ত্ব বোধের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় অর্থাৎ উপদেশের নিমিত্ত গৃহীত হয়। যেমন মিথ্যা রজ্জুসর্প দর্শনে সত্য ভয়কম্পাদি

ফল উদ্ভূত হয়, তেমনি, মিথ্যা দ্বৈতের অনুবাদ করিয়া উপদেষ্টৃগণ সত্য ব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকেন। ব্যবহারসিদ্ধ দ্বৈত অবলম্বন না করিলে অদ্বৈত বুঝান যায় না। যাহার শব্দশক্তির গ্রহ (জ্ঞান) নাই অর্থাৎ অমুক শব্দ অমুক বস্তুর বাচক, অমুক বস্তু অমুক শব্দের বাচ্য, ইত্যাদি-বিধ বোধ নাই, সে ব্যক্তিকে কোন কিছু বুঝান যায় না। সেইজন্য ব্যবহার সিদ্ধ দ্বৈত গ্রহণীয় হয়। নচেৎ বিচার দৃষ্টির অগ্রে দ্বৈতের অবস্থান অসিদ্ধ[২৭।২৮]। অতএব, হে রাঘব! তুমি শব্দজনিত ভেদ অনাদর করিয়া, মিথ্যা বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিকে মহাবাক্যার্থে নিমগ্ন করতঃ অর্থাৎ চিত্তকে এক অখণ্ডাদ্বৈতাকার করিয়া, আমার বাক্য সকল শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই জগৎ এক অখণ্ড মৌন অর্থাৎ অদ্বৈত অবশেষিত হইয়াছে[২৯]। এই জগৎ গন্ধর্ব্ব পুর পত্তনের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র। হে অনঘ! যে প্রকারে এই জগদ্রূপিণী মায়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আমি দৃষ্টান্ত সহ তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শ্রবণের দ্বারা ইহার ভ্রান্তিময়তা অবধারণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার বাসনারাশি বিনষ্ট হইবে[৩০।৩২]। এই ত্রিজগৎ মনের মনন (কল্পনা) দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিলে তুমি শান্তাত্মা হইবে ও আপনি আপনাতেই থাকিবে[৩৩]। রাম! মনোরূপ ব্যাধির চিকিৎসার্থ মদীয় বাক্যে মনঃসংযোগ করিবে ও বিবেকরূপ ঔষধের প্রতি যত্নবান্ হইবে[৩৪]। তুমি বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকা শ্রবণ করতঃ তদনুসারে অবস্থিত হইতে পারিলে; জানিতে পারিবে, সংসারে একমাত্র চিত্তই প্রকাশমান আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই। এমন কি, শরীরাদিও নাই। বস্তুতঃ রাগদ্বেষদূষিত চিত্তই সংসার; তাহা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিলে সংসারমুক্ত হওয়া যায়[৩৫।৩৬]। চিত্তই সাধ্য, পালনীয়, বিচারণীয়, আহরণীয়, ব্যবহরণীয়, সঞ্চারণীয় ও ধারণীয়। * আকাশসদৃশ (অশরীরী) চিত্ত স্বীয় অন্তরে ত্রিজগৎ (দৃশ্য-

---

* যাহা সিদ্ধ হয় নাই, তাহা সাধনপ্রয়োগে সাধ্য হয়। যাহা সিদ্ধ হইয়াছে তাহা পালনীয় অর্থাৎ রক্ষণীয় হয়। অসিদ্ধ সাধনের নানা পথ বা নানা উপায় থাকিলে কোন্ উপায় সুগম? তাহা বিবেচনা করার নাম বিচার। যাহা তদ্‌যোগ্য তাহা বিচারণীয়। দেশান্তরে বা সময়ান্তরে সিদ্ধ আছে, কিন্তু তাহা নিকটে বা বর্ত্তমানে অসিদ্ধ আছে, সেরূপ হইলে উপায় প্রয়োগে নিকটস্থ ও বর্ত্তমান করা

জাল) ধারণ করিতেছে। চিত্তই অহন্তাবরূপে দেহাদিতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে[৩৭।৩৮]। যাহা চিত্তের চিদ্‌ভাগ (চৈতন্যভাগ) তাহাই সর্ব্বপ্রকার কল্পনার বা কল্পনাশক্তির বীজ। যাহা জড়ভাগ তাহাই ভ্রমাত্মক জগৎ[৩৯]। সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সমস্ত যখন অবিদ্যমান বা অস্পষ্ট ছিল তখন ব্রহ্মা এ সকল স্বপ্নের ন্যায় দেখিয়াও দেখিতেন না। পরে তিনি কালে সংবিদ্‌দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়; জড়সংবিদ্‌দ্বারা (জড়ভাবের বুদ্ধি) শৈলাদি ও সূক্ষ্মসংবিদ্‌দ্বারা লিঙ্গসমষ্টিরূপাত্মক সূক্ষ্ম হিরণ্য গর্ভ, এই ত্রিবিধ দেহ অনুভব করেন[৪০।৪১]। অথচ উক্ত দেহত্রয় শূন্যস্বরূপ; সুতরাং বাস্তব নহে। সেই মনোময় আত্মবপু সর্ব্বগামী সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। চিত্তরূপ বালক অবোধতা প্রযুক্তই জগৎকে যক্ষস্বরূপে (অপূর্ব্ব বস্তু) অবলোকন করিতেছে। আবার প্রবুদ্ধ হইলে ইহাকে নিরাময় আত্মারূপে দর্শন করিবে। আত্মা যে প্রকারে দ্বিত্ব ও ভ্রমদায়ক রূপে দৃষ্ট হন, আমি বক্ষ্যমাণ বাক্যাবলির দ্বারা তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করি, তুমি প্রণিহিত হও[৪২।৪৪]। আমি যুক্তি সমবেত মধুর পদপদার্থ যুক্ত, ঐন্দবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিব, তুমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে। সে উপাখ্যান শ্রবণ করিলে শ্রোতার হৃদয় সুশীতল হয়। হে অনঘ! এক মাত্র স্বাত্মভ্রান্তিই আপনাকে জগৎ স্বরূপে বিস্তৃত করিয়াছে। যেরূপে জগন্মায়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৪৫।৪৭]।

হইলে তাহা আহরণ নাম প্রাপ্ত হয়। আয়ত্তাধীন বস্তুকে যথেচ্ছ বিনিয়োগ করার নাম ব্যবহার। তদ্‌যোগ্য করার নাম ব্যবহরণীয়। ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে অশ্বাদি সঞ্চারণীয় এবং ভূষণাদি স্থাবর বস্তু ধারণীয়। এই কয়েকটী সংজ্ঞায় জগতের সর্ব্বপ্রকার পদার্থ নিবিষ্ট আছে।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

ঐন্দবোপাখ্যান।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে, অনঘ! পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে এই জগৎ সম্বন্ধীয় কথা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমি তোমার নিকট বর্ণন করি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে আমি একদা পিতামহ ব্রহ্মাকে "ভগবন্! এই সমুদায় দৃশ্য কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার নিকট এক বৃহৎ ঐন্দবোপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন১।৩।

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! যেমন জলাশয়ের জল বিচিত্র আবর্ত্তাকারে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি, একমাত্র জগৎশক্তিসম্পন্ন মনই দৃশ্য জগদ্রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে৪। পূর্ব্বকালে আমি কোন এক কল্পের আদিতে প্রবুদ্ধ হইয়া জগৎ সৃষ্টির অভিলাষ করিলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর৫।

একদা আমি দিবাবসানে নিখিল সৃষ্টি পরম্পরা সংহার করিয়া স্বস্থ ও একাগ্র চিত্ত হইয়া যামিনী যাপন করিলাম৬। * অনন্তর নিশাবসানে প্রবুদ্ধ হইয়া যথাবিধি সন্ধ্যাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতঃ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বিস্তৃত নভোমণ্ডলে নয়নদ্বয় সংযোজিত করিলাম৭। দেখিলাম, কেবল মাত্র অসীম আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাতে আলোক ও অন্ধকার দুএর কিছুই নাই। অনন্তর আমি মনে করিলাম, এই গগনে আমি সৃষ্টি অনুসন্ধান করিব। পরে ঐরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া আমি একাগ্র চিত্তে স্রষ্টব্য বস্তু সকল পর্য্যালোচনা বা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি মনের দ্বারা সেই বিস্তৃত অব্যক্তাকাশে পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলাম। সে সকল ব্যাঘাত

---

* ব্রহ্মার দিনে সৃষ্টি এবং রাত্রিতে মহাপ্রলয়। তাঁহার এক দিনে আমাদের এক কল্প। কল্পের আদি ও সৃষ্ট্যারম্ভ সমান কথা। এস্থলে আকাশ ও নভোমণ্ডল প্রভৃতি শব্দের অর্থ মায়াশক্তি।

রহিত অর্থাৎ বিশেষ সুশৃঙ্খল, ও মহারম্ভযুক্ত[৮।১০]। আরও দেখিলাম, সেই ব্রহ্মাণ্ডে দশ ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন। তাহারা সকলেই অবিকল আমার ন্যায় এবং সকলেই আমার ন্যায় পদ্মকোষনিবাসী ও রাজহংস সমারূঢ়[১১]। সে সকল সৃষ্টি (ব্রহ্মাণ্ড) বিষ্ণু প্রভৃতির দ্বারা পালনাদি ব্যবস্থায় নিরর্গল অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইতেছে। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডেও স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী, ও বর্ষণকারী মেঘ রহিয়াছে এবং সে সমস্তই অনাবৃষ্ট্যাদিদোষরহিত। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডেও নদী প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য, উষ্ণস্পর্শ মরীচিমালা বিস্তার করিতেছে, নভোমণ্ডলে সমীরণ প্রস্ফুরিত হইতেছে[১২।১৩]। স্বর্গে দেবগণ ও ভূতলে মানবগণ ক্রীড়া করিতেছে, পাতালে দানব ও ভোগীগণ (সর্পগণ) বিচরণ করিতেছে[১৪], কালচক্র স্থাপিত রহিয়াছে; শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু শীতাতপ প্রদান করিতেছে, কালানুসারে ফল পুষ্পাদি উদ্ভূত হইয়া মহীমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে[১৫]। সর্ব্বত্রই বিহিত ও নিষিদ্ধ আচার প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র তদ্বোধক স্মৃত্যাদি গ্রন্থ, এবং সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় রহিয়াছে। তত্রস্থ প্রাণিগণ ভোগমোক্ষফলার্থী হইয়া তাহা লাভের নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে কালে কালে প্রযত্ন করিতেছে ও তাহারা স্বর্গ নরকাদিফলভোগও করিতেছে[১৬।১৭]। সর্ব্বত্রই প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী সপ্ত লোক, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র ও অষ্ট কুলাচল প্রস্ফুরিত হইতেছে[১৮]। তমঃপুঞ্জ কোন স্থানে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কোন স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে এবং কুঞ্জাদিতে (লতার ঝোপ্‌কে কুঞ্জ বলে) যেন সস্নেহে তেজের সহিত সংমিলিত হইতেছে[১৯]। তারকা-নিকররূপ-কেশরসম্পন্ন-নীলবর্ণনভোরূপনীলোৎপলে অভ্রখণ্ডরূপ ভ্রমররাজি পরিভ্রমণ করিতেছে[২০]। যেমন সুশুভ্র শাল্মলীর তুলা তদীয় অষ্ঠীলায় (ফলকর্পরে কর্পর=আবরণ ছাল।) অবস্থিত থাকে, তেমনি, হিমালয়ের গুহাদি প্রদেশে ঘনীভূত সুশুভ্র নীহার রাশি অবস্থিত রহিয়াছে[২১]। লোকালোক পর্ব্বত যাহার মেখলা, অর্ণবের ঘোর গর্জ্জন যাহার অলঙ্কার ধ্বনি, তমঃখণ্ড যাহার ইন্দ্রনীলমণিপ্রভা, যিনি অন্তর্গত রত্নরাজি-দ্বারা রত্নসম্পন্ন, ধান্যাদি শস্য সকল যাহার অধরসুধা, প্রাণিগণের বাক্যালাপ যাহার বাক্‌বিলাস, তাদৃশী পৃথিবী দেবী সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে অন্তঃপুরাঙ্গনার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন[২২।২৩]। সমুদায়

ব্রহ্মাণ্ডেই সম্বৎসরলক্ষ্মী (শ্রী) শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর দ্বারা রঞ্জিত হইয়া উৎপলমালাধারিণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন[২৪]। অহো! অন্তরালে অন্তরালে ভিন্ন ভিন্ন লোক সকল সন্নিবিষ্ট থাকায় ব্রহ্মাণ্ডগণ তদালোকে আলোকিত দাড়িম ফলের ন্যায় আরক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল[২৫]। ত্রিপ্রবাহা ও ত্রিপথগা গঙ্গানদী জগতের ঊর্দ্ধ অধঃ মধ্য এই ত্রিস্থানে বিরাজিত থাকিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন[২৬]। দিকরূপ লতানিকরে তড়িতরূপ পুষ্পসমন্বিত মেঘরূপ পল্লব সকল বায়ুকর্ত্তৃক বিতাড়িত ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে[২৭]। মদ্‌দৃষ্ট এবম্বিধ জগৎ, যাহাতে সমুদ্র, ভূমি ও আকাশ, এই তিনের সমাবেশ, তাহা গন্ধর্ব্ব-নগরীয় উদ্যানে অবস্থিত লতার অনুরূপ অনুভূত হইল। * ভুবনান্তরালে দেব, অসুর, নর ও উরগগণ উড়ম্বরমধ্য স্থিত মশকের ন্যায় ঘুমঘুম রব করতঃ অবস্থিত রহিয়াছে। অতর্কিত সর্ব্বনাশ প্রতীক্ষাকারী কাল যুগ, কল্প, ক্ষণ, কলা ও কাষ্ঠাদিরূপে নিরন্তর বহমান হইতেছে[২৮।৩০]।

বৎস! আমি স্বীয় বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সমস্ত অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, ইহা কি! কি দেখিলাম! আমি মাংসময় চক্ষুর্দ্বারা যাহা কখন দেখি নাই সেই মায়িক সৃষ্টি আজ আমি চিত্তাকাশে দর্শন করিলাম! কি আশ্চর্য্য! [৩১৩২]।

পরে আমি আকাশস্থিত সেই সকল জগৎ হইতে এক সূর্য্যকে সমাহ্বান করিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে দেবদেব! হে ভাস্কর! হে মহাদ্যুতে! আসুন, আপনার মঙ্গল হউক। আমি জানিতে চাহি, তুমি কে? তোমার সম্বন্ধীয় এই জগৎ এবং অন্যান্য জগৎ কাহার দ্বারা সৃষ্ট? হে অনঘ! যদি তুমি অবগত থাক, তাহা হইলে, আমার নিকট কীর্ত্তন কর[৩৩।৩৫]।

তাঁহাকে ঐরূপ কহিলে তিনি আমাকে অবলোকন পূর্ব্বক পরিজ্ঞাত হইলেন। অনন্তর নমস্কার পূর্ব্বক আমাকে উদার বাক্যে পশ্চাদুক্ত কথা বলিলেন। বলিলেন, হে ঈশ্বর! আপনি সমুদায় দৃশ্য প্রপঞ্চের

* গন্ধর্ব্বনগর=ভ্রমক্রমে আকাশে পরিদৃষ্ট পুর। মেঘবিশেষের সংস্থান অনুসারে আকাশে কখন কখন ক্ষণিক দৃষ্টিবিভ্রম হইয়া থাকে। হটাৎ বোধ হয়, যেন একটা নগর। তাদৃশ নগর গন্ধর্ব্বনগর। তত্রস্থ উদ্যান, ও তন্মধ্যবর্ত্তী লতা। সমস্তই মিথ্যার বা ভ্রান্তির বিলাস। তাহার ন্যায় বর্ণিত জগৎও ভ্রান্তির বিলাস।

কারণ, অথচ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। যদি জানিয়াও মদুক্তি শ্রবণে আপনার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আমার অচিন্তিত উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন৩৬।৩৮। হে মহাত্মন্! হে ঈশ্বরাত্মন্! আপনি ইহাই জানুন যে, যাহা নিরন্তরিত জগদ্রচনাশক্তিশালিনী, যাহা কখন কোথাও সৎ ও কখন কোথাও অসৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং যাহাকে সৎ কি অসৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে জানা সুকঠিন, অতএব, ব্যামোহ (ভ্রান্তি) দায়িনী, এবং যাহাতে কাল দেশাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জগৎসত্তা প্রদর্শনের কৌশল নিহিত আছে, তাহার দ্বারা এই দৃশ্য (অনির্ব্বাচ্য) বিস্তৃত হইয়াছে সত্য; পরন্তু এ সমস্তই মন বা মনের বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে৩৯।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।
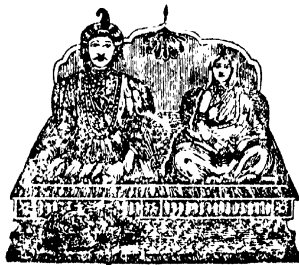
ষড়শীতিতম সর্গ।

অতঃপর সূর্য্য বলিলেন, হে মহাদেব! আপনার কল্পনামক পূর্ব্ব-দিবসে (এতৎকল্পের পূর্ব্বকল্পে) জম্বুদ্বীপের এক কোণে কৈলাস নামক যে শৈল আছে তাহার সমতল প্রদেশে সুবর্ণজটনামে প্রসিদ্ধ এক স্থান আছে। সেই স্থানে আপনার মরীচি প্রভৃতি পুণ্যবান্ তনয়গণ প্রজা (নিজ সন্তান পরম্পরার) নিবাসার্থ উৎকৃষ্ট ও সুখপ্রদ মণ্ডল (বাসযোগ্য ভূমি বা স্থান) কল্পনা করিয়া ছিলেন[১।২]। সেই মণ্ডলে (বাসভূমে) কশ্যপকুলোদ্ভব ধর্ম্মপরায়ণ বেদবিদ্‌শ্রেষ্ঠ শান্তস্বভাব ইন্দু নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন[৩]। মহাত্মা ইন্দু সেই সর্ব্বসুখপ্রদ মণ্ডলে (রাজ্যে) বাস করিতেন এবং তাঁহার অপরিজ্ঞাতনামা প্রাণসমা ভার্য্যাও তৎসঙ্গে বাস করিতেন[৪]। যেমন মরুভূমিতে তৃণের উৎপত্তি হয় না, তেমনি, সেই ভার্য্যাতে তাঁহার সন্তানোৎপন্ন হইল না। শর-লতা (তৃণগুচ্ছ) যেমন পত্র পুষ্প ফল বিহীন বলিয়া শোভা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ, তদীয় ভার্য্যা ঋজু, গৌরী ও বিশুদ্ধচরিত্রা হইলেও অপুত্রতানিবন্ধন শোভা প্রাপ্ত হইল না।

তদনন্তর, অপুত্রতা নিবন্ধন খিন্নমনা সেই বিপ্রদম্পতী তপস্যার্থ কৈলাস ভূধরের কোন এক প্রদেশে অধিরূঢ় হইলেন এবং তথায় জনশূন্য অনাবৃত প্রদেশে গিয়া মহীরুহের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ সলিলমাত্র ভক্ষণ করিয়া ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দিবাবসানে কেবলমাত্র এক গণ্ডুষ জল পান করিতেন, অবশিষ্ট কাল বৃক্ষবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক (বৃক্ষবৃত্তি=বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া থাকা) তপস্যা করিতেন। যাবৎ ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের অবসান না হইয়াছিল, তাবৎ তাঁহারা তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। অনন্তর ইন্দু যেমন কুমুদের প্রতি প্রসন্ন হন, সেইরূপ, শশিকলাধর মহেশ, সেই আতপ-তাপিত বিপ্রদম্পতীর প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন। এবং যে স্থানে তাঁহারা তপস্যা করিতেছিলেন, তন্নিকটস্থ লতাপাদপসমাচ্ছন্নপ্রদেশে সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায় আবির্ভূত হইলেন। তখন বিপ্রদম্পতী সেই তুষারধবল

বৃষভারূঢ় সোমার্দ্ধশেখর সোমদেবকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন[৫।১৩]। কুমুদ যেমন কৌমুদী দর্শনে পুলকিত হয়, বিপ্রদম্পতি ইষ্টদেব দর্শনে সেইরূপ পুলকিত হইলেন। যেমন পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সুপ্রসন্ন হয়, বিপ্রদম্পতি সেইরূপ প্রসন্নমনা হইলেন।

অনন্তর মহাদেব লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে মৃদুমধুর হাস্য প্রকট করতঃ সুমধুর বাক্যে কহিলেন, বিপ্র! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করিয়া বসন্তানুগৃহীত বৃক্ষের ন্যায় প্রমুদিত হও। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে দেবদেবেশ! হে ভগবন্! যাহাদের দ্বারা আমি পুনঃ শোকাক্রান্ত না হই, এরূপ কল্যাণগুণাচারশালী মহাধীসম্পন্ন দশ পুত্র আমার হউক।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর মহাবপু মহেশ্বর "তাহাই হউক" বলিয়া আকাশে অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই উমামহেশ্বরসদৃশ বিপ্রদম্পতী মহাদেবের নিকট বর লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল গৃহে থাকিলে ব্রাহ্মণী গর্ব্বিণী হইলেন[১৪।১৯]। দেখিতে দেখিতে তিনি পূর্ণগর্ভা হইলেন এবং বারির দ্বারা মেঘলেখার ন্যায় শ্যামকলেবর ধারণ করিলেন। তদনন্তর সেই বিপ্রভার্য্যা যথাকালে পরম সুন্দর প্রতিপচ্চন্দ্রলেখার ন্যায় সুশোভন দশ পুত্র প্রসব করিলেন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অল্পকাল মধ্যেই তনয়গণের ব্রাহ্মণোচিত জাত কর্ম্মাদি সংস্কার সকল সমাপিত করিলেন। বিপ্রতনয়গণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহারা সপ্তম বর্ষ অতিবাহিত করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই তাঁহারা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অবগত হইলেন এবং স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলস্থিত নির্ম্মল গ্রহের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সেই তনয় গণের ব্রহ্মকোবিদ পিতা মাতা দেহ পরিত্যাগ করতঃ পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই দশজন ব্রাহ্মণ পিতৃ মাতৃ বিহীন হইয়া সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসাচলে গমন করিলেন। তথায় সেই বান্ধববিহীন ব্রাহ্মণগণ উদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া "এখন আমাদিগের শ্রেয়ঃ কি" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, হে ভ্রাতৃগণ! এখানে আমাদিগের সমুচিত কর্ত্তব্য কি? কিই বা পরিণামে অদুঃখ-

দায়ক? আমিই বা কি? তুমিই বা কি? এই সমস্ত জনগণের ঐশ্বর্য্যই বা কি? ইহাদের অপেক্ষা সামন্তগণ অধিক ঐশ্বর্য্যশালী কি না? সামন্তগণ অপেক্ষা রাজগণ, রাজগণ অপেক্ষা সম্রাট ও সম্রাট অপেক্ষা ইন্দ্র সমধিক ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন দেখা যাইতেছে। আবার ইহাও দেখা যায়, ইন্দ্রত্ব পদ প্রজাপতির এক মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী। অতএব ইহাদের (জনগণের) ঐশ্বর্য্য কি? যাহা কল্পান্তেও বিনষ্ট হয় না, ইহ জগতে এমন কোন্ বস্তু বিদ্যমান আছে তাহা বিচারের দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া উচিত[২৭।২৯]?

ভ্রাতৃগণ পরস্পর ঐরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগের মহামতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গম্ভীর স্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্যই শ্রেষ্ঠ। কেননা, ব্রহ্মা ব্যতিরেকে কল্পান্তে আর কিছুই অবিনাশী থাকে না। জ্যেষ্ঠ ঐরূপ কহিলে, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান ও পরম সংকার করতঃ কহিলেন, হে তাত! আমরা কি প্রকারে সর্ব্বদুঃখবিনাশন জগৎপূজ্য পদ্মাসন বিরিঞ্চির পদ প্রাপ্ত হইব[৩০।৩৩]? তখন জ্যেষ্ঠ পুনর্ব্বার বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমিই সেই পদ্মাসন সমারূঢ় পরমতেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মা। আমিই চিত্তদ্বারা সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকি। তোমাদের অন্তরে এইরূপ জ্ঞান বদ্ধমূল হউক[৩৪।৩৫]।

তখন অন্যান্য ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করতঃ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আমিই সকল জগতের স্রষ্টা, কর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। যজ্ঞমূর্ত্তি যাজকগণ, মহর্ষিগণ, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ও পুরাণাদি, সরস্বতী ও গায়ত্রীযুক্ত বেদ, নরগণ, এ সমস্তই আমার অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। লোকপাল ও সঞ্চরমান সিদ্ধমণ্ডল পরিপূর্ণ এই শোভমান স্বর্গ, পর্ব্বত, দ্বীপ, কানন ও জলধিসমলঙ্কৃত ত্রিলোকীর কুণ্ডলস্বরূপ এই ভূমণ্ডল, দৈত্য দানব প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ পাতালকুহর, অমরস্ত্রীগণ পূর্ণ গৃহসম্পন্ন গগনরাজ্য (অমরাবতী), যিনি সকল রাজার শ্রেষ্ঠ ও যিনি একাকী এই লোকত্রয় পালন করিতেছেন, সেই পবিত্র যজ্ঞভোজী মহাবাহু ইন্দ্র, যিনি স্বীয় কান্তিরূপ পাশদ্বারা দিক্ সকলকে বন্ধন করিয়াই যেন সন্তাপিত করিতেছেন সেই প্রভূতকিরণশালী দ্বাদশ আদিত্য, গোপালগণের গোযূথ রক্ষার ন্যায় যাঁহারা বিশুদ্ধ মর্য্যাদা দ্বারা

লোক সকলকে রক্ষা করিতেছেন, সেই সমস্ত লোকপালগণ আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে[৩৬।৪৫]। এই সমস্ত প্রজাগণ সলিলতরঙ্গের ন্যায় আমাতে আবির্ভূত, আমাতেই তিরোহিত, আমার দ্বারা বিরাজিত ও আমাতে নিপতিত হইতেছে। আমিই সৃষ্টি বিস্তার ও সংহার করিয়া থাকি। আমি আপনাতে অবস্থিত ও আপনাতে বিলীন হইতেছি। যে আত্মা সম্বৎসররূপে জাত ও যুগরূপে পরিণত হইতেছে, যাহা সৃষ্টি ও সংহারের কাল এবং যাহা ব্রহ্মার কল্প (দিন) এবং রাত্রি স্বরূপ, আমি সেই পূর্ণাত্মা পরমেশ্বর"[৪৬।৪৯]।

ইন্দুতনয়গণ একাগ্রচিত্তে দৃঢ়বদ্ধাসনে উপবিষ্ট ও চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে ইতর বৃত্তি সকল বিগলিত হইল। তখন তাঁহারা কমলাসনবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব কুশাসনকে পঙ্কজাসন কল্পনা করতঃ বিরাজমান হইতে লাগিলেন[৫০।৫১]।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যেমন সৃষ্টিকর্ত্তার পদে অধিরূঢ় থাকিয়া সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাসক্তচিত্ত আছেন, সেইরূপ, সেই দশ ইন্দু-পুত্র উপাসনায় সিদ্ধ হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার পদে অবস্থান করতঃ ভাবময় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অর্থাৎ মনে মনে জগৎ রচনা কার্য্যে ব্যাসক্ত-চিত্ত থাকিলেন। যাবৎ তাঁহাদের দেহ বিগলিত না হইয়াছিল তাবৎ তাঁহারা ঐ কার্য্যে অবস্থিত ছিলেন। অনন্তর তাঁহাদের দেহ যথা-কালে শীর্ণ পর্ণবৎ বিগলিত হইলে বনবাসী ক্রব্যাদগণ তাঁহাদিগের সেই দেহ ভক্ষণ করিল। তাঁহাদের বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান আত্যন্তিক রূপে নিবৃত্ত হইল। এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া কল্প শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলেন। অনন্তর কল্প শেষ হইলে দ্বাদশ আদিত্য সমুদিত, পুষ্করাবর্ত্ত মেঘের ঘর্ঘর রবে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ, কল্পান্তবায়ু প্রবাহিত ও জগৎ ঐকার্ণবীকৃত এবং সমুদায় ভূত বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইন্দুসন্তানগণ সেই ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[১।৩]। হে ভবগন্! আপনি যখন আপনার রাত্র্যাগমে সর্ব্ব সংসার সংহার করতঃ যোগনিদ্রায় অবস্থিত করিতে ছিলেন, তখনও তাঁহারা সেই ভাবে (মানসিক সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপৃত) অবস্থিত ছিলেন[৭]। আজ্ আপনি নিদ্রোত্থিত হইয়া পুনঃ সংসার সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সেইরূপ ব্যবস্থায় অবস্থিত আছেন[৮]। হে ব্রহ্মন্! হে ভগবন্! সেই দশ জন ব্রাহ্মণরূপ ব্রহ্মার দশ সংসার (জগৎ) তাঁহাদের চিত্তাকাশে অবস্থিত রহিয়াছে। হে বিভো! আমি সেই দশ সংসারের একতমের ছিদ্রভূত আকাশে তৎসংসারের ভানু হইয়া কালবিভাগকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছি[৯।১০]। হে পদ্মজ! আমি আকাশস্থিত দশ সর্গের বিবরণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারেন। এই মহাড়ম্বর সম্পন্ন জগৎ ঐ দশ জন ব্রহ্মার চিত্তের কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১১।১২]।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

---*---

ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ! ভানুদেব ব্রহ্মাকে সম্বোধন সহকারে "সেই দশ ব্রাহ্মণই দশ ব্রহ্মা" এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন[১]। অনন্তর ব্রহ্মা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ভানো! এক্ষণে আমি আর কি সৃষ্টি করিব তাহা শীঘ্র বল[২।৩]। হে ভাস্কর! যেখানে দশ জন ব্রহ্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেখানে আর আমার স্রষ্টব্য কি? ব্রহ্মা ঐরূপ বলিলে ভানুদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন[৪], প্রভো! আপনি নিরীহ ও নিরিচ্ছ। সুতরাং আপনার সৃষ্টি কার্য্যে কোন প্রয়োজন নাই। হে জগৎপতে! সৃষ্টি কেবল আপনার বিনোদমাত্র (লীলা)[৫]। হে মহামতে! যেমন সূর্য্য হইতে জলে প্রতিবিম্বাত্মক সূর্য্যের উদ্ভব হয়, তেমনি, কামনাবিহীন আপনা হইতে সৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়[৬]। আপনি যখন শরীর-বিষয়েও নিষ্কাম, অর্থাৎ তাহার ত্যাগ ও অহং-অভিমান স্থাপন দ্বারা তাহার গ্রহণ, এই দুই দুষ্পরিহার্য্য বিষয়েও আপনি উদাসীন, তখন আর আপনার সৃষ্টিবিষয়ক নিষ্কামতার কথা কি বলিব? হে দেব! হে ভূতপতে! তবে যে আপনি সৃজন করেন, তাহা বিনোদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন দিনপতি, বিনা স্বপ্রয়োজনে দিন সৃজন করেন, তেমনি, আপনিও বিনা স্বপ্রয়োজনে এই সকল সংহার করেন, করিয়া পুনর্ব্বার সৃজন করেন। আপনি উদ্যম ও ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কিছু করেন না। দিবাকরের দিবাসৃষ্টির ন্যায় কেবল বিনোদের নিমিত্তই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে মহেশ! আপনি যদি সৃষ্টি না করেন, তাহা হইলে নিত্যকর্ম্ম অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়। কর্ত্তব্য পরিত্যাগেই বা আপনি অন্য কি ফল পাইবেন[৭।১০]? শাস্ত্রের শাসন এই যে, সদা আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবেক। সে ভাবে কর্ম্ম করিলে যে ফলসংসর্গ হয় তাহা নির্ম্মল মুকুরে প্রতিবিম্ব পাতের সমান। অর্থাৎ প্রতিবিম্ব যেমন স্বীয় আধরকে লিপ্ত করে না সেইরূপ কর্ম্মফলও তদ্রূপ কর্ত্তায় লিপ্ত হয় না[১১]।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ম্মকরণে যদ্রূপ অনাসক্ত, কর্ম্ম পরিত্যাগেও তদ্রূপ অনাসক্ত অর্থাৎ কামনা বিহীন[১২]। আপনি সুষুপ্তিতুল্য নিষ্কাম বুদ্ধি অবলম্বন করতঃ কার্য্য করণের স্থায় যথোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন[১৩]। হে সুরেশ্বর! যদি ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টির দ্বারা আপনার সন্তোষ সাধন হয়, তাহা হইলে, তাঁহারাও সৃষ্টির দ্বারা আপনার সন্তোষ সাধন করিবেন[১৪]। আপনি ইন্দুতনয়গণের সৃষ্টি চিত্তনেত্রের দ্বারাই দর্শন করিতেছেন, নয়নদ্বারা নহে। যিনি যাহা সৃজন করেন, তিনিই তাহা চক্ষে দর্শন করিতে সমর্থ হন। অন্যের মানসী সৃষ্টিতে অন্যের পরোক্ষ-জ্ঞান হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। কিন্তু নিজ মনের সৃষ্টিতে নিজের অপরোক্ষানুভব হইয়া থাকে। ভাবার্থ—ইন্দুপুত্রগণের সৃষ্টিতে আপনার যে পরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে তাহাও বিনোদ বিশেষ। কারণ এই যে, মনের দ্বারা যিনি যাহা নির্ম্মাণ করেন, তিনিই তাহা মাংসময় চক্ষুতেও দর্শন করিতে সমর্থ হন। অন্যে তাহা নেত্রদ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ নহে[১৫।১৬]। ঐ দশ ব্রহ্মার দশ সর্গ কেহ বিনাশ করিতেও সমর্থ নহে। যাহা কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃত হয়, তাহাই বিনাশনীয়। যাহা চিত্তদ্বারা কৃত হয়, তাহা কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ নহে[১৭]। হে ব্রহ্মন্! যাহার মনে যাহা নিশ্চয়রূপে বদ্ধমূল হয়, তাহা, সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। যাহা বহুকালের অভ্যস্ত ও দৃঢ়মূল, মহাত্মাদিগের অভিশাপেও তাহা বিনষ্ট হয় না। শরীর বিনষ্ট হইবে তথাপি তাহার মানস রচনা বিনষ্ট হইবেক না। মনে যাহা নিশ্চয়রূপে বদ্ধমূল হয়, পুরুষ বা আত্মা সেইরূপই হইয়া থাকে। সেই বদ্ধমূল বোধের বৈপরীত্য করিবার নিমিত্ত ইতর উপায় অবলম্বন, বা চেষ্টা করিলে তাহা অঙ্কুরোৎপাদনার্থ উপলখণ্ডে সলিল সেকের স্থায় বৃথা হয়[১৮।২১]।

ইন্দুপুত্রগণের উপাখ্যান সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোননবতিতম সর্গ

ইন্দ্র ও অহল্যার ইতিবৃত্ত।

ভানু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনই জগতের কর্ত্তা এবং মনই পরম পুরুষ। যাহা কিছু কৃত হয়, সমস্তই মনের দ্বারা, শরীর দ্বারা নহে[১]। দেখুন, ইন্দুতনয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়াও ভাবনার দ্বারা (মানসিক উপাসনায়) ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[২]। মনের দ্বারা দেহ ভাব ভাবনা করিলে দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দেহ ভাবনা না করিলে দেহধর্ম্ম (জন্ম-মরণাদি) হইতে মুক্ত হওয়া যায়[৩]। যাহারা বাহ্যদর্শী তাহারা নিয়ত সুখদুঃখ অনুভব করে। যাহারা বাহ্যদৃষ্টিবিহীন অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন-যোগী, তাহারা দেহে প্রিয় অপ্রিয় কিছুই অনুভব করে না[৪]। হে ব্রহ্মন্! মনই এই ভ্রমময় জগতের মূল কারণ। ইন্দ্র ও অহল্যার সংবাদ তাহার পুষ্কল দৃষ্টান্ত[৫]।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভানো! যাহাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মন পবিত্র হয় সেই অহল্যা ও ইন্দ্র কে? ভানু বলিলেন, হে দেব! শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে মগধরাজ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নসদৃশ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক মহীপতি বাস করিতেন[৬।৭]। শশাঙ্কের রোহিণীর ন্যায় সেই মহী-পতির ইন্দুবিম্বপ্রতিমা কমললোচনা অহল্যা নাম্নী ভার্য্যা ছিল[৮]। সেই রাজপুরে কামশাস্ত্রবিশারদ কামুকপ্রধান ইন্দ্র নামে অপর এক ব্রাহ্মণ-কুমার বাস করিতেন[৯]। একদা রাজমহিষী অহল্যা কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে গৌতমপত্নী অহল্যা যে দেবরাজ ইন্দ্রের পরম প্রণয়িণী হইয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করতঃ তদবধি সেই পুরবরস্থিত ইন্দ্রের প্রতি সাতিশয় অনুরাগিণী হইলেন। এবং সেই ব্রাহ্মণকুমার ইন্দ্রও তাঁহার প্রতি অত্যা-সক্ত হন; ইন্দ্র অন্য কোন স্থানে গমন না করেন, সে নিমিত্ত অহল্যা একান্ত সমুৎসুকা হইলেন[১০।১১]। অহল্যা ইন্দ্রের জন্য এত সন্তপ্তা হইল যে, মৃণালশয্যা ও কদলীপল্লবাস্তরণ তাহার দাহ পীড়ার হ্রাস করিতে অসমর্থ হইল[১২]। ভূপতির তত ঐশ্বর্য্য, তথাপি সে, নিদাঘ-তপ্তসলিলস্থিত মৎসীর ন্যায় খেদ প্রাপ্ত হইতে লাগিল[১৩]। অহল্যা

সর্ব্বদাই "এই ইন্দ্র, এই ইন্দ্র" এইরূপ প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করতঃ লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধীরা হইয়া উঠিল[১৩]। অনন্তর তাহার কোন বয়স্যা তাহাকে তদ্রূপ কাতরা দেখিয়া কহিল, সখি! আমি শীঘ্রই ইন্দ্রকে তোমার নিকটে নির্ব্বিঘ্নে আনয়ন করিব, তুমি উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ কর। সে ঐ কথা শুনিয়া এক নলিনী যেমন অন্য নলিনীর মূলদেশে নিপতিত হয়, তেমনিই অহল্যা প্রিয়বয়স্যার পদতলে নিপতিত হইল[১৫,১৬]।

অনন্তর দিবা অবসান ও রাত্রি সমাগত হইলে সেই বয়স্যা সেই ইন্দ্রনামক দ্বিজকুমার সমীপে গমন পূর্ব্বক সমুচিত প্রবোধ প্রদান করতঃ তাঁহাকে সেই রজনীতে অহল্যার নিকট আনয়ন করিল[১৭,১৮]। যুবতী অহল্যা মনোহর মাল্য, হার ও অঙ্গদাদিদ্বারা বিভূষিতা, চন্দনাদি বিলেপিতা ও মন্মথের একান্ত বশীভূতা হইয়া কোন গোপনীয় গৃহে সেই কামুক ইন্দ্রের সহিত রতিক্রীড়া সমাপন করিল। অহল্যা ক্রমেই ইন্দ্রের প্রতি অধিক অনুরাগিণী হইতে লাগিল এবং জগৎকে তন্ময় জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং তখন সে সেই বহুগুণসম্পন্ন ভর্ত্তাকে (রাজাকে) আর গুণশালী বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিল না[১৯,২১]।

কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইলে রাজা তাহার অনুরাগের বিষয় অবগত হইলেন। অহল্যা যতক্ষণ মনে মনে ইন্দ্রকে ভাবিতেন, ততক্ষণ তাহার মুখ প্রফুল্ল কৈরবের ন্যায় বিরাজ করিত[২২,২৩]। ইন্দ্রও অহল্যার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, ক্ষণকালও অহল্যাদর্শন বর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পারিত না[২৪]। তাহাদিগের তাদৃশ দৃঢ়ানুরাগ ও অপ্রচ্ছন্নচেষ্টাজনিত দুর্নীতি রাজার বিশেষ পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল[২৫]। ভূপতি তখন বহুবিধ দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহারা ক্লেশ বোধ করিল না। হিমকালে জলাশয়ে নিক্ষেপ করিতেন কিন্তু তাহারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণচিত্ত হইত না প্রত্যুত হৃষ্ট হইয়া রাজাকে উপহাস করিত[২৬,২৭]। রাজা সেই সলিলনিক্ষিপ্ত দুর্ম্মতিদ্বয়ের দুঃখ না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা জল হইতে সমুদ্ধৃত হইয়া বলিতে লাগিল। "আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখকান্তি স্মরণ করতঃ ভাবে নিমগ্ন থাকি, শরীর কি হইয়াছে না হইয়াছে তাহা জানি না[২৮,২৯]। আমাদিগের পরস্পরের মন নিতান্ত নিঃশঙ্ক। সেইজন্য আমরা আপনার শাসনে শঙ্কিত না হইয়া বরং

হৃষ্ট হই। হে মহীপাল! আমাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও ক্লেশ বোধ করি না৩০।”

তাহারা উত্তপ্ত ভর্জ্জনপাত্রে নিক্ষিপ্ত, গজপাদে মর্দ্দিত ও কশার (কশা=চর্ম্মরজ্জু, চাবুক) দ্বারা সন্তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র খেদ প্রাপ্ত হইত না। রাজা তাহাদিগকে অদুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা পূর্ব্বোক্ত কারণই নির্দ্দেশ করিত। রাজা অন্য প্রকার শাসন করিলেও তাহারা উদ্ধার লাভ করতঃ রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হর্ষের পূর্ব্বোক্ত কারণই নির্দ্দেশ করিত। অবশেষে ইন্দ্র মহীপালকে কহিল, হে ভূপাল! আমি সমুদায় জগৎকে আমার দয়িতাময় বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। অধিক কি বলিব, আমি বিনাশ দুঃখেও কাতর নহি। রাজন্! আমার এই দয়িতাও এই জগৎকে মন্ময় অবলোকন করিতেছেন। সেই হেতু শাসন দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র দুঃখ হয় না। মহারাজ! আমি কি?- আমি মনোমাত্র। মনই পুরুষ অর্থাৎ জীব৩১।৩৬। এই দেহ মনেরই কাল্পনিক প্রতিচ্ছায়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বহু দণ্ড প্রয়োগ করিলেও বীররূপ মনকে আপনি অল্পমাত্রও ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না। কে মনকে বাহ্যিক দণ্ডের দ্বারা ভেদ করিতে সমর্থ হয়? দেহ শীর্ণ বিশীর্ণ হউক, আর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হউক, পরন্তু মন সমভাবে অবস্থিতি করিবে। দৃঢ়নিশ্চয়বান্ মনকে ভেদ করিবার জন্য কাহার কি শক্তি আছে? হে নৃপ! মন যদি কোন প্রকার বাঞ্ছিত বিষয়ে একান্ত সমাবিষ্ট ও তদ্গত ভাব প্রাপ্ত হইয়া যায় তাহা হইলে তখন শরীরস্থ ভাব ও অভাব সমুদায়ই বাধিত হইয়া যায়। হে মহীপতে! তীব্রবেগে মনে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই স্থিরভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শারীরিক চেষ্টার ফল সেরূপ নহে। হে রাজন্! বর ও শাপ প্রভৃতি কোন প্রকার ক্রিয়া বাঞ্ছিত বিষয়ে দৃঢ়াভিনিবিষ্ট মনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। মৃগ যেমন মহাশৈলকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, মনুষ্যগণও বাঞ্ছিত বিষয়ে দৃঢ় নিবিষ্ট মনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। হে ভূপতে! এই অসিতাপাঙ্গী রমণী দেবগৃহে প্রতিষ্ঠিতা দেবীর ন্যায় আমার মনঃকোষে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে৩৭।৪৪। মেঘমালা বেষ্টিত গিরি যেমন গ্রীষ্মদাহ অনুভব করে না, তেমনি, আমিও জীবিতেশ্বরী প্রিয়ার সহিত মিলিত থাকিয়া কোন প্রকার দুঃখ অনুভব করি

না। হে নরপতে! আমি যেখানে যেখানে অবস্থান করি, সেই সেই স্থানে বাঞ্ছিতার্থ লাভ ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করি না। (বাঞ্ছিতার্থলাভ=প্রিয়াপ্রীতি অনুভব) আমি আমার দয়িতা অহল্যার মনঃস্বরূপ[৪৬।৪৭]। ইহাতে আমি এরূপ আসক্ত হইয়াছি যে, যত্নশতদ্বারাও বিচলিত হইতে সমর্থ নহি। হে ভূপতে! ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, সুমেরু যেমন শত বজ্রপাতেও বিচলিত হয় না, সেইরূপ, ধীর ব্যক্তির একাগ্রতাপন্ন চিত্তকে বিচলিত করিতে পারা যায় না। হে মহারাজ! বর ও অভিশাপ শরীরের অন্যথা করিতে পারে, মনের কিছুই করিতে পারে না। মন বিজিগীষুর ন্যায় সতেজে অবস্থান করে[৪৮।৪৯]। হে রাজন্! এই যে জীবশরীর দৃষ্ট হইতেছে, এ সকল মনেরই কল্পনা বিশেষ। শরীর মনের উৎপাদক নহে; কিন্তু মনঃ শরীরের উৎপাদক। অর্থাৎ এই সকল শরীর মনোভ্রান্তির দ্বারা নির্ম্মিত। জল যেমন বৃক্ষলতাদিরসের কারণ, সেইরূপ, চিত্তকে আপনি এই সমস্ত শরীরের কারণ বলিয়া জানিবেন[৫০]। হে মহাত্মন্! মনঃই আত্মার প্রথম শরীর অর্থাৎ প্রথম ভোগায়তন। প্রথমে "অহং" এই অভিমান দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়। সুতরাং তাহা মানস সংকল্পের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫১]। মন জগতের প্রথম অঙ্কুর। সেই মনোরূপ অঙ্কুর হইতে ফলপল্লবাদিশালী দেহতরু বিস্তৃত হইয়া থাকে। অঙ্কুর বিনষ্ট হইলে পল্লবশ্রী সমুদিত হয় না; কিন্তু পল্লব বিনষ্ট হইলে পুনর্ব্বার পল্লব হয়; এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, দেহ বিনষ্ট হইলে চিত্ত অভিনব দেহ বিস্তৃত করিতে পারে, কিন্তু চিত্ত বিনষ্ট হইলে তখন সর্ব্বাভাব ঘটনা হয়। অতএব হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বতোভাবে চিত্তরত্ন পরিপালন করুন।

হে মহারাজ! আমি তন্মনস্ক হইয়া সর্ব্বদিকে এই হরিণনয়না যুবতীকে দর্শন করতঃ পরমানন্দ অনুভব করিতেছি। সেইজন্য আপনার ভৃত্য প্রভৃতি পুরবাসীরা আমাকে শস্ত্রাদিদ্বারা ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। করিলেও আমার ক্লেশানুভব হয় না। কারণ, আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত ভৃত্যাদির কথা দূরে থাকুক, প্রেয়সী ব্যতীত অন্য কোন কিছু দেখিতে পাই না[৫২।৫৩]।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতম সর্গ।

বাসুদেব বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐরূপ উক্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভরত নামক মুনিকে বলিলেন, ভগবন্! আমার দারাপহারী এই দুরাত্মা ইন্দ্র বহুবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছে। হে মহামুনে! অবধ্য ব্যক্তির বধ ও বধ্য ব্যক্তি পরিত্যাগ করিলে যে পাপ হয়, তদনুরূপ পাপপরায়ণ এই দুরাত্মাকে অভিশাপ প্রদান করুন[১।৩]।

মহামুনি ভরত রাজশার্দ্দূল কর্ত্তৃক ঐরূপে অভিহিত হইয়া দুরাত্মার পাপ বিচার করত: "রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই এই ভর্ত্তৃদ্রোহকারিণী দুর্ভাগিনী অহল্যার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হ" এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন[৪।৫]। তৎশ্রবণে ইন্দ্র ও অহল্যা রাজাকে ও ভরতকে বলিলেন, তোমরা নিতান্ত দুর্ম্মতি। যাহারা দুশ্চর তপস্যা বৃথা ক্ষয় করে, তাহাদের শাপে আমাদের কিছুই হইবে না। কারণ, আমাদের দেহ নাই, পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা উভয়ে এখন কেবল মন। সুতরাং আমরা সূক্ষ্ম, চিন্ময় ও দুর্লক্ষ্য। কে ঈদৃশ আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়[৬।৮]?

ভানু বলিলেন, অনন্তর প্রগাঢ়স্নেহসম্বদ্ধ ও পরস্পরতন্মনস্কচিত্ত অহল্যা ও ইন্দ্র মহামুনি ভরতের শাপে বৃক্ষবিচ্যুত পল্লবের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল[৯]। পরে তাহারা সুদৃঢ় বিষয়ানুরাগ বশতঃ মৃগযোনি, তদনন্তর বিহঙ্গমযোনি প্রাপ্ত হইল। সে যোনিতেও তাহারা পরস্পরানুরক্ত দম্পতীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল[১০]। তদনন্তর তাহারা বহু জন্মের পর আমাদিগের এই সৃষ্টিতে তপঃপরায়ণ পুণ্যশীল ব্রাহ্মণদম্পতী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন[১১]। সে সময়ে ভরতের শাপ তাহাদের শরীর মাত্র আক্রমণে সমর্থ হইয়াছিল, মন আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই[১২]। তাহারা মোহের বশীভূত হইয়া যে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সেই যোনিতেই তাহারা দম্পতীভাবে অবস্থিতি করিয়াছিল[১৩]। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের অকৃত্রিমপ্রেম-রসসম্বদ্ধ স্নেহ দর্শনে বৃক্ষেরাও প্রেমরসানুবিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গারচেষ্টাকুলিত হইয়াছিল[১৪]।

ইতিহাস সমাপ্ত।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ।

ভানু বলিলেন, হে ভগবন্! আমি ইন্দ্র অহল্যার ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া বলিতেছি যে, মন বড়ই দুরাসদ। মন শাপাদির দ্বারা নিগ্রাহ্য বা ভিন্ন হইবার নহে[১]। হে ব্রহ্মন্! আপনি উক্ত কারণে ইন্দুসন্তানগণের সৃষ্টি বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ সেরূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা মহাত্মাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসমুচিত। হে নাথ! এই জগতে অথবা অন্যান্য জগতে এমন কোন্ বস্তু বিদ্যমান আছে, যাহা আপনার খেদের কারণ হইতে পারে[২।৩]? হে ব্রহ্মন্! মনঃই জগতের কর্ত্তা এবং মনঃই পুরুষ। মন যাহা নিশ্চয় করে, সৃজন করে, তাহা দ্রব্য, ওষধি ও দণ্ডদ্বারা বিনিবৃত্ত হয় না। যেমন কেহ মণিস্থ প্রাতিবিম্বিক দেহ ভেদ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি, মানস সৃষ্টিও কেহ নাশ করিতে পারক হয় না। সেই কারণে বলিতেছি, ইন্দুতনয়গণ ভাস্বর সৃষ্টি-ভ্রান্তিতে অবস্থিতি করুন, তাহাতে আপনার ক্ষতি হইবেক না[৪।৫]। হে জগৎপতে! আপনিও প্রজা সৃষ্টি করতঃ অবস্থিতি করুন। যদি বলেন, কোথায় করিব? তদুত্তরে বলিতেছি, চিত্তাকাশ, চিদাকাশ এবং পরমাকাশ অনন্ত। আপনি স্বীয় চিত্তাকাশে এক, দুই বা বহু সৃষ্টি রচনা করতঃ স্বেচ্ছানুসারে অবস্থিতি করুন। ইন্দুতনয়গণ আপনার কোন কিছু গ্রহণ করে নাই[৬।৭]।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহামুনে! ভানু ঐরূপ কহিলে আমি কিয়ৎকাল চিন্তা করিলাম। পরে বলিলাম, ভানো! তুমি যোগ্য কথাই বলিয়াছ। এই আকাশ, মন ও চিদাকাশ, বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি ইহাতেই অভিমত সৃষ্টি স্থাপন করিয়া নিত্যকর্ম্ম সাধন করিব[৮।১০]। হে ভাস্কর! আমি শীঘ্রই বহুপ্রকার ভূতজাল কল্পনা করিব। কিন্তু হে ভগবন্! এক্ষণে আপনি মৎকৃত সৃষ্টির প্রথম (স্বায়ম্ভুব) মনু হউন এবং আমার অভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

অনন্তর মহাতেজা ভাস্কর মদীয় বাক্য অঙ্গীকার করিয়া আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করতঃ এক ভাগের দ্বারা ঐন্দবসর্গে সূর্য্যত্ব পদে অধিরূঢ়

হইলেন ও আকাশমার্গে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দিবসাবলি বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় দ্বিতীয় ভাগে মনু হইয়া মনুর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন ও মদীয় অভিপ্রেত সৃষ্টি বিস্তৃত করিতে লাগিলেন[১১।১৫]।

হে বশিষ্ঠ! হে মুনে! এই আমি তোমার নিকট মনের স্বরূপ, কার্য্য ও শক্তি কীর্ত্তন করিলাম[১৬]। যে যে রূপে চিত্তের প্রতিভাস সমুদিত হয়, চিত্ত সেই সেই রূপেই প্রকাশিত ও দর্শিত হয়[১৭]। তাহার উদাহরণ দেখ, ইন্দুতনয়গণ সামান্য ব্রাহ্মণ হইয়া চিত্ত প্রতিভাস বলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল[১৮]। যেমন ঐন্দবজীবগণ চৈতন্য ভাব হইতে চিত্তভাব ও চিত্তভাব হইতে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইয়াছিল, তেমনি, আমরাও প্রোক্ত প্রণালীতে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি[১৯]। প্রতিভাসস্বভাব চিত্তের যে প্রতিভাস, তাহাই দেহাদিরূপে প্রতিভাত হয়। চিত্ত ব্যতীত আর কেহ দেহদ্রষ্টা নাই[২০]। চিত্তই কামকর্ম্মাদিবাসনার অনুসারী হইয়া আত্মাতে চমৎকারিত্ব বিস্তার করে[২১]। চিত্তময় আতিবাহিকনামক সূক্ষ্ম দেহও সুনিবিড় ভ্রান্তির ফল। আবার তাহাই অত্যন্ত স্থূল, ভ্রান্তির যোগে জীব এবং ভ্রান্তিবিগমে ব্রহ্ম[২২।২৩]। হে বশিষ্ঠ! চিত্ত ব্যতিরেকে আমি বা দেহশালী অন্য কিছু নাই। এই যে দেহাদি দেখিতেছ, এ সকল ঐন্দবসম্বিদের ন্যায় অসৎ[২৪]। ইন্দুসন্তানগণের ব্রহ্মত্বও মদীয় চিত্তের একাংশ। অর্থাৎ তাহাও মদীয় চিত্তের কল্পনা[২৫]। আমি যে এখানে ব্রহ্মা হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, ইহাও চিত্তের অন্য এক প্রকার বিলাস। পরমাত্মাই, সর্ব্বপ্রপঞ্চশূন্য শূন্যরূপী অত্মাকাশ হইতে যেন পৃথক্ হইয়া দেহাদি আকারে অবস্থিত রহিয়াছেন[২৬]। যাহা বিশুদ্ধ চিৎ তাহাই পরম এবং তাহাই স্বমোহের প্রচ্ছাদনে জীব। সেই জীব মন হইয়া বৃথা দেহাদিভাব অনুভব করে। চিদ্বপু পরমাত্মাই সর্ব্বাত্মা এবং তিনিই ঐন্দব সৃষ্টির ন্যায় মদীয় সৃষ্টির আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। অপিচ, তিনি আপন মায়া শক্তিতে এতদ্রূপ (ব্রহ্মাণ্ডরূপ) দীর্ঘ স্বপ্ন অনুভব করিতেছেন। যেমন ইন্দুপুত্রগণের বিশ্ব দ্বিচন্দ্রাদিদর্শনের ন্যায় ভ্রান্তিবিশেষ, সেইরূপ, মদীয় বিশ্বও ভ্রান্তি বিশেষ অর্থাৎ চিত্তময় ও চিত্তপরিকল্পিত[২৭,২৯]। ইহা সৎ ও অসৎ দুএর বহির্ভূত। কেননা উপলব্ধি কালে সৎ ও অনুপলব্ধি কালে অসৎ বলিয়া অবধারিত হয়[৩০]। সেই সংকল্পাত্মা বৃহদ্বপু মন জড়ও বটে, অজড়ও বটে। যেহেতু তুচ্ছ, সেই

হেতু জড়, এবং যে হেতু ব্রহ্ম, সেই হেতু অজড়[৩১]। মন দৃশ্যানুভব কালে দৃশ্যের ন্যায় এবং ব্রহ্মানুভব কালে ব্রহ্মের সমান হয়। যেমন সুবর্ণে সুবর্ণত্ব ও কটকত্ব অবিরুদ্ধ, তেমনি, মনে জড়াজড়ত্ব অবিরুদ্ধ[৩২]। ব্রহ্ম সর্ব্বময়; সে ভাবে সমস্তই জড় ও সমস্তই চেতন। বলিতে কি, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ বস্তুতঃ জড়াজড়ধর্ম্মবর্জ্জিত। যুক্তি চক্ষে দেখিতে গেলে একেরই উক্ত উভয়বিধতা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় সত্য; পরন্তু পরমার্থ দর্শনে তাহা নির্ধর্ম্মক। অর্থাৎ পরমতত্বে জড়ত্ব ও চৈতন্যত্ব কোনও ধর্ম্মের অবস্থান সিদ্ধ হয় না[৩৩]। যদি বৃক্ষাদি পদার্থ চিন্ময় না হইত, তাহা হইলে ইহ জগতে উপলব্ধি কথা প্রসিদ্ধ থাকিত না। (চৈতন্যোপাদানক) উপলব্ধি ব্যবস্থার নিয়ম এই যে, চৈতন্যে চৈতন্যে সমান হইলে তবে তাহা (উপলব্ধি) প্রসিদ্ধ হয়[৩৪]। * যাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, বস্তুতঃ তাহাও জড় নহে; কিন্তু অজড়। সুতরাং বুঝিতে হইবেক, সমস্তই অজড় এবং চিত্তের রূপ[৩৫]। † অতএব, ইহা জড়, ইহা অজড়; এ সকল কথার কোন বাস্তব অর্থ নাই, কেবল মাত্র কথা ব্যবহার আছে। সে পদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ অনির্দ্দিশ্য; তাহাতে মরুভূমে লতাদির অসম্ভবের ন্যায় ইত্থম্প্রকারে নির্দ্দেশ অসম্ভব[৩৬]। চিত্তের চেত্যাকার হওয়াই মনস্ত্ব এবং তাহাতেই জড়াজড় বিভাগের ব্যবস্থা। তাহার স্ফূর্ত্তিভাগ (চেতনাংশ) অজড় এবং অস্ফূর্ত্তিভাগ চেত্য বা জড়[৩৭]। যাহাকে অববোধ শব্দে বলা যায় তাহা চিদ্ভাগ এবং যাহাকে চেত্য (চিত্তে ভাসমান) বলা যায় তাহা জড়ভাগ। জীব উক্ত প্রণালীক্রমে জগদ্ভ্রান্তি অনুভব করতঃ তাহাতে লোল (অপৃথক ভাব প্রাপ্ত) হইতেছে[৩৮]। অতএব, যাহা শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই উক্ত ক্রমে চিত্ত ও জগৎ এই দ্বিধা আকারে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং সমুদায় জগৎ চিদ্বুদ্ধিতে দেখিলে চিন্ময় (চিৎ পদার্থ ছাড়া নহে), এবং দ্বৈত বুদ্ধিতে দেখিলেও চিন্ময় (চিৎ ছাড়া অন্য

---

* দর্শন শাস্ত্রে লিখিত আছে, বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও মনোবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অভেদ অর্থাৎ অপৃথক্ হইলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। যে বস্তু দূরে থাকে, ইন্দ্রিয়ের অগোচরে থাকে, অনুমানাদির দ্বারা সে বস্তুর জ্ঞান হইলেও তাহা পরোক্ষ থাকে। প্রত্যক্ষ হয় না। এ স্থানে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

† অভিপ্রায় এই যে, সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বিদ্যমান, তদাশ্রয়ে চিত্তের যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হয়, সেই সকল পরিণাম বিষয় বা ব্যবহার্য্য বস্তু নামে প্রসিদ্ধ।

কিছু নহে)[৩৯]। ফলিতার্থ—চিৎই ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনিই আপনাকে অন্যাকারে দেখিতেছে[৪০]। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে যে, পরমার্থ পদে ভ্রান্তি নাই সুতরাং ভ্রান্ত আত্মাও নাই। যেমন জলপূর্ণ সমুদ্রে জল ব্যতীত পদার্থান্তর নাই, তেমনি, পূর্ণস্বভাব চিদ্বস্তুতেও পদার্থান্তর নাই[৪১]। চিত্তের রূপ সমুদায় জড় নামে প্রখ্যাত হইলেও চিতের অতিরিক্ত নহে। কেননা, সেই জড়ভাবেও চিতের ভাব অনুভূত হয়। চিদ্ভাব না থাকিলে স্ফূর্ত্তি পায় না এবং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হইলেও "ইহা জড়" এরূপ অবধারণ হয় না। অতএব, যেমন জড়ে বোধের সত্তা, তেমনি, বোধেও জড়ের প্রতিভাস। যাহা বোধ (চৈতন্য) তাহা চিদ্ভাগ এবং তাহাতে যে অহংএর উদয় হয় তাহা জড়ভাগ[৪২]। বস্তুতঃ পরমার্থদর্শনে (জ্ঞানদৃষ্টিতে) পরতত্ত্ব ব্রহ্মে অনুমাত্রও অহংমমভাবের স্থিতি নাই। যাহা পরতত্ত্ব তাহা সংবিৎসার অর্থাৎ কেবল সংবিৎ (মুখ্যজ্ঞান)। তাহাতে অন্য কোন কিছু নাই[৪৩]। তাহাতে যে চেত্যের উদয় দেখা যায়, যাহা অহং বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা মৃগতৃষ্ণিকার অনুরূপ[৪৪]। যাহাকে অহং বৃত্তির আস্পদ বলিয়া মনে হয়, তাহাকে তুমি নিরাময় পদ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহা বস্তুতঃ অহংএর আস্পদ বা আশ্রয় নহে। লোকে যেমন ঘনীভূত শৈত্যকে হিম বলিয়া জানে, তেমনি, ঘনীভূত বাসনাবিশিষ্ট চিৎকে অহং বলিয়া জানিতেছে[৪৫]। চিৎ আপনিই আপনাতে স্বপ্নে স্বমরণ অনুভবের অনুরূপে জাড্য দর্শন করে। চিৎ যে আপনার বিচিত্রা শক্তি প্রদর্শন করিতেছে, বিস্তার করিতেছে, তাহা জ্ঞানের দৃঢ়তা ব্যতীত উপশান্ত হইবে না[৪৬]। নানাশক্ত্যাত্মক চিত্তরূপ দেহই আতিবাহিক দেহ। তাহা আকাশের ন্যায় বিশদ (স্বচ্ছ)। এবং মনঃপ্রভৃতি পদার্থ তাহারই বিজৃম্ভণ[৪৭]। অতএব, স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ বিস্মৃত হইয়া চিত্তের দ্বারাই চিত্তের বিচার (স্বরূপ, শক্তি ও স্বভাবাদি পরীক্ষা) করা কর্ত্তব্য[৪৮]। যদি চিত্তরূপ তাম্র (তামা) শোধিত হইয়া (রসায়ন দ্বারা) পরমার্থরূপ সুবর্ণে পরিণত হয়, তাহা হইলে অকৃত্রিম পরমানন্দ লব্ধ হয়। তখন আর দেহরূপ প্রস্তর খণ্ডে প্রয়োজন থাকে না[৪৯]। আরও দেখ, যাহা থাকে বা আছে, তাহারই শোধন কর্ত্তব্য। যাহা নাই তাহার আবার শোধন কি? যেমন আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি, আত্মায় দেহাদিও নাই। "ইহা দেহ" এ প্রতীতি কেবল

মিথ্যাজ্ঞানের প্রকারভেদ। যদি তাহা সৎ হইত তাহা হইলে তৎপ্রতি আগ্রহ করিতে (আমার বলিয়া অভিমান করিতে) আপত্তি উত্থাপিত হইত না৩০। যাহারা অসৎ দেহাদিতে বৃথা অহং মম (আমি ও আমার ইত্যাকার) অভিমান ধারণ করিতেছে তাহারাই আত্মাদি শব্দ সমূহকে দেহবাচী বলিয়া উপদেশ করে৩১। মূর্ত্তিরহিত চিত্ত দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে মূর্ত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। তাহার নিদর্শন—পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র, অহল্যা এবং ইন্দুপুত্রগণ। তাহারা দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে সেই সেই প্রকার হইয়াছিল৩২। চিত্ত যখন যে ভাবে স্ফূর্ত্তি পায় তখন তাহাই হয়। সুতরাং বুঝা উচিত যে, বাস্তব পক্ষে দেহও নাই, অহংও নাই। কেবল এক অখণ্ড বিজ্ঞান মাত্র আছে, তাহা বিজ্ঞাত হইয়া তুমি ইচ্ছাবিহীন হইয়া সুখে অবস্থান কর৩৩। বালক যেমন ভূতের কল্পনা করিয়া ভীত হয়, আবার কল্পনা পরিত্যাগ করিলে নির্ভয় হয়, তেমনি, "এই আমার দেহ" ইত্যাকার কল্পনা করিলে সংসারভয় ও ঐ কল্পনা পরিহার করিলে নির্ভয় হইতে পারা যায়৩৪।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! সেই ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে ঐরূপ কহিলে পুনর্ব্বার আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, হে ভগবন্! আপনি বলিলেন, শাপ মন্ত্রাদির শক্তি সমুদায় অমোঘ, অথচ সে সকলও ব্যর্থ হয়। কেন ব্যর্থ হয়? তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। অপিচ, শাপ ও মন্ত্রের প্রভাবে জন্তুগণের মন, বুদ্ধি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল বিমূঢ় হইতে দেখা যায়। যেমন পবন ও স্পন্দন এবং তিল ও তৈল পরস্পর অভিন্ন; দেহ ও মন কি তদ্রূপ অভিন্ন? অথবা দেহ নাই? আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার যে প্রকার জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, দেহ বিনষ্ট হইলে মনও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আবার মনে হইতেছে, চিত্তই স্বপ্নের ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বৃথা দেহভাব অনুভব করিতেছে। ঐ সকল বিচার করিয়া আমার এই সন্দেহ জন্মিতেছে যে, দেহ এবং মন, উভয়ের মধ্যে একের নাশ হইলে উভয় বিনষ্ট হয় কি না। অতএব, হে প্রভো! মন কেনইবা শাপাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়? আবার কেনইবা শাপাদির দ্বারা আক্রান্ত হয় না? যাহা এই বিষয়ের গূঢ় রহস্য, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১।৭]। ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহামতে! এই জগৎকোশে এমন কিছুই নাই, যাহা শুভকর্ম্মানুপাতী পুরুষকারের দ্বারা না পাওয়া যায়[৮]। এই জগতে ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় দেহধারী দ্বিশরীরী। এক শরীর মনোময়, অপর শরীর মাংসময়। মনোময় শরীর অতিচঞ্চল এবং অতিক্ষিপ্রকারী। মাংসময় শরীর স্থূল এবং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর[৯।১০]। সেইজন্য এই মাংসময় শরীর শাপ, অভিচার, বিদ্যা, শস্ত্র ও বিষাদির দ্বারা অভিভূত হয়[১১]। এ শরীর মূক, অশক্ত, দীন, ক্ষণভঙ্গুর ও পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় চপল এবং দৈব, বাক্য ও প্রভু প্রভৃতির বশ্য হয়[১২]। শরীরীদিগের মনঃশরীর ভূতগণের আয়ত্তও বটে, অনায়ত্তও বটে[১৩]। পৌরুষ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেও ঐ অনিন্দিত শরীরকে অনেক সময়ে আক্রমণ করা যায় না[১৪]। নিয়তির নিয়ম এই যে, দেহীদিগের মনোরূপ দেহ যে

প্রকার যত্নপরায়ণ হয় সেই প্রকারই হয়। কারণ, এই শরীরই আপন নিশ্চয়ের ফলভাগী[১৫]। মাংসদেহের চেষ্টা সফল হয় না, কিন্তু মনোময় দেহের সমুদায় চেষ্টা সফল হইয়া থাকে[১৬]। যে চিত্ত সর্ব্বদা পবিত্র বিষয়ের স্মরণ করে, অভিশাপাদি সে চিত্তে শিলানিক্ষিপ্ত সায়কের ন্যায় বিফল হয়[১৭]। মাংসশরীর জলমগ্ন, বহ্নিপ্রবিষ্ট বা কর্দ্দমপতিত হইলেও তাহার প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি মনের অনুসন্ধান অনুসারেই হইয়া থাকে[১৮]। হে মহামুনে! পুরুষকারান্বিত মন সর্ব্ববস্তু উপমর্দ্দন করিয়া ফলপ্রদ হয়[১৯]। স্মরণ কর, ইন্দ্র পুরুষকার দ্বারা চিত্তকে প্রিয়াময় করিয়া ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া অনুভব করে নাই[২০]। মাণ্ডব্য মুনিও পৌরুষ প্রযত্নে মনকে রাগবিহীন ও বিগত-সন্তাপ করিয়া শূলপ্রান্তে অবস্থিতি করিয়াও দুস্তরতর ক্লেশকে পরাজিত করিয়াছিলেন[২১]। দীর্ঘতপা নামে এক মহর্ষি কূপে নিপতিত হইয়া তথায় মানসিক যজ্ঞ করিয়া বিবুধপদ (দেবত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২২]। ইন্দুতনয়গণ নর হইয়াও ধ্যানরূপ পুরুষকারের দৃঢ়তায় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল[২৩]। অন্যান্য অনেক ধীর মহর্ষিগণ ও দেবগণ চিত্ত হইতে স্বীয় অনুসন্ধান (ব্রহ্মাত্ম-উপাসনা) পরিত্যাগ করেন নাই[২৪]। যেমন শিলা, পদ্মের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয় না, তেমনি, সর্ব্বপ্রকার আধি, ব্যাধি, শাপ, রাক্ষস ও পিশাচাদি, চিত্তকে খণ্ডিত করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা শাপাদির দ্বারা বিচলিত হয়, বুঝিতে হইবে, তাহাদিগের মনোবিবেকের অক্ষমতাই তাহার কারণ[২৫।২৬]। যাহারা সাবধান চিত্ত, তাহারা এই সংসারে কি স্বপ্ন, কি জাগ্রৎ, কোনও অবস্থায় দোষজালে জড়িত হয় না[২৭]। রামচন্দ্র! সেইজন্য ঋষিদিগের উপদেশ—পুরুষ পুরষকার সহকৃত মনের দ্বারা আপনিই আপনাকে পবিত্র পদে নিয়োজিত করিবেন[২৮]। মনে কোনও বিষয় অল্পমাত্র প্রতিভাত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা নিরূঢ় ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া উপ-ভোগক্ষম হয়[২৯]। যেমন কুম্ভকারের ব্যাপারের পর মৃৎপিণ্ড পিণ্ডভাব পরিত্যাগ করিয়া ঘটভাব ধারণ করে, সেইরূপ, পুরুষের দৃঢ় ভাবনার দ্বারাও তদীয় প্রাক্তনভাব বিনষ্ট হইয়া পরবর্ত্তী ভাব নিরূঢ় হয়[৩০]। হে মুনে! সলিল যেমন স্পন্দন মাত্রে তরঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, মনঃও ক্ষণমধ্যে ভাবনার দ্বারা অভিনব ভাব্যের প্রতিভাসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং প্রাক্তন ভাব পরিত্যাগ করে[৩১]। মন কেবল মাত্র ভাবনার দ্বারা

সূর্য্যবিম্বে যামিনী ও চন্দ্রবিম্বে দ্বিত্ব দর্শন করে। (দিবসে অন্ধকার দেখে এবং রাত্রেও চন্দ্রদ্বয় দর্শন করে)৩২। চিত্ত ভাবনার দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলকে শত শত অগ্নিশিখা সম্পন্ন দর্শন করে ও তৎকর্ত্তৃক দাহ অনুভব করে (বিরহী ব্যক্তি তাহার নিদর্শন। বিরহীরা জ্যোৎস্নার আলোকেও গাত্রদাহ অনুভব করে)৩৩,৩৪। চিত্ত প্রতিভার অনুগামী হইয়া লবণ রসকে মধুর জ্ঞানে পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে৩৫। চিত্ত কখন কখন নভোমণ্ডলে মহাবন অবলোকন করে ও তাহা ছেদন করিয়া তাহাতে উৎপল রোপণ করে। মন এবম্প্রকারে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কল্পনাজাল বিস্তার করিয়া সে সকল দর্শন করিয়া কখন হৃষ্ট, কখন তুষ্ট, কখন পুষ্ট, কখন রুষ্ট, কখন সুখী, কখন দুঃখী হয়। হে তাত! তুমি এই জগৎকে সৎ ও অসৎ দুএর বহির্ভূত বিবেচনা করতঃ ভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে৩৬,৩৭।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম সর্গ।
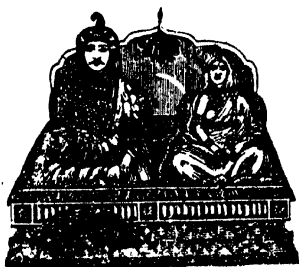
বশিষ্ঠ বলিলেন, পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিলাম[১]। অব্যক্তনামরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রথমতঃ নামোল্লেখের অযোগ্য (নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া নামোল্লেখের অযোগ্য) স্পন্দাত্মক ও নির্ব্বিকল্পজ্ঞান সদৃশ সর্ব্বপ্রপঞ্চবীজ উৎপন্ন হয়। কাল্পিক (কাল্পিক = কল্পারম্ভ সম্বন্ধীয়) পরিণামে তাহা স্বয়ং (আপনা আপনি) ঘনতা প্রাপ্ত হইয়া (নিবিড় হইয়া) সংকল্পবিকল্পশক্তিমৎ মনোরূপে উৎপন্ন হয়[২]। অনন্তর সেই মন আপনাতে সূক্ষ্ম ভূতের কল্পনা করে এবং তৎপরে তদ্দ্বারা আপনার স্বাপ্নশরীরের ন্যায় বাসনাময় শরীর কল্পনা করে। সেই তেজঃপ্রধান সমষ্টিসূক্ষ্মশরীর উপাধানে উৎপন্ন তৈজস পুরুষ (আত্মা) আপনার "পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা" এই নাম নির্দ্দেশ বা কল্পনা করেন[৩]। সুতরাং হে রামচন্দ্র! যিনি ব্রহ্মা তিনিই মন[৪]। এই মনস্তত্ত্বাকার ব্রহ্মা সঙ্কল্পময়ত্বহেতু যাহা সংকল্প করেন তাহাই দেখিতে পান[৫]। এই মন কর্তৃক অনাত্মায় আত্মাভিমানরূপিণী অবিদ্যা পরিকল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্মা তাদৃশী অবিদ্যার দ্বারা যথানুক্রমে এই গিরি, তৃণ ও জলধি সমন্বিত জগৎ রচনা করিয়াছেন[৬]। উক্ত প্রকারে, ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে এই জগৎ সমাগত হইলেও বুদ্ধিমোহ বশতঃ তার্কিকগণ ইহাকে কেহ প্রধান কেহ বা পরমাণু প্রভৃতি হইতে সমাগত বিবেচনা করেন[৭]। কিন্তু রাঘব! অর্ণবে তরঙ্গোৎপত্তির ন্যায় এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মেই সমুৎপন্ন হইয়াছে[৮]। পরমার্থতঃ অনুৎপন্ন এই জগতে ব্রহ্মার যে মনোরূপা চিৎ (চৈতন্য), তাহা সমষ্ট্যহংকাররূপ উপাধিতে আবিষ্ট হইয়া পরমেষ্ঠিতা (ব্রহ্মতা) প্রাপ্ত হয়[৯]। যাহা ব্যষ্ট্যহঙ্কারোপহিত অন্তঃস্থর চিৎশক্তি অর্থাৎ প্রতিবিম্বরূপা চিচ্ছক্তি এবং যাহা পিতামহরূপ মনোদ্বারা সমুল্লসিত হয়, সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাস উপাধির অসংখ্যতায় অসংখ্য ও সংসরণশীল জীব[১০।১১]। তাহারা চিদাকাশ হইতে সমুৎপন্ন ও মায়াকাশে ভূতোপাধির সহিত মিলিত হইয়া আকাশস্থ বাতস্কন্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে, যে ভূতজাতিতে যেরূপ

বাসনায় ও যেরূপ কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়, পরে সেই ভূত জাতির সাহায্যে প্রাণশক্তিদ্বারা হয় স্থাবর না হয় জঙ্গম শরীরে প্রবেশ করতঃ শুক্রশোণিতাদিরূপ বীজতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে[১৩]। অনন্তর তাহারা বাসনানুরূপ কর্ম্মকারী ও তৎফলভাগী হয়[১৪]। পরে তাহারা বাসনানুযায়ী কর্ম্মরজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কখন ভ্রান্ত, কখন উর্দ্ধগামী ও কখন অধোগামী হইতে থাকে[১৫]। কর্ম্ম ও কর্ম্ম-বাসনার বীজ ইচ্ছা অর্থাৎ কাম বা রাগ[১৬।১৭]। ঐ সকল জীবের মধ্যে কেহ কেহ, যাবৎ না পরম তত্ত্ববোধ হয় তাবৎ, সহস্র সহস্র জন্মকর্ম্মরূপ বায়ুর দ্বারা পরিভ্রান্ত হইয়া বনপর্ণবৎ বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে। কেহ বা অজ্ঞানবিমোহিত হইয়া এই সংসারে বহুশত কল্প উত্তমাধমভাবে অবস্থিতি করতঃ অসংখ্য জন্মপরম্পরা ভোগ করে। কোন কোন জীব কতিপয় অশুভ জন্ম অতিক্রম করতঃ শুভকর্ম্মপরায়ণ হইয়া এই জগতে উত্তম জন্ম লাভ করতঃ বিহার করে[১৮।১৯]। বাতোদ্ধূত জলপরমাণু যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, কেহ কেহ পরমাত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া পরমাত্মায় বিলীন হয়[২০]। সেই অনাদি ব্রহ্মপদ হইতে এইরূপে জীব সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এ উৎপত্তি রজ্জুতে সর্পোৎপত্তির ন্যায় অসত্য। এই সারশূন্যা অসত্যা সৃষ্টি বাসনাবিষধারিণী, জরকারিণী, অনন্তসঙ্কটজননী, এবং অনর্থকার্য্যের সংকারকারিণী। ইহা নানা দিক, নানা দেশ ও নানা কাল যুক্তা ও নানাপ্রকার শৈলকন্দরাদি-ধারিণী, আবির্ভাব ও তিরোভাবময়ী এবং অতীব বিচিত্রা[২১।২৩]।

হে রামভদ্র! এই মনোময় জগৎরূপা জীর্ণবল্লী তত্ত্বজ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা ছিন্না হইলে পুনর্ব্বার আর সমুৎপন্ন হয় না[২৪]।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

—*—

বশিষ্ঠ বলিলেন, "রাম! এক্ষণে তোমার নিকট আমি উত্তম, মধ্য ও অধম প্রাণি-নিবহের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিব, প্রণিহিত হও। জীব পূর্ব্বকল্পীয় শেষ জন্মে শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়াও গুরুর অলা কিম্বা অন্য প্রতিবন্ধক বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ হইয়া মৃত হ সেই জীব এতৎ কল্পের প্রথম জন্মেই জ্ঞান লাভের যোগ্য হইয়া উ পন্ন হয়। এই শ্রেণীর জীবের তাদৃশ জন্ম প্রথম নামে বিখ্যাত। প্রথমতা পূর্ব্বকল্পীয় শুভাভ্যাসের ফল। প্রথম অর্থাৎ উত্তম। এরূ উত্তম জন্ম পাইলে সে, সেই জন্মেই সংসারমুক্ত হয়। সে যদি বৈরা গ্যের অল্পতা বশতঃ শুভলোক প্রাপ্তির ইচ্ছায় উপাসনাদি করিয়া থাকে, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার বিচিত্র সংসার বাসনা সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে, পর পর কতিপয় শুভ জন্ম গ্রহণ করিয়া বাসনা ক্ষয় করে এবং বাসনা ক্ষয়ের পর সংসারমুক্ত হয়। তাদৃশ জন্ম মধ্যম ও গুণপীবর নামে অভিহিত হয়। আর যে জন্ম তাদৃশ তাদৃশ অর্থাৎ সেই সেই সুখ-দুঃখফলপ্রদানসমর্থ দুর্ব্বাসনা ও দুষ্কর্ম্ম বহুল, সে জন্ম অধমসত্ত্ব নামে-খ্যাত। যে জন্ম বিচিত্র সংসারবাসনাযুক্ত ও সহস্র সহস্র জন্মের পর জ্ঞানপ্রদ হয়, সে জন্ম ধর্ম্মানুমানদ নামের যোগ্য। সেইজন্য তাহা অধমসত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। যে জন্ম অত্যন্তশাস্ত্রাদিবহির্ম্মুখতা উৎপাদন করে, আর যদি অসংখ্য জন্ম ভোগের পরেও মোক্ষ লাভ সন্দিগ্ধ হয়, সে জন্ম অত্যন্ত তামস। পূর্ব্বকল্পীয় বাসনা অনুসারে এতৎ কল্পে যে জন্ম হয়, এবং যদি তাহাতে তাহার সর্গ নরক প্রাপক চরিত্রাদি দৃষ্ট হয়, তবে তাদৃশ মনুষ্যরূপ জন্মকে রাজসজন্ম বলিয়া জানিবে। রাজসজন্মোচিত দুঃখানুভবের পর বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলে মুমুক্ষুগণ সেরূপ জন্মকে মোক্ষলাভের উপযুক্ত বলেন। পরন্তু আমি সেই উৎপত্তিকে রাজস-সাত্ত্বিক বলিয়া অনুমান করি। আর যদি যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি কতিপয় জন্মের পর ...

প্রাপ্তিক্রমে মোক্ষলাভ হয়, তবে, সে জন্ম আমার মতে রাজস-রাজস (রাজস=রজোগুণপ্রধান)। যেরূপ জন্মই হউক, শত শত জন্মের পরে চিরাভিলষিত মোক্ষ পদ উপস্থিত হইলে সাধুগণ সেরূপ জন্মকে রাজস-তামস বলেন। সহস্র সহস্র জন্মের পরেও যদি মোক্ষলাভ সন্দিগ্ধ হয় (সন্দেহ যুক্ত। মোক্ষ হয় কি না হয়, এরূপ মনে হয়) তাহা হইলে সে উৎপত্তি রাজসাত্যন্ততামস বলিয়া খ্যাত। যে উৎপত্তিতে সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ হয় অথচ মোক্ষ পথে মতি হয় না, সে উৎপত্তিকে মহর্ষি-গণ তামস জন্ম বলেন। তামস জন্মের প্রথমেই যদি মোক্ষ পথ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাদৃশ জন্মকে তত্ত্বজ্ঞগণ তামস-সত্ত্ব নাম প্রদান করেন। যদি কতিপয় জন্মের পরেই মোক্ষাধিকারী হইয়া উৎপন্ন হওয়া যায় তাহা হইলে সেই রজস্তমোগুণবহুলা উৎপত্তি তমোরাজস আখ্যা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব সহস্র জন্ম ও আগামী শত জন্ম ভোগের পরে যদি মোক্ষের উপযুক্ত হওয়া যায় তাহা হইলে সে উৎপত্তিকে তামস-তামস (তামস= তমোগুণবহুল) বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বলক্ষজন্ম ও আগামী লক্ষজন্ম অতিক্রম করিলেও যদি মোক্ষ সন্দিগ্ধ (মোক্ষ কখনও হইবে কি না এরূপ সন্দেহ) হয়, তাহা হইলে তাদৃশ জন্ম অত্যন্ত তামস বলিয়া জানিবে। যত প্রকার জন্মের কথা বলিলাম, সমস্তই সেই ব্রহ্ম হইতে পয়োরাশি হইতে ঊর্ম্মিমালার ন্যায় সমাগত হয় বলিয়া জানিবে[১০।২০]। সমুদায় জীব তেজোময় ও স্পন্দনস্বভাব দীপ হইতে রশ্মিমালা নির্গমের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছে। দৃশ্যমান ভূতপংক্তি প্রজ্জলিত অনল হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। দৃশ্যদৃষ্টি মাত্রেই চন্দ্রবিম্ব হইতে অংশু সমূহের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে[২১।২৩]। কনক হইতে কটক ও অঙ্গদ কেয়ূরাদির উৎপত্তির ন্যায় এই সকল জীব ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। নির্ম্মল নির্ঝর সলিল হইতে বিন্দু (জলকণা) উদ্ভবনের ন্যায় এই নিখিল ভূত সেই অনাময় ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যেরূপ সলিল হইতে শীকর, আবর্ত্ত, লহরী ও বিন্দুসমূহের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ, এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দৃশ্যদৃষ্টি ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। যেমন মৃগতৃষ্ণাতরঙ্গিণী মরু নিপতিত ভাস্করতেজ হইতে ভিন্ন নহে, যেমন শীতরশ্মির আলোক চান্দ্র তেজ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, এই ভূতজাতি যাহা হইতে সমাগত

তাহা হইতে ভিন্ন নহে। এ সমস্তই তাঁহাতে উৎপন্ন ও তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে।

হে রামচন্দ্র! পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গরাশি উৎপত্তির ন্যায় এই ব্যবহারশালিনী শ্রী, (সংসার রূপ দৃশ্য সম্পত্তি) ভগবান্ ব্রহ্মার ইচ্ছায় বিবিধ জগতে সমাগত, নিপতিত, উৎপতিত ও জাত হইতেছে[২৬।৩২]।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যদ্রূপ তরু হইতে যুগপৎ (অভিন্ন সময়ে) পুষ্প গন্ধ সমুৎপন্ন হয় বলিয়া অভিন্ন, তেমনি, সেই পরম পদ হইতে গপৎ প্রকাশিত কর্ত্তা ও কর্ম্ম অভিন্ন[১]। যদ্রূপ অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে র্ম্মল নভোমণ্ডলে নীলিমা প্রস্ফুরিত হয়, তদ্রূপ, নির্ম্মল ব্রহ্মে জীব-াবের প্রস্ফুরণ হইতেছে[২]। হে রঘুনাথ! অল্প বিবেক দৃষ্টি পরিচালন রিলেই দেখা যায়, যে অবস্থায় অজ্ঞসম্মত ব্যবহারের প্রচলন, সেই বস্থার কথা—জীব ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। কিন্তু ঐ কথা তত্ত্বজ্ঞগণের ্যবহারে অশোভন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত। যুক্তিপক্ষ বা জ্ঞানিপক্ষ এই য়, যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তাহা বাস্তব উৎপন্ন নহে। উৎপন্ন না ইলেও, যাবৎ না দ্বৈতকল্পনা অপনীত হয়, তাবৎ উপদেশ্য, উপদেশক ও উপদেশ কার্য্যকারী হইয়া থাকে। অতএব, ভেদদর্শী[৩] দিগের প্রতি "জীব নিশ্চয়ই ব্রহ্ম" এরূপ উপদেশ অনুপযুক্ত নহে, প্রত্যুত উপযুক্ত[৩।৬]। জ্ঞানচক্ষুঃ বিকশিত হইলে স্পষ্টই দেখা যায়, এই জগৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু হইতে জলে তরঙ্গোৎপত্তির অনুরূপে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং ইহা তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। পরন্তু ভ্রান্তি বশতঃ পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হইতেছে[৭]। এ পর্য্যন্ত অনেক পর্ব্বতাকার জীবদেহ উক্ত পরম পদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনঃ তাহাতে বিলীন হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে[৮]। যদ্রূপ নিকুঞ্জস্থ পাদপে পল্লবের উৎপত্তি ও অবস্থিতি, সেইরূপ, ব্রহ্মেই অনন্ত জীব রাশির উৎপত্তি ও অবস্থিতি[৯]। যেমন বসন্তকাল আগতে নূতন নূতন অঙ্কুরের উদ্ভব হয় ও গ্রীষ্ম সমাগমে সে সকল লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সৃষ্টিকালে জীব সংখ্যার উৎপত্তি ও প্রলয় কালে সে সংখ্যার বিলয় হইয়া থাকে[১০]। এ সকল, সে সকল ও অন্যান্য জীব সকল (যাহারা ভবিষ্যতে প্রকট প্রাপ্ত হইবে তাহারা) সমস্তই সেই পরম তত্ত্বে উৎপন্ন, স্থিত ও প্রলীন হয়[১১]। হে রামচন্দ্র! যেমন পুষ্প ও তদ্গন্ধ পৃথক্ নহে, তেমনি, পুরুষ ও কর্ম্ম পৃথক্ নহে। কেননা, উক্ত উভয়ই সেই পরদেশ হইতে সমাগত ও পরদেশে বিলীন

হয়[১২]। দৈত্য, উরগ, নর ও অমরগণ বস্তুতঃ উৎপন্ন না হইলেও ভাবতঃ অর্থাৎ বাসনা প্রবাহের দ্বারা উৎপন্নপ্রায় ও স্থিত হইতেছে[১৩]। হে সাধো! ঐরূপ উৎপত্ত্যাদির প্রতি আত্মবিস্মৃতি ব্যতীত কারণান্তর দৃষ্ট হয় না[১৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ধর্ম্ম বিষয়ে (ব্রহ্ম বিষয়েও বটে) শ্রুতি ব্যতীত প্রমাণান্তর নাই। একমাত্র শ্রুতিই উক্ত উভয়ের অস্তিত্বাদি সাধক প্রমাণ। যাঁহাদের জ্ঞান তৎপ্রসূত, তাঁহারা প্রামাণিক এবং তাঁহাদের দৃষ্টি প্রামাণিকদৃষ্টি নামে প্রসিদ্ধ। রাগদ্বেষাদিবিহীন প্রামাণিকদৃষ্টি মন্বাদি ঋষিগণ ধর্ম্মব্রহ্ম বিষয়ে অবিসম্বাদিনী। তাঁহারা শ্রুতিমূলা যুক্তির দ্বারা যাহা নির্ণয় ও নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে শাস্ত্রসংজ্ঞায় অবস্থিত। আর যাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্বগুণোপেত রাগদ্বেষাদিবিহীন ও নিরতিশয়ানন্দব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী তাঁহারা সাধু সংজ্ঞায় পরিগণিত। সাধুদিগের আচার ও শাস্ত্র এই দুইটী ধর্ম্মব্রহ্ম দেখিবার দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষুঃ। যাহারা অবোধ, কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত তাহাদের ঐ দুই চক্ষুর (সদাচারের ও শাস্ত্রের) অনুগামী হওয়াও উচিত[১৫।১৭]। যে ব্যক্তি স্বর্গের ও মোক্ষের উপায়ীভূত তাদৃশ শাস্ত্রের ও সদাচারের অনুবর্ত্তী না হয়, সে, ইহলোকে শিষ্টগণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত ও পরলোকে মহাদুঃখে নিপতিত হয়, ইহা সাধুগণের ও সৎশাস্ত্রের ঘোষণা। তাদৃশ শাস্ত্রে ও সাধু দিগের সমবায়ে (সমাজে) এ কথাও নিরূঢ় আছে যে, কর্ত্তা ও কর্ম্ম পরস্পর পর্য্যায়ক্রমে সংগত অর্থাৎ হেতু-ফল-ভাবে অবস্থিত। ফলিতার্থ এই যে, কখন কর্ম্মের ফল কর্ত্তা এবং কখন বা কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বের ফল কর্ম্ম। কেননা, কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তা উৎপন্ন হন এবং কর্ত্তা কর্ত্তৃক কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। আরও বিশদ কথা—জন্তুগণ বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্ম হইতে এবং অঙ্কুর হইতে বীজের ন্যায় জন্তুগণ হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে[১৮।২১]। জন্তুগণ যেরূপ বাসনা লইয়া ভবপিঞ্জরে জন্ম গ্রহণ করে, জন্মের পর তাহারই অনুরূপ ফল অনুভব করে[২২]। হে ব্রহ্মন্! যদি এই সিদ্ধান্তই খাঁটি হয় তাহা হইলে আপনি যে জন্মবীজ কর্ম্মের কথা না বলিয়া ব্রহ্মপদ হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হওয়ার কথা বলিলেন, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে[২৩]? [illegible] অর্থাৎ কা[illegible]শূন্য মায়াশবল ব্রহ্মে আকাশাদি স্থূল দেহান্ত সৃষ্টিরূপ [illegible]মান আছে এবং স্থূল সূক্ষ্ম

দেহাদিতে ভোগ ও ভোগসামগ্রী (কারণ পুঞ্জ) সৃষ্টিরূপ ফল প্রসক্ত (সংলগ্ন) আছে, অপিচ, জন্মের সহিত কর্ম্মের, হেতু-ফল-ভাব নির্দ্ধারিত আছে, আপনার উক্তবিধ কথায় সে নির্দ্ধারণ প্রমার্জ্জিত [illegible] তেছে। আরও দেখুন, আপনি ঐ দুই সিদ্ধান্তকেও নিরাকৃত করিতেছেন[২৪,২৫]। অপিচ, এই এক বিশেষ দোষ প্রসক্ত হইতেছে যে, যদি কর্ম্মফল না থাকে, তাহা হইলে নরকাদি ভয়ের অভাবে লোক সকল পরস্পর পরস্পরকে হিংসন ভক্ষণাদি করিয়া ও সঙ্কর অতিসঙ্কর করিয়া অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যাওয়াই সম্ভব হয়[২৬]। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! নিষ্পাদিত কর্ম্ম, ফলে পরিণত হয় কি না, এই বিষয়ে যে আমার সংশয় হইয়াছে, সে বিষয়ের তত্ত্ব কি? রহস্য কি? আপনি তত্তাবৎ বর্ণন করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদ করুন[২৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ। যাহাতে তুমি ঐ বিষয়ে উত্তমরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পার, তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২৮]।

যাহা কর্ত্তব্যানুসন্ধানরূপ মানসী ক্রিয়া, মনের বিকাশ, তাহাই কর্ম্ম-বীজ। * কেননা, তাহারই অনন্তর ক্রিয়ানিষ্পত্তিরূপ ফল হইতে দেখা যায়[২৯]। সৃষ্টির আদিতে যে সময়ে পরম পদ হইতে মনোরূপ তত্ত্ব (হিরণ্যগর্ভ) সমুৎপন্ন হইয়াছিল সেই সময় হইতেই জন্তুগণের কর্ম্ম সমুত্থিত হইয়াছে ও তখন হইতেই জীব প্রাক্তন কর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া আসিতেছে[৩০]। যেমন পুষ্প ও তদন্তর্গত সৌগন্ধ অভিন্ন ভাবে অবস্থিত, তেমনি, কর্ম্ম ও মন পরস্পর অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। বুধগণ স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াকেই [illegible] নামে [illegible] (মনে যে কর্ম্মসংস্কারাত্মিকা ক্রিয়া [illegible] অবস্থিত থাকে [illegible] অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্ট যথাকালে দেহাদি ও স্বর্গনরকাদি ফলে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।) এই যে কর্ম্মের আশ্রয় [illegible] পূর্ব্বে মনোরূপে অবস্থিত ছিল। কারণ, মনঃ অগ্রে ভবিষ্যদ্দেহের [illegible] তাহার তদনুরূপ শরীর [illegible] তাহাও [illegible]

* মনে যাহা যেরূপ [illegible] বিষয় [illegible] করে, বাক্য [illegible] নির্দ্ধারিত [illegible] কারণ।

নও।৩২। শৈল, ব্যোম, সমুদ্র, স্বর্গ বা নরক, সমস্তই আত্মকৃত কর্ম্মের ফল, তদতিরিক্ত নহে৩৩। ঐহিক কর্ম্মই হউক, আর প্রাক্তন কর্ম্মই বা হউক, সমস্তই পৌরুষপ্রযত্ন বিশেষ। সুতরাং তাহা নিষ্ফল হইবার নহে৩৪। যেমন কৃষ্ণতা ক্ষীণ হইলে কজ্জলত্বও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, স্পন্দধর্ম্ম প্রাণের স্পন্দন বা কর্ম্ম বিরত হইলে মনও ক্ষীণ হইয়া যায়৩৫। কর্ম্মনাশে মনোনাশ ও মনোনাশে কর্ম্মনাশ অবশ্যম্ভাবী। মনোলয় মূলক অকর্ম্মতা মুক্ত পুরুষে প্রসিদ্ধ। অন্যত্র নহে৩৬। যেমন বহ্নি ও ঔষ্ণ্য সদা সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ অপৃথক্, তেমনি, চিত্ত ও কর্ম্ম নিরন্তর সংশ্লিষ্ট সুতরাং একতরের অভাবে অন্যতরের বিলয় অবশ্যম্ভাবী৩৭। চিত্ত সর্ব্বদাই স্পন্দনরূপ বিলাসে সমবেত হইয়া কর্ম্মসিদ্ধ আকারে (বিহিতনিষিদ্ধ নিষ্পাদন দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে বা অদৃষ্টের আকারে) পরিণত হয়, এবং কর্ম্মও চিত্তের ফলভোগানুরূপ স্পন্দাত্মক বিলাসের সহিত মিলিত হইয়া চিত্তরূপে পরিণত হয়। এইরূপে চিত্ত ও কর্ম্ম পরস্পর ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়া লোক মধ্যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে৩৮।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।